অমৃত সঞ্চয়

মহাশ্বেতা দেবী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড্, কলিকাতা-৭

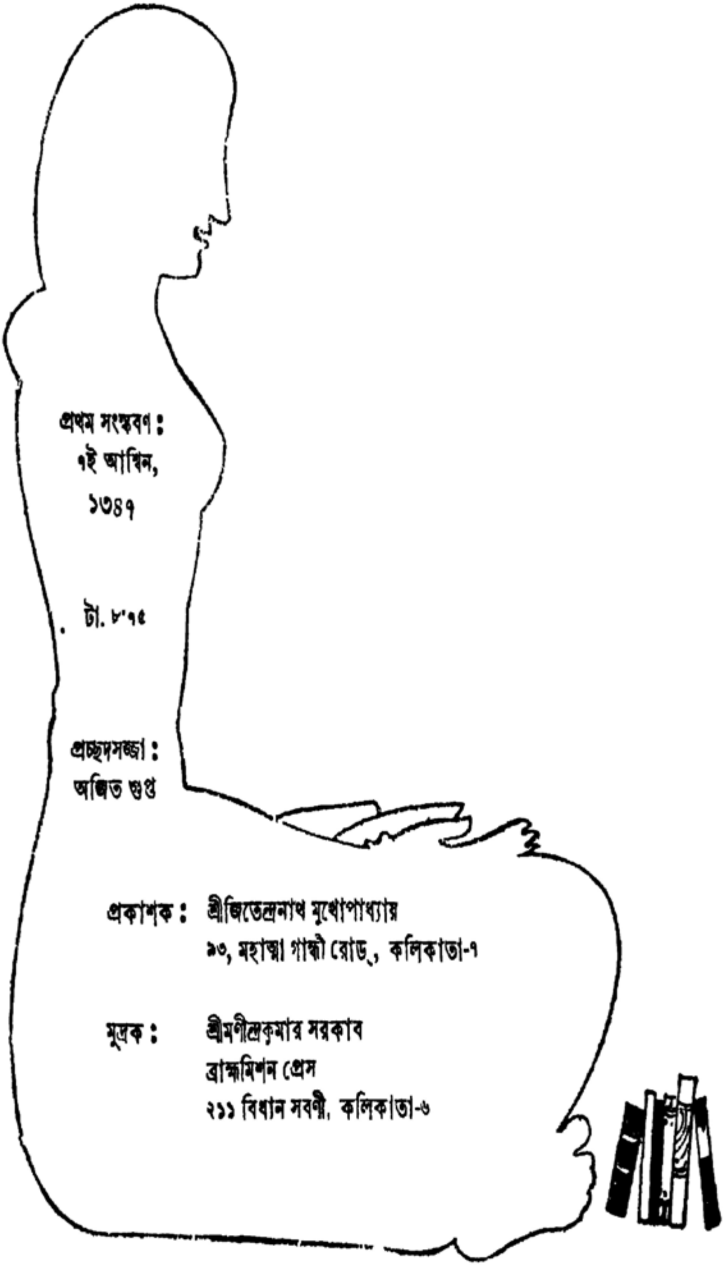

প্রথম সংস্করণ :
৭ই আশ্বিন,
১৩৪৭

টা. ৮'৭৫

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড্, কলিকাতা-৭

মুদ্রক : শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

৺অতুলচন্দ্র গুপ্ত

৺সুরেন্দ্রনাথ সেন

যাঁদের স্নেহ ও সঙ্গ লাভ করেছি

নিবেদন

'অমৃত সঞ্চয়' উপন্যাসটির যখন আরম্ভ তখন লর্ড ক্যানিং ভারতে গভর্ণর জেনারেল। ডালহৌসী 'Doctrine of Lapse' নীতিটি নতুন ক'রে চালু করলেন। ১৮৫৬তে অযোধ্যা ইংরেজশাসিত ভারতের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। ফলে সেখানকার তালুকদার ও ভূ-স্বামী থেকে শুরু ক'রে বিপুল সংখ্যক কৃষক ও সিপাহী বিক্ষুব্ধ হয়। ১৮৫৫-৫৬-তে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটে গেছে, বাংলা ও বিহারে নীলকরদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়মান। সিপাহী ও অশ্বারোহীরা নিজেদের বেতন, প্রোমোশান ইত্যাদির অবিচারে ক্রুদ্ধ; এরই মধ্যে ছোট ভূ-স্বামী ও সর্দার, বণিক ও ব্যবসায়ী সকলেই নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় ত্রস্ত। শাসিত শাসককে বিশ্বাস করে না, শাসকও বিশ্বাস অর্জনে ব্যস্ত নন।

বিশাল ভারতের সামগ্রিক রূপটি প্রায়শ তিরোহিত। প্রদেশগুলি দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন ও আত্মকেন্দ্রিক। মানুষেরা প্রধানত নিজেতে নিমজ্জিত— অশিক্ষা এবং কুসংস্কার তাদের দাস বানিয়ে ফেলেছে, অন্যদিকে ক্ষমতার লোভ, ঐশ্বর্যের আতিশয্য এবং তারই মাঝখানে হিন্দু, মুসলমান ও ইঙ্গসমাজের পাঁচমিশেলী সভ্যতার কোলাহল। এই সংপ্লবের সময়েই এই উপন্যাসটির আরম্ভ হয়েছে। শেষ হয়েছে এর তেত্রিশ বছর পরে, যখন চেহারায় এবং পারিপাট্যে একটা পরিবর্তনের আভাস প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, চিন্তায় ও চেতনায় শিক্ষাজনিত একটা সুস্পষ্ট সংহতি আকার নিচ্ছে। বলা বাহুল্য ইতোমধ্যে পটভূমিরও বদল হয়েছে—এবং জাগ্রত ভারতের হৃৎপিণ্ড তখন বঙ্গদেশ।

সাতান্ন সালে ইংরেজ অধিকৃত ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে যে বিশাল অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল তার প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও মতদ্বৈধ আছে। কেউ কেউ বলেন একে 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' বা 'জাতীয় বিদ্রোহ' নাম দেওয়া চলে না, কেননা, জাতীয়তাবোধ, জাতীয় বিদ্রোহের সুপরিকল্পিত লক্ষণগুলি যথা অভীষ্ট লক্ষ্য ও পন্থার ঐক্য এতে অনুপস্থিত ছিল। তাঁরা একে 'আপাত ঘটনা' বা 'immediate events'-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন।

অপরপক্ষে, আপাতঘটনা দিয়ে বিচার না ক'রে কোন কোন ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সিপাহীদের সংক্ষোভের হেতু নিহিত

রয়েছে ঋণ-রিক্ত, দারিদ্র্য-পীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনে এবং 'Civil Rebellion' আখ্যা দিয়ে তাঁরা সমাজের অপরাপর স্তরের বিভিন্ন বিক্ষোভ গুলির সঙ্গে এই বিদ্রোহের একটি ঐক্য ও যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সম্ভবত এই ধারণার বশবর্তী যে, সিপাহীদের সেই অভিঘাতের ফলে ভারতীয় জনমানসে একটি অভ্যস্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তি টলে ওঠে এবং সেদিন থেকে শিক্ষিত সমাজের মনেও ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে যে-অশান্তি ঘনিয়ে ওঠে পরবর্তীকালে তা-ই জাতীয় সংগ্রামের নতুনতর পটভূমি রচনার চেতনায় ব্যাপ্ত হয়, হয়ত নীলবিদ্রোহ, প্রেস অ্যাক্ট ও ইলবার্ট বিল ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ না-হলেও পরোক্ষে সেই অভীপ্সাই ফলবতী হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানে বাঙালীদের কোন ভূমিকা কেন ছিল না এ নিয়ে মতান্তর রয়েছে, তবে কারণ যা-ই হোক্ না, এ কথা বুঝতে এখন অসুবিধে নেই যে, সেদিন বাঙালী সেই বিদ্রোহের অংশীদার হলেও ইংরেজ শাসনের অকস্মাৎ-অবসান ঘটতে পেত না এবং পরবর্তীকালে শিক্ষায়, শিল্পে, জ্ঞানে, সাহিত্যে এবং সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত জাতীয় আন্দোলনের অপ্রতিবদ্ধ ক্ষেত্ররূপে বাংলার বলাম্বিত আত্মপ্রকাশ ভারতের ইতিহাসকে এমন জটিল, বিচিত্র ও অমোঘ ক'রে তুলতে পারত না।

আমার উপন্যাসে ভারতবর্ষের সেই সংকটকাল ও সেই সংস্থচিত নব্যচেতনার সময়কে কার্যকরী করবার চেষ্টা পেয়েছি। উপন্যাস রচনা করতে গেলে একটি নিশ্চিত গল্পের প্রয়োজন হয় কিন্তু সেই গল্পটুকু ব্যতীত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, সাধারণ মানুষের চরিত্র, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, প্রথা-সংস্কার, যানবাহন-পোশাক-পরিচ্ছদ, তুচ্ছ ও উচ্চ মানবিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াকে যথাসম্ভব প্রামাণ্য ক'রে তুলতে সাধ্যমতো যত্নের কসুর করিনি। নানাজাত, নানাভাষার এই বিশাল ভারতবর্ষের অন্তঃকরণে প্রবেশ করতে গিয়ে স্বভাবতই বিস্ময়ে এবং নিজের অজ্ঞতায় অস্বস্তি বোধ করেছি তবু নিজের দেখা কিছু অভিজ্ঞতা এবং বই পড়ার অভ্যাসকে কাজে লাগিয়েছি সুষ্ঠু আভাস প্রতিফলিত করবার জন্যে।

দেশী-বিদেশী মিলিয়ে প্রায় একশ' চরিত্রের উল্লেখ আছে এ-বইয়ে, তবে বিদেশী ম্যাকমোহন এবং ভারতবর্ষীয় ভবানীশংকর সম্বন্ধে আমার আলাদা ক'রে কিছু বলবার আছে। ইংরেজ মাত্রই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী এ ধারণা যেমন ভুল, তেমনি তাঁরাই আমাদের একমাত্র পরিত্রাতা ছিলেন এ কথাও ঠিক

নয়। ম্যাকমোহন হচ্ছেন সেই দলের যাঁরা সরকারী অফিসার হয়েও শ্বেতাঙ্গ সমাজের বাইরে ভারতীয় সংসর্গে সময় কাটিয়েছেন, কেননা তাঁরা fanatic ছিলেন না এবং তাঁরা যে-দেশে এবং যে-সংস্পর্শে বসবাস করেছেন তাদের চেনবার চেষ্টা করতেন স্বভাবে ও অভাবে। আগে থেকেই মনের দ্বারকে রুদ্ধ ক'রে 'মিলাবে-মিলিবে'র সম্ভাবনাকে রুখে রাখতেন না। ভারততত্ত্ববিদ্ যাকে বলে তা হয়ত এঁরা ছিলেন না, কিন্তু এঁদেরই অক্লান্ত চেষ্টায় এদেশের নৃতত্ত্ব, রীতিনীতি, উপকথা, ইতিহাস, পশুপাখী ও উদ্ভিদ্ বিষয়ে বই ও বিবরণ বেরোত এবং আমাদের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ ও সভ্যতাকে জানবার ব্যাপারে আমরা যখন আগ্রহী হয়েছি তখন এই উপাদানগুলিই আমাদের সাহায্যে এসেছে। এদেশের অশিক্ষিত ও অনুন্নত সম্প্রদায়কে ধর্মের নেশায় ঘুম পাড়িয়ে দেবার জন্যে হয়ত মিশনারীরা ওদেশ থেকে প্রেরিত হতেন কিন্তু কার্যত তাঁদের অনেকেরই প্রধান ধর্ম থেকেছে সেবা, মানুষের কল্যাণ। দূর দুর্গমে তাঁরা হয়ত সম্পূর্ণ জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, হয়ত ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম নেই, তবু আমরা জানি এঁরা দীনহীন সাধারণ মানুষের কত নিকটবর্তী হতে পেরেছেন। ফাদার ব্রাউন তেমনি একটি চরিত্র। আবার এসবের বিপরীত চিত্র ও চরিত্রও রয়েছে।

সাধারণ ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তিমাত্রেই জানেন প্রথম ইংরিজী শিক্ষার আলোকে অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীর চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে জেসুইটদের কৃপায় উন্নত ধর্মাবলম্বনের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দু সমাজকে তাঁদের প্রাচীন ও স্থবির এবং হিন্দুধর্মকে গোঁড়া ও অনুদার মনে হয়েছিল। যুগসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ও হিন্দুশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর নিজেদের কর্মময় জীবন দিয়ে সেদিন ইতিহাসের এক মহাসর্বনাশকে রোধ করেছিলেন। তাঁরা দেখিয়ে দিলেন জাতির মুক্তি আছে সনাতনধর্মে, তাকে এড়িয়ে পালিয়ে গেলে সমস্যার কোন সমাধান হবে না। ভবানীশংকর সেই যুগের ভারতবাসীর প্রতিনিধি—হুবহু সেই মাপের কিনা বলতে পারি না, তবে অনেকটা সেই ছাপের যাতে হয় সেদিকে যথাসাধ্য দৃষ্টি রেখেছি। ব্রিজদুলারীর সঙ্গে ভবানীশংকরের সম্পর্কটি কাহিনীর কারণে সংঘটিত হলেও যাঁরা এতে স্বস্তি বোধ করবেন না, তাঁদের জানাই যে, ভবানীশংকরের পক্ষে তথাকথিত প্রেমের দুর্বার স্রোতে ভেসে যাওয়া কখনোই সম্ভব ছিল না, বিশেষত ব্রিজদুলারীর মতো এক মেয়ের সঙ্গে, যে জীবনের ঘাটে ঘাটে

নানা মূল্য দিয়ে শুধু অভিজ্ঞতা ক্রয় করেছে মাত্র, অন্য কোন মানসিকতার সাযুজ্য যার সঙ্গে একেবারেই নেই! তবে কি উভয়ের প্রেমের বৃত্তটি তৈরি হয়েছে কেবল 'ঘটনাকে idealised করবার অভিসন্ধিতে? না, তা-ও নয়। ব্রিজদুলারীর বহুব্যবহৃত শরীরের তলায় তিনি একটি পবিত্র হৃদয়কে লক্ষ্য করেছিলেন এবং তা রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য ব'লে মনে হয়েছিল। আসলে প্রেমের চেয়েও সেই কর্তব্যপরায়ণতাই ভবানীশংকরকে ব্রিজদুলারীর কাছে এনেছে বেশী—আর কঠোর দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তৎকালীন বাঙালীদের মধ্যে রয়েছে তা কি বলবার অপেক্ষা রাখে?

নানাসাহেব ইতিহাসের চরিত্র। আমার দৃষ্টি একান্ত ভাবেই তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। কানপুরের হত্যাকাণ্ড এবং যুদ্ধের পরবর্তী পর্বে তাঁর ভূমিকা আজও তর্কাতীত ভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি না, সুতরাং সে বিতর্কমূলক প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইনি। আমার ধারণা এই প্রৌঢ় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ যুদ্ধের সংকটকালের অব্যবহিত আগেও বিষয়চিন্তা এবং পারিবারিক সমস্যা নিয়ে অত্যন্ত জড়িত ছিলেন। ইংরেজ প্রচারিত 'Myth that is Nana' এবং ভারতীয়মানসে স্বদেশপ্রেমিক যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ নানা দুটি পরিচয়ই সমান দৃঢ়মূল ও বহুবছর ধ'রে প্রচারিত হওয়ার ফলে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। 'অমৃত সঞ্চয়ে'র নানা সাহেব 'Fiend of Cawnpore' অথবা 'অমর যোদ্ধা' কোনটিই নন। যতটুকু তথ্যাদি পাওয়া যায় তাই অবলম্বনে তাঁর যে প্রতিকৃতি রচনা করা হয়েছে তাতে ইতিহাসের খেলার পুতুল এই হতভাগ্য মানুষটিকে পাঠক যদি কাছের মানুষ বলে মনে করেন তাহ'লেই আমার চেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করব।

পরিশেষে একটা কথা বলব। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা আজও আমাদের যথার্থ আয়ত্তে আসেনি। ইতিহাস নিয়ে পুরুমাত্রার রোমান্স কিংবা হরেক ঘটনার পরিত্রাহি চিৎকারের মধ্যেই আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব শেষ হয়ে থাকে। আমি নিজেও যে এমনটা ক'রিনি তা নয়, কিন্তু এখন মনে করি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অতিরিক্ত দায়িত্ব রয়েছে তার জন্যে একটি বিশেষ প্রবণতা, গল্প অপেক্ষা দেশ, কাল, পাত্র, প্রথা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক, আবশ্যক আধুনিক মননশীলতা, কেননা ইতিহাস শুধুই অতীতের দর্পণ নয়, 'history is written precisely when the historian's vision of the past is illuminated by insights into

the problems of the present' এবং ইতিহাস ভবিষ্যতের দিগদর্শনও বটে। ইতিহাসের রূপান্তর চলে ভেতরে, দৃষ্টিগোচর ঘটনার অলক্ষ্যে।

এই উপন্যাসে যাতে ঐতিহাসিক তথ্য-বিচ্যুতি না ঘটে সেদিকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রেখেছি। তবে পাঞ্জাবে কুপারের নির্দেশে যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তা ১৮৫৮-র মাঝামাঝি সময়ে, কানপুরের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার বছর খানেকের তফাৎ, এটি আমার ইচ্ছাকৃত, উপন্যাসের প্রয়োজনে। এ উপন্যাসে এক-জায়গায় বলেছি ইংরেজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পরও তাদের মধ্যে ভারতীয় গুপ্তচর দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল এবং গ্রামবাসীদের সংবাদ সরবরাহ ক'রে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। আর একজায়গায় কয়েকটি ইংরেজ ও আইরিশ সৈন্যের কথা বলেছি যারা ভারতীয়দের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে। এ দুটি ঘটনা যাঁদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি ইতিহাসে এর সমর্থন আছে এবং ইচ্ছা হ'লে তাঁরা মোব্রে টম্‌সন, ফ্রেডারিক কুপার, সার হিউগাফ এবং রীস্-এর বই প'ড়ে দেখতে পারেন।

অনেকদিন আগে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় এই উপন্যাসের একটি অপটু ও স্বতন্ত্র চেহারা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে স্বভাবতই আজ আমার সংকোচ বোধ আছে। 'অমৃত সঞ্চয়'কে আমি তিনবছরের নানা সময়ে লিখেছি এবং আমার জীবনের নানা সংকটের মধ্যে। শেষ করেছি প্রায় একবছর আগে। দিনে দিনে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পালা বদল হয়। ইচ্ছে হচ্ছে ইতোমধ্যে যে দোষ-ত্রুটিগুলি হঠাৎ চোখে বড় হয়ে ধরা পড়ছে, সেগুলি সেরে দিই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও আবার মনে হচ্ছে ইচ্ছের শেষ তো নেই, সম্পূর্ণ তৃপ্তি লেখকের কখনো আসে না, আসা উচিত নয়।

গড়িয়া ট্যাঙ্ক,
১৯৩ কানুনগো পার্ক,
পোঃ গড়িয়া, ২৪-পরগণা
২৭.৯.৬৩

মহাশ্বেতা দেবী

১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাসের এক সন্ধ্যা।

কানপুরের সন্নিকটে বিঠুরে, একটি সুবৃহৎ প্রাসাদের দ্বিতলে একটি প্রশস্ত কক্ষে একজন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ কেদারায় বসেছিলেন। তাঁর বর্ণ শ্যাম, দেহ স্থূলকায়। তাঁর মুখ ও মাথা ক্ষৌর কার্যের চিহ্ন বহন করে। তাঁর নাক তীক্ষ্ম, ওষ্ঠাধর পাতলা ও চাপা। তাঁর মাথায় বহুমূল্য রেশমের পাগড়া, কানে ও গলায় মুক্তার কুণ্ডল ও হার। তাঁর একটি হাত অলসভাবে কেদারার হাতলে রাখা। অন্যহাতে আলবোলার নল ধরা। নল তিনি মুখে দিচ্ছিলেন না। আলবোলা থেকে সুগন্ধি তামাকের মৃদু গন্ধ উঠছিল। অপর হাতটি মাঝে মাঝে নড়ছিল। তখন ঝোলানো শেজবাতির আলো হাতে পড়ছিল। দেখা যাচ্ছিল তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা তিনটি আঙুলেই অনেকগুলি ক'রে আংটি। নবরত্ন, প্রবাল, মুক্তা, হীরা ও চুনী। আংটিগুলি শুধু অলঙ্কারই নয়, সম্ভবত গ্রহনক্ষত্রকে সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে তাদের ধারণ করা হয়েছে। তাঁর পরণে শালের ঢিলে জামা। গলার স্বর্ণ উপবীতের একটু দেখা যাচ্ছিল। তাঁর চোখ দুটির দৃষ্টি গভীর এবং শান্ত। তাঁর বয়স চল্লিশের সামান্য উপরে।

আর একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। তিনি দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ, মুণ্ডিতমস্তক। পৌষ মাসের দুরন্ত শীতে-ও তাঁর দেহে একটি মাত্র পশমের উত্তরীয় এবং পায়ে কাষ্ঠ পাদুকা। তিনি দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ম ও উজ্জ্বল চোখে নিজের ডান হাতের তালুর দিকে তাকাচ্ছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ধীর এবং এমনভাবে যতি রেখে রেখে তিনি কথাগুলি উচ্চারণ করছিলেন, যেন কোন পত্র দেখে তিনি পড়ে পড়ে কথা বলছেন। তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গী সংযত। কণ্ঠস্বর সংহত। তবু তাঁর মধ্যে কেমন ক'রে যেন একটি উদ্ধত স্পর্ধার ভাব ফুটে উঠছিল। যেন তিনি প্রথমজনকে মানতে চাননা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বা পদমর্যাদা স্বীকার করতে চাননা।

প্রথমজন পেশোয়া নানা ধুন্ধুপন্থ্। মৃত দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র এবং মনোনীত উত্তরাধিকারী। দ্বিতীয় জন বিশ্বেশ্বর মঙ্গল থাট্টে। নানার

পিতৃব্য স্বর্গত চিমনাজী আপ্পার দৌহিত্র চিমনাজী থাট্টের পিতৃবংশের ব্রাহ্মণ। নানা-র দুই বিমাতা, বৈমাত্রেয় বোন যোগবাঈ ও কুসুমবাঈ, এঁদের সঙ্গে নানা-র নানা বিষয়ে বিরোধিতা লেগে থাকে। যোগ ও কুসুমের মাতামহ বলবন্ত্ আগৌয়ালে চান তাঁর দৌহিত্রীরা বিষয়ের সমান অংশ পা'ক। নানার বিমাতারা গোপনে চিমনাজী থাট্টেকে বিষয় দিতে চান। বিশ্বেশ্বর মঙ্গল থাট্টে তাঁদের বিশ্বাসভাজন। ইনি আচারনিষ্ঠ, কূটবুদ্ধি ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ।

অন্তঃপুরের এই গোলযোগ নানাকে ঘরে শান্তি পেতে দেয় না। বাইরেও তাঁর শান্তি নেই। তিনি শান্তিপ্রিয় এবং নিরীহ। কিন্তু বৈষয়িক গোলযোগ তাঁকে সতত চিন্তিত রাখে।

বিশ্বেশ্বর মঙ্গল থাট্টে নানা-কে কোন আবেদন জানাচ্ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ক'রে জানলার দিকে চাইছিলেন। প্রখর শীতেও জানলাটি খোলা ছিল। বাইরে শেষ-সন্ধ্যার ধূসর আলো দেখা যাচ্ছিল। জানলার নিচে ব'সে বাজিকর বাজি পোড়াচ্ছিল। মাঝে মাঝে রঙিন তুবড়ির আলো এই জানলা ছাড়িয়ে উপরে উঠছিল। সেই আলোতে ঘরের শেজবাতিটি নিষ্প্রভ মনে হচ্ছিল।

বিশ্বেশ্বরের মনে হচ্ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার সময়ে এই আলোকোৎসব যেন বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তিনি পেশবার দিকে তাকাচ্ছিলেন, কিন্তু কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। কেননা তিনি জানতেন এই বাজিকরটি পেশবার বিশেষ স্নেহের পাত্র। তিনি আরো জানতেন, আজ যে সব সাহেবরা কানপুর থেকে বিঠুরে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, তাঁদের প্রীত্যর্থেই এই বাজিকরকে খবর দেওয়া হয়েছে। এই বাজিকর গত দশ বছরে বৃদ্ধ বাজীরাও এবং নানা ধুন্ধুপন্থ্-এর কাছ থেকে কত পয়সা নিয়ে গেছে তা তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন।

বৃদ্ধ বাজীরাওয়ের স্বজন-প্রীতি ছিল গভীর। তাঁকে আশ্রয় ক'রে যে সব মহারাষ্ট্রীয় দক্ষিণ থেকে ব্রহ্মাবর্তে এসেছিল, তাদের তিনি নিজের পোষ্য মনে করতেন। বহুজনের সঙ্গে এই প্রৌঢ় বাজিকরও এসেছিল। এই বাজিকর-এর পূর্বপুরুষ, পেশোয়া সাম্রাজ্যের বিগত গৌরবের দিনে পুণা ও সাতারা, রায়গড ও কোলাবা-য় বাজি জ্বালাতে আসত। প্রথম বাজীরাও-এর এক একটি বিজয় গৌরবের সময় যখন ছত্রপতি শাহু

উৎসবের আদেশ দিতেন, সে উৎকৃষ্ট বাজি তৈরী ক'রে আলোকোৎসব করত। কোঙ্কণে, ত'ার স্ব-গ্রামে সে প্রভুত ভু-সম্পত্তি সঞ্চিত করতে পেরেছিল।

বিশ্বেশ্বরে-র মনে হলো, সেদিন এর সার্থকতা ছিল। সেদিন পেশোয়ারা মধ্যভারত, বরোদা, বিজাপুর জয় করতেন। রাজকোষে অর্থ আসত। সেদিন হোলকার, গাইকোয়াড় এবং সিন্ধিয়া-রা নতমস্তকে পেশোয়াদের আজ্ঞা পালন করতেন।

তিনি মনে মনে বললেন 'সেদিন এই আলোকোৎসব পেশোয়াদের বিজয়লক্ষ্মীকে সম্বর্ধনা জানাত। আজ কয়েকটা সাহেবকে খুশী করবার জন্যে তুমি এই আয়োজন কর।'

পেশোয়া যেন তাঁর মনের কথা বুঝলেন। মুখ না ফিরিয়েই তিনি বললেন 'সাহেবরা ওর বাজি দেখতে চেয়েছেন। ভালো হলে ওকে কানপুরে ডাকবেন। রেজিমেন্টের স্পোর্টস্-এ ও যাবে। ওর ছেলে বলছিল ইদানীং নাকি ওকে কেউ ডাকছেনা।'

বিশ্বেশ্বর একটু চকিত হলেন। তারপর আবার বলতে সুরু করলেন 'আপনার মাতৃদ্বয় উদ্বিগ্ন হয়েছেন। আপনার পিতার গঙ্গাপ্রাপ্তি হলে আপনি পঞ্চ মহাদান করেননি।'

'না। আমি তাঁদের ঘোড়া, স্বর্ণ এবং রত্ন দিয়েছিলাম। আমার উৎকৃষ্ট হাতী ছিল। আমি দশ লাখ বাছাই করা আরবী ঘোড়া কিনে রেখেছিলাম, এবং শুধু হীরা নয়, প্রবাল, মুক্তা, গোমেদ, পান্না ইত্যাদি নবটি রত্নই আমি দান করেছিলাম। কিন্তু আমার এক ছটাক জমিও ছিল না। রঘুনাথ রাও ভিঞ্চুরকার তাঁর জাগীর এবং ইনামের সমস্ত জমি, বাহান্নটি গ্রাম-ই আমাকে দিতে চেয়েছিলেন। (তখন সেই প্রভুভক্ত সর্দারের কথা শুনে আমার চোখে জল এসেছিল।—নানা মনে ভাবলেন) কিন্তু তাঁর সে দান আমি নিতে পারিনি। কেননা অপরের ভূমি নিয়ে দান করলে আমার পিতার স্বর্গত আত্মা সন্তুষ্ট হতোনা, এবং যে ভূমি একবার দান করা হয়েছে, তাকে আর আমি ফিরিয়ে নিতে পারতাম না।' এই বলে নানা চুপ করলেন। তাঁর কণ্ঠ নিরুত্তাপ এবং বিষণ্ণ শোনাল।

বিশ্বেশ্বর বললেন 'তাই আপনার মাতৃদ্বয় প্রস্তাব করেছেন, নানা কারণে আপনার ভাগ্য যখন অপ্রসন্ন, তখন বিঠোবা, মঙ্গলক্ষ্মী ও গণেশ, এই ত্রি-দেবতাকে প্রসন্ন করা প্রয়োজন। তাই…

'সেদিনই মাতৃদ্বয় মাঙ্গলিক যজ্ঞ করেছেন। আমি লক্ষ্ণৌ থেকে ফেরবার পর-ই।'

'সে আপনার পুত্র কামনায়।'

বিশ্বেশ্বরের কণ্ঠ ভাবলেশহীন, এবং নানার শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল ক্রমে আরক্ত হয়ে উঠল। পুত্র উৎপাদনের ক্ষমতা তাঁর নেই, এই সন্দেহে-ই কি বিমাতাদ্বয় তাঁকে অপদস্থ করেন না? তিনি বললেন 'পেশোয়া বংশ কখনো যাতে লুপ্ত না হয়, সেজন্য আমিও উদ্বিগ্ন। তবে আমি মনে করি এই সব যাগ-যজ্ঞ ও হোমপূজার এখনই প্রয়োজন হয়নি। আমার কনিষ্ঠা পত্নী কাশীবাই বালিকা মাত্র।'

বিশ্বেশ্বর ধীর এবং স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন 'আপনি আপনার মাতৃদ্বয়ের আন্তরিকতায় সংশয়ান্বিত। শ্রীমন্ত, তাঁরা দেখছেন যে বিলেতে আপনার আর্জি নিষ্ফল হয়েছে। তাঁরা দেখছেন, আপনার স্বর্গীয় পিতার সীলমোহর ব্যবহারের অনুমতি আপনি পেলেন না। তাঁরা স্ত্রীলোক। তাঁদের চিত্ত সহজেই ব্যাকুল হয়।'

(তাই তাঁরা নিজের নিজের ভকিল পাঠিয়ে রেসিডেণ্টের দরবারে নালিশ জানান এবং এই সেদিন অবধি সম্পত্তি নিয়ে অন্তঃপুরে কি দ্বন্দ্ব-ই না চলেছে!) নানাসাহেব বললেন 'এবার কি করতে হবে?'

'গঙ্গার তীরে যজ্ঞানুষ্ঠান, নবচণ্ডীপাঠ, এবং গঙ্গাজলে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দান, এ করা আশু প্রয়োজন। তাঁরা আপনাকে জানাতে বলেছেন।'

বিশ্বেশ্বর বিরত হলেন। নানা নিরানন্দ হাসি হাসলেন। বললেন— 'ভাল, ভাল। তাই হোক। আমার জন্য ত' আপনারা ব'সে নেই! নিশ্চয় আনুষঙ্গিক সব আয়োজনই করেছেন? ব্যয়নির্বাহের ভারটা আমায় দিয়েছেন? ভাল। তা-ই হবে।'

বিশ্বেশ্বর চলে গেলেন। তাঁর কাষ্ঠ পাদুকার শব্দ ঘরের গালিচায় ডুবে গেল। নানা শ্রান্তিতে চোখ বুঁজলেন। জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। নানা চিন্তায় উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে হাওয়া পরম রমণীয় বোধ হচ্ছিল।

তাঁর মনে হলো, অন্তঃপুরে রমণীরা-ই সুখী। কেননা তা'রা শুধু মন্ত্রণা কৌশল করে। সম্পত্তির জন্যে চক্রান্ত করে। এবং ব্রতপূজা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

অবশ্য সকলে নয়। তাঁর দুই বিমাতা ব্রত পূজা এবং উকীলদের সঙ্গে কূট ও অর্থহীন মন্ত্রণায় ব্যস্ত থাকেন। তাঁর দুই বোন যোগবাঈ ও কুসুমবাঈ-য়ের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের দিন তাঁর দেখা হয়। গত 'ভাওবীজ'-এর দিনও দেখা হয়েছিল। তা'রা তাঁকে তিলক দিয়েছিল। তা'রা দু'জন বেশ ভূষা ও প্রসাধন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাঁর স্ত্রী তরুণী কাশীবাইও কচিৎ ব্রত পূজা-র মধ্যে যান। তিনি একজন কোঙ্কণী দাসীর কাছে চুল বাঁধতে শেখেন, স্বর্ণকারের কাছে নতুন নতুন অলঙ্কারের ফরমাস পাঠান। কখনো কখনো, নানা-কে আনন্দ দিতে শাড়ী ছেড়ে রেশমের পেশোয়াজ, ওড়না-ও পরেন।

নানা যখনই তাঁর কাছে যান, দেখেন, তিনি হয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছেন। দাসীর কাছে পা তুলে দিয়ে পায়ে দুধ ও চন্দন মাখাচ্ছেন। নয়তো হেলান দিয়ে ব'সে দাসীদের কাছে নানাবিধ মুখরোচক গল্প কাহিনী শুনছেন। কাশীবাই-এর রূপের প্রশস্তি ক'রে চতুরা কোঙ্কণী দাসীটি দুটি একটি গান বেঁধেছে। সেই গান শুনে কাশীবাই তা'কে পুরস্কার দিয়ে থাকেন। নানা এ-ও শুনেছেন, বিমাতাদের কাছে-ই শুনেছেন, মাঝে মাঝে তাঁরা যখন কাশীবাইকে নিজেদের কাছে ডেকে উপদেশাদি দিয়ে থাকেন, তখন কাশীবাই তাঁদের সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করেন না।

নানা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। হ্যাঁ। কাশীবাই একটু চটুল, একটু দর্পিত। বালিকা বুদ্ধির বশে একটু বা অসংযত। তবু তাঁকে নানার ভালো লাগে। শ্রান্ত, নিরুত্তেজ দিনের শেষে, তাঁর অর্থহীন অজস্র কথা শুনতে ভালো লাগে নানার। একটি সুন্দর অলঙ্কার, একজোড়া সাদা ময়ূর, ছোট একটা চীনে বানর এই সব উপহার দিলে কাশীবাই আনন্দে হেসে ওঠেন। নানার পায়ের কাছে বসে মাথাটা জানুতে হেলিয়ে রাখেন। এই ভঙ্গীটি নানার ভালো লাগে। অবশ্য এমন কথা-ও তাঁর মনে হয়, এই কৃতজ্ঞতাটুকু তিনি উপহার দিয়ে দিয়ে আদায় করছেন। কিন্তু কি আর করা যায়! না দিলে পরিবর্তে কিছুই মেলে না।

এবার নিচে যেতে হবে।

নানা তাঁর কাঁধে শালের প্রান্তটা টেনে নিলেন। একজন পরিচারক তাঁর পায়ের কাছে জরি ও পশমের কাশ্মীরি পাদুকাটি ধরল। তিনি নিচে চললেন। কিছুদিন আগে অবধি বিঠুরের প্রাসাদে তিনি সাহেবদের ডেকে

বড় বড় পার্টি দিয়েছেন। এবার, ডক্টর ট্রেসিড্‌ডার-এর কথায় দু' চারজনকে ডেকেছেন মাত্র।

যদি সবকিছু ইচ্ছামতো হ'ত তবে তিনি বিরাট বিরাট পার্টি দিতেন। যদি তাঁর পেনশান স্বীকার করা হ'ত। তাহ'লে এত গোলমাল হ'ত না। কিছুই হ'ত না। যদি ইংরেজ পেশবাকে পরাজিত না করত, বৃদ্ধ পেশবার কথা মতো দিল্লী, মুঙ্গের বা ভাগলপুরে তাঁকে থাকতে দিত। যদি পেশবার সঙ্গে বর্মা ও নেপালের রাজাদের ষড়যন্ত্রের কথা কল্পনা ক'রে তাঁকে কষ্ট না দিত। যদি ইংরেজ না আসত। ভাবতে না আসত। কিন্তু তাহ'লেও দুর্ভাগ্যকে এড়ান যেতনা। তবে ফরাসী, অথবা পর্তুগীজ বা অন্য কোন দেশ এসে রাজা হয়ে বসত। চা, মশলা চামড়া, লোহা, সোনা, হাতী, কাঠ, ধান, গম, তুলো, তাদের টেনে আনত। ঠিক টেনে আনত। না। ভারতের এ দুর্দিন এড়ান যেত না। কিছুতেই না। তা'রা আসতই। জাহাজে করে। দৃঢ়সংকল্প নিয়ে। সাদা চামড়া নিয়ে। ধবধবে সাদা চামড়া। অশুচি সাদা। ধবল রোগীর অঙ্গের মতো সাদা। ওরা লক্ষে লক্ষে জর ও শোথে মরত, তবু আরো আসত। নানা হতাশায় মাথা নাড়লেন।

নানা সাহেব হলঘর পেরিয়ে কাঁচঘরের ভিতর দিয়ে চললেন। ঝাড়ে বাতি জ্বলছিল। কাঁচ ও পাথরের বিদেশী সুন্দরীদের মূর্তিতে আলো পড়ছিল। আয়নায় তাঁর ছায়া পড়ছিল। দু'পাশের দেওয়াল আয়নায় ঢাকা। তাঁর ছায়া তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর দু'পাশে দু'জন শ্যামবর্ণ স্থূলদেহ প্রৌঢ় চলেছেন। মুণ্ডিত মস্তকে রেশমীপাগড়ী। শালের ঢিলে জামা তাঁদের পরণে। কানে ও গলায় বহুমূল্য মুক্তার অলঙ্কার। তাঁদের দুজনেরই মুখে চিন্তার বিষণ্ণ ছায়া। পেছনে দু'জন অতীব সুদর্শন কিশোর ভৃত্য সোনার আলবোলা সযত্নে বয়ে নিয়ে চলেছে।

কাঁচঘরের পর আরো দু'টি ঘর তিনটি প্রশস্ত বারান্দা পেরিয়ে নেমে চললেন নানা, এবং নামবার আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে চাইলেন। বাগানের এক অংশ এবং শিকারখানা দেখা যাচ্ছে। চিতাবাঘের ঘন ঘন গর্জন, পাখির কিচির মিচির, ঘোড়ার হ্রেষারব এবং হরিণের উত্তেজিত আওয়াজ শোনা গেল। তিনি জ্রূকুটি ক'রে তাড়াতাড়ি নেমে চললেন। সন্ত্রস্ত পদে কে পাশ থেকে সরে যাচ্ছিল তা'র দিকে না তাকিয়েই বললেন— 'শিকারখানার পাশে বাজিকরকে ... জায়গা দিয়েছে ?'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠ একটু চাপা শোনাল।

এমনিতে ধীরস্থির মানুষটি। চটকরে রাগেন না। উত্তেজিত হন না। কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে তাঁর আশ্চর্য দুর্বলতা আছে। বন্য এবং বিচিত্র জীবজন্তু, গাছপালা সংগ্রহে তাঁর আগ্রহ আছে। এইসব জীবজন্তু কোন কারণে বিরক্ত বা বিপন্ন হলে তিনি ভয়ানক চটে যান। বাজির শব্দে জীবজন্তু ভয় পেলে চটে যান। টড সাহেব এতদিন তাঁকে বিলেতী কাগজপত্র পড়ে শোনাতেন মাত্র। এখন মাঝে মাঝে পেশোয়া তাঁর কাছে জীবজন্তু সম্পর্কে এ কথা সে কথা শুনতে চান। সাহেবদের লেখা শিকারের বই থেকে স্টীল এনগ্রেভিং-এ 'ভারতীয় সিংহ', 'কাশ্মীরি লাল হরিণ', এইসব প্রাণীর ছবি দেখতে চান।

পেশোয়া নিচের হলঘরে ঢুকলেন।

সাহেবদের আপ্যায়ন করবার জন্য এই ঘর, এবং আরো ক'টি ঘর সযত্নে সাজানো হয়েছে।

যতদিন বৃদ্ধ পেশোয়া ছিলেন ততদিন নানা সাহেব নিজের খেয়ালখুশিকে কাজে লাগাতে পারেননি। তিনি মারা গেলেন ১৮৫১ সালে। আজিমুল্লা বছর কয়েক বাদে নানা'র আর্জিসহ বিলেত ঘুরে এলেন। আজিমুল্লা নিশ্চয় কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। তারপর বম্বের পোর্টে লণ্ডন প্রত্যাগত জাহাজ থেকে কাচের বাসন, আসবাব, পর্দা, ইত্যাদি এল। ছাদে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলল। উৎকৃষ্ট পারসী গালিচায় মেঝে ঢাকা হল। বিখ্যাত সব বিলিতী ছবির অনুকরণে তৈলচিত্র টাঙানো হ'ল। ব্রোকেড ও সাটিনের পর্দা, রুপা ও সোনার পানদানি, আতরদানি, এবং ফুলদানী রাখা হ'ল। অবশ্য, ফুলদানিতে কোনদিনই ফুল রাখা হয়নি।

সেখানে অভ্যাগতরা উঠে নানা-কে অভিবাদন জানালেন। বয়স্ক অফিসারেরা দু'একজন এগিয়ে এসে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ব্যস্ত হলেন। নানা সাহেব তখনও সম্ভ্রান্ত গৃহস্বামীর মতো তাঁদের যথোচিত বিনয়ে আপ্যায়িত করতে চেষ্টিত হলেন। তাঁর কথা ডাক্তার এড্উইন ও ডাক্তার ট্রেসিডার ছাড়া অন্যরা বুঝলেন না। আজিমুল্লা খান্ কথাগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ ক'রে অতিথিদের বোঝালেন। অফিসার রমনেনে তাঁকে লক্ষ্ণৌ-এর রেজিমেণ্ট্ রেসের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। নানা বললেন, 'হাঁ। ঘোড়াগুলি সত্যিই সুন্দর। তবে ফৈজী এবার আমার জন্যে চারটি ঘোড়া এনেছে, তাদের মতো নয়।'

'আপনার অশ্বশালার জোড়া কোথায়? আমিত' দেখিনা।' ডাক্তার এড্উইনের বিনয়ী উক্তির উত্তরে নানাসাহেব একটু হাসলেন।

'আপনার আতিথ্যে কোথাও ত্রুটি থাকে না। আমাদের এই নতুন ইঞ্জিনীয়ারটি আপনার শিকারখানা দেখে মুগ্ধ হয়েছে।'

ইভান্স-এর সঙ্গে নানাসাহেবের পরিচয় হল। ইভান্স খুব মুগ্ধ হয়ে নানা-কে দেখছিল। একজন ভারতীয় মহারাজা এবং তাঁর ঐশ্বর্য দেখে সে অবাক হয়েছিল। সে বললো 'বাইরে কতকগুলি কামান দেখলাম। ওগুলি কি ব্যবহার করা যায়? না প্রাসাদ সাজাবার জন্য রেখেছেন?'

আজিমুল্লা খান্ বললেন 'পেশোয়ার পূর্বপুরুষ-রা যুদ্ধের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। ওগুলি বিভিন্ন দেশের এবং বহু বিজয়ের স্মারক চিহ্ন। অবশ্য এখন কামানগুলির কাজ ফুরিয়েছে।'

কথা বলতে বলতে আজিমুল্লা খান্-এর সুশ্রী মুখখানা ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠল। এড্উইন এবং ব্রেসিড্ডার তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে সুরু করলেন।

ইংরেজ অভ্যাগতদের সামনে পানপাত্র এল। উৎকৃষ্ট ফরাসী শ্যাম্পেন, ইংরেজী ব্রাণ্ডি, ফরাসী ও ইতালীয় পোর্ট, কনিয়াক কিছুরই অভাব ছিলনা। কালো আঙুর এবং ব্রাণ্ডিতে ভেজান আপেলের টুকরো, মনক্কা ও চেরীফল-ও দেখা গেল। বয়স্ক অফিসাররা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ব'সে গল্প করতে ব্যাপৃত হলেন। নিঃশব্দ চরণে ভৃত্যরা এসে ঘরের কোণে কোণে চন্দন ধূপের আধার ব'সিয়ে গেল। ঘরের একপাশে বৃদ্ধ সম্পূরণ পা মুড়িয়ে স্থির হয়ে বসেছিল। তা'কে দেখিয়ে আজিমুল্লা বললেন, 'ঐ বৃদ্ধ পরে সাহেবদের হাত দেখবে। ভারী কুশলী গণক।'

তারপর একটু থেমে ঈষৎ হেসে বললেন, 'ওর-ই সঙ্গে চম্পা এসেছে। ও না থাকলে মেয়েটা কোথাও যায়না।'

ব্রিগেডিয়ার ইভান্স বড়দের দলে পাত্তা না পেয়ে মোব্রে টমসনের পাশে গিয়ে বসল। টম্সন বলল, 'মহারাজাকে কেমন লাগল?'

ইভান্স ঘাড় নাড়ল। তা'র ভাল লেগেছে। সে নতুন এসেছে ভারতে। রহস্যময় ভারত। যোগী, সাপুড়ে, সুন্দরী নর্তকী, এবং রাজামহারাজার দেশ ভারত। ভারতে যে আসে সে-ই ছোটখাটো নবাব ব'নে দেশে ফিরতে পারে, এরকম ধারণা এই ১৮৫৭ সালে-ও এই অনভিজ্ঞ যুবক বিশ্বাস করে।

মাদ্রাজ ও বম্বে-তে পানোন্মত্ত গোরাসৈন্যদের হতভাগ্য জীবন, কবরখানায় ম্যালেরিয়া, শোথ ও আমাশয়ে মৃত শ্বেতাঙ্গদের কবর, এবং স্বদেশ ইংলণ্ডে পোর্টমাউথ ও ব্রাইটনে ভারত প্রত্যাগত গরীব সৈন্যদের দেখে-ও তা'র অভিজ্ঞতা হয়নি। বড় বড় চোখ মেলে সে ঘর, আসবাব, বাতির ঝাড়, ফুলদানী, আতরদান এইসব দেখছিল। টম্‌সন তা'র কানেকানে বলল 'তোমার মহারাজাটি একটু পরে-ই ডাক্তার ট্রেসিড্‌ডারকে নিজের কাল্পনিক অসুখের বিবরণ দিতে সুরু করবেন!'

'ডাক্তার ট্রেসিড্‌ডার ওঁর চিকিৎসক?'

'হ্যাঁ। তাঁর একটা কথাও উনি শোনেননা বটে। তবে গণ্ডারের শিঙের চূর্ণ খেয়ে যখনই হজমের গোলমাল হয়, তখনই ওঁর ডাক পড়ে। ওঁর কাছে সব শোনেন, 'আর ওষুধ খান দেশী হাকিমের।'

'গণ্ডারের শিঙের চূর্ণ?'

টমসন আঙুর ছিঁড়ে মুখে পুরে হাসল। বললে 'এরা বিশ্বাস করে তা'তে হৃত পৌরুষ ফিরে পাওয়া যায়। চীনে মান্দারিণ-রা খায়, কার কাছে যেন শুনেছেন! মহারাজার নতুন রাণীটি ভারী সুন্দর শুনেছি। অতএব মহারাজার একটি পুত্র চাই। আরে, একটা ছেলের জন্যে এদের মাথাব্যথার এবং খরচের বহর দেখলে তুমি অবাক হবে।'

ইভান্‌স আশ্চর্য হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ ভৃত্যরা এসে জলন্ত মশাল নিয়ে মাঝখানের বড় ঝাড়টার বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। সারেঙ্গীয়া সারেঙ্গী বাজাতে সুরু করল। প্রৌঢ়া এক বিগত যৌবনা রমণী পিকদানীতে পিক ফেলে একদিকের কানে হাত দিয়ে গান গাইতে সুরু করল। এবং পেছনের দরজা দিয়ে ছুটে এল একটি মেয়ে। একহাতে ঘাঘরা তুলে ধ'রে এক হাতে ছোট একটি দীপাধার ধ'রে সে নাচতে সুরু করল। দীপাধারে দীপ জ্বলছিল। মেয়েটি পরম কৌশলে তা'কে বাঁচিয়ে নাচতে লাগল।

'চম্পা! ভাল ক'রে দেখ ইভান্‌স!'

সুগঠিত ছোট খাটো শরীর। বড় বড় চোখ। সবুজ ঘাঘরা, লাল চোলি, এবং অজস্র সোনারুপোর গহনা গায়ে। যৌবনটি আঁটসাট। শরীরে একটা কোলাহল আছে। যৌবনের মুখরতার কোলাহল। প্রথম দর্শনেই, ইভান্‌স প্রেমে পড়া স্থির করল। তা'র মনটা এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে, প্রেমে না পড়লে তা'র উপায় ছিলনা। সে বলল, 'কি চমৎকার মেয়েটি।'

'ডার্টি!' মোত্রে টম্সনের নেশা হয়েছে। সে আবার বলল, 'গেঁয়ো মেয়ে! মেয়ে কত চাও যাওনা বাবা—কানপুরে কি মেয়ের অভাব? নেটিভ মেয়ে দেখে উতলা কেন?'

নাচতে নাচতে চম্পা হাসছিল। কিন্তু সে ভাবছিল, খুব উদ্বিগ্নভাবে ভাবছিল—কি ভাবছিল তা সে-ই জানে। একবার সে ভাবছিল, আজ তা'কে অন্দরে ডেকেছিলেন নতুন বাঈ সাহেবা। তা'কে অন্দরে ডেকে নিয়ে কৌতূহলী চোখে দেখছিলেন, পাষাণ মহল বাইরের পৃথিবীর মানুষ কেমন হয়। সে দেখছিল বাঈসাহেবার হাতে মুসম্মম নাদের মতো হীরের গহনা এবং নাকের নথে হীরে। পায়ের চটিতে মুক্তো বসানো। যদিও কোমল পা দুখানা দেখে মনে হয়না সে পায়ে কোনদিন চটি উঠেছে। কাশীবাঈ বলছিলেন, 'তুমি রমজানী কেন হলে?'

চম্পা তাঁর লাবণ্যমণ্ডিত কিশোর মুখখানা দেখছিল। সে বলল 'আমাকে একজন বলেছিল।'

কাশীবাঈ হাসছিলেন। দাসীদের কাছ থেকে আদিরস এবং কেচ্ছা-কাহিনীর রসাল গল্প শুনেই সময় কাটাতে হয়। বাইরের পৃথিবীর এই মুক্ত মানুষটি তাঁকে একটা মজার কথা শুনিয়েছে। তিনি হাততালি দিলেন। বললেন, 'কে?'

চম্পা হাসল না। সে বলে গেল 'বাঈ সাহেব, আমাদের গ্রামে দুর্গা নামে একজন বড় মানুষের ঘরণী আছে। সে বলেছিল, চম্পা তুই রমজানী হ'গে যা! শহরে যা।'

'সে বললো, আর তুমি চলে এলে?'

'না বাঈ সাহেব। তারপর অনেক জীবন ঘুরে এখানে এলাম!' কাশী বাঈ আর কথা খুঁজে পাননি। চম্পা চলে এসেছিল। এবং নাচতে নাচতে চম্পার সে সব কথা মনে পড়ল। তা'র দুঃখ হচ্ছিল। বুকের নিচে ব্যথা করছিল। নাচের পর, যখন সাহেবরা ভোজন করতে গেলেন, নিচু গলায় প্রৌঢ়া গায়িকা সারেঙ্গীয়াকে গালাগালি ক'রে ভুল বাজাবার জন্যে বকতে সুরু করল এবং সম্পূরণকে যে এনেছিল সেই কবিন্দাটি (দালাল) যখন টাকার ভাগ নিয়ে রফা করতে চাইল, তখনই চম্পা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পাশের ঘর থেকে একটা কালো রামপুরী চাদর টেনে নিয়ে মাথা ঢেকে সে নাগরা প'রে পাশের দরজা দিয়ে বেরুল।

প্রাসাদের বাইরে এসেছে চম্পা। নদীর তীর দিয়ে চলেছে। শেষ পৌষের তীব্র শীতের বাতাসে নগ্নপত্র গাছগুলি কাঁপছে। কুয়াশায় চারিদিক আবছা। পায়ের নিচে বালি। মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছে চম্পা। চারিদিক ভালো ক'রে দেখে নিচ্ছে। একপাশে শেয়ালেরা কাড়াকাড়ি করছে বালির উপর। সাদা সাদা নেকড়া বাঁধা লাঠি দেখে চম্পা অস্ফুটে ভগবানের নাম ক'রে জলের দিকে স'রে এল। ছোট্ট শিশুদের সমাধির জায়গা এটা। শাস্ত্রে বলে, খুব ছোট শিশুদের না কি দাহ করতে নেই।

চম্পার মনে পড়ল ছোটবেলা গাঁয়ের বাইরে অশ্বত্থ গাছটার নিচে কেউ রাতে বিরেতে যেতে চাইত না। সেখানে না কি রাত হ'লে শিশুদের কান্না শুনতে পাওয়া যেত। যদি কেউ ছোট ছেলের কান্না শুনে এগিয়ে যেত, অমনি এক সঙ্গে অনেক ছেলে কেঁদে উঠত। ভয় পেয়ে সে দেখত, ছোট ছোট নেকড়া বাঁধা লাঠিগুলো সরিয়ে ছোট ছোট শিশুরা তা'র দিকে নড়ে নড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে। প্রাণের ভয়ে মানুষটি ভোলানাথ শিবের নাম করত আর একসঙ্গে অনেকগুলো গলা খলখল ক'রে হাসত। কতজন না কি সত্যি দেখেছে।

চম্পার আরো মনে পড়ল। সে আর চন্দন একবার সন্ধের পর গিয়েছিল। কিন্তু অশ্বত্থ পাতার মর্মর্ শব্দ, শকুনের বাচ্চার চেঁয়া চেঁয়া কান্না, আর শেয়ালের দীর্ঘ কান্না সদৃশ চীৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনেনি তা'রা, আর কিছুই দেখেনি। পরে যখন চম্পা বড় হয়েছে, তখন আর তা'র মনে কোন ভয় ছিল না। অন্তত মরা মানুষের নয়। মানুষ মরে গেলে আর ফেরে না। যাদের ভালবাসে তাদের একবারও দেখা দিতে আসে না। তখন মানুষরা স্বেচ্ছায়, অনায়াসে হয়ে অন্য এক পৃথিবীতে চলে যায়। চম্পা তা'র মাকে একবার দেখতে পেলে কত খুশী হ'ত। কিন্তু মা ত' আসে না। চম্পার মুখ দেখতে, চম্পাকে দেখতে ত' আসে না।

চম্পা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল।

হ্যাঁ। এই সেই মন্দির। এ মন্দিরে একদিন দেবতা ছিল, আজ আর নেই। একজন ব্রহ্মচারী বাবা কিছুদিন এখানে এসে বাস করেছিল। চম্পা দেখেছে, গঙ্গার দিকে চেয়ে মানুষটি স্থির হয়ে বসে আছে। দুটি পা অদ্ভুত ভাবে মোড়ানো। ওকে বলে পদ্মাসন। যোগী আর সাধক মানুষ ছাড়া কেউ অমন ভাবে বসে থাকতে পারে না। ব্রহ্মচারীটির কাছে কয়দিন

কৌতূহলী মানুষরা এসেছিল। তা'রা নানা রকম প্রশ্ন করত। কেউ ছোট ছেলেমেয়ের অসুখ হ'লে কোলে ক'রে নিয়ে আসত। বিকলাঙ্গ, এবং অন্ধ শিশুদেরও দেখা গেল।

একটি বিশ্বাস দীর্ঘ দিন ধরে সাধারণ মানুষরা লালন ক'রে আসছে। এই মন্দিরে দীর্ঘদিন আগে এক মৌনী সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তিনি নাকি ব্রহ্মাবর্তে ব'সে তপস্যা ক'রে আশ্চর্য ফল পান। সেই তপস্যার ফল এখানেই তিনি ব্যয় করেন। অন্ধকে দৃষ্টি দেন। বিকলাঙ্গকে সুস্থ করেন। যতদিন তপস্যার বল তাঁর দেহে ছিল, তিনি একজন আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। তপস্যার সব ফল দিয়ে ফেলে, নিঃশেষিত হয়ে, খুব সাধারণ মানুষ হয়ে গেলেন তিনি। ন্যুব্জ দেহ, এক বৃদ্ধ ভিখারীর মতো আস্তে আস্তে চলে গেলেন। তাঁর পর থেকে মানুষরা এখনো বিশ্বাস করে মৌনী সন্ন্যাসী মাত্রে-ই আশ্চর্য কোন ক্ষমতা আছে। এই ব্রহ্মচারীটি যখন বুঝলেন, এরা তাঁর কাছে লোকোত্তর, আশ্চর্য সব বর চায়, তখন তিনি একদিন রাতে মন্দির ছেড়ে চলে গেলেন।

নির্জন মন্দির। পরিত্যক্ত মন্দির। পরিত্যক্ত কোন গৃহস্থ ঘরের মতোই শ্রীহীন। এখন মাঝে মাঝে দুপুরে ছোট ছোট রাখাল ছেলে মেয়ে আসে। ছাগল ছেড়ে দিয়ে চত্বরে বসে। পাথরে আঁক কেটে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করে। তারপর কেউ থাকে না। ছাগলের নাদি, শুকনো পাতা আর কাঠকুটো গঙ্গার তীব্র বাতাসে মন্দিরের মেজেতে উড়ে উড়ে বেড়ায়। চম্পা সেখানে দাঁড়াল।

মন্দিরের গায়ে হেলান দিয়ে একজন দাঁড়িয়েছিল। চম্পা তাকে ডাকল 'চন্দন।'

চন্দন তা'র দিকে ফিরল। তা'র কাছে এল। তারপর তা'র হাতে হাত রাখতে গিয়ে সঙ্কোচে হাত টেনে নিল। চম্পা বললো 'ভেতরে চল। বড় শীত করছে।'

চম্পা হঠাৎ কাঁপতে সুরু করল। থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল তা'র শরীর। সে দুর্বল বোধ করছে। দাঁড়াতে পারছে না। চন্দনের কাঁধে হাত রেখে সে উঠে এল চত্বরে। দুজনে পাশাপাশি বসল।

অনেকক্ষণ ধরে তা'রা অনেক কথা বলল। চম্পা বলছিল 'তারপর থেকে এখানেই আছি। আর কোথাও যাব না।'

চন্দন বলল 'আমি-ও তোমার খোঁজ করেই এখানে এলাম। এখানেই থাকব। তুমি জান না, সম্পূরণ আমার চেনা লোক।'

'সম্পূরণকে আমি বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে আমার ভয় করে। যাকে বোঝা যায় না, তা'কে ভয় করে না?'

'করে। তবে ভয় পেয়ো না।'

চম্পা একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলতে সুরু করলো 'তোমার মা যা বলেছিল, তাই-ই হ'ল। আমাকে বাজারে নামতে হলো। রমজানী হতে হলো আমাকে।'

'ও সব কথা মিথ্যে। তুমি ভাগ্য চক্রে এখানে এসেছ।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আগে বিশ্বাস করতাম না আমি এইরকম হতভাগ্য। তুমি রেগে যেতে তাই বিশ্বাস করতাম না। তুমি জাননা, আমি একটা গাছ পুঁতে দেখতাম সে গাছে ফুল ধরবে কি না! তুমি বলবে সে আমার দুর্বলতা। কিন্তু চন্দন, আমার যে ভয় করত! তারপর দেখ, কত কি হ'ল। আজ আমি সত্যিই বিশ্বাস করি আমি দুর্ভাগ্যবতী। আমার কাছে যে আসবে, তারই অনিষ্ট হবে। তুমিই বল চন্দন, আমি কেমন ক'রে তোমাকে আবার আমার কাছে আসতে বলি।'

একটা শেয়াল কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। চন্দন একটা পাথর ছুঁড়ে মারল। ক্যাক্ ক'রে ভয়ের আর্তনাদ ক'রে সেটা পালিয়ে গেল। চন্দন অসহিষ্ণু এবং উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে সুরু করল 'তোমার মনটা স্বার্থপর। তুমি নিজের কথাই বলছ। তুমি জাননা আজ দু'বছর আমি গ্রাম ছাড়া। তোমায় খুঁজেছি। অনেক খুঁজেছি। চম্পা, আমি তোমাকে আর কোথাও ছেড়ে দেব না। আমি তোমায় কি ভুলতে পারি? তুমি কি আমায় ভুলতে পার? ইচ্ছে করলে কেমন ক'রে আমি ষোলটা বছর ভুলে যাব চম্পা? আমার দাদা-র রক্ত আমি-ও পেয়েছি। আমি গ্রামে গিয়ে থাকতে চাই না। ভাল লাগে না আমার। আমার অস্থজীবন ভাল লাগে। আমি সিপাহী হ'তে পারলাম না। ফৌজী আইন কানুন আমার ভাল লাগে না। সিপাহীদের ছোকরা সাহেবরা বে-তমিজ, ড্যামিট, নন্‌সেন্, শূয়ার বলে। আমি সে সব শুনে থাকতে পারতাম না। বাঙালী ডাক্তারবাবুর কাছে তাই এসেছি। এখানে আমি থাকতে পারব। আমি তোমার জন্যে এসেছি।'

'তুমি কি আমাকে…?'

চন্দন আবার মাথা নাড়ল। বলল, 'না। এখন বিয়ে করতে পারব না। এখন আমার ওপর কাজ পড়েছে। পরে, এর পরে চম্পা। আমি আর তুমি ডেবাপুর চলে যাব।'

চম্পা বিষণ্ণ সুরে বলল 'তোমরা সবাই কাজের কথা বল। সম্পূরণের ঘরে রোজ লোক আসছে। কত লোক, কত কথা বলছে। তোমরা কি কাজ করবে চন্দন? সম্পূরণ আমার কাছে টাকা রাখতে দেয়। অনেক টাকা। সম্পূরণ আমাকে সব সময় চোখে চোখে রাখে।'

'ভালই করে।'

'শহরে বাজারে নইলে আমার বদনাম হ'ত জানি। তবু এক একসময় আমার ভাল লাগে না।'

দূরে শেয়াল ডেকে উঠল। উত্তর দিকের নদীর তীর থেকে 'রামনাম' এবং ভাঙা কাঁসা শোকার্ত গানের কান্না শোনা গেল। কুয়াশার মধ্যে কয়েকটি মানুষ নড়াচড়া করছে দেখা গেল।

'ভয় করছে, চম্পা?'

চম্পা মাথা নাড়ল। তারপর উঠে পড়লো। বললো 'এবার চলে যাব আমি।'

'আমি-ও যাব।'

দুজনেই একটু দাঁড়াল। তারপর চন্দন বলল 'বড় সুন্দর নদীটা। বড় সুন্দর, তাই না চম্পা?'

চম্পা মাথা কাৎ করল। সত্যি, তখন তা'র-ও মনে হল এই শ্মশানের নির্জনতা, এই ভাঙা মন্দিরের অন্ধকার, সাদাটে বালু আর সাদা কুয়াশা, এবং দূরে চিতার আগুনের লেলিহান শিখার দপ্ দপ্ ক'রে ওপর পানে লাফিয়ে ওঠার মধ্যে এক অতীব সৌন্দর্য আছে। বৈরাগী অবধূতের মতো রিক্ত, ভীষণ সৌন্দর্য। এ সৌন্দর্য দেখলে মানুষের নিজেকে সংযত ও শান্ত করতে ইচ্ছে হয়। যে গভীরে ইচ্ছে করলেই পৌঁছনো যায় না মানুষ সেই গভীরে-ও চলে যেতে পারে। চন্দনের সম্পর্কে তা'র হৃদয়ানুভূতিকে-ও অনুভব করল চম্পা। খুব গভীর এবং ভয়ঙ্কর তা'র সেই গভীরতা। চম্পার মনে হল, এই প্রেমকে সে কিছুতেই কথায় প্রকাশ করতে পারবে না। অন্তত সে যা যা কথা জানে, তা'তে নয়। সে একটু

যেন নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল 'তুমি আমার ভেতরে চলে গিয়েছ। রক্তের মধ্যে। তোমাকে আমি ভুলতে পারি না। পারলে আমি সুখী হতাম।'

'কেমন ক'রে?'

'মগনলালের ভাতিজা আমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল।'

'টাকা আর সোনায় তোমার সুখ হ'ত না।'

'তোমার কথা-ও যেন বদলে গিয়েছে।'

'জানি। ডাক্তারবাবু বলেন…'

'কি বলেন?'

'ডাক্তারবাবু সব কথা অন্য ভাবে ভাবেন, অন্য ভাবে বলেন। বোধহয়, তাঁর কাছে শুনে শুনে আমিও শিখেছি। টাকা আর সোনায় সুখ হয় না, এ কথা তিনিই বলেন।'

এ সব কথা-ই সত্যি। এবং সেই জন্যেই চম্পা রেগে গেল। রেগে গিয়ে বলল 'তা কি আমি জানি না? আমার আর কিছুতে সুখ হবে না, আর কোথাও আমি শান্তি পাব না? আমি কি জানি না, তুমি আমাকে একটু একটু ক'রে গ্রাস করেছ? দু'বছর বাদে দেখা হ'ল। দেখা না হবারই কথা। আর তুমি কতকগুলো কেতাবের কথা আমায় শোনাচ্ছ। যাও, তুমি যাও।'

'রাগ করছ কেন?'

'ঐ আলো দেখা যাচ্ছে চন্দন। তুমি যাও।'

'কাল কি পরশু-ই দেখা হবে। বুঝলে?'

'বুঝেছি।'

হঠাৎ চম্পা চন্দনের গলাটা জড়িয়ে ধরল। তারপর ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল। আমবাগানের আলো আঁধারিতে তা'র চেহারা মিলিয়ে গেল, কিন্তু শুকনো পাতার ওপর খসখস শব্দ আরো কিছুক্ষণ শোনা গেল। তারপর আর শোনা গেল না। চন্দন পেছন ফিরল, এবং যে পথে এসেছিল, সেই পথেই চলতে সুরু করল।

বড় একটা বাড়ির নিচে ব'সে সম্পূরণ সাহেবদের হাত দেখছিল। উৎকৃষ্ট আহার এবং উত্তম পানীয়ের পর সাহেবরা অনেকেই খুব অমায়িক

মেজাজে ছিলেন। টাইম্‌স-এ মাঝে মাঝে যিনি লিখে থাকেন, সেই সাহেবটি জিজ্ঞাসা করছিলেন 'হরিণের মাংস এবং ওটা কি ছিল, ময়ূর?'

নানা হাত তুলছিলেন। সাহেবদের আহারের সময়ে তিনি উঠে গিয়েছিলেন। সাহেবদের মাংস আহার তিনি দেখেন না। ওরা যখন আহার করছিল, তিনি শিকারখানার নতুন চীনে হাঁসজোড়াকে আদর করছিলেন। যে লোকটি পাখীদের খেতে দেয় তা'র কথা শুনছিলেন। তারপর তিনি অতিথিদের সামনে এলেন।

আজিমুল্লা এবং ডক্টর এড্‌উইন বলছিলেন—'ময়ূর পবিত্র এবং ময়ূর হিন্দুরা শিকার করতে চাননা। তা'র মাংস-ও নিষিদ্ধ।'

'এই রুপোর সার্ভিস সবই কি অতিথিদের জন্যে?'

'হ্যাঁ। পেশোয়া স্বয়ং আলাদা ভোজনশালায়, ব্রাহ্মণের হাতে প্রস্তুত খাদ্য খান, এবং সোনার পাত্র ব্যবহার করেন।'

সংবাদদাতাটি বলছিলেন 'আমি আজকে মহারাজার কাছে যে সুন্দর আতিথ্য পেলাম, তা'র বিবরণ লিখে পাঠাব। ইংলণ্ডে সবাই আগ্রহ ক'রে পড়বে। কেননা তা'রা মহারাজের নামের সঙ্গে পরিচিত।'

নানা সাহেব সহসা অনেক কথা বলতে সুরু করলেন। তিনি থামলে আজিমুল্লা খান্ ব'লে গেলেন—'শ্রীমন্ত পেশোয়া বলছেন, অনেক খবর আপনারা টাইম্‌সে দেন, যার কার্যকারণ বোঝা যায়না। টড্‌ সাহেব কাগজ পড়ে শোনান, এবং শ্রীমন্ত আগ্রহের সঙ্গে ভারতের রাজামহারাজাদের খবর লক্ষ্য করেন। যেমন ১৮৫৪ সালে গোয়ালিয়রের জয়াজীরাও সওয়ারদের মাইনে দেননি, বা গুলী করেছেন এই খবরটি বেরিয়েছিল। তা'তে আপনার দেশের লোক হয়ত' মনে করে এখানকার রাজামহারাজারা কথায়' কথায় সৈন্যদের মেরে ফেলে। কিন্তু এই নিমন্ত্রণের কথা কেন লিখবেন? শ্রীমন্ত বলছেন, এ অতি সামান্য আয়োজন। শ্রীমন্ত বলছেন, একদিন আপনি বিঠুরের অস্ত্রাগার, শিকারখানা, এবং অন্যান্য যা কিছু আছে দেখুন। দেখে লিখবেন অবশ্য যদি লিখতে ইচ্ছে হয়।'

অতঃপর নানা সাহেব, আজিমুল্লা এবং ডাক্তার ট্রেসিড্‌ডার পাশের ঘরে গিয়ে পেশোয়ার রোগ নিয়ে আলোচনা করতে ব্যাপৃত হলেন। সম্পূরণের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন কেউ কেউ। কৌতূহলী ইভান্‌স বলছিল 'এ কি মহারাজের নিজের জ্যোতিষী?'

এড্উইন ঈষৎ হাসলেন। তিনি বললেন, 'না। মহারাজার জ্যোতিষী সম্প্রতি কাশী গেছেন। সে জ্যোতিষী সাহেবদের ছোঁবে না।'

'কেন ?'

ঘাড় নেড়ে এড্উইন বললেন, 'ঐ আর কি !'

ছোকরা সাহেবরা ভীড় করেছিল। সম্পূরণ একজনের হাত দেখে বলছিল, 'ছোটবেলা অস্ত্রাঘাত। মাতৃবিয়োগ। চাকরিতে বিফলতা। ভারতে আগমন। বিবাহে নৈরাশ্য।'

একটু লাল হয়ে এ্যাড্জুটেন্ট-টি হাত টেনে নিল। অন্যরা হাসি লুকোতে মুখ ফিরিয়ে নিল। অবিবাহিতা ইংরেজ মেয়েদের অভাব নেই। তবু ছেলেটির স্ত্রী জুটছে না। রোজএমিলি মীড এই সেদিনই ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ্যাড্জুটেন্ট শেফার তা'র লজ্জা ঢাকতে তাড়াতাড়ি বলল, 'অতীতটা ঠিকই বলেছে। একেবারে ঠিক।' সে সরে গিয়ে তৃষ্ণার্ত সৈনিককে সার ফিলিপ সিড়নী জল দিচ্ছেন, এই তৈলচিত্রটি নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে লাগল।

ইভান্স এগিয়ে এল। এবং আরো দু'জন। বলল, 'ভবিষ্যৎ বল। বল ভবিষ্যতে কি হবে !'

পাইপে তামাক ভরতে ভরতে এড্উইন বললেন, 'হ্যাঁ। সাহেবদের সোনার থালাবাটি হবে, একশো ছেলে হবে, এ সব বলো না। অন্তত সব সাহেব-ই সি. ইন. সি. হবে এ কথা বলো না।' তিনি চোখ টিপে হাসলেন।

সম্পূরণ বলতে সুরু করল, 'সাহেবদের হাতে, সব সাহেবদের হাতে আমি ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগ দেখতে পাচ্ছি।'

'অর্থাৎ গঙ্গার জল বাড়বে, বাঁধ ভেসে যাবে, আর প্যারেড গ্রাউণ্ডে ঘোড়া ক্ষেপবে ?'

'না। আমি দেখছি এক ভয়ঙ্কর আঁধি আসবে। সে ঝড়কে কেউ ঠেকাতে পারবে না। পাহাড়ের চূড়া থেকে ঈগলের বাসা উড়ে যাবে। সিংহ ভয়ে গুহায় লুকোবে, বা জলে ঝাঁপ দেবে।'

'আর কি দেখছ ?'

'রক্তপাত, হানাহানি, মৃত্যু। এই সব ঘটবে।'

'আর কি দেখছ ? বুড়ো শয়তান ?'

'আর কিছু না। আমার চোখ আর চলছে না।'

নিরাশ হয়ে সাহেবরা উঠে পড়ল। এড্উইন বলতে শুরু করলেন, 'ওরা

এমনি রূপকথা ক'রে কথা কয়। সব বাজে। যেদিন বম্বেতে পোর্টে নেমেছি, সেদিন থেকে যত জ্যোতিষী আমায় যা বলেছে, তা সত্যি হলে আমি এখন কোটিপতি হতাম। ওরা এইসব বলে···কই, আমি ত' চল্লিশ বছরে কারো মধ্যে অলৌকিক কোন ক্ষমতা দেখলাম না···'

একা গাড়ী চড়ে কানপুরে ফিরতে ফিরতে সম্পূরণ বলল, 'কোথায় গিয়েছিলি? এত দেরি করলি?'

জবাব দিল না চম্পা।

'দেখ, দেরি হ'ল। কত দেরি হ'ল।'

চম্পা বলল, 'তুমি বুঝবে না।'

'কি বুঝব না?'

উত্তর নেই।

সম্পূরণ রেগে গাড়োয়ানকে ছুটো ধমক দিল। হঠাৎ হেসে উঠল চম্পা। বলল, 'ভাল ক'রে কথা তুমি বলতে পার না কারুর সঙ্গে?'

'না।'

'একদিন ঐ ব্যবহারের জন্যেই কেউ তোমাকে মারবে।'

'সম্পূরণকে মারবে তেমন পুরুষ নেই, বুঝলি?'

চম্পাকে হঠাৎ যেন ছেলেমানুষিতে পেয়েছে। সে হেসে হেসে বলল, 'সত্যি তোমাকে দেখলে একটা ছোট ছেলেও ভয় পায়। তুমি বড় দুর্ভাগা।'

'চম্পা।'

'হঁ্যা, বড় দুর্ভাগা তুমি। কিন্তু সকলকে ভয় দেখিয়ে তুমি কাজ করাতে চাও কেন? মিষ্টি ক'রে, এই আমার মতো ক'রে বলতে পার না?'

'চম্পা, তোর কি হয়েছে?'

'আমার? আমার আনন্দ হয়েছে।'

'কেন, চম্পা?'

'কেন?'

হঠাৎ সম্পূরণের হাতটা ধরল চম্পা। হেসে বললো, 'সম্পূরণ, সম্পূরণ, তোমার কোনদিন যৌবন ছিল না?'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চম্পাকে গালি দিতে শুরু করল সম্পূরণ। তারপর চুপ ক'রে গেল।

দুই

চম্পা আয়নার দিকে চেয়ে বসেছিল। আয়নাতে, নিজের ছায়া অমন করে না কি দেখতে নেই। যারা আয়না দেখে, তাদের দুর্ভাগ্য হয়। কিন্তু চম্পা আয়নায় নিজেকে দেখে না। আয়নার দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের জীবনের কথা ভাবে সে। নিজের জীবনের কথা যখনই সে ভাবে তখনই আয়না নিয়ে বসে। আয়নার সামনে ব'সে থাকতে দেখলে সম্পূরণও তা'কে ডাকতে ভয় পায়। কোন কোন দিন সে অনেকক্ষণ বসে থাকে। সম্পূরণ তখন বলে, 'রাঁধবি না চম্পা? খেতে দিবি না?'

নিশ্বাস ফেলে উঠে যায় চম্পা। দেখে যে ছোট মেয়েটা তা'কে সাহায্য করতে আসে, সে গুটিসুটি হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। উনোনে আগুন নেই। চম্পা কাঠটা ঠেলে দেয়। ডালের হাঁড়িটা চড়িয়ে দিয়ে শাক-সবজি কাটতে শুরু করে।

আবার সময় পেলেই সে আয়নার সামনে বসে। আয়না ধ'রে নিশ্চল হয়ে ব'সে থাকে।

আয়নার সামনে বসে থাকার মতো রূপ চম্পার নেই। তা'র মা সুরজ-কুমারীর ছিল। অনেক রূপ ছিল ব'লে, সেঙ্গার নদীর তীরে, ছোট ডেরাপুর গ্রামের গৃহস্থ মোহনচাঁদ তা'কে একমাত্র ছেলে অনন্তরামের বৌ ক'রে এনেছিল। উঠোনে গম ঢালা ছিল। পরাতে মিষ্টি চুড়ো ক'রে রাখা ছিল। কলসীতে দুধ ছিল। সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘরে উঠেছিল সুরজ। সুরজের বাপের বাড়ীতে কেউ ছিল না। তাই বিয়ের পর থেকে সে বাপের বাড়ী যায়নি।

তা'র খুব রূপ ছিল। তবু মুখ দেখতে একটা আয়না ছিল না। একবার গাঁয়ে একজন উলকিদার এসেছিল। সুরজের শাশুড়ী দাঁড়িয়ে থেকে তা'র হাত, গলা ও কপালে উলকি দিয়েছিল। সুরজ শুনেছিল উলকি প'রে তা'কে রানীর মতো দেখাচ্ছে। সে একখানা পেতলের থালা সোনার মতো ক'রে মেজে নিয়েছিল। তাতেই সে মুখ দেখত। ময়লা হ'লে আবার তেঁতুল দিয়ে মেজে নিত। অনন্তরাম বলত, 'আমি তোকে একটা আয়না এনে দেব বৌ।'

শাশুড়ী কিন্তু বৌয়ের মুখ দেখা পছন্দ করত না। শাশুড়ী নিজে কোন কাজ

করত না। শাশুড়ী তা'কে পাহারা দিত। নদীতে বাসন মাজার সময়ে, প্রতাপদের ইঁদারায় জল ভরার সময়ে তা'র সঙ্গে থাকত। শাশুড়ী বলত 'তোর ছেলে হোক বৌ। অনেক ছেলে হোক। তাহ'লে তোর রূপ টস্‌কাবে। মা গো, কি রূপ! এত রূপ ভাল নয়।'

সুরজও চাইত তা'র অনেক ছেলে হোক। কিন্তু তা'র পেটে যখন ছেলে এল, তখন সে লজ্জায় শাশুড়ীকে বলতে পারেনি।

তখন ১৮৩৭ সাল। প্রয়াগে মাঘমেলায় যাবে শ্বশুর আর শাশুড়ী। গ্রামের অন্যরাও যাবে। গয়া গিয়ে মোহনচাঁদ পিতৃপক্ষে তর্পণ করবে। কাশী গিয়ে বিশ্বনাথ দেখবে। তারপর প্রয়াগ যাবে। তিনতীর্থ ক'রে প্রয়াগে স্নান করলে তবে পুণ্য হবে।

যাবার আগে শাশুড়ী সুরজকে অনেক কথা ব'লে যায়। সন্ধ্যেবেলা যেন বেরোয় না। খোলাচুলে যেন গাছতলায় যায় না। রাতে কারো ডাক শুনলে হঠাৎ সাড়া দেয় না। গ্রামের কোন শয়তান বুড়ী যদি শনিবারে তা'কে কলা খেতে দেয়, সে যেন খায় না। কারো কাছ থেকে যেন মাদুলী কবচ নেয় না। ভারী কাজ সব কৌশল্যা ক'রে দেবে। সুরজ যেন গম মাড়াতে, ঘোল মইতে, বা গরুর ঘাস দিতে না যায়। কাঠ না থাকলে যেন জঙ্গলে কুড়োতে না যায়।

শেষ অবধি গয়া বিশ্বনাথ যাবার আগেই প্রয়াগ যায় মোহনচাঁদ। এবং সেখানে প্রয়াগে যে হায়জার মড়ক লেগেছিল, তা'তেই সে মারা যায়। তা'র বৌ-ও বাঁচেনি।

গ্রামের আরো মানুষ মরেছিল।

দুঃসংবাদ শুনে সুরজ ভয়ে এবং দুঃখে কিরকম হয়ে যায়। পেটের ছেলেটা তা'র বাঁচেনি। পেটেই মরে যায়।

অনন্তরামের উঠোনে গ্রামের দশজন এসেছিল। চারপাই পেতে ব'সে পান, তামাক ও খৈনী খেয়েছিল। অনন্তরামের এই উপর্যুপরি দুর্ভাগ্যের কারণ খুঁজছিল তা'রা। গ্রামের জাগ্রত দেবতা গৈবীনাথ শিবের সেবায়েত কেশবরাম বললেন, 'মোহনচাঁদ মহাপাপী। আরে, আগে গয়াজীতে রামসীতা দর্শন, বিষ্ণুপাদ মন্দির দর্শন। তারপর বিশ্বনাথজী, তারপর পৈরাগ। দেখ, গঙ্গাতীরে মরল মোহনচাঁদ, হয়তো মৃত্যুকালে জল পেল না একফোঁটা। জয় প্রয়াগ, জয় জয় প্রয়াগ, মোহনচাঁদের সব ফাঁকি তুমি ধ'রে ফেলেছ।'

গ্রামের সবাই সম্মতি দিল।

কেশবরাম অনন্তরামকে বিধান দিলেন, অনন্তরাম যদি গৈবীনাথকে সোনার বেলপাতা গড়িয়ে দেয়, এবং গয়া-কাশী-প্রয়াগ ত্রিতীর্থ করে, তবে প্রায়শ্চিত্ত হবে। নইলে মোহনচাঁদ চোদ্দ পুরুষ ধ'রে নরকে পচবে।

স্বয়ং কেশবরামের কথা।

কে না জানে কেশবরামের মুখ দিয়ে গৈবীনাথ-ই বলছেন! গ্রামের প্রান্তে বসে গৈবীনাথ, ডেরাপুর এবং কাছাকাছি তিনচারটি গ্রামের মানুষের সুখ, দুঃখ ও ভাগ্যকে শাসন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, মানুষ ও পশুর মড়কের সময়ে কেশবরাম তিনদিন তিনরাত উপোস ক'রে পড়ে থাকে। তারপর তা'র উপর গৈবীনাথ ভর করেন। সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে এবং রক্তচোখ ক'রে মুখদিয়ে ফেনা তুলতে তুলতে উচ্চকণ্ঠে দেবতার আদেশ জানাতে থাকে।

নিত্য আরতির সময়ে রুপোর সাজ বেরোয়—লালারা করিয়ে দিয়েছে। শিবরাত্রির দিন গৈবীনাথের মাথায় সোনার ছাতা ওঠে, হাজিপুরের জমিদারের দান। কাশীতে বিশ্বনাথের অন্নকূটের সময়ে গৈবীনাথের মাথায় একমণ দুধ ঢালা হয়। হাজিপুরের তশীলদার খরচ দেয়, তবে গোয়ালাদের দুধ জোগাতে হয়। দুধের ওজনে ফাঁকি পড়বার জো নেই।

একবার পরমেশ্বর আহীর দশ সেরের জায়গায় ন'সের দুধ এনেছিল। কিন্তু দিন তিনেক বাদে নিজের গোয়ালেই তা'কে সাপ কাটল। সবাই এসেছিল। পায়ে দড়ি বেঁধে ওঝা তা'কে ঝাড়ফুঁক করছিল। সে শিঙে বাজাচ্ছিল, শেকড় পোড়াচ্ছিল, মন্ত্র বলছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ক্রমেই নীল হয়ে যাচ্ছিল। মাথার চুল উঠে আসছিল তা'র, হাতের নখ কালো হয়ে যাচ্ছিল। কেশবরাম বলেছিল, 'দড়ি খুলে দে!'

ওঝা দড়ি খুলে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল। পরমেশ্বর তখন জড়িয়ে জড়িয়ে গোঙিয়ে গোঙিয়ে বলেছিল, 'আমার হাতের সাত আঙুল দুধ হলে ওজন পুরো হতো। আমি কি করলাম।' কেশবরাম সক্রোধে বলেছিল 'মহাপাপী তুই। তাই বাবার মাথায় যে গোহমন সাপ থাকে, সে তোকে কামড়িয়েছে।'

গৈবীনাথকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।

অনন্তরামও ফাঁকি দিতে চাইল না। তা'র সাহস হল না। সে কথা

দিল, চাষের টাকা ঘরে তুলেই সে যাবে। তিনতীর্থ করবে। প্রায়শ্চিত্ত করবে।

কয়েকমাস কেটে গেল! সুরজকুমারী অনন্তর মুখের দিকে চাইতে পারত না। দুশ্চিন্তা ক'রে মানুষটা শুকিয়ে উঠেছিল। তারপর সুরজের যখন দ্বিতীয়বার সন্তানসম্ভাবনা, সেবার কৌশল্যা, আত্মীয়স্বজন এবং চাচীর হেপাজতে বৌ-কে রেখে অনন্তরাম তীর্থে বেরুল।

চাষ ভাল হয়নি। চাসের জমি, হাল এবং পেতলের বাসন লালা বৈজনাথের ঘরে জমা পড়েছিল। সুরজের গয়নার বন্ধকী টাকা এবং ধারকরা টাকা নিয়ে অনন্তরাম পথে বেরুল। এক মাসেই সে সব শেষ করবে।

অনন্তরাম পথে বেরুলো। অনন্তরাম বেশী দূর যায় নি। গ্রাম ছেড়ে হাজিপুরের পাকা সড়কে পা দিতে দিতেই মনটা তা'র অজানা সংশয়ে অস্থির হচ্ছিল। এই প্রথম সে নিজের পরিচিত সীমানা ছেড়ে দূরগামী হয়েছে। তা'র চারিদিকের সব কিছুই অচেনা। ভয় ভয় করছিল অনন্তরামের, নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছিল। বাইরের পৃথিবীর বিপুল আয়োজনে অস্বস্তি আর সংকোচ জমা হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। ঠিকানা-না-জানা আগন্তুকের মতো তা'র মুখেও একটা উদ্বেগ এবং দুর্বলতা করুণ ছায়া ফেলছিল।

ঠিক তখনি বাড়ীর জন্যে মন কেমন করল তা'র। পথের বিরাট সমারোহ ছেড়ে নিজের সেই ক্ষুদ্র আশ্রয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করল।

অনন্তরামের সঙ্গে তা'র কাকার শালা ছিল। সে নেহাৎই নাবালক, শুধু পথের সঙ্গী মাত্র, কোন ভরসা নয়। বরং তা'র ভাবনা অনন্তরামের ভয়কে আরো বাড়তে সাহায্য করছিল।

চলতে চলতে দিনের আলো ফুরিয়ে এল। সন্ধ্যার অন্ধকার একটা প্রগাঢ় মেঘের মতো গ্রাস ক'রে ফেলল চরাচর। গাছের মাথায় মাথায় অন্ধকার জমাট বাঁধতে লাগল। দিনের বেলায় সারা পথ জুড়ে যে-সব ছোট খাট নাম-না-জানা শব্দ, পাখীর ডাক, দূরাগত পথিকের অতর্কিত কণ্ঠস্বরে জীবনের স্পন্দন শোনা যাচ্ছিল, সন্ধ্যার সূচনায় সেসব আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে গেল।

পাখীরা ক্লান্ত পাখা টানতে টানতে গাছের ডালে ডালে আশ্রয় রচনা করল। জোনাকী জ্বলল, ঝিঁঝি ডাকল, পাতায় পাতায় খড়খড় শব্দ তুলে পালিয়ে গেল শিয়াল। প্যাঁচা পাখা ঝাপটাল। অনন্তরামের মনে হল ওরা যেন কোন ভয়ংকর আগমনকে ঘোষণা করছে। অনন্তরাম আরেকটু বেশী ভয় পেল।

বড় একটি গাছের তলায় তিনজন নেড়া মাথা সন্ন্যাসী বসেছিল। তাদের দেখা পেয়ে একটু আশ্বস্ত হলো অনন্তরাম। রাত কাটাবার মতো জায়গা নিল তাদের পাশে। সন্ন্যাসীরা ধুনী জ্বালাল। বড় বড় ঝোলা থেকে চিম্‌টে, পেতলের সাঁড়াশী বা'র করল। আটা বা'র করল, তারপর রুটি পাকাতে লাগল।

রাত বাড়ছিল। আগুনের দপদপে আলোয় সন্ন্যাসীদের মুখ দেখা যাচ্ছিল। ভাবলেশহীন মুখ। কখনো কখনো অনন্তরামের কথায় তা'রা পরস্পরের দিকে চাইছিল কিন্তু কখনোই খাঁটি অভিব্যক্তিতে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছিল না।

নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না অনন্তরাম। তবে সে আন্তরিকভাবে নিজের সব কথা খুলে বলছিল সন্ন্যাসীদের। তা'র মনে হচ্ছিল এদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে কোন ক্ষতি নেই। এই অচেনা-অজানা পথে এরাই তা'র একমাত্র সহায়, বন্ধু। খানিকটা উদ্‌বেগ প্রশমিত হওয়ার উৎসাহে, এবং খানিকটা পথের সঙ্গীদের অনুগ্রহভাজন হবার চেষ্টায় অনন্তরাম নিজের জীবনের সব কিছুই ব'লে ফেলে। বাপ মা'র কথা। কেশবরামের আদেশের কথা। ডেরাপুরের গৈবীনাথ শিবের কথা।

সন্ন্যাসীরা নীরবে সব শোনে। মাঝে-মাঝে এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। রুটি সেঁকা চলে। ধুনীর আগুন কেঁপে কেঁপে ওঠে হাওয়া লেগে। ওদের মুখ লালচে দেখায়।

একজন উপদেশ পরামর্শ দেয় তা'কে। সন্ন্যাসীদের মধ্যে সে-ই একটু বয়োপ্রবীণ। শ্মশ্রুবিহীন কঠিন মুখ, চোয়ালটা শক্ত। চওড়া কপাল। কপালের ওপর দুটো নীল-নীল শিরা পেন্সিলের মোটা রেখার মতো সমান্তরাল হ'য়ে আছে। দু'টি চোখের মধ্যে বাঁ চোখটা অপেক্ষাকৃত ছোট। তা'তে তা'র দৃষ্টিকে কিছু নির্দয় করেছে।

তারপর ওরা তাদের খেতে দেয়। রুটি আর মিষ্টি, অনেকদিনের শক্ত

শক্ত লাড্ডু। অনন্তরামের মনে হয় ওরা যেন তা'কে একটু বেশী যত্ন করছে। ওরা আশ্চর্যভাবে মৌন হ'য়ে গেছে। অনন্তরাম মাথা নীচু ক'রে রুটির টুকরো মুখে তোলে। মাঝে মাঝে সচকিত দৃষ্টি তুলে ওদের মুখের দিকে তাকায়। ওরা তাকিয়েই আছে। বয়স্ক সন্ন্যাসীটি ঠোঁটটা অল্প একটু ফাঁক ক'রে হাসে। অনন্তরামের আবার ভয় ভয় করে। মনে হয় যে-চিন্তাটুকু সে নানা অছিলায় আবরিত ক'রে রেখেছিল এখন এই নির্বাক পরিবেশে, নির্জন পথপ্রান্তে দপদপে আলোয় গুঁড়ি মেরে সেটা আবার মাথা বা'র করছে।

অনন্তরামের শরীর অস্থির করতে থাকে। সে শুয়ে পড়ে। শালাটিও শোয় তা'র পাশে। ঘন হ'য়ে। যতক্ষণ বাড়ীর বাইরে সে আসেনি, ততক্ষণ দেশ দেখার উৎসাহ ও উত্তেজনা তা'কে ঘিরে ছিল। পথে বেরিয়ে সেটা আস্তে আস্তে সংকুচিত হ'য়ে আসতে থাকল। তারপর শুধু ভয় এবং বিহ্বলতা তা'র বুকের ভেতর তাড়িত হ'য়ে বেড়িয়েছে। মন কেমন করেছে বাড়ীর জন্যে। অনন্তকে বলতে পারে নি, কিন্তু তা'র চোখে সেরকমই একটা আকুলতা ফুটে উঠেছে। অনন্তরাম সে আকুলতাকে চিনতে চায় নি, কেননা তা'র মনেও ওই একই দুর্ভাবনা-জনিত দুর্বল ইচ্ছেটা গোপন ছিল।

অনন্ত খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে ছিল। কিন্তু বুঝতে পারছিল কা'রা যেন তা'র জ্ঞাতসা'রেই শরীরের ভেতর থেকে সব শক্তি শুষে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে একটা দংশনের জ্বালা পাচ্ছিল, তারপর অবসাদ, ঘোর অবসাদ ওর চেতনাকে পাকে পাকে বেঁধে ফেলছিল যেন। অনন্ত উদ্যমের সঙ্গে ভাববার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝছিল, ক্রমশই সে শক্তিহীন হচ্ছে। যেন মনের ভেতর ধুলো এবং ঘামের এক চটচটে পুরু আস্তরণ পড়েছে। তা'র শরীরের সকল ইন্দ্রিয়কে অসাড় ক'রে একটা মহানিদ্রা আসছে যেন। প্রত্যঙ্গ সকল গভীর তন্দ্রার সঙ্গকামী!

অনন্ত জোর ক'রে জেগে থাকতে চাইল।

সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সন্ন্যাসীরা পাশাপাশি লম্বা হ'য়ে শুয়ে আছে। ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে বুঝল কত হীনবল হয়েছে সে। জিব জড়িয়ে আসছে। গলা শুকোচ্ছে। কাকার শালাটি ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা! ঘুমোক, বেচারী বড় ভয় পেয়েছিল। অনন্ত যেন একটু মমতাবোধ করল ছেলেটির জন্যে। কিন্তু মমতাবোধ করারও পূর্ণাঙ্গ শক্তি ছিল না তা'র।

অনন্ত আবার আকাশের দিকে তাকাল! দূরে কোথায় ডেকে গেল জন্তুরা। গাছের ডালে পাখীরা শরীর নাড়ল। রাতের অসীম মৌনতার কিছু ব্যাঘাত হ'ল তা'তে।

আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে অনন্তরামের বুকটা বাড়ী ফিরে যাবার ব্যথায় টনটন ক'রে উঠল। মনে পড়তে লাগল স্ত্রীর কথা। তা'র ছোট্ট সংসারটির কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেতনার বিপরীত কোণ থেকে একটা আশ্চর্য পরাক্রান্ত নিদ্রা প্রতিকূল স্রোতে ভাসতে ভাসতে তা'র সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন.ক'রে ফেলতে চাইল।

অনন্তর হঠাৎ মনে হলো এই সন্ন্যাসীগুলো তার খাবারে বিষ দিয়েছে। তা'কে ওরা হত্যা করতে চায়। সে ওদের বিশ্বাস করেছিল। নিজের কথা সব খুলে বলেছিল। সঙ্গের সামান্য সঞ্চয়ের কথাও জানাতে ভোলে নি। সে ওদের পথের বন্ধু ভেবেছিল।

অনন্ত প্রাণপণে মহানিদ্রার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। পা ঘস্‌টালো মাটিতে। পা অবশ। তবু তা'কে জেগে থাকতেই হবে। অনন্ত ডান হাতটা উঁচু ক'রে তুলতে চাইল। হাতে তা'র একটা তাবিজ ছিল। সেটার শক্ত কোণটা দিয়ে সে কপাল, মুখ ঘসল নির্মমভাবে। একটু পরেই রক্ত বেরিয়ে এল ঘর্ষিত স্থান থেকে। চুইয়ে চুইয়ে ঠোঁটের সমতলবর্তী হ'ল। অনন্ত জিব বা'র ক'রে চেটে নিল সেটা। আপন রক্তের স্বাদ পেল।

তবু দুর্জয় ঘুম তা'র সব চেষ্টাকে তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে আসতে থাকল। অনন্তর মনে হ'ল, তা'র এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে—ভেতরের মহলের বাতি এক এক ক'রে নিভে যাচ্ছে যেন। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশটুকুর সে আর কোনই হদিশ পাচ্ছে না।

তখন অনন্ত সেই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন নিদ্রাকে আসতে দিল। তা'র ওপর অধিকার স্থাপন করতে। চোখের পাতা যখন বুজে গেল গভীর ক্লান্তিতে তখন কোণ বেয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে রক্তের সঙ্গে মিশল। সে অশ্রুপাত মৃত্যুর যন্ত্রণার জন্যে নয়, বাড়ীর জন্যে। অনন্ত জেনে গেল, শেষ পর্যন্ত সে বাড়ী ফিরে যেতেই চেয়েছিল।

অনেক দূর থেকেই আর্ত চিৎকারটা শুনতে পেয়েছিল সূরজকুঁয়ারী। ডেরাপুর গ্রামের বিকেলের বাতাসে বাতাসে ভেসে আসছিল। দাওয়ায়

ব'সে মকাই বাছছিল সুরজ। আর বিলাপের শব্দে মাঝে-মাঝে মুখ তুলে বাইরের দিকে চাইছিল। বুকের ভেতর একটা অস্পষ্ট আশংকা জলোচ্ছ্বাসের মতো স্ফীত হ'য়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল।

বিলাপটা যখন গ্রামের পথ-ঘাট পেরিয়ে তাদের বাড়ীর দিকেই আসতে থাকল সুরজ তখন মকাই বাছা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হেলান দিল দাওয়ার খুঁটিতে। কৌশল্যা আর চাচী এসে দাঁড়াল তা'র পাশে। তাদের মুখ পাংশু হয়েছে। তা'রা তাকাল সুরজের দিকে। সুরজ নিজের দৃষ্টিকে ওদের পানে মিনতির মতো মেলে দিল। কিন্তু কেউই কথা বলল না।

ছেলেটা এসে সামনের আঙিনায় আছড়ে পড়ল। গ্রামের অনেক লোক তা'র সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল, কান্নায় আকৃষ্ট হ'য়ে। তা'রা ওকে চুপ ক'রে ঘিরে দাঁড়াল।

ছেলেটা দাপাদাপি ক'রে কাঁদছিল। তা'র খালি পা ধূলোয় ভর্তি। গায়ে কিছু নেই। শুধু যে কম্বলটা সুরজকুঁয়ারী অনন্তরামের সঙ্গে দিয়েছিল, সেটা গায়ে জড়ানো। দু'পাশের দুটো খোঁট হাত দিয়ে শক্ত ক'রে ধ'রে আছে ছেলেটা।

সুরজকুঁয়ারী বুঝল তা'র কপাল ভেঙেছে। সে কাঁদল না। শক্ত ক'রে খুঁটিটা ধ'রে দাঁড়াল। চাচী এবং কৌশল্যা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করছে। ছেলেটা কাঁদছে। সুরজকুঁয়ারীর ভারী মন আস্তে আস্তে সেসব ডিঙিয়ে স্বামীর স্মৃতিকে ঘিরে ঘুরতে লাগল। যন্ত্রণার তীব্র বোধ তা'র ছিল না। পুকুরঘাটে জল আনতে গিয়ে বহুবার পাথরে তা'র পায়ের বুড়ো আঙুল ছেঁচে গিয়েছিল। অমন নরম ফর্সা পা রক্তে লাল হ'য়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম আঘাতের বেদনাটা অসহ্য হ'ত, তারপর আর লাগত না। জায়গাটা অসাড় হ'য়ে গিয়েছিল। ভাগ্যের কঠিন শাস্তি পেতে পেতে মন থেকেও শাস্তির বোধটা চলে যায় তা'র। তাই, অনন্তরামের মৃত্যুর শোক তা'র চোখ দিয়ে গলে গলে পড়ল না, বুকের মাঝে জমাট হ'য়ে রইল। একটা নির্দিষ্ট আয়তনে, কঠিন মৌনতায়। ওদের সকরুণ বিলাপটা তাই সুরজকুঁয়ারীর কাছে অস্বাভাবিক ঠেকছিল।

তারপর পাড়া প্রতিবেশীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে অনন্তরামের দেহটাকে দাহ করবার জন্যে চলে গেল।

স্বরজকুঁয়ারীর এই দুর্ভাগ্যের দিনে চম্পা এল পৃথিবীতে। পার্থিব প্রাসাদে বাস করতে। কিন্তু মেয়ের জন্যে কোন অনুকম্পা অথবা বিদ্বেষ কিছুই বোধ করল না স্বরজ। জীবনের অনেক ঘটনার জমায়েতে আরেকটি ঘটনা জমা হ'ল মাত্র।

সংসারের সব প্রয়োজনেই তা'র মনোযোগী অংশ যেন ফুরিয়েছিল। মেয়ের দিকে তাকায় না। উনোনে রান্না পুড়ে যায় খেয়াল থাকে না। কুলোয় ক'রে গম ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ এক সময় হাতের আন্দোলনটা থেমে যায়, দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের মতো নির্নিমেষ হ'য়ে থাকে পথের দিকে। বাহুনিয়া গাছে পাখী ডাকে, কার্তিক মাসের ম্লান রোদ ঢলে পড়ে পশ্চিম পানে, দূরে মাঠের পথ বেয়ে কিষাণরা ঘরে ফেরে, তাদের গলার আওয়াজ বাতাসের হঠাৎ বওযার মতো কানে এসে বাজে। তখন স্বরজের মনটা ভাসতে ভাসতে বহুদূর চলে যায়, তারপর যখন এক জায়গায় হোঁচট খেয়ে ফিরে আসে তখন বুকের মাঝখানটায় ব্যথা ব্যথা করে। নিজেকে অনেক পরিশ্রান্ত মনে হয়। যেন সংসারের প্রচুর কাজ ক'রে হাঁপিয়ে পড়েছে সে। ভাবনার চেয়ে ক্লান্তিকর শ্রম আর কি আছে পৃথিবীতে!

আবার, জল আনতে গিয়ে বাওলির ধারে স্বরজ চুপ ক'রে বসেই থাকে। মাঠের দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। জল ভরার কথা ভুলে যায়। ছোট্ট মেয়ে আঁচল ধ'রে টানাটানি করে। বুক থেকে কাপড় খসে যায়। তবু স্বরজের হুঁশ ফেরে না। স্বরজ ভাবে, এ সংসারে আসার প্রথম দিনটির কথা। আট বছরের মেয়ে, বিয়ে হ'ল তা'র। কত লোকজন নিয়ে 'বরাত' গিয়েছিল। দুটো 'বয়েল' গাড়ী ভরতি মানুষ। ভেঁপু আর শানাই বেজেছিল তা'র বাড়ীতে। রুপোর গয়না দিয়ে তা'কে সাজিয়েছিল এরা। ছোট্ট ফর্সা নরম হাত মেহেন্দীর রঙে রাঙিয়েছিল। হলুদে ছোপানো শাড়ী। স্বরজের কপালে, নাকের পাশে ছোট ছোট মুক্তোর মতো বিন্দুতে ঘাম জমেছিল। ভয় ভয় চোখ ক'রে তাকিয়েছিল স্বরজ। আর পাড়ার বৌ-ঝি, মেয়েরা ওকে ঘিরে গান করেছিল, রাম-সীতার গান :

'শাদি বৈঠবে সীতা মাঈয়া
বরাত লে কে আয়ো লছমণ ভৈয়া।"

তারপর গওনা হ'ল ষোলো বছর বয়সে। আগেই হয়ত হ'ত। কিন্তু

স্বরজের কাকা ছিল গরীব। টাকা পয়সার তেমন সুবিধে ছিল না ব'লেই হতে পারেনি। অনন্তরাম দেখতে যেত তা'কে। 'গওনা' হবার আগেই, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে যেত। মানুষটা ভীষণ ভালবাসত তা'কে। কখনো কাছ-ছাড়া হতো না। লোকে তাই নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। বলেছে—বৌ-পাগলা! কিন্তু অনন্তরাম সেসব গায়ে মাখত না, গ্রাহ্যেও আনত না। আর. আবার কাছছাড়া হ'য়েই জন্মের মতো চলে গেল অনন্তরাম।

হঠাৎ মেয়ের কান্নায় চমক ভাঙে স্বরজের, ভাবনার স্তরীভূত ফেনাগুলো আস্তে আস্তে ফাটতে আরম্ভ করে তারপর এক সময় থিতিয়ে যায়, তখন স্বরজ মেয়ের দিকে তাকায়। তাকায় একান্ত নিস্পৃহ এবং নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। মেয়ে ছোট্ট হাত দিয়ে তা'র চোলী ধরে টানছে, আঁচড়াচ্ছে।

স্বরজ আস্তে আস্তে মেয়েকে বুকে তুলে নেয়।

কার্তিক মাস। সংসারের কল্যাণে আকাশ প্রদীপ জ্বালাতে হয়, যারা পরলোকে গেছে তাদের কল্যাণে। ছোট ছোট নাবালক দেওরদের সাহায্যে স্বরজ আকাশ প্রদীপ জ্বালায়। কিন্তু মনটা তার কোথায় কোথায় যেন ঘুরে ফেরে। মন্ত্রপড়া পুতুলের মতো সংসারের আনাচ-কানাচ দিয়ে কাজের অছিলায় হেঁটে-চলে বেড়ায় বটে, কিন্তু কিছুতে যেন মন বসে না। মেয়ের দিকে তাকাবার অবসর পর্যন্ত হয় না।

চাচী আক্ষেপ করে, কপালে করাঘাত ক'রে বলে, হায়, কি সংসার কি হ'য়ে গেল! নজর লেগেছে শনির তাই অমন বৌটারও মতিচ্ছন্ন হয়েছে!

স্বরজ সব শোনে কিন্তু কিছু বলে না। আস্তে ক'রে দরজার আড়ালে স'রে যায়।

একদিন সন্ধ্যায় ঘরে ব'সে আয়না দিয়ে মুখ দেখছিল স্বরজ। অনন্ত মারা যাবার পর আয়না সে হাতে তোলে নি।

একটি সম্ভাষণের মতো প্রথম শীতের হাওয়া আসছিল। সিরসির করছিল গা-হাত-পা। কিন্তু স্বরজের কোনদিকে খেয়াল ছিল না। নিবিষ্টচিত্তে আয়না দিয়ে নিজেকে দেখছিল সে।

তা'র অঙ্গ ঘিরে কালো কাপড়ের আচ্ছাদন বর্ষাকালের মেঘের মতো সমাচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল। কালো বাস তা'র বৈধব্যের সাজ। গায়ে একখানিও

গয়না নেই। নিরাভরণ দেহ মরুভূমির মতো রুক্ষ এবং রিক্ত হয়েছে। অমন গায়ের রঙ অযত্নে এবং বেদনায় মলিন। চোখের তলাটায় কালির আস্তর।

স্বরজের কোনদিকে খেয়াল ছিল না। আয়না দিয়ে মুখ দেখতে দেখতে আপন ভাবাবেশে নিবিষ্ট হ'য়ে পড়েছিল।

মেয়েটা এই ঠাণ্ডার সন্ধ্যায় উঠোনে পড়ে পড়ে কখন কেঁদেছে, ধুলো-বালিতে হাত-পা আছড়েছে, তারপর কখন ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—কিছু খেয়াল করে নি স্বরজ।

চাচী আর কৌশল্যা এসে যখন উঠোনে দাঁড়িয়ে হাউমাউ ক'রে উঠল তখন সে ঘর থেকে ছুটে এসে লজ্জায় আর বাঁচে না। ঘুমন্ত মেয়েকে বুকে তুলে নিল। হাত-পা-মাথা ধুলোয় মাখামাখি। গালের ওপর কান্না শুকিয়ে উঠেছে। আঁচল দিয়ে দিয়ে সব পরিষ্কার করল স্বরজ, তারপর বিছানায় শুয়ে গায়ে কাঁথা চাপা দিতে দিতে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকাল। তারপর একসময় গভীর মমতায় ভ'রে উঠল বুক।

স্বরজ বুঝল, বেঁচে তা'কে থাকতেই হবে, বাঁচতে হবে ওই মেয়েটার মুখ চেয়ে। ওকে মানুষ করতে হবে, বড় করতে হবে। নিজেকে অত দুঃখের প্রকোপে ভেসে যেতে দেওয়া চলবে না। সংসারের খুঁটিতে শক্ত ক'রে বাঁধতে হবে পলাতক মনকে।

তাছাড়া অনন্তরাম নেই, সুতরাং খাবার-পরবার সংস্থানটুকুও ঘুচে গেছে। তা'র জোগাড় করতে হবে। বাড়ী বাড়ী কাজ ক'রে বাঁচবার উপায় খুঁজতে হবে। অতঃপর স্বরজ সেই সব ভাবনায় ব্যস্ত হ'ল। মনোযোগী হ'ল মেয়ের প্রতি। তা'কে নাওয়ায়, খাওয়ায়, শোওয়ায়। প্রতিবেশীর জল তুলে দিয়ে আসে। গম-জোয়ারীর দিনে ঝেড়ে-বেছে দেয় রবিশস্য। জাঁতায় ক'রে পিষে দেয়। বিনিময়ে তা'রা ডালটা, আটাটা, গুড়ের সময় গুড়, কালে-ভদ্রে নগদ কিছু পয়সা, বৎসরান্তে নতুন কাপড় ইত্যাদি দেয়।

প্রতাপ সিং গ্রামের বর্ধিষ্ণু লোক। তা'র বৌ দুর্গা স্বরজের ছেলেবেলার সাথী, সহেলী। পাল-পরবে তা'র বাড়ীতেও কাজের ডাক পড়ে। কিন্তু দুর্গা বড়মানুষের গৃহিণী হ'য়ে তা'র স্বভাবকে অহমিকার পাহারায় রাখতে অভ্যস্ত হয়েছিল। কথায় কথায় তা'র মুখ ছোটে, আর সেসব কথা তো নয় যেন হুল। অন্তরাত্মা জ্বালিয়ে দেয়।

দুর্গা শিবরাত্রি করে। শিবরাত্রির দিনে গৈবীনাথকে ঘরের গরুর দশ সের দুধ দিয়ে স্নান করায়। ডাকের গাড়ী ভাড়া ক'রে ইচ্ছে হলেই তীর্থ করতে যায়। তার বাড়ীর গরু-মোষেরা গরমের দিনে সের সের গুড় দিয়ে জল খায়। সরকারী সডকের পাশে কুয়ো খুঁড়ে দিয়েছে দুর্গা। বৈশাখ মাসে সেখানে জলসত্র বসে।

ডালের বেসন বানাতে বানাতে, দইয়ের ঘোল করতে কিংবা লাড্ডু মিঠাই পাকাতে পাকাতে সুরজ এসব কথা শোনে। দুর্গার ঐশ্বর্যের কথা, তার মহাপ্রতাপের কথা। তাকে শোনানো হয়। কিন্তু সুরজ আপন মনে কাজ করে যায়, এসব আলোচনায় অংশ নেয় না।

তবু তাকে নিস্তার দেয় না দুর্গা। তার কথায় বড় ধার, তার হিংসে অগ্নিবর্ষী। অনেকদিন ধরে বুকে জ্বালা পুষে রেখেছে সে, আজ সুরজের দুর্ভাগ্যে, তাকে দুর্বল অবস্থায় পেয়ে দুর্গা তার জিবকে যথাসম্ভব শাণিত করে। মানুষের মধ্যে বরাবরই একটা পশু থাকে, অপ্রস্তুত অবস্থায় কাউকে পেলে তাকে ছাড়ে না, আঘাত ক'রে আনন্দ পায়।

প্রতাপ সিংয়ের বৌ হ'য়ে আসবার পর শাশুড়ী দুর্গাকে মাঝে মাঝেই খোঁটা দিত। তার রূপ ছিল না। রূপ ছিল অনন্তর বৌ সুরজের! শাশুড়ী আক্ষেপ করত। কখনো সামনে, কখনো আড়ালে। মনে মনে একটা বিদ্বেষ জমা হতো দুর্গার, বিষাক্ত বাষ্পের মতো তার বুকে একটা রুগ্ন আবহাওয়া তৈরি করত।

দুর্গা বলে, 'আমি সেদিন থেকে মনে মনে গৈবীনাথকে ডাকতাম। তিনি যেন আমারও দিন দেন।'

হাজাম-বৌ তোতাপাখীর মতো বলে ওঠে, 'আহা! 'সুরৎ' তো দু'দিনের বিবিজী কিন্তু ধর্ম চিরদিনের। আপনার মতো ধার্মিক আর কে আছে।'

বেলা তিনটেয় ছোট জলচৌকিতে বসে হাজাম-বৌয়ের কাছে পায়ে মেহেন্দী লাগাতে লাগাতে দুর্গা এসব আলোচনা করে। আর, পাশের ঘরে আগুন তাতের সামনে মালাই জ্বাল দিতে দিতে কপালে হাত রেখে সুরজ ভাবে, দুর্গার কথাগুলো কি আগুন-তাতের চেয়েও বেশী তপ্ত! মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা যায় তায়। ভীষণ প্রতিবাদ। ভেতরটা তেমনি ক্ষোভ ও উত্তেজনায় প্রস্তুত হয়। কিন্তু পারে না। খুব অসহ্য হ'লে, আক্ষেপ

হ'য়ে কিছু কথা মুখে ফোটে বটে কিন্তু প্রতিবাদ হয়ে ফাটে না। আস্তে আস্তে বলে, আমার 'নসিব' নিয়ে আমি আছি, তোমাদের তো কোন ক্ষতি করি নি, তোমরা কেন বারবার আমার দুর্ভাগ্যের কথা তুলে খোঁটা দাও দুর্গা বহিন?'

দুর্গার মন তাতে গলে না। সব কথাই নিজের সুবিধামত ব্যবহার করবার অধিকার আছে তার এবং সব কথারই সমর্থন পাবার লোক আছে। সে হাজাম-বৌকে সাক্ষী মানার মতো ক'রে বলে, 'দেখলে, দেখলে গরীবের ভাল করতে নেই কখনো। আমি নেহাত ভাল মানুষ বলেই ওর কথা অত ক'রে ভাবি। নইলে আমার কি দায় পড়েছে! নইলে, আমি কি জানি না ওর ধর্ম-কর্ম ব'লে কিছু নেই! তা যদি থাকত তাহলে এই বয়সে স্বামীকে খেয়ে এখনো রূপ দেখিয়ে বেড়াতে পারত, সঙ্গে সঙ্গে চিতায় গিয়ে উঠত না? স্নান, দান, উপবাস করে কিছু ও? পরলোকের কথা ভাবে?'

শুনতে শুনতে সুরজের মনে হয় সত্যিই হয়ত সে মহাপাপ করছে। সে মহাপাপী। সে ধর্ম-কর্ম করছে না, ব্রত-উপবাস করছে না, গৈবীনাথকে দুধ দিয়ে নাইয়ে তুষ্ট করছে না। কিন্তু,—সুরজের মনে হয়, গৈবীনাথ কি তার অন্তরে নেই? মনে মনে সে কি তাঁর নিত্য পূজা করে না? সে পূজার কোন দাম নেই কি? তাছাড়া, সে বেঁচে থাকার জন্যে, দু'বেলা দু'মুঠো অন্নসংস্থানের জন্যে লড়াই করছে, তার মেয়ের মুখ চেয়ে বাড়ী বাড়ী পরিশ্রম ক'রে বেড়াচ্ছে—এগুলো কি কোন ধর্ম নয়? জীবনের ধর্ম-ই কি শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়? ওই দুর্গা, যার টাকা আছে, সহায় সম্বল আছে, সব কথা বলবার এক্তিয়ার আছে, ধর্ম কি শুধু তাকেই অনুসরণ করছে! সে-ই কি একা ধার্মিক, আর সুরজ, হতভাগ্য সুরজ মহাপাতকী?

কোঁচড়ে কিছু সিধে নিয়ে মেয়েকে সঙ্গে করে বেরিয়ে আসে সুরজ। একটিও কথা না ব'লে। সে দুঃখী, বিধবা। পৃথিবীতে তার বেশী কথা বলবার আছেই বা কি!

বাড়ীর দিকে যেতে যেতে, পথে কুয়োতলায় বসে মেয়েকে দু'টো মকাইয়ের ছাতু দেয়। নিজেও একটু জল খায়। দুর্গার সংসার সচ্ছল, দুর্গার সংসারে কোন অভাব নেই। ঘরভরা দুধ, মণ্ডামিঠাই, মিছরীর সার, গোছা গোছা লিচু, আর দই-ঘি'তে বাড়ী ভরে থাকে সব সময় কিন্তু কোনদিন

একটুকরো ফল কি মিছরী প্রাণে ধ'রে তুলে দেয় নি সে চম্পার হাতে। দুর্গার অবস্থাটা বড় কিন্তু মনটা বড় নয়।

জল নিয়ে স্বরজ যখন বাড়ী ফেরে তখন বেলা গড়িয়ে যায়। পাড়া-প্রতিবেশী আসে কেউ কেউ। তেওয়ারী-গৃহিণী আর তাঁর বৌ আসেন। মাজা ঘটিতে ক'রে চম্পার নাম ক'রে দুধ আনেন। এক একদিন শাক-সবজি। ডালা ক'রে সাজিয়ে দেন। চম্পাকে কাছে ডেকে তা'র রুক্ষ চুল বেঁধে দেন সযত্নে। নানারকম গল্প করেন। হাসি ঠাট্টায় ভরিয়ে রাখেন সন্ধ্যাটা। যাতে স্বরজের মনটা একটু ভাল হয়। যাতে সে একটু আনন্দ পায়।

তেওয়ারী-গৃহিণীর বয়স হয়েছে। পাক ধরেছে চুলে। চামড়ায় টান পড়ছে। অনেক দাঁতই পড়ে গিয়ে ছোট গহ্বর সৃষ্টি করেছে মুখে, তবু যেগুলো আছে, তাতে তিনি মিশি ঘষেন। বুড়ো হলেও মনটা সরস আছে তেওয়ারী-গিন্নীর। দুনিয়ার রকম রকমের খবর তাঁর নখদর্পণে। যদিও, সবাই জানে, তার অনেকখানিই অতিরঞ্জিত, বিকৃত। তবু, কেউ কিছু মনে করে না, এই নির্দোষ মিথ্যাচরণকে সর্বান্তঃকরণে উপভোগ করে।

তেওয়ারী-গিন্নীর দুই ছেলে এলাহাবাদে ইংরাজী ফৌজে জমাদার। তাই, নানা গল্পের উৎপত্তিতে স্বতঃই তাঁর একটি অধিকার আছে। আর, ছেলেদের কথা বলতে গেলে তিনি গর্বে গৌরবে নিজেকে সামলাতে পারেন না, একটু বেশী রাশ আলগা করে ফেলেন— একথা সবাই টের পায়। টের পায় কিন্তু কেউ কিছু বলে না। তেওয়ারী-গিন্নী বলেন, 'জান, এবার শিকারে গিয়ে রামসহায় সাহেবের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে ব'লে সাহেব ওকে একটি সোনার মেডেল দিয়েছে, এই এ-ত বড়।'

হাত তুলে অবিশ্বাস্য একটি আকারকে প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেন তেওয়ারী-গিন্নী।

শাশুড়ীর রকম দেখে অল্পবয়সী বৌটি লজ্জা পায়। সে ঘোমটার আড়াল থেকে স্বরজের দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়ে। বোঝাতে চায় কাহিনীটি সত্যি নয়।

স্বরজ কিন্তু বৃদ্ধার উৎসাহকে দমিয়ে দেয় না। সায় দিয়ে বলে, 'তা তো হবেই, কত 'ভারী' কাজ!'

তেওয়ারী-গিন্নীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি প্রসন্নমুখে আবার গল্পের সন্ধান করতে থাকেন। তারপর একসময় চোখ-মুখের ভাব

বদলে যায় তাঁর। একটা উত্তেজনার আভাসকে পরিষ্কার পড়া যায়। তিনি তাঁর বয়োশীর্ণ কোঁচকানো ও অসমতল চামড়ার হাতটিকে নেড়ে নেড়ে শরীরটাকে সুমুখ পানে ঝুঁকিয়ে বলতে থাকেন, 'এবার পৌষ মাসে সাহেবরা ক্যান্টুমেণ্টে বড়দিন করল তো! তা' একটা বাহারে গাছ ঘরের মধ্যে এনে বসিয়েছিল। তা'তে আবার বাতি দিয়েছিল। ওমা! সকাল বেলা দেখে কি তা'র ডালে এক পরী বসে আছে। সেই পরীকে বিয়ে করল সাহেব সেই পরী এখন সাহেবকে খুব জব্দ করেছে। আজ মোতি 'মাঙ্গাচ্ছে', কাল সোনার বালা 'মাঙ্গাচ্ছে'। আবার, রোজ রোজ নতুন গয়না না দিলে উড়ে যাবে ব'লে ভয় দেখায়।'

এমনি সব নানা রকম গল্প ক'রে সন্ধ্যা উত্‌রে গেলে তবে তিনি ওঠেন ততক্ষণে কৌশল্যারাও এসে পড়ে। সুরজ তুলসীতলায় পিদীম দেখায় তেওয়ারী-গিন্নী আর তাঁর ছেলের বউকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে দরজার কাছে এসে তেওয়ারী-গিন্নী ফোক্‌লা দাঁতে হেঁসে বলেন, 'আবা আসব।' সুরজ ঘাড় নাড়ে। মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে এঁদে প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার অন্তর ভরে ওঠে।

কৌশল্যারাও খুব করে সুরজের জন্যে। একদিন নুন খেয়েছি এ পরিবারের। আজ তাই, বুড়ো হাড়েও ঋণ শোধ করার ইচ্ছেটুকু মলি হয় না তা'র। সুরজকে সে ভরসা দেয়। বলে, 'কিছু ভেব না বউ দুঃখের দিন পার হ'য়ে যাবেই। তাঁকে ভাব, রামজীকো, গৈবীনাথের চর আশ্রয় নাও। দেখো, তিনি তোমার সব ঠিক ক'রে দেবেন।'

সুরজকুমারীর মনে হয়, দেবতাকে ডাকলে কি সত্যিই কোন ফল হয় তা' যদি হয়, তাহলে সে তো দেবতাকে ডাকে, অহর্নিশি। আন্তরিকভা বলে, ঠাকুর, আমার মেয়ের মঙ্গল কোরো। সে বড় দুঃখের দিনে পৃথিবী এসেছে। তাকে বাঁচিয়ে রেখো, একটু সুখ পেতে দিও।

মন্দিরে সে যায় না, যেতে পারে না। গৈবীনাথের আগে আছেন পণ্ডি কেশবরাম। গৈবীনাথকে চোখে যায় না কিন্তু কেশবরামকে দেখা যা তাঁকে খুশী করা বড় কঠিন। সুরজ শুনেছে, দেবতা আশুতোষ, তিনি কি চান না। কিন্তু দেবতার প্রতিনিধি এই কেশবরামের মতো মানুষরা সহ সন্তুষ্ট হন না। তাঁদের চাহিদা মেটে না কিছুতেই। সুরজ ভা কেশবরামকে ডিঙিয়ে তা'র একান্ত প্রার্থনা কি গৈবীনাথের চরণে পৌঁছয় ন

কখনো কখনো মন্দিরে যায় স্বরজ। মেয়ের আয়ু কামনা ক'রে বটগাছের ডালে লাল কাপড়ের টুকরো বেঁধে দিয়ে আসে। কেশবরামের সামনাসামনি পড়ে গেলে জড়সড হ'য়ে পালিয়ে আসতে চায়। কেশবরাম বলেন, 'কি অনন্তর বউ, তুমি মন্দিরে আস না কেন? এস, এস, মন্দিরে এস। গৈবীশ্বরকে ভক্তিভরে ডাক।'

স্বরজ মুখে কিছু বলে না, ঘোমটাটা নাক পর্যন্ত টেনে পাশে মেয়েকে ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু মনে মনে হাসে। ভাবে, সে কথা তুমি কি নতুন ক'রে বলবে পণ্ডিত! যাদের কেউ নেই, কিছু নেই, কাউকে তাদের ডাকতেই হয়। বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় কারুর ওপর। আর মানুষের চেয়ে দেবতাকে বিশ্বাস করা সহজ। ওই বিশ্বাসটুকুই গরীবের একমাত্র সম্বল।

মন্দিরে অনেক পোষা পায়রার ঝাঁক ছিল। চম্পা তাদের দেখে উল্লসিত হ'ত। মন্দিরে এলেই মকাইয়ের চুর নিয়ে আসত সে। কোঁচড় থেকে সেগুলো ছড়িয়ে দিত। ডানা ঝাপ্টে বকবকম্ ক'রে নেমে আসত পায়রারা। চম্পা ছুটে গিয়ে তা'র মা'র হাত ধরত। মনোযোগের সঙ্গে দেখত তাদের খুঁটে খুঁটে মকাই খাওয়া। কোন পায়রার ভাগ্যে মকাই না জুটলে মুখ শুকিয়ে যেত চম্পার। দুঃখ হ'ত। মা'র মুখের দিকে ছলছল চোখে তাকাত। স্বরজ হেসে বলত, 'আচ্ছা, কাল বেশী ক'রে নিয়ে আসব।'

ঠাকুরবাড়ীর দালানে ওপর থেকে নেমে এসেছে বড় বড ঘণ্টা। ঝুলছে। তা'র নিচেই পাথরের ষাঁড়। চম্পা মা'র কোলে উঠে সেই ঘণ্টা বাজায়। শান্ত মন্দিরকে কাঁপিয়ে ঘণ্টা বেজে ওঠে ঢং ঢং ক'রে।

তারপর স্বরজ কাজে যায়। নতুবা পরিশ্রান্ত অঙ্গ বিছিয়ে দেয় ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেতে। ঘুম জড়িয়ে আসতে চায় চোখে। জোর ক'রে সে চোখ মেলবার চেষ্টা করে, তারপর আবার পাতা দুটো বুজে আসে। তখন চন্দনের দেওয়া ছাগলছানাটি নিয়ে মাঠে চরাতে যায় চম্পা। চন্দন দুর্গার ছেলে, চম্মনের নাতি। তা'র খেলার সাথী।

'চন্দন, সত্যিই আমি দুর্ভাগ্যবতী। আমি তোমাকে পেলাম না, আমি রমজানী হলাম। আমি আমার মা'র বিশ্বাস রাখতে পারলাম না।'

চম্পা মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণ করে। পা টিপে হেঁটে যাওয়ার মতো একটা অনুভূতি হয় বুকের মধ্যে।

চম্পা ভাবে, কি আশ্চর্য তা'র জীবন, কি অদ্ভুত ভাগ্য! সে পৃথিবীতে আসার আগেই তা'র বাবার পৃথিবী-বাস ঘুচে গেছে। লোকে বলেছে, মেয়েটার মন্দ ভাগ্য! চন্দনকে ভালবেসে সুখের সন্ধান করতে চেয়েছে সে। দুর্গা বলেছে, সর্বনাশী! তারপর তা'র মা গেল। এই এত বড় দুনিয়ায় আপন জন বলতে কেউ রইল না। তখন সে রমজানী হ'ল। বাজারে নামল। সে যে দুর্ভাগ্যকে বহন ক'রে নিয়ে এসেছে পৃথিবীতে একথা সে আগে বুঝত না। লোকে বলত, তবু বিশ্বাস করত না। এখন করে। 'হ্যাঁ, এখন আমি আমার দুর্ভাগ্যে বিশ্বাস করি।'

বেতের বেড়া দেওয়া ছোট্ট কাঁচা আঁতুড়ঘর। ঘুঁটের আগুনে গরম, ধোঁয়ায় ঝাপ্‌সা। সেই ঘরে জন্ম নিল সে। পার্থিব প্রাসাদে বাস করতে এল। কিন্তু সঙ্গে এতটুকু সুখ নিয়ে এল না। ছ' দিনের দিন বিধাতাপুরুষ এসে তা'র কপালে ভবিষ্যৎ লিখে দিয়ে গেলেন। সে জানে না, হয়ত সেদিনই তার গোটা জীবনটায় দুঃখের কালো পাথর চাপা পড়েছিল। তা'র মনে হয়, আঁতুড়ঘরের দরজায় কৌশল্যা ঘুমিয়ে পড়েছিল হয়ত। তাই সে বিধাতাপুরুষকে লক্ষ্য করে নি। সোনার দোয়াত-কলম নিয়ে চুপিসাড়ে প্রবেশ করলেন বিধাতা। তাঁর পায়ে খড়ম। ভালে চন্দন-রেখা। মুণ্ডিত মাথা। শিখা গোছা ক'রে বাঁধা। মাথাটা হয়ত আকাশকে স্পর্শ করতে চাইছে। কপালে চাঁদ আর সূর্যের আলোক উদ্‌গারিত হচ্ছে। কিন্তু মানুষের ঘরে ঘুরে ঘুরে যখন বিধিলিপি লেখেন তখন এই বিধাতাই মাথা নুইয়ে ছোটখাটটি হ'য়ে যান।

সেই বিধাতা তা'র কপালে দুঃখ লিখলেন। একফোঁটাও সুখ দিলেন না, শান্তি দিলেন না।

কৌশল্যা যদি জেগে থাকত, যদি সে তাঁর পা দু' খানা চেপে ধ'রে অনুনয় ক'রে বলত, 'গোড় লাগী দেবতা, তুমি আমাদের মেয়েটার কপালে খানিক সুখ লিখে দাও' তাহলে কি তিনি শুনতেন না? তাহলে কি বিধাতাপুরুষ তা'র কপালে এমন ক'রে কালি বুলিয়ে যেতে পারতেন?

পরে বড় হয়ে অনেক ভেবেছে চম্পা, আয়নায় অনেক দেখেছে। কোথায় আছে সেই ললাটলিপি? কোন্ অক্ষরে লেখা আছে তা'র সেই দুর্ভাগ্যের দুঃসংবাদ।

অনেক খুঁজেছে, তবু পায়নি। তখন মনে হয়েছে, লোকের কথা মিথ্যে।

তা'রা তা'কে অকারণে দুষছে। ভাগ্যচক্র ব'লে কিছু নেই। আছে কর্মের পরিণতি। যা'র যেমন কাজ তা'র তেমন ফল। কিন্তু চন্দন বলত, না, এ সবই নসিব। নসিবের ওপর মানুষের কোন হাত নেই। চম্পার নসিব খারাপ তাই এমন হয়েছে। চম্পার বিশ্বাস হ'ত না, তবু মনে হ'ত হবেও বা, নইলে তা'র সংস্পর্শে এলে সকলেরই এমন অনিষ্ট হয় কেন? তা'র নিজের জীবনটাও আর পাঁচজনের মতো সোজা পথে গেল না কেন, কেন এমন-অসমান্তরাল হয়ে গেল?

মা তা'কে বারণ করত। চন্দনের সঙ্গে অত মিশতে বারণ করত। ও বড়লোকের ছেলে। ওর সঙ্গে তাদের অবস্থার কত তফাত। আসমান জমিনের প্রভেদ।

চম্পা বুঝত না, ছোট ছিল, কিছুই বুঝতে পারত না। অবাক হয়ে ভাবত, চন্দন তা'র খেলার সঙ্গী, মা ছাড়া এই পৃথিবীতে তা'র একমাত্র বিশ্বস্ত অনুচর। সে আছে বলেই তো দুপুর বেলায় নদীর ওপারে যায় সে। যে-নদীটা সারা বছর শান্ত ছেলেব মতো চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকে। আর বর্ষাকালে জেগে উঠে ভীষণ দাপাদাপি করে। তখন তা'র দৌরাত্ম্য দেখে ভয় লাগে গ্রামের মানুষের। নদীর ওপারে ঘন জঙ্গল। কতরকম ফলের গাছ, ফুলের গাছ।

একবার শীতকালে বালির চর পেরিয়ে ওরা ওপারে গিয়ে কুল পাড়ছিল। জঙ্গলের মাটিতে বাঘের থাবার চিহ্ন দেখে ভয় পেয়েছিল চম্পা। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ঝোপের আড়াল থেকে ওরা প্রতীক্ষা করেছিল একটা বিপদের। কিন্তু বিপদ আসে নি। এসেছিল একটা সুন্দর ছোট্ট হরিণ। কি ভীরু ভীরু চোখ তা'র, সবে শিঙ গজাচ্ছে মাথায়। ওদের দেখে হরিণটা ছুটে আবার জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে গিয়েছিল।

চম্পার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারে না চন্দন। লেখাপড়ায় তা'র মন ছিল না। কেশবরামের পাঠশালা থেকে বারবার পালিয়ে আসত। তা'র বাবা প্রতাপ তাই নিয়ে কত বকত ছেলেকে। টুকরি ভর্তি ক'রে শাকসবজী, পেতলের লোটায় ঘি আর কলসিতে গুড় নিয়ে প্রতাপ যেত কেশবরামের কাছে। তা'কে নিবেদন করত দ্রব্যগুলি, তারপর ছেলের হয়ে মাফ চাইত, আবার গছিয়ে আসত চন্দনকে। কিন্তু চন্দনের মন পুঁথির পাতায় আটকে থাকত না, ওপারের জঙ্গলে, চম্পার সঙ্গে কুল-সংগ্রহের নেশায় নেশায় ঘুরে

বেড়াত। কেশবরামের একটু অন্যমনস্কতার সুযোগে পালাত সে পাঠশালা ছেড়ে, তারপর চম্পার সঙ্গে নদী পেরিয়ে ওপারের বাঘা-জঙ্গলে গিয়ে হাজির হ'ত। হাতে থাকত একটা বিছুয়া। তাই দিয়ে গাছের গায়ে নিজের নাম লিখত চন্দন। চম্পা তখন লিখতে জানত না। তাই চন্দনই লিখে দিত তা'র নামটা। তারপর গাছে চড়ে চন্দন ডাল ধরে নাড়া দিত। কুল পড়ত ঝাঁকে ঝাঁকে। চম্পা ঊর্ধ্বশ্বাসে সেগুলো কোঁচড়ে তুলতে ব্যস্ত হ'ত। কুল খেতে খেতে জঙ্গলের ভেতরে ভেতরে ঘুরে যখন শরীর ক্লান্ত হয়ে আসত তখন বেলা পড়ে এসেছে। গাছের ডালের ফাঁকে নিস্তেজ রোদ্দুরটা লুকোচুরি খেলছে। ওরা হাত ধরাধরি ক'রে ফিরে আসত।

বাড়ী ফিরতেই প্রতাপ সিং ছেলেকে ভর্ৎসনা করত, ধমক দিত। চুপ ক'রে থাকত চন্দন। কথা বলত না। কিন্তু বাবার শাসন যখন উত্তরোত্তর বেড়েই চলত তখন আর সামলে থাকতে পারত না, মরিয়া হয়ে ব'লে ফেলত, 'আমি লেখাপড়া করব না। আমি সিপাহী হব। আমি কি বাণিয়া নাকি?'

প্রতাপ হাঁ ক'রে ছেলের মুখের দিকে তাকাত। বুঝত চন্দন তা'র ঠাকুর্দার স্বভাব পাচ্ছে। সে আর কিছু বলত না। কিন্তু দুর্গা অত সহজে রেহাই দিত না। সে চেঁচিয়ে কপাল চাপড়ে অস্থির হ'ত। বলত, 'এ আর কিছু নয়, ওই সর্বনাশী মেয়েটার সঙ্গদোষ। নইলে আমার এমন ছেলে অত বারমুখো হবে কেন?' স্বামীকে বলত, 'আমি বলছি তুমি এখনই এর একটা বিহিত কর, পরে ছেলে তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। ওই মেয়েটাই ভুলিয়ে ভালিয়ে, যাদু ক'রে, ওকে আমাদের পর করে দেবে।'

রাত্তির বেলায় তুষভর্তি বস্তার ওপর শু'য়ে, মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে স্বরূপও বোঝায়, 'তুই গরীবের মেয়ে, ওদের ছেলের সঙ্গে অমন ক'রে মিশতে যাস কেন?'

চম্পা মা'র বুকের উত্তাপ থেকে বিস্মিত মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন মা, তাহলে কি হয়?'

'ওরা যে বড়লোক, বাবা।'

'কিন্তু চন্দন তো আমার বন্ধু। আমাকে কুল পেড়ে দেয়। তারপর, কটৈর, হরিয়াল কত পাখী ধরে দেবে বলেছে। আমার সঙ্গে এত ভাব, তাহলে দোষ হবে কেন?'

'ওর মা-বাবা পছন্দ করে না। রাগ করে।'

'কেন রাগ করে! আমি কি খারাপ মেয়ে?'

'না বাবা, এখন তো তোমরা বড হচ্ছ, আর এমন ক'রে মেলামেশা উচিত নয়, তাই।'

'বা-রে, বড় হলেই বুঝি পুরনো সম্পর্ক সব চলে যায়? বড হ'লে তোমার সঙ্গেও কি সম্পর্ক চলে যাবে?'

স্বরজ হাত দিয়ে মেয়ের শরীরে একটু চাপ দেয়। তারপর অল্প হেসে বলে, 'পাগলা মেয়ে, তা নয়। বড় হলে ওর তো বিয়ে হয়ে যাবে।'

'বিয়ে? চন্দনের বিয়ে হবে! কোথায়?'

'কত বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে। কত আলো জ্বলবে, বাজনা বাজবে, ঘি পুড়বে, কত টাকা খরচ হবে, লোকজন আসবে।'

চম্পার মুখ মা'র কথা শুনে পাংশু হয়ে গেল। অনেকক্ষণ সে তাদের ঘরের ভাঙা চালের দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবল, ঘন ঘন পাতা ফেলল চোখের, তারপর একটি মিনতির মতো ক'রে বলল, 'তাহলে আমার সঙ্গে চন্দনের বিযে হবে না?'

স্বরজ মেয়ের কথা শুনে ভয় পেল। আবার মায়াও হ'ল। ভাবল ভাগ্য নয়, মানুষ নিজেই নিজের জন্যে জটিলতা তৈরি করে। নিজের ইচ্ছেতে, কামনায়, বাসনায়। সুতোর মতো জট পাকায়। নইলে ওইটুকু মেয়ে, তা'র মনেও কি ভয়ংকর ইচ্ছের বুনুনি চলেছে।

'কেন হবে না মা, বল না? আমার সঙ্গে বিয়ে হবে না কেন?'

'ওরা বড়লোক যে, আর আমরা গরীব লোক।'

পরের দিন সকাল বেলা নদীর পারে বটগাছের তলায় চুপ ক'রে বসে থাকে চম্পা। একা। মনটা তা'র ভারী হযে গেছে কাল মা'র কথা শুনে।

গাঁয়ের লোকজন হাটের দিকে যাচ্ছে। নদীর বালির উপর দিয়ে গরুর গাড়ী যাচ্ছে মানুষ বোঝাই ক'রে, মেলার দিকে। তা'র মতো ছেলে-মেয়েরা মেলায় যাবে। তাদের কেউ মিষ্টি কিনবে, কেউ কাঁচের চুড়ি পরবে।

কিন্তু তা'র কেউ নেই, সুতরাং সে কিছুই করবে না। সে একা থাকবে। এমন কি সে চন্দনের সঙ্গেও খেলতে পারবে না। নদীর ওপারে যেতে পারবে না। মা বলেছে, চন্দনের সঙ্গে মিশলে দোষ হবে।

এমন সময় চন্দন এল। হাতে তা'র একটা সুন্দর পাখী। ফাঁদ

পেতেছিল সে, তা'তে ধরা পড়েছে। ধবধবে সাদা রঙ। ঝুলে পড়া ল্যাজ। গলায় আর ডানায় ময়ূরকণ্ঠী রঙের আঁজি কাটা। নরম পালক।

'তুই কোথায় ছিলি? আমি তোকে খুঁজে খুঁজে সারা! এই দ্যাখ্ কেমন একটা পাখী ধরেছি?'

চন্দন হাতটা উঁচু ক'রে ধ'রে পাখীটা দেখাতে চাইলে চম্পাকে। মুখটা তা'র আনন্দে এবং গৌরবে উদ্ভাসিত। চম্পার কাছ থেকে সে তা'র গৌরবের সমর্থন খুঁজল।

চম্পা নিস্পৃহভাবে ঘাড়টা ঘোরাল। চন্দনের হাতের দিকে তাকাল নিরাসক্তভাবে তারপর আবার ঘাড়টা ঘুরিয়ে নিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল। দূর থেকে অল্প অল্প হাওয়ার সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা ভেসে আসছে। গাছের ডালে ডালে তখনো ফিকে ফিকে অন্ধকার। পাখী ডাকছে।

চন্দন একটু বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর চম্পার পাশে এসে বসল। কিন্তু চম্পা একটিও কথা বলল না। চন্দন ঘন ঘন তা'র মুখের দিকে তাকাল, উসখুস করল। শেষে একসময় জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে রে তোর? চাচী বকেছে বুঝি?'

চম্পা কোন উত্তর দিল না।

'বল না কি হয়েছে? অমন মুখ হাঁড়ি ক'রে আছিস কেন?'

চম্পা এবার আস্তে আস্তে মুখ ফেরাল। তা'র চোখ দুটো ছলছল করছে। সে আস্তে আস্তে বলল, 'না, তুমি আমার সঙ্গে আর মিশ না। তোমরা বড়লোক, আমার সঙ্গে মিশলে তোমার বাবা-মা রাগ করে, দোষ হয়।'

'কে বলেছে?'

'মা বলেছে। তাছাডা, তাছাড়া তোমার তো অন্য জায়গায় বিয়ে হবে।'

ব'লেই বড় বড় চোখ ক'রে কোন সংবাদের অপেক্ষায় চম্পা চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'দূর বোকা! আমি অন্য কাউকে বিয়ে করবই না। আমি তো বড় হয়ে সিপাহী হব। ফৌজে যাব। বাবাকে কাল বলে দিয়েছি।'

'সিপাহী? সিপাহী হলে তো যুদ্ধ করতে হয়?'

'হ্যাঁ। আমি করব, আমার দাদুর মতো। জানিস, দাদু কত বড় সিপাহী, কত নাম, আর কত গল্প জানে। আমিও বড় হয়ে ফৌজে গিয়ে তোকে ফৌজের রকম রকম গল্প শোনাব।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ, এখন চল যাই ছাগলটাকে চরিয়ে আনি। আর এই যে পানিফলের জিলিপী, তোর জন্যে এনেছি।'

কাপড়ের খুঁট থেকে শালপাতায় জড়ানো দুটো জিলিপি সাবধানে বা'র করল চন্দন, তারপর সেটা চম্পার হাতে তুলে দিল।

'তুই খাবি না ?'

'আমি খেয়েছি, আজ আমাদের বাড়ীতে পুজো তো!

তবু চম্পা ওর হাতে একখানা জিলিপি তুলে দেয়। চন্দন আপত্তি করে না। দু'জনে জিলিপি খেতে খেতে উঠে পড়ে। যাবার সময় চন্দন ওর হাতের পাখীটা চম্পাকে দিয়ে দেয়। এতক্ষণে চম্পার মনের মেঘ কেটেছে। সে বলে, 'পাখীটা ভারী সুন্দর, না রে চন্দন ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তোর মত ?'

হাত ধরাধরি ক'রে ছুটতে ছুটতে ওরা চলে যায়।

আবার, বিকেলের রোদ পড়ে গেলে সন্ধ্যার আকাশে যখন দুটো, একটা ক'রে তারা ফুটতে থাকে তখন বাড়ীর পথে ফিরতে ফিরতে চন্দন হঠাৎ ওপর পানে চেয়ে চম্পাকে বলে, 'জানিস, ওই তারাগুলো কার ?'

চম্পা বিস্মিত হয়ে, ঊর্ধ্বে ঘনায়মান অন্ধকার আকাশকে লক্ষ্য ক'রে তারপর মাথাটা নামিয়ে চন্দনের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ে।

'রামজীর, সব রামজীর।'

'রামজীর ? রামজী কোথায় থাকে ? ডেরাপুর গ্রাম থেকে কত দূরে ?'

'রামজী সব জায়গায় থাকে। মন্দিরের মধ্যে, তোর মধ্যে, আমার মধ্যে।'

চম্পা খানিক অবাক হয়ে মৌন থাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি ক'রে জানলে এত কথা ?'

'আমার দাদু আমাকে সব বলেছে।'

কিন্তু গাঁয়ে একদিন কথা উঠল। চন্দনদের কুয়োতে জল নিতে গিয়ে, পুকুরে কাপড় কাচতে গিয়ে গ্রামের বউ-ঝিদের মধ্যে আলোচনাটা শুরু হ'ল প্রথম। সেই কথা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে বাড়তে বাড়তে চন্দনদের ভেতর

বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছল। কানে গেল দুর্গার। দুর্গা শুনে প্রথমটা ভুরু কোঁচকাল। অতটা আমল দিল না। কিন্তু কেউ কেউ যখন তা'র গায়ে প'ড়ে বলে গেল, 'দুর্গা বহিন, বউটি বেছেছ বেশ। অবস্থা ভাল না, এই যা! তা না হোক্, গৈবীনাথের কৃপায় বলতে নেই, তোমার তো আর অভাব নেই কিছুর। অমন পঞ্চাশটা বউ তুমি পুষতে পার। তা' এবার বিয়েটা দিয়ে দিলেই হয়, তখন দুর্গা আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না। সর্বাঙ্গ জলে উঠল। স্বামীকে ডেকে বলল, 'তোমাকে তখনই বলেছিলাম, মেয়েটা সর্বনাশী। আসতে না আসতেই বাপকে খেয়েছে। এখন আমার ছেলেটার দিকে নজর দিয়েছে।'

প্রতাপ কোন কথা বলে না, চুপ ক'রে থাকে। বউকে সে ভাল করেই চেনে। তিলকে তাল করা তা'র স্বভাব।

'কি ব্যাপার, তুমি যে না রাম, না গঙ্গা কিছুই বলছ না! কানে যাচ্ছে না বুঝি কথাগুলো?'

'যাচ্ছে যাচ্ছে, কি হয়েছে খুলে বলবে তো'?

'হয়েছে আমার কপাল! তোমার বন্ধু অনন্তরামের বিধবা বউয়ের দুঃখে তুমি তো কাতর হও। জান, সে কি ভয়ঙ্কর ফন্দী এঁটেছে তলায় তলায়?'

'কি?'

'শহরের সাহেব লোকরা যেমন মেয়েদের বিয়ে দেয় না, ধিঙ্গী ক'রে রাখে, অনন্তর বউ স্বরজ সেই খৃষ্টানী কানুন গাঁয়ে চালু করতে চাইছে।'

'কেমন করে?'

'বিয়ে দিয়েছে ও, মেয়ের?'

'তা'তে আমাদের কী?'

'আমাদের কি! আমাদেরই তো তা'তে কপাল ভাঙবে।'

'কেন?'

দুর্গা চোখ কপালে তুলে হাঁ ক'রে তাকায় প্রতাপের দিকে। যেন এই পুরুষমানুষটার সীমাহীন নির্বুদ্ধিতায় তা'র বিস্ময় বাগ মানছে না। 'হায় রাম! ওযে আমাদের ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে ব'লে মতলব ফেঁদে বসে আছে।'

এবার একটু যেন বিচলিত হ'ল প্রতাপ। অস্বস্তিতে কয়েকবার ঘাড় নাড়ল, গলা খাঁকারি দিল। তারপর বলল, 'না, না, মেয়ের বিয়ে

দিচ্ছে না, বিয়ে দেবে কি ক'রে? অনাথা বিধবা। সহায় নেই, সম্বল নেই।'

'বেশ তো, ওর কেউ না থাকে, গ্রামে সমাজ রয়েছে, তোমরা এতগুলো লোক রয়েছ, আসুক, এসে বলুক, আর্জি পেশ করুক। তারপর তোমরা একটা পাত্র দেখে দিয়ে দাও বিয়ে। তা ব'লে আমার ছেলের পেছনে মেয়েকে লেলিয়ে দেবে কেন?'

স্বরজের কানেও পৌঁছল কথাগুলো। সে বুঝল, আরেক প্রকার বিপদ আসছে তা'র। বড় ভয়ংকর বিপদ। হয়ত এর জন্যে তা'র গ্রামে বাস করাই কঠিন হবে। হয়ত তা'র জীবিকার শেষ উপায়টুকুও ঘুচে যাবে। কিন্তু স্বরজ দমল না। শক্ত করল নিজেকে। না, আর মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য নয়। তা'তে যা হয় হোক্। ওপরে গৈবীনাথ আছেন, তিনিই জানেন সে কারুর সর্বনাশ করে নি, তা'র মেয়ে কারুর ছেলেকেই কেড়ে নিতে চায় না। অবোধ শিশু ওরা, একসঙ্গে মিলে মিশে খেলা করে, ঘুরে বেড়ায়, সেটার মধ্যেও ছল খুঁজছে এরা। এত নীচ মানুষ।

মেয়েকে সে কঠিন ভর্ৎসনা করল। বলল, 'খবর্দার বলছি আর বাড়ী থেকে এক'পা-ও বেরোবি না। মিশবি না চন্দনের সঙ্গে। তোর জন্যে কি আমি গ্রামের সকলের সঙ্গে বিবাদ ক'রে বেড়াব?'

তারপর স্বরজ শুনল চম্পার বিয়ের ঠিক হচ্ছে। ঠিক করছে কেশবরাম, প্রতাপ সিং আর গ্রামের মাতব্বররা। কোথায় বিয়ে, কা'র সঙ্গে বিয়ে কেউ 'তা' জানে না। সব জানে কেশবরাম আর প্রতাপ। শুধু এইটুকু জানা গেল, ছেলেটি চাষী। তাও নিজের বলতে কিচ্ছু নেই। তা'র বাবা অপরের জমিতে ভাগে চাষ করে। খানদানীর কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

স্বরজ বুঝল, আর দেরি করা নয়। প্রতিবাদ তা'কে করতেই হবে। নইলে মেয়েটাকে সবাই মিলে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেবে।

কৌশল্যার ছেলেকে নিয়ে স্বরজ গেল প্রতাপদের বাড়ী। তা'কে সামনে রেখে দরজার পাশ থেকে প্রতাপের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। কালো কাপড়ের ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখল। কিন্তু অবগুণ্ঠনের তলায় তা'র উত্তেজিত শরীরটা থরথর ক'রে কাঁপতে থাকল।

সে বলল, 'আমার শ্বশুর তোমার বাবার বন্ধু ছিলেন। চম্পার বাপও

তোমারই বন্ধু ছিল। আজ আমার কেউ নেই। আমি অনাথ। তাই ব'লে তোমরা চম্পাকে হাত পা বেঁধে ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছ, তা আমি সইব না।'

প্রতাপ রুষ্ট হ'ল। সে সম্মানিত এবং বিত্তশালী। অপরে তা'র কথায় প্রতিবাদ করলে সে সইতে পারে না। সে বলল, 'কে বলল তোমার মেয়েকে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে? আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? আমি যা ভাল বুঝেছি তাই করছি।'

'না। তোমার ভাল করতে হবে না। আমি ওখানে চম্পার বিয়ে দেব না।'

'চম্পার মা, বড্ড বড় কথা হয়ে যাচ্ছে না?'

'বড় কথা?'

স্বরজ এবার তা'র ঘোমটা খুলে ফেলল। সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'আমার টাকা নেই, জমি নেই, তাই আমার কথাটা বড় কথা হয়ে গেল? আমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা আমিই ভাবব। মাথার ওপর গৈবীনাথ আছেন, তিনি জানেন আমি কোনদিন কোন অধর্ম করিনি। আমি আমার ভাবনা-চিন্তা নিয়ে যেমন আছি, তেমনই একপাশে পড়ে থাকব। কিন্তু তোমাদের পছন্দ-করা ঐ চাষাটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না, কিছুতেই না!'

সে বেরিয়ে এল। মুখ ফিরিয়ে ব'লে এল, 'যদি বেশী জ্বালাতন কর তবে রসুলাবাদ যাব। সাহেব তাঁবু ফেলেছে, সেখানে গিয়ে নালিশ করব।'

দুর্গা আড়াল থেকে শুনছিল এবং রাগে জ্বলছিল। এখন সে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে বেরিয়ে এল। বলল, 'ওলো সর্বনাশী, মেয়েকে বিয়ে দিবি কেন? খুদ খাস, কুঁড়ো খাস, তবু তোর এত তেজ কেন তা কি আমি বুঝিনা! ভাবছিস আমার ছেলেকে হাত করবি আর মেয়েকে আমার ঘাড়ে চাপাবি।'

'চম্পার মা, ভগবান জানেন আমি কোনদিন সে কথা ভাবিনি।'

'না, ভাবিস নি! তাই ছেলেটাকে হাত করছিস্, না? তোর মেয়ে যেমন বাপকে খেয়েছে, তোর ঘর জ্বালিয়েছে, আমার ঘরটাও তেমনি জ্বালাতে চাস্, তাই না?'

অপমানে লজ্জায় স্বরজ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'নির্দোষ শিশুটাকে অমন ক'রে বলো না। তুমিও ত' সন্তানেরই মা!

আর খুদকুঁড়ো খাই, আমার ভাগ্যে খাই। তা নিয়ে এমন ক'রে তুমি বলো না!' সে বেরিয়ে এল।

দুর্গা তখন স্বামীর ওপর ফেটে পড়ল, 'এর একটা বিহিত করবে ত' কর! চাঁদমুখ দেখিয়ে কথা বলল আর তুমি গলে গেলে। আরে, ভিখিরীর মেয়ে, তা'র বিয়ে কি রাজার ঘরে হবে? ওসব বদমায়েসী আমি বুঝি গো, বুঝি!'

প্রতাপ বিব্রত হয়ে দু'বার 'আঃ, কি হচ্ছে, আঃ' বলল। তারপর বলল. 'আর চেঁচিও না। চন্দনকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব। নিজের ঘর সামলাই, তারপর অন্তকথা। তারপর ওর মেয়ে ও বিয়ে দিক না দিক, যা খুশী করুক গে!'

তা'তেও দুর্গার রাগ কমল না।

সে রান্নাঘরে গিয়ে ডালে দু'বার নুন দিল। বেড়াল তাড়াতে গিয়ে এক ভাঁড় তেল উল্‌টে ফেলে দিল। দাসীকে বলল, 'বাসন মাজিস্ তা'তে ছাই থাকে কেন? তোরা সবাই মিলে কি আমার মাথাটা খাবি?'

তা'র যে দূরসম্পর্কের ননদটি দুধ জ্বাল দিচ্ছিল তাকে বললো, 'ওগো, পরের জিনিসে একটু মায়া করতে হয়। হাতা নাড়ছ, দুধ ছিটকে পড়ছে দেখছ না?'

সে নিজেই হাতা নিয়ে বসল এবং উচ্চ-স্বরে বিলাপ ক'রে যে সব কথা বলল, তা'তে ঘুরে ফিরে একটা কথাই বারবার শোনা গেল। দুর্গার বাপ মা তার হাত পা বেঁধে এমন সংসারে দিয়েছে যেখানে এসে দুর্গার হাড়মাস ভাজাভাজা হয়ে গেল।

•

সুরজের এই আচরণ নিয়ে অনেক কথা হ'ল।

সুরজ রসুলাবাদে গিয়ে নালিশ করবে বলেছে শুনে সবাই বলল, 'গাঁয়ে আজকাল উল্‌টো বাতাস লেগেছে। মেয়েগুলো সব মদ্দা হয়েছে।'

রসুলাবাদে যে সাহেব কাছারীর তাঁবু ফেলেছেন তিনি বড কড়া। তাঁর নায়েব, নাজীর, আমলা, বেয়ারা, পেয়াদা কারুর দু'পয়সা এদিক-ওদিক থেকে নেবার উপায় নেই। তাঁর আর্দালী বা খানসামা যদি কারুর বকরা বা খাসী ধ'রে আনে, তখন সাহেবের কানে উঠলে রক্ষে থাকে না। তিনি ছ'আনার খাসীর বদলে দশ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবেন। তাঁর কর্মচারীরা যদি জঙ্গলের কাঠ এনে ধুনী জ্বালে, বুড়ীরা গিয়ে তাঁর কাছে কেঁদে কেটে বললেই হ'ল

'সাহেব, ঐ কাঠ কুড়িয়ে আমাদের দিন যায়।' সাহেব তখনই তাদের সামনে কর্মচারীদের জরিমানা ক'রে আট দশ টাকা পাইয়ে দেবেন।

কেউ কারুর ওপর অত্যাচার করছে জানলেই তিনি ক্ষেপে যান। স্বরজ যদি গিয়ে নালিশ করে, হয়ত তিনি গাঁ-সুদ্ধ লোককে অপমানে ফেলবেন। তাদের জরিমানা করবেন। স্বরজকে বলবেন, 'মা, তোমার উপর কেউ জুলুম করলে তুমি শুধু একটিবার খবর দিও।'

গ্রামে ও থানায় থানায় ঘুরে তাঁবু ফেলে বিচারের কাজ চালান তিনি। এমন কি তাঁর বিচারের জন্যে ও পাড়ার গঙ্গারাম চিরদিনের মতো 'নাককাটা গঙ্গারাম' নাম কিনেছে। গঙ্গার বউ জানকী বড় বেয়াড়া। এ পাড়ায় তা'র বাপের বাড়ী। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হলেই সে কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ী এসে হাজির হয়। জানকীর মা-বাপ সেদিন বিরক্ত হয়ে জামাইকে বলে, 'হারামজাদীকে নিয়ে যাও। যদি বেয়াড়াপনা করে, দু'ঘা মার দিও!'

গঙ্গারাম তিতিবিরক্ত হয়ে বৌকে দু ঘা চড় মারে। জানকী রাস্তা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলল। পেছনে গঙ্গারাম তর্জন করতে করতে আসে, 'গেলে পরে এবার হাড় ভেঙে দেব। তোর পিঠে বেশ ক'ঘা না পড়লে তুই শায়েস্তা হবি না।'

পড়বি ত' পড়, তা'রা সাহেবের সামনে পড়ে। সাহেব নাজীরকে বলেন, 'ও কি বলছে, তুমি ইংরেজী ক'রে বুঝিয়ে দাও।'

নাজীর একগাল হেসে বলেন, 'হুজুর স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার। বলছে, 'হাড় ভেঙ্গে দেবে, বেত মারবে। ও কিছু না।'

'হোআট?' ব'লে সাহেব চোখ কপালে তোলেন। নাজীর বোঝেন সাহেব বুঝছে না। তিনি আরো বিশদ ক'রে বলেন, 'হুজুর, ও সব বলতে হয়। নইলে বউ স্বামীকে মানবে না।'

সাহেব দুঃখিত হন। বলেন, 'নাজীরবাবু, তুমি শিক্ষিত, তুমি ভদ্রলোক, তুমি এই সব বর্বরতাকে সমর্থন করছ? এসবকে ভাল বলছ?'

নাজীর বলেন, 'হুজুর, মাঝে মাঝে বীটিং গুড ফর অবস্টিনেট ওআইফ। নইলে ও স্বামীকে ভক্তি করবে কেন?'

সাহেব আরো দুঃখিত হয়ে বলেন, 'না, না। আমার চোখের সামনে আমি এত বড় অবিচার হতে দিতে পারি না। তুমি ওকে দু' আনা জরিমানা কর, আর ব'লে দাও ও যেন কখনো স্ত্রীকে না মারে!'

ঘরের বৌ, যে বৌ উনোন থেকে হাঁড়ি নামিয়ে রেখে কথায় কথায় 'এ মাই গে! এ বাপ গে!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে বাপের বাড়ী যায়, তা'কে শাসন করবার ন্যায্য অধিকারে ঘা খেল গঙ্গারাম, উপরন্তু তা'র জরিমানা হল। সেই থেকে সবাই বলতে লাগল, 'ও কি পুরুষ মানুষ! অপমানে ওর নাককাটা গেছে।'

এই লজ্জায় গঙ্গারাম দেশান্তরী হয়েছে। সে হাজিপুরে গিয়ে বসবাস করছে। আর একটি বিয়ে করেছে। নতুন বৌকে বিয়ের প্রথম রাতেই মেরে ধ'রে সে নিজের পৌরুষ প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। এখন সে বলে, 'প্রথম রাতে খুব লম্ফঝম্প ক'রে হাঁক ডাক দিলে পরে আর মারবার দরকার হয় না। বৌ আপনিই ভয় ক'রে চলে।'

এখন জানকী বাপের বাড়ীতেই থাকে। গঙ্গারাম ক্বচিৎ আসে। তবু সবাই বলে 'নাককাটা গঙ্গারামের বৌ!'

এ সব কথা আবার আলোচনা ক'রে কেশবরাম রায় দিল, 'না। সুরজকে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। শেষকালে কি করতে কি হবে, আমরা সকলে বিপদে পড়ব।'

তারপর একদিন একটি লোকের সঙ্গে প্রতাপ চন্দনকে তা'র বাবার কাছে পাঠাল।

সুরজ বুঝল এবার তা'র দুঃখ আরো বাড়বে। গ্রামের সবাই তা'র উপর চটেছে। প্রতাপের বৌ দুর্গা তা'কে আর কাজ দেবে না। সে ভেবে পেল না এবার কি করবে! চম্পার মুখের দিকে চেয়েই তা'র বুকটা ভারী হয়ে উঠল। সে কি হঠকারিতা করেছে? মেয়ের সৌভাগ্যে বাদ সেধেছে? তারপর সে জোর ক'রে চিন্তার এই গতির মুখ ফেরাল। কৌশল্যাকে বলল লালাদের বাড়ী খবর নিতে। লালার মা আগে আগে তা'কে ডেকেছে, কেন ডেকেছে জেনে আসতে বলল। চম্পাকে বললো, 'তুই আর যখন তখন বাইরে বেরুস না মা।'

চম্পা ঘাড় নাড়ল।

কি হয়েছে তা চম্পা বোঝেনি। তবে এটা বুঝেছে তা'র জন্যেই মা-কে অপদস্থ হতে হয়েছে। চন্দন চলে যাবার সময়ে তা'র সঙ্গে দেখা

হয়নি। সেই কথা মনে পড়তে লাগল। সে আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করল পাখী ধরতে তার আর ভাল লাগে না, নদীর ধারে গিয়ে জল দেখতেও না। অনেক জিনিসই আর ভাল লাগছে না। যেদিন তাদের উঠোনে একটা হলুদ পাখী এসে বসল, চাল থেকে শুকনো লঙ্কা ঠোঁটে নিয়ে উড়ে গেল অথচ তা'র মনটা ঐ পাখী ধরবার জন্যে নেচে উঠল না, সেদিন প্রথম চম্পার মন খারাপ হয়ে গেল।

তা হ'লে এ সব তা'র আর ভাল লাগবে না! অথচ পাখী, প্রজাপতি, ফুল, এসব দেখে দেখে কত সময় কেটেছে সেদিনও! চন্দনের জন্যে ভীষণ মন খারাপ হল, এবং মনে হল চন্দন থাকলে বোধহয় আবার তা'র সেই সব কিছু ভাল লাগবে। তা'র মনে হল চন্দন বোধ-হয় অনেক দূরে হারিয়ে গেছে।

তিন

প্রতাপের বাবা চম্মন, ডেরাপুরের মানুষ হয়েও স্বভাবে রুচিতে অন্যরকম। প্রতাপ ক্ষেতী গৃহস্থ। চাষবাস করে। নিপুণ অভিজ্ঞ এবং পরিশ্রমী চাষী ব'লে তা'র সুনাম আছে। প্রতাপের কাছে তা'র ক্ষেত, ক্ষেতের ফসল তোলা সেই ফসল বেচে ঐশ্বর্যকে আয়তনে বাড়াবার চেয়ে বড় নেশা নেই। গ্রামের সম্মানিত বাসিন্দা হিসেবে সে আরো অনেক কর্তব্যের দায় বহন করে। কা'রো পারিবারিক অশান্তি হ'লে সে তা মিটাতে যায়। কা'রো বাড়ীতে বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন থাকলে সে নিজে গিয়ে কাজকর্মের ভার নেয়। আস্তে আস্তে সে গ্রামের একজন মাতব্বর হয়ে উঠেছে। সে নিজের পদমর্যাদা রেখে চলে। ধর্মকর্ম করে, ব্যবহার তা'র গম্ভীর এবং দার্ঢ্যপূর্ণ। তা'র বয়স আন্দাজে সে খুব পরিণত। সমবয়সীদের চেয়ে বুড়োদের সঙ্গেই আলাপ আলোচনা করতে দেখা যায় তা'কে।

চম্মন অন্যরকম। চম্মন বে-পরোয়া, ফুর্তিবাজ। বয়স আন্দাজে সে এখনো দেহে-মনে তরুণ আছে। প্রতাপের সেটা পছন্দ নয়, কিন্তু বাবাকে সে কিছু বলতে পারে না। গ্রামের মানুষরা চম্মনকে দেখে মাথা নাড়ে। ভাবে এই বুড়োমানুষটা, জীবনের মধ্যে এত আনন্দ এবং উৎসাহের কি উপাদান খুঁজে পেয়েছে? কেন ও গ্রামের ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে গল্প করে শিকার করতে যায়, দোললীলায় কি নতুন 'তামাসা' হবে তাই নিয়ে

আলোচনা করে? চম্মনের সমবয়সী যা'রা, তা'রা বুড়ো হয়েছে, স্থবির হয়েছে। ইহকালের সঙ্গে কারবার চুকিয়ে দিয়ে পরকালের জন্যে পুণ্য অর্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত। কিন্তু চম্মন কেমন ক'রে জরা এবং বার্ধক্যকে আজও দূরে রাখতে পেরেছে, তা তা'রা বোঝে না। তা'রা বলে—ওসব ফৌজী জীবনের নেশা। ঐ জীবনে নেশা লেগে গেছে চম্মনের। তাই ও গ্রামে টিঁকতে পারে না। গ্রামের এই শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন সইতে পারে না।

মিথ্যে বলে না তা'রা। চম্মনের রক্তে রক্তে সত্যিই লড়াইয়ের নেশা আছে। ষোল বছর বয়সে গিয়ে কোম্পানীর ফৌজে সে নাম লিখিয়েছিল। তারপর থেকে দীর্ঘদিন ধরে দেশে দেশে ঘুরেছে, যুদ্ধ করেছে, ক্যাম্প জীবনের যাযাবর স্বাদ পেয়েছে। আজও সে সেই কর্মব্যস্ত দ্রুত গতিময় জীবনের রসে মাতাল। অবসর নিয়ে গ্রামে এসে যদি নিষ্ক্রিয়, শান্ত জীবন যাপন করতে হয় তাহলে সে মরে যাবে। সেদিন সে স্থবির হবে, জরা এসে তা'কে পরাজিত করবে।

অল্প বয়স হতে চম্মন বে-হিসেবী, বে-পরোয়া।

যখন যেদিকে ঝোঁক গিয়েছে, তাই করেছে সে। অনেক নির্বুদ্ধিতার জন্যে দাম দিতে হয়েছে তাকে। এক সময়ে তাদের গ্রামের প্রান্তে, বনের ধারে কয়েকজন 'গুজারী', রাজস্থানী যাযাবর, মদ চোলাইয়ের কারবার শুরু করে। গ্রামের চৌকিদার মাঝে মাঝে তাদের গিয়ে ধমক দিত। চম্মন, সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে হয়েও সেখানে নিয়মিত যেত। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে সে একবার চৌকিদারের সঙ্গে মারামারি ক'রে চৌকিদারের একখানা হাত মুচড়ে ভেঙে দেয়। নিজেও খুব জখম হয়েছিল। আর একবার সে তখন ফৌজের সঙ্গে কুচ-এ চলেছে। আজমীর-এর কাছে এক গ্রামের ঠাকুরসাহেবের মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে রেখেছিল তিন মাস। তিন মাস বাদে মেয়েটি তা'কে ছেড়ে তামাকের ব্যবসায়ী এক সাহেবের কাছে চলে যায়। চম্মন সেই সাহেবকে কাটতে গিয়েছিল। দারুণ হৈ-চৈ হয়। চাকরি ত' বটেই, প্রাণ নিয়েও টানাটানি হবার উপক্রম। সাহেব বলে, 'তোমরা ঐ বদমায়েসটাকে ফাঁসি দাও। দেখে অন্যদের শিক্ষা হোক'। চম্মনের অফিসার অনেক চেষ্টায় গোলমাল মেটান। কিন্তু তখনো চম্মনের মাথা থেকে ভূত নামেনি। প্রণয়িনীর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষেপে গিয়ে সে শেষ অবধি নিজের টুঁটি কেটে ফেলতে চেষ্টা

করে। তা'র বন্ধুরা তা'কে ধ'রে এক মুসলমান হাকিমের কাছে নিয়ে যায়। তাঁর নির্দেশে চম্মনের হাত-পা বেঁধে তা'র মাথায় বড় বড় জোঁক লাগিয়ে মাথা থেকে বদরক্ত নামায়।

এইসব খবর যখন গাঁয়ে পৌঁছতো, চম্মনের মা, চম্মনের বৌ, চম্মনের পিসী সবাই সুর করে কাঁদতে বসে যেত। চম্মনের বৌ সারাবছর ধরে সাধু, সন্ন্যাসী, পীর, ফকির সকলের কাছ থেকে মাদুলী যোগাড় করে রাখত। চম্মন যখন বাড়ী আসত, তখন সে চুপে-চুপে স্বামীর হাতে গলায় মাদুলি ঠেকিয়ে তার ফৌজী উর্দির পকেটে রেখে দিত। বেঁধে দেবার সাহস হত না। পকেটে সেগুলো দেখতে পেলেই চম্মন ক্ষেপে যেত। মাদুলীর ওষুধ ফেলে দিয়ে রুপো বা সোনার খোলটা স্যাকরার দোকানে বেচে জুয়ো খেলে আসত শহর থেকে। বৌ যখন বিলাপ করে কাঁদত, চম্মন তাকে আচ্ছা করে পিটিযে দিত। পরে যখন প্রতাপ হ'ল তখন আর সে বৌ-কে মারত না। তবে চোখ পাকিয়ে বলত, 'খবর্দার, ছেলেকে দুধের সর মাখিয়ে ক্ষীর খাইয়ে ননীর পুতুল বানাস্‌নি।' বৌ ঝঙ্কার দিত, 'তোমার মতো গোঁয়ার বানাব ?'

'নিশ্চয়। ও-ও ফৌজে যাবে। দমাদম গুলী চালাবে, বন্‌বন্‌ তলোয়ার ঘোরাবে, জানলি ?'

কিন্তু তা হয়নি। স্বামীকে বশ করতে পারেনি প্রতাপের মা। ছেলেকে আঁচল চাপা দিয়ে রেখেছিল। তাই ছেলে অন্যরকম হল। দেখে চম্মনের মনটা নিরাশায় ভরে গেল। ছেলের বিয়ে হলো, বৌ এল। চম্মন বলে বসল, 'আরে প্রতাপের মা! টাকা, গয়না আর বংশ দেখে ভুলে গেলি? একটা কুচ্ছিৎ বৌ আনলি ? আমার অমন সুন্দর ছেলে ? সে কি ঘরে মন বসাতে পারবে ?

'পারবে। বৌয়ের হাত ভাল। ওর খুব পয় আছে।'

ধীরে ধীরে সেই বৌ গিন্নী হ'ল। প্রতাপের মা মারা গেল। বৌ দুর্গার পয়ে প্রতাপের সংসারে উন্নতি হতে থাকল। কিন্তু চম্মন যেন এ সব থেকে আরো দূরে সরে গেল। পুত্রবধূ তাকে খুব সেবা করে। পায়ে তেল মালিশ করে দেয়। গরু, ক্ষেত, মকাই, দই, দুধ, এ সব নিয়ে একটা পুরুষ মানুষ কেমন করে সারাদিন সময় কাটাতে পারে, তা সে বোঝে না।

প্রতাপ তাকে খুব আগ্রহ ক'রে বলে, 'একজোড়া হালের বলদ কিনলাম।

ভকত চাচা-র জমিটায় এবার অড়হর লাগালাম। গৈবীনাথের মন্দিরে এবার রূপার জল-ঝারি দিলাম।'

চম্মন অন্যমনস্ক ভাবে হুঁ হাঁ ক'রে যায়। তারপর বলে, 'গাঁয়ের ছেলেরা খুব ধরেছে। এবার আমার বাড়ীতে একদিন রামগান হবে। উঠোনটা সাফ করিয়ে দে। কাহারদের বল্ লালাদের বাড়ী থেকে শতরঞ্জি চেয়ে আনতে!' সিদ্ধি খাবে ওরা। আমি বলেছি দশ টাকা দেব!'

প্রতাপ ভারী ক্ষুণ্ণ হয়। সে আহত স্বরে বলে, 'দশটা টাকা কবুল ক'রে এলে?'

'কি করব? ওরা ধ'রল।'

চম্মন হাসে। প্রতাপ আর দুর্গা দুঃখ করে! দশটা টাকা! যারা গাইবে, তারা তিনটে টাকা নেবে। বাকি টাকা দিয়ে খাওয়া-দাওয়া ফূর্তি হবে? সাতটা টাকার দাম কি কম? একটাকায় তিরিশ সের দুধ মেলে। তিনখানা কাপড় কেনা যায় এক টাকায়। এক টাকায় বত্রিশ সের আটা মেলে। এক টাকায় একটা দু'পালো ছাগল কেনা যায়, তিন টাকায় একটা বকনা বাছুর কেনা যায়। প্রতাপ মাথা নেড়ে বলে. 'পিতাজীর কোন বুদ্ধি নেই!'

চম্মন এসেছে খবর পেলেই গ্রামের ছেলেছোকরা ভীড করে আসে। চম্মনও তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে। তাদের সঙ্গে বনে যায়। চম্মন পাকা শিকারী। বন্দুকে তার নিশানা অব্যর্থ। তার কাছে সায়েবদের সার্টিফিকেট আছে। ছেলেরা তাকে বন্দুক দিয়ে বাঘ মারবার জন্য অনুরোধ করে। চম্মন রাজী হয় না। হেসে বলে, 'জঙ্গলে বাঘ চরে বেড়ায়। সে খেয়াল খুশীতে হরিণ মেরে খায়। ভগবান তাকে ঐ আহার দিয়েছে। সে যদি জঙ্গল ছেড়ে গাঁয়ে আসে, তোদের গরুবাছুর মারে তখন তাকে মারব।'

'যদি মানুষ মারে?'

'দূর দূর। বাঘ কি চট করে মানুষ মারে? কোন্ বাঘ মানুষ মারে জানিস? যার মধ্যে শয়তান ঢুকে যায়, হ্যাঁ, শয়তান! তখন সেই বাঘেরও শয়তানী বুদ্ধি হয়। সেই বাঘ তখন মানুষ ধরে নিয়ে যায়।'

'যে বাঘ মানুষ মারে তাকে তুমি মেরেছ?'

'নিশ্চয়। দু'বার। দুটো বাঘ মেরেছি।'

'বাঘ দেখলে ভয় করে না তোমার?'

'কিসের ভয়? আরে, জঙ্গলে দেখেছি বাঘের বাচ্চা ছুটো খেলছে। ঠিক যেন কুকুরের মতো। এ ওকে ধরছে! এ মাটিতে গড়াচ্ছে ও লুকিয়ে তাকে দেখছে! দেখতে কি মজা লাগে!'

'বাঘের গল্প বল না। তুমি ফৌজের গল্প কর।'

চমন খুব হাসে। ছেলেদের পিঠে থাপ্পড় মেরে বলে, 'যা যা, ফৌজে যা! কানপুরে গিয়ে নাম লেখা। যুদ্ধে যাবি, দু'চারটে ঘা জখম হবে! নইলে কি আর পুরুষ?'

ছেলেরা বলে, 'মদন সিংহের বিবির গল্পটা বল।'

চমন হেসে হেসে বলে, 'তোরা বড় হয়েছিস, তোদের বলতে পারি। শোন, মদন সিংহের বিবি সে মানুষ ত নয়, বাঘিনী। রোজ ছিলিম ছিলিম তামাক খায়। মদন সিংকে চড় মেরে সিধে ক'রে দেয়। সেই বিবির আমার ওপর খুব টাঁক হল। আমি দেখতে খুব ভাল ছিলাম কি না?'

চমন ছেলেদের দিকে চায়। বলে, 'জিজ্ঞেস করিস তোদের নানা, পর-দাদা-দের! তারা বলবে—হাঁ, চমন ভারি সুন্দর ছিল। তা' মদন সিংহের বিবি আমাকে একটা গোলাপ ফুল দিল। আমি ত' জানি, গোলাপ ফুল শুঁকলে আমি ওর বান্দা হয়ে যাব। আবার মন্ত্রপড়া ফুল ত! যদি সন্ধ্যের মধ্যে ফুলটা না শুঁকি বা আর কাউকে না দিই, তাহ'লে আমি হয় কুকুর, নয় বেড়াল, নয় তো পাখী হয়ে যাব। মহা মুশকিল! সুবেদার দুর্গা সিংহ হচ্ছেন মদন সিংহের মহা দুশমন। দুজনে চাচাতো ভাই। কিন্তু দু'জনে দুজনকে দেখতে পারেন না। দুর্গা সিংহের বিবি হলেন যেমন সুন্দরী, তেমনি বদরাগী। দুজনে একই রেজিমেণ্টে আছেন, কেউ কার সঙ্গে কথা কন না, না দুর্গা সিং না মদন সিং! তা, আমি ত' গিয়ে দুর্গা সিংকে সেলাম ঠুকে ফুলটি দিলাম। দুর্গা সিং বললেন, 'চমৎকার ফুলটি ত! তিনি নাকের কাছে নিয়ে শুঁকতে থাকলেন। আমি ত' নিজের তাঁবুতে চলে এলাম!'

'তারপর কি হলো?'

'তারপরই ত' জমলো মজা! সন্ধ্যেবেলা মহা হৈ চৈ, সাংঘাতিক চ্যাচামেচি। মদন সিংহের তাঁবুতে মদন সিংহের বিবি চ্যাচাচ্ছেন ছেড়ে দে! ছেড়ে দে! দুর্গা সিং বাঘের মতো থাবা দিয়ে তাঁর ঘাঘরার কোণা চেপে ধরে বসে আছেন। দুর্গা সিংহের বিবি মদন সিংহের বিবিকে একবার, দুর্গা সিংকে

একবার বেদম ঠ্যাঙাচ্ছেন, আর মদন সিং বলছেন 'জয় রাম! জয় রাম! বিবি মেরা গর্দান সে উতর গয়ী!'

সত্যিমিথ্যে মেশানো এইসব রংবাহারী গল্প শুনতে ছেলেরা খুব ভালবাসত। চম্মন আগে গ্রামে আসতে চাইত না। প্রতাপের ছেলে চন্দন জন্মালে তার মনটা একটু নরম হ'ল। চন্দন যখন একটু একটু করে বড় হতে থাকল, তখন চম্মনের সঙ্গে তার স্বভাবের সাদৃশ্য ধরা পড়ল।

চম্মন বছরে একবার আসে। এসে দেখে চন্দন আগের চেয়ে আরেকটু বড় হয়েছে। নতুন নতুন কথা শিখছে। যেবার সে শুনলো চন্দন পাঠশালার পণ্ডিত কেশবরামকে মেরে পালিয়ে গিয়েছিল, সেবার তার ভারী ফুর্তি হ'ল। তারপর এক একবার সে বাড়ী আসে, আর শোনে, এবার চন্দন গুলতি দিয়ে হরিয়াল মেরেছে। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে একটা কালো গোখরোকে মেরেছে। সাপটা নাকি জলের কলসী পেঁচিয়ে শুয়েছিল। চন্দন নাকি ছেলেদের সঙ্গে বাজি ধরে সন্ধ্যেবেলা শ্মশানে গিয়ে লাঠি পুঁতে এসেছে। এই সব শুনে তার আনন্দ হয়। দুর্গা তাকে বলে, 'পিতাজী, খুব শাসন করুন ওকে। বড দুরন্ত হয়েছে।'

চম্মন বলে, 'হ্যাঁ, শাসন করব।'

নাতিকে বলে, 'বেশ করেছিস, ব্যাটাছেলে তুই, তুই কি পুতুল খেলবি না সেলাই করবি? তবে দেখিস, হাত পা বাঁচিয়ে, হাত পা খোঁড়া করিস না।'

নাতিকে নিয়ে সে বন্দুক দেখায়, গুলী দেখায়। নাতিকে সে ফৌজের গল্প বলে। দুর্গা দেখে, একা একা চন্দন পেঁপেগাছের ডাল মুখে দিয়ে বিউগ্‌ল বাজিয়ে উঠোনে ঘুরছে আর বলছে 'মার্চঅন্! 'টেন্‌শান্! স্ট্যাণ্ডাপ!' দুর্গা ছেলেকে কাছে ডাকে। দুর্গা ধমক দেয়। বলে, 'কি করিস সারাদিন? পাঠশালায় গিয়ে অন্য ছেলেরা রামজী-র শতনাম, গঙ্গামায়ীর স্তব, কত কি শিখে নিল।'

'নিক গে! আমিত' লেখাপড়া করব না!'

'কি করবি?'

'আমি দাদা-র মতো ফৌজে যাব। লড়াই করব। দমাদম গুলী চালাব!'

দুর্গা সে-সব কথা শুনে, মনের দুঃখে কি করবে ভেবে পায় না। বিয়ের

পর কতদিন তার ছেলে হয়নি। অনেক দেবতাকে পুজো করে, অনেক উপোস, অনেক ব্রত করে, তবে সে ছেলে পেয়েছে। সেই ছেলে এ কি সব কথা বলে? তার কান্না পায়। সে বলে, 'তোর দাদা মস্ত বড় বীর। তাই ফৌজ ছেড়ে দিয়ে কোথায় কোন্ জঙ্গলে গিয়ে বসে আছে।'

'তুমি জান না। দাদা মস্তবড শিকারী, তাই তাকে একজন সাহেব সেখানে রেখে দিয়েছে।'

তখন দুর্গা একা একা-ই বিলাপ করে। ফৌজে কি অন্য মানুষ যায় না? কত জনই ত' যায়। তারা কেমন পয়সাকড়ি গুছিয়ে নিয়ে গ্রামে ফিরেছে। তার শ্বশুর ত' মস্তবড চাকরি পেয়েছিল। সে পে-হাবিলদার হয়েছিল। সে সকলকে মাইনে দিত। হঠাৎ সব ছেডে দিয়ে সে কোথায় চলে গেল। হলদোয়ানি কোথায় কে জানে! সে নাকি পাহাড়ের উপর। নৈনীতালের কাছে। সেখানে সাফাখানা আছে। সাফাখানা কাকে বলে তা দুর্গা জানত না। পরে শুনেছে সে একটা কাঁচ আর কাঠের বাড়ী! সাহেবদের জন্যে সেখানে ওষুধ-বিষুধ থাকে। আবার মাঝে মাঝে সাহেবরা সেখানে বিশ্রাম করতে যান। শিকার করেন, খাওয়া দাওয়া করেন। এত জায়গা থাকতে জঙ্গলের মধ্যে কেন সাহেবরা বাডী বানায়, কাঁচ আর কাঠ দিয়েই বা বানায় কেন? সাহেবরা ত মস্ত রাজা, চাঁদসূর্যের মতো প্রতাপ তাদের। তারা কি ইঁট পায় না? মাটি পায় না? সেখানে দুর্গার শ্বশুর না কি কীপার! কীপারের কাজ কি একটা ভাল কাজ? দুর্গা সে সব বোঝে না। তার শুধু দুঃখ হয়। সে দেখেছে, এ সব কথা জিজ্ঞাসা করলে তার শ্বশুরের মুখখানা যেন কেমন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। সে তাই এ সব কথা তোলে না। তাকে কেউ এ সব কথা বলে না। সে শুধু নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকে। প্রতাপের বৌ হ'য়ে, গ্রামের গরীব ও দুঃখী মানুষদের কাছে নিজের টাকা-পয়সা, সুখ-সমৃদ্ধির উত্তাপটা জাহির করার কাজটা-ও কম নয়। দুর্গার সময় তাতেই কেটে যায়। তবু, মাঝে মাঝে তার মনে হয়, তার শ্বশুরের মনে ফৌজী জীবন ছেড়ে হলদোয়ানি যাওয়া নিয়ে কি যেন একটা দুঃখ আছে।

চন্দনও এ সব কথা মাঝে মাঝে ভাবে।

সে যেদিন ফৌজে ঢুকেছিল, তখন উনিশ শতক সবে শুরু হয়েছে।

কোম্পানীর বিভিন্ন পদাতিক, অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ বাহিনী তখন সবে তৈরী হয়েছে। তখন শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা নেহাতই মুষ্টিমেয়। কোম্পানীর রাজত্বটাও এত বিস্তৃত হয়নি। ছোট-খাটো যুদ্ধ করতে গেলে কোম্পানী সরকার ভারতীয় রাজা, জমিদার, এঁদের কাছ থেকে ফৌজ ধার নেন। বড় বড় ঘর থেকে যে সব ভারতীয় কোম্পানীর রেজিমেণ্টে যোগ দেন, তাঁরা তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী জাঁকজমকে বাস করেন। সাহেবদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে সিল্কের তাঁবু খাটান, চাকর-বাকর রাখেন। বাছাই-করা দামী ঘোড়া, দামী বন্দুক, তলোয়ার কেনেন। নিজেদের টাকাতেই করেন। মাইনের টাকার ওপর নির্ভর করেন না তাঁরা।

সাহেবরাও তখন ভারতীয় জীবনের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করেন। তাঁরা জমিদারী কেনেন। ব্যবসা করেন। তাঁরা ভারতীয় মেয়েদের বিয়ে করেন। তাঁরা আলবোলায় তামাক খান। উৎসবের সময়ে বাড়ীতে বাইনাচ, ভানুমতীর খেলা, ভালুক নাচ, মোরগের লড়াই-এর আয়োজন করেন। তাঁরা টাকা লেনদেনের ব্যবসা করেন। রেজিমেণ্ট-এর উগ্র সাহেবরা অবশ্য তাঁদের সম্পর্কে বলেন, 'ব্যাটারা নেটিভ হয়ে গেছে'! তবে সে সব তুচ্ছতাচ্ছিল্যকে তাঁরা পরোয়া করেন না।

তখনো এদেশে রেলপথ নেই। টেলিগ্রাফে খবর পাঠাবার কথা স্বপ্নকথা। দেশের মানুষ দেশে বাস করে। টাকার বদলে তামার 'দামড়ি' বা লোহা ও তামা মিশ্রিত 'ঢেবুয়া' পয়সা দিয়েই কেনাবেচা চলে। তখন বেরিলি, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা শহরে টাকায় বত্রিশ সের আটা মেলে। একমণ চাল দেড় টাকা। তখন সুদূর বাংলাদেশ থেকে বাঙালীরা কাজ নিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আসছেন। মাসে দশ, পনরো বা বিশ টাকা মাইনে থেকে তাঁরা দেশে টাকা পাঠাতে পারেন। দেশে ভূ-সম্পত্তি বাড়াতে পারেন। আবার চাকরিস্থলেও সসম্মানে বাস করতে পারেন।

উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে তখন ধনী, লুঠেরা, পিণ্ডারী এবং ফাঁসুড়ে ডাকাতদের নিরবচ্ছিন্ন উপদ্রব চলে। সমৃদ্ধ ভূ-স্বামী মাত্রেই নিজের নিজের লাঠিয়াল এবং অশ্বারোহী দল রাখেন। যথেষ্ট টাকাপয়সা থাকলেও সবসময়ে তাঁরা ধুমধাম করে পূজাপার্বণ বা উৎসব করতে চান না। দস্যুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান না। খুব প্রয়োজন না হলে মানুষ দেশ ছেড়ে পথে পা দেয় না। দল বেঁধে তীর্থ করতে যাওয়া ছাড়া অন্য কারণে গৃহস্থ ঘর ছাড়তে

চায় না। ব্যবসায়ীরা এদেশ থেকে ওদেশে যায়; কিন্তু ঘোড়া বা বয়ালগাড়ী ভাড়া ক'রে। নয়তো সরকারের ডাকগাড়ীর সঙ্গী হয় তারা।

তখনো মানুষের জীবন একান্ত ভাবে-ই গ্রাম-কেন্দ্রিক। যারা চাষবাস করে না, তারা গ্রাম-শিল্পের কারিগর বা অন্য জীবিকা আশ্রয় করে। লোহার, ছুতার এবং চর্মকার, তাঁতি ও রেজাই-কর বা ধুনুরী, এরা সারা বছরই কাজ পায়। গ্রামের ধনী ও সমৃদ্ধ লোকেরা বহুজনকে আশ্রয় দেন, জীবিকা দেন। গ্রামের বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়ে দেন। উৎসব বা পূজাপার্বণ, মৃতব্যক্তির স্মৃতিরক্ষা বা মানসিক; এই সবকে উপলক্ষ ক'রে পথ বাঁধিয়ে দেন, কুয়ো খোঁড়েন, পুজো ক'রে গাছ বসান পথের ধারে।

সাহেবদের সম্পর্কে মানুষদের মনে তখন অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য সব ধারণা। সুদূর কলকাতা থেকে ইংরেজরা যে শাসন চালাচ্ছে, সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তেমন কোন ধারণা নেই। তারা গ্রামের তালুকদারকে যতটা চেনে, কোম্পানী সরকারকে ততটা চেনে না। মিশনারী সাহেবরা গ্রামের হাটে-বাজারে এলে মানুষ পালিয়ে যায়। দক্ষিণ ভারত এবং পাঞ্জাব, নেপাল এবং বর্মা, এ সব জায়গায় ইংরেজরা যে তখনো আধিপত্য লাভের জন্যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত, এ সব কথা তারা জানে না। তখনো চন্দনদের গ্রামে ব্রাহ্মণবংশের কেউ মরলে তার বিধবা চিতায় গিয়ে ওঠে। তখনো, মাঝে মাঝে, গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে গুপ্ত পূজা করে মানুষ লুকিয়ে নরবলি দেয়। গ্রাম থেকে শহরে খবর পৌঁছুতে অনেক দেরি হয়। কোম্পানী সরকারের সাহেব সরজমিনে তদন্ত করতে এসে কোন খবরই যোগাড় করে উঠতে পারে না। সাহেব ভীষণ রেগে যায়। আমীন গ্রামে এসে সাহেবের জন্যে সরু চাল, মুরগী, খাসী, ঘি নিয়ে গিয়ে সাহেবকে সন্তুষ্ট করে।

সেই সময়ে চন্দন ঠিক করে সে ফৌজে নাম লেখাবে।

ডেরাপুর গ্রামে সোরগোল পড়ে যায়। সাহেবদের সঙ্গে কাজ করতে যাবে চন্দন! তাহ'লে কি জাত থাকবে! কে না জানে, কথায় কথায় কতজনের জাত চলে যায়? প্রায়শ্চিত্ত করলেও হারানো জাত আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

কি গ্রামের মানুষ, কি শহরের লেখাপড়া জানা মানুষ, সবাই তখন জাত এবং ধর্ম নিয়ে শঙ্কিত থাকছিল। জাত এবং ধর্মকে চোখে দেখা যায় না। জাত এবং ধর্ম মানুষকে ত্যাগ করবার জন্যে সর্বদাই ছল খুঁজছে। পাঁউরুটি বা

বরফ খেলে জাত যায়। একাদশীতে জল খেলে বিধবার জাত যায়। বিলিতি ওষুধ খেলে মুমূর্ষু রুগীর জাত যায়। উঠোনের পাশ দিয়ে মুসলমান হেঁটে গেলে ধানের জাত যায়, ধান ফেলে দিতে হয়। নৌকাযাত্রার সময়ে জল পান করলে ব্রাহ্মণের জাত যায়।

ইংরেজরা আসার পর থেকে জাতধর্ম নিয়ে আরো বিপদ। জাতধর্ম যাবার আশ্চর্য গল্পকাহিনী এই ছোট্ট ডেরাপুর গ্রামেও এসে পৌঁছয়। নদী পেরিয়ে পাঞ্জাব ছাড়িয়ে কাবুল বা কাশ্মীরের মাটিতে পা দিয়ে দলে দলে সৈন্য জাত খুইয়েছে। তারা প্রায়শ্চিত্ত করেও পরিত্রাণ পায়নি। ভেড়ার চামড়ার 'পোস্তিন' জামা পরে শীত নিবারণ করতে যেয়ে পাঞ্জাবে একদল সৈন্য জাত খুইয়েছে। এ দেশে ও দেশে ক্যাম্প করতে গিয়ে একই ঝরনা থেকে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর জাতি, হিন্দু এবং মুসলমান, নিরুপায় হয়ে জল নিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। তারা সবাই জাত খুইয়েছে। সাহেবদের কথা শুনে, সাহেবদের ভয়ে, রাজস্থান, বাংলা, মধ্যভারত এবং উত্তরভারতে অনেক পরিবার সদ্য-বিধবাদের 'সতী' করেনি। তাদের সবাই জাত হারিয়েছে। সাহেবরা এখনো আইন করেনি। 'সতীদাহ' এখনো চলে। তবু, সাহেবরা, মিশনের পাদ্রীরা 'সতী' আয়োজনের খবর পেলেই সেখানে যায়; সকলকে বারণ করে। যাদের বুদ্ধি আছে তারা সাহেবদের বারণ শোনে না। তারা অক্ষয় পুণ্য অর্জন করে। যারা শোনে, তারা অনন্ত নরকে গিয়ে পচে।

যাদের জাত থাকে না, তারা অগত্যা গিয়ে ক্রীশ্চান হয়। গ্রামের এককোণে অন্ত্যজের অবমানিত জীবন যাপন করার চেয়ে তারা ধর্মান্তরিত হওয়াকেই ভাল মনে করে। কেউবা মুসলমান হয়। কেউবা বুক ফুলিয়ে অজাতে-কুজাতে বিয়ে করে জীবন যাপন করে। তাই দেখে মানুষ হায় হায় করে। কলকাতা থেকে, বাংলাদেশ থেকে যে সব কাগজ বেরোয়, তাতে মানুষের এই মতিভ্রমকে নিন্দে ক'রে অনেক কথা লেখা হয়। লেখাপড়া জানা মানুষরা সভা ক'রে পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বলেন, 'কি হ'ল? যা ধারণ করে, তারই নাম ধর্ম। তাই যদি হয়, তাহ'লে হিন্দুধর্মের আঙুলের ফাঁক দিয়ে মানুষগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে কেন?'

কেউ বলেন, 'ধর্মের হাতটা যে জরায় বার্ধক্যে শিথিল হয়েছে। অবমানিত, নিপীড়িত মানুষগুলোকে ধরে রাখতে পারে এমন শক্তি তার কোথায়?'

কেউ বলেন, 'অনাবশ্যক কঠোরতা, অনাবশ্যক কড়াকড়ি, এর ফলে মানুষ সুবিচার পাচ্ছে না। ধর্মকে সংস্কার করা হোক। আদি এবং অকৃত্রিম মানবধর্মের উপর যুগ যুগ ধরে মানুষ সব আচার-নিয়ম, বিধি-নিষেধের বোঝা চাপিয়েছে, সেগুলো ছেঁটে ফেলা হোক। একমাত্র তাহ'লেই হিন্দুধর্ম রক্ষা পাবে। নতুবা, এর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'

প্রতিবাদ ওঠে। বিচারকরা 'ধিক ধিক' বলেন। সংস্কারকরা তখন গলা চড়িয়ে বলেন, 'নদীতে যখন আবর্জনা জমে, মাটি প'ড়ে যখন তার স্রোত রুদ্ধ হয়, তখন মাটি কেটে তার স্রোত বইয়ে দিতে হয়। নইলে নদী মরে যায়। ধর্ম যদি সংস্কারের স্তূপে বাধা পেয়ে প্রাণশক্তি হারায়, সে ধর্মকে ত্যাগ করে যে নিরুপায় মানুষগুলো অন্যধর্মের আশ্রয় নিল, তারা কি দোষ করেছে?'

দুইপক্ষে তুমুল তর্ক হয়। ঘনঘন মাথা নেড়ে পণ্ডিতরা নস্যি নেন। নতুন নতুন সভা হয়। নতুন নতুন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে। বিনাতর্কে, বিনা যুক্তিতে অন্ধভাবে বিধি-নিষেধ মেনে নিতে চায় না তারা। তারা বিদ্রোহ করে।

কিন্তু সে অনেক দূরে। সুদূর বাংলাদেশে। চন্দনদের ছোট্ট গ্রাম ডেরাপুরে কেউ প্রশ্ন করে না, কেউ সংশয় প্রকাশ করে না। তাদের যা বলা হয়, তাই মেনে নেয় তারা। নরক, মহাপাপ, পিতৃপুরুষের দুর্গতি আর লাঞ্ছনার ভয় দেখিয়ে পুরোহিত আর পণ্ডিতরা মানুষের মুখ বন্ধ করে রাখে। এই গ্রামের ছেলে হয়েও চন্দন তবু ফৌজে যেতে চাইল।

গৈবীনাথ শিবের সেবাইত তখন লছমীনারায়ণ মিশ্র। তার ভাগ্নে কেশবরাম তখন বালক।

লছমীনারায়ণের, ডেরাপুরের গ্রামসমাজে প্রবীণ ও বহুদর্শী লোক হিসেবে খ্যাতি আছে। বহু তীর্থ করেছে সে। বহু দেশ দেখেছে। নর্মদার পুণ্যজলে স্নান করেছে। সুদূর উত্তরে কেদারনাথ বদরীনাথ দর্শন করে শুকনো নারকেল, মেওয়া এবং মিছরীর প্রসাদ নিয়ে এসেছে। কাশীধামে বিশ্বনাথকে দেখেছে। আবার বিশ্বনাথের অবতার শ্রীত্রৈলঙ্গস্বামীজিকেও দেখেছে। দ্বারকায় গিয়ে দ্বারকাধীশের ভোগরাগ ও আরতির সমারোহও তার দেখা।

চন্দনদের বাড়ী এসে সে কম্বলের আসনে বসলো। হাতে সোনার

রুদ্রাক্ষমালা জড়িয়ে কথা বলতে লাগল। সে বললো, 'সাহেবদের কাছে গেলে জাত থাকে না। জব্বলপুরে আমার চাচেরা ভাই থাকে। সে বলেছে, —সাহেবরা সকল রকম মাংস খায়। রং সাদা হবে বলে বাচ্চাদের মদের হাঁড়িতে ডুবিয়ে রাখে। নদীর উপর পুল বানাবার সময়ে ছোট ছোট ছেলে ধরে এনে কাটে। ফৌজে যারা যায় সাহেবদের হুকুমে তাদের মেথর ও চণ্ডালের সঙ্গে ভাত খেতে হয়। ব্রাহ্মণরা পৈতে রাখতে পারে না। মুসলমানরা নমাজ পড়তে পারে না।'

গ্রামের মানুষরা এ সব কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হল। চম্মনের মা ঘোমটার নিচ থেকে দেখছিল লছমীনারায়ণকে। এখন সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

লছমীনারায়ণ বুঝল তার কথাগুলো এরা মন দিয়ে শুনছে। সে আরো গম্ভীর গলায় বলল—

'ব্রহ্মাবর্তে স্নান করতে গিয়েছিলাম। কানপুর আর এলাহাবাদে দেখলাম বুড়ো দাড়িওয়ালা সাহেবরা ভূতের মতো পোশাক পরেছে। গলায় একটা তামার কাঠি ঝুলিয়েছে। তারা নাকি হাট-বাজারের দিন গ্রামে গ্রামে ঘোরে। তারা বলে দেব-দেবী পুজো ক'র না। দেব-দেবী সব পুতুল মাত্র। তাদের কোন ক্ষমতা নেই।'

'আর কি বলে?'

'তারা এমনি ক'রে বলে, এখন যদি তোমার ঘর পুড়িয়া যায় তাহা হইলে কি চারটি হাত দিয়া তোমাদের বিষ্ণু ঘরে জল ঢালিবেন?'

লছমীনারায়ণ পাদ্রীসাহেবদের উচ্চারণকে নকল ক'রে দেখাল। বলল, 'এ কথা কে না জানে যে সাহেবরা কাঁচা জোয়ান ছেলেদের জাতটি নষ্ট করবার জন্যে সদাই ব্যস্ত?'

চম্মনের মা উচ্চকণ্ঠে বিলাপ শুরু করলো। সে কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে গালি দিয়ে কথা বলতে লাগল। সে শুনেছিল, একছেলে থাকলে তাকে গালি দিতে হয়, তাকে মিষ্টি করে কথা কইলে দেবতারা অলক্ষ্যে হাসেন, এবং ছেলের অনিষ্ট করেন। কচি ছেলেকে তাই মাঝে মাঝে মুখপোড়া, কালোভূত ইত্যাদি বলা দরকার। এ সব জানে না বলেই তরুণী, অনভিজ্ঞ মায়ের ছেলেরা পেটব্যথা ও কান কট্কটে-তে কষ্ট পায়। দেবতাদের মধ্যে যাঁরা ছোট-খাটো, যেমন 'হায়জা' বা 'কলেরা'র অধিষ্ঠাত্রী বৃদ্ধা দেবী,

ছোটছেলেদের ভালমন্দ করার অধিকারিণী 'ছটিয়া মাঈ', গরুবাছুরের অসুখ বিসুখ সারাবার মালিক 'গাবইয়া গোপাল'— এই সব দেবতারা পুঁথিপুরাণে অপাংক্তেয়। মহাদেব, বিষ্ণু, সরস্বতী বা গণপতি এইসব গরীব, পাড়াগেঁয়ে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ রাখেন না। সাধারণ মানুষের সংস্কার ও বিশ্বাসেই এঁদের উৎপত্তি। ছেলের অসুখ হয়েছে? তবে 'ছটিয়া মা'-র নাম করে অশ্বত্থ গাছের ডালে একটি ন্যাকড়া বেঁধে দিয়ে এস। যে জরতী বুড়ী অশ্বত্থ গাছের ঝুরি-র কোটরে 'ছটিয়া মা'-র লেপাপোঁছা পাথরের মূর্তিতে সিঁদুর লেপে বসে আছে, তাকে এক 'পাই' চাল আর একটি হলুদ দিয়ে এস। ছেলের অসুখ সেরে যাবে। গাইয়ের অসুখ হয়েছে? যে বৃদ্ধটি 'গাবইয়া গোপালে'র গান গায়, তাকে আটটি আটা ও গুড়ের শক্ত লাড্ডু দিয়ে এস। গোয়ালটি পরিষ্কার ক'রে তাকে ডেক। সে গরুকে ঝাড়ফুঁক ক'রে যাবে। বছরে তাকে একটি কাপড় বা একটি চাদর দিও। সে শীতের দিনে কানের ওপর দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে নেবে। তোমার গাইগরু ভাল থাকবে।

ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, মহাদ্যুতিসম্পন্ন বিভাবসু, বা প্রজাপতিব্রহ্মা, এঁদের সঙ্গে গ্রামের মানুষের নিত্যকারবার নেই। তাদের দৈনন্দিন জীবনের সবটুকু লেনদেন এইসব ছোট ছোট দেবতাদের সঙ্গে। দেবতাদের চরিত্রেও অনেক দোষগুণ বর্তিয়েছে যা একান্তই গ্রাম্য সহজ সাধারণ মানুষকে মানায়। তাই এসব দেবতারা এক 'পাই' চাল, বা একটি 'ঢেবুয়া' পয়সা কে দিল না, তাই মনে করে তার ছোট-খাটো অনিষ্ট করেন। তার ছেলেটার পেট কামড়ায়, তার গাইটা দুধের বালতি চাট্ মেরে ফেলে দেয়, তার মেয়েটা হঠাৎ ভিরমি লেগে মূর্ছা যায়। এই সব দেবতার দৌড় ঐ পর্যন্ত। তাঁরা বেশী চান না। তাঁরা জানেন স্বয়ং গৈবীশ্বর শিব একদিনে যা পুজো পাচ্ছেন তা তাঁদের সংবৎসরেও জুটবে না।

চম্মনের মা এখন তাঁদের কথাই ভাবল। ছেলে যে তার কত আদরের সে কথা এই ভরসন্ধ্যেবেলা বললে কে শুনবেন তার ঠিক কি! হয়তো ছেলেটার জরজ্বালা হবে, হয়তো নতুন বাছুরটা বারান্দায় লাফিয়ে উঠে গয়া থেকে আনা পাথরের বাটিটা ভেঙে দেবে, হয়তো চম্মনের বৌ-টা শুকনো মাটিতে আছাড় খেয়ে বাঁজা হয়ে থাকবে। সে গালি দিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল—

'ওরে পাষাণ ছেলে, তোর মতো পোড়ামুখ হতভাগা আর একটাও নেই

যে আমার! আরে চম্মন! তুই যে আমাকে জন্মের থেকে জ্বালাচ্ছিস! তোর মতো কে আর জুয়া খেলে রাত ক'রে আসবে রে, কোন উজবকের জন্যে আমি বসে থাকব? আরে আমার মটকী ভরা ভৈঁষা ঘি রে! আরে আমার ক্ষীরের লাড্ডু! কার সামনে ধরে দেব রে, কার সামনে!'

প্রতিবেশিনীরা এগিয়ে এসে চম্মনের মা-কে ধরে সান্ত্বনার কথা বলল। চম্মনের বৌ-টি শ্বাশুড়ীর দেখাদেখি কান্নার সঙ্গে ধুয়া তুলতে লাগল, 'এ-এ-এ-এ' বিলম্বিত কাঁপা কাঁপা গলায়। চম্মনের মা অতঃপর মনে ক'রল, দেবতাদের কথা ভেবে ছেলেকে সে 'পোড়ার মুখো' ও 'উজবক' বলেছে, আর না বললেও হবে। এতেই নজর লাগার ভয় কেটে গেছে। সে এবার গলা ছেড়ে দুঃখ করতে লাগল।

'রেজাই রে রেজাই! তিনসের তুলোর রেজাই! কে গায়ে দেবে রে চম্মন! রুটির সঙ্গে আচার না থাকলে কে উঠোনে থালা ছুঁড়ে ফেলবে রে, তোর হাতের জোরে তুই যে ঐ কতদূরে থালা আছড়ে ফেলিস! নতুন মোষটাকে কে মারতে মারতে 'টাঁড' (খোঁয়াড) থেকে আনবে রে, তোর বাবা যে ভয়ে সারা হয়! আরে চম্মন রে চম্মন, তোর জাত চলে যাবে, তোকে আমি ধরতে ছুঁতে পারব না। তুই কাহারদের মতো উঠোনে দাঁড়াবি রে, আমি বারান্দা থেকে খাবার ঢেলে দেব তোর হাতে! আরে তুই ফৌজে যাবি কেন? তোর কিসের অভাব! তোর ক্ষেতের মকাই ক্ষেতের জোয়ারী ঝেড়ে বেছে যে দুটো পরিবার খেয়ে পরে বাঁচে। আরে দুধ রে দুধ! পেতলের ফুল বসানো কড়াই-এ তোর নাম করে যে দুধ জ্বাল দেই, তার থেকে ঘটি ঘটি আমি পাড়ায় পাঠাই, তারা তোর নাম করে। তুই কেন ফৌজে যাবি? তুই কেন জাত দিয়ে আসবি? তুই দুধের ছেলে, তুই কি বন্দুক চালাতে পারবি? তারা কি তোকে এমন করে মন বুঝে বুঝে খেতে দেবে?

প্রথমে পুরুষরা চম্মনের মা-র কথা শুনে হেসেছিল। কিন্তু শেষে তারা অস্বস্তি বোধ করলো। তারা এই কান্নার মধ্যে যে সকরুণ মিনতি বাজছিল, তা সহ্য করতে পারছিল না।

পুরুষেরা জাত ও ধর্ম যাবার কথা ভেবে চিন্তিত হয়েছিল। কিন্তু চম্মনের মা যখন কাঁদতে লাগল, তখন তারা চলে যাবার উদ্যোগ করল। লছমী-নারায়ণ চম্মনকে বলল, 'ভাল ক'রে ভেবে দেখ। মায়ের চোখের জল ফেলে

এমন ক'রে যেতে নেই। কিসের অভাব তোমার? কি তোমার নেই? তোমার বাবা দরকার পড়লে গ্রামের মানুষকে গমের গোলা খুলে দিয়ে একমাস পুষতে পারে। এ সবই ত' তোমার।'

কিন্তু চন্মন কারু কথা শুনল না।

অন্য জীবন তাকে ডাকছিল। অপরিচিত, বর্ণাঢ্য এক রোমাঞ্চকর জীবন। লোকের মুখে মুখে যে জীবনের কথা চন্মন শুনেছে, সেই জীবনই তাকে হাতছানি দিতে লাগল।

চার

সাহেবকে প্রথম দেখার সঙ্গে বিস্ময়ের যে আঘাত লাগে তাকে বোঝানো যায় না! চন্মনকে যিনি এনেছিলেন, সেই হাবিলদার-এর শিক্ষামত চন্মন সেলাম করার কথা ভোলেনি। তবু তার পা কাঁপছিল। তার ভয় করছিল। তার কানের মধ্যে ঝিমঝিম করছিল। তারপর সে মুখ তুলে তাকাল।

না। অদ্ভুত, আশ্চর্য কিছু নয়। নাতিদীর্ঘ প্রৌঢ় একটি মানুষ। কাঁচাপাকা চুল। তামাটে রঙ। ঝাঁকড়া ভুরুর নিচে নীল, তীক্ষ্ণ দুটি চোখে কৌতুকের উজ্জ্বল হাসি। সাহেবের জামার কাঁধে ঝকঝকে চকমকে কি সব লাগানো। সাহেব ধীর স্পষ্ট উচ্চারণে তারই ভাষায় তার সঙ্গে কথা বললেন।

চন্মন একটু নিরাশ হয়েছিল। তার গল্পে শোনা আশ্চর্য সব বর্ণনা তা হ'লে মিথ্যে, সাহেব ত' ভয়ঙ্কর গর্জন করলেন না? তাঁর হাত দুখানা দেখে ত' মনে হ'ল না তিনি শরীরে অত্যাশ্চর্য কোন শক্তি ধরেন! সাহেবের মেম নেই। তাই চন্মনের দেখা হ'ল না মেমদের ডানা থাকে কি না! বাচ্চাদের মদে ডুবিয়ে কেমন করে ফর্সা করা হয়, তাও সে দেখতে পেল না। চন্মনের মনে হ'ল এর চেয়ে আশ্চর্য এবং অলৌকিক কিছু সে দেখতে পেলে খুশী হ'ত।

পরে অবশ্য সে বুঝেছিল সাহেব মেম-রা তাদের মতোই মানুষ। সে বুঝেছিল, মেম-রা ময়ূরের পালকের বড় পাখা নিয়ে বেড়াতে বেরোন। সাহেবরা বৌদের কাঁধে হাত রাখেন। তাতেই অমন সব কথা রটে। ডানামেলে পরী উড়ে যাচ্ছে, আর সাহেব তাকে ধরে রেখেছে। সে

বুঝেছিল, সাহেবদের গায়ের চামড়া অমনি সাদা। বিশ্রী, ধবধবে সাদা। ধবল রোগ হয়ে কেউ কেউ অমন সাদা হয়ে যায়। তা ছাড়া সাহেবরা অনেক অদ্ভুত আচরণ করে। তারা বৌদের হাত ধরে, ঘাড় ধরে হাঁটে। ওদের লজ্জা করে না। ওদের দেবতাও একজন সাধারণ মানুষ। তার মূর্তি ওরা ঘরের দেওয়ালে কাঠের ক্রুশে টাঙিয়ে রাখে। দেবতার কোমরে একটা কাপড়ের টুকরা, মাথায় কাঁটার মুকুট। তার সাহেব তাকে বলেছিলেন, 'মানুষকে বাঁচাবার জন্যে উনি মৃত্যুবরণ করেন।'

'তা না হয় হলো। কিন্তু কৃষ্ণকে ত' ব্যাধ মেরেছিল, আমরা ত' তাঁর সেই মরবার মূর্তি দেখি না? আপনাদের দেবতার কোন ভাল মূর্তি হয় না কেন?'

'উনি ঐ চেহারা-ই মানুষের মনে এঁকে রাখতে চান!'

চন্মন আর প্রশ্ন করেনি তাঁকে। তবে, সে ব্যাপারটা ঠিক বোঝেনি। দেবতা যদি হবেন, তবে কি তাঁকে কেউ মারতে পারে? কৃষ্ণকে কি কেউ মারতে পেরেছে? দেবতারা ত' অমর। একা কৃষ্ণ কতবার কত অবতার হয়ে এলেন। সাহেবদের দেবতা তবে দেবতা নয়, মানুষ। তাই তাঁর মৃত্যুতে ওরা বিশ্বাস করে। ওঁর মৃত্যুটাই না কি মনে রাখবার। ঐ মৃত্যুটাই না কি পবিত্র। চন্মনের মনে হয়েছে, বেশ ত! আর কি দেবতা নেই? তাঁদের কি পুজো করা যায় না? তবে সে কিছু বলেনি। ওরা মন্দির গড়ে না। ধূপদীপ দিয়ে পুজো করে না। ওরা অন্য জগত, অন্য বিশ্বাসের মানুষ।

সৌভাগ্যক্রমে চন্মন প্রথম থেকেই কর্নেল ম্যাকমোহনকে পায়। তাঁর সঙ্গে তাই সে অবাধ কথা বলতে পারত। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে পারত।

ড্রিল প্যারেড শিখতে রং-রুটদের অনেক সময় লাগে। চন্মন খুব তাড়াতাড়ি সব শেখে। তাই, অনেক রং-রুটকে ডিঙিয়ে সে রেগুলার সিপাহী হ'ল।

তখনকার হালচাল অন্যরকম।

সবে, পঞ্চাশ বাহান্ন বছর হ'ল কোম্পানী মুর্শিদাবাদের নবাবকে যুদ্ধে হারিয়েছে। কোথায় পলাশীর আমবাগান, তাতে যুদ্ধ হয়েছিল। একটি বুড়ো জমাদার পেনশান নিতে আসতো। সে পলাশীতে লড়েছিল। সে

বাংলাদেশে অনেকদিন থেকেছে। তাকে শুধোলে সে বলত, 'পলাশীতে যুদ্ধ হ'ল। যেমন গরম, তেমনি মশা। বাপরে মশা! আমরা সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ গেলাম। নবাবদের আমবাগানে এই বড় বড় কোহিতুর আম! আমরা খুব আম খেলাম। খুব হৈ-চৈ ক'রলাম।'

সে বলতো, 'আরে ব্বাপ্‌রে ক্লাইভ সাহেব! যেমন মেজাজ, তেমনি রাগী!'

'বুড়ো নানা, বাংলা মুলুক কেমন দেখলে? কলকাতা কেমন?'

'আরে বাড়ীর উপর বাড়ী! তবে সে দেশ ভাল না! খুব ভাত খাবে, আর হাড নরম হয়ে যাবে। আমার ত' বাড়ীর জন্যে দুঃখ হতো। তবে হ্যাঁ, আমরা ঝোলা ভারী করতাম!'

'কি দিয়ে? সোনাদানা?'

'না বাবা। সে সব অন্যরা দেখব। আমরা দেখিনি। আমরা খাসী ধ'রলে খেয়ে নিতাম। তরকারী মাছ ঝুড়ি ধরে তুলে আনতাম হাট থেকে!'

সে বলতো, 'নবাবকে আগে দেখিনি। ওদের ফৌজ কত! কি সুন্দর তাদের সাজপোশাক। হাতীর পিঠে সোনালী হাওদাটা ঝকমক করছিল। সবাই বলছিল ও-ই যে নবাব সিরাজদ্দৌলা! শুনেছিলাম নবাবের ভারী সাহস। দুধের ছেলে হয়েও পলতার যুদ্ধে সাহেবদের হারিয়ে দেয়। নবাবের ভয়ে হেস্তিন সাহেব নাকি কোন মুদীর বাড়ী লুকিয়েছিল। পরে হেস্তিন সাহেব হ'ল বড়লাট।'

'নবাবের কথা বল!'

'নবাবকে দেখলাম মরবার পর। হাতীর পিঠে তাকে বেঁধে মুর্শিদাবাদের রাস্তায় ঘোরাচ্ছিল। হাতীটা যখন দাঁড়াল, নবাবের মা যে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বেরিয়ে এসেছিল, তখন দেখলাম। আহা, দুধের ছেলে। শামলা রং, কেমন শরীর! দেখে আমরা ভারী কষ্ট পেয়েছিলাম। ঐ পলাশী থেকেই ত' পেতলের কামানগুলো টেনে আনলাম কলকাতায়। ফরাসীরা কামান গড়েছিল। আবার বাঙলার কারিগরের গড়া কামান যেমন হাল্কা, তেমনি চমৎকার!'

তখনও কোম্পানীর রাজত্ব এমন ক'রে ছড়ায়নি।

পাঞ্জাব, বর্মা, আফগানিস্তান স্বাধীন। দাক্ষিণাত্য আর পশ্চিমভারত, তাও অনেকখানিই ইংরেজের হাতের বাইরে।

ইংরেজ তাই যুদ্ধ চালাত। কোন্ রাজা সন্ধির শর্ত মানেনি, কোন্ রাজা স্ব-রাজ্যে ফরাসীদের তোয়াজ করছে, কোন্ রাজা শক্তিশালী হয়ে উঠছে, সব খবর রাখত তারা। যুদ্ধ চালাত। যুদ্ধ জিতত, আর একটু একটু ক'রে নিজেদের রাজত্বকে বাড়াত।

তাই কোম্পানীর সিপাহীদের বছর ভোর লড়তে হত। সিপাহীদের বীরত্ব দেখাতে হ'ত। পায়ে হেঁটে বন্দুক ঘাড়ে তারা যুদ্ধ ক'রে বেড়াত। তারা যুদ্ধ ক'রে ক'রে, যুদ্ধ জিতে জিতে নিজেদের রাজ্য ইংরেজদের হাতে তুলে দিত। না দিলে চলবে কেন?

এত তুলো, এত ধান, এত গম, এত পাট, এত কয়লা, এসবের কি বিলি-ব্যবস্থা হবে? বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতার ডক থেকে জাহাজগুলো কি শুধু শুধু ফিরে যাবে? যারা কষ্ট ক'রে ওদের দেশ থেকে আসছে তাদের কি হবে? তারা যে 'Nabob' হবে বলে আসছে। তাদের চোখের সামনে যে রবার্ট ক্লাইভ, হ্ব বয়েন, হেস্টিংস, এই সব সাহেবদের চেহারা ভাসছে। এইসব সাহেব-রা, আরো কত ক্লাইভ-রা, ফ্রান্সিস-রা, বারওয়েল-রা দেশে ফিরে বিরাট ম্যানর-হাউস কিনছে, কোট-অফ-আর্মস করাচ্ছে, দামী ঘোড়া কিনছে, বিরাট প্রাসাদের ঘরে ঘরে ভারতের ব্রোকেড, কিংখাব, শ্বেতপাথরের জিনিস, চন্দন কাঠ, হাতীর দাঁত ও রুপোর জিনিস সাজাচ্ছে। তাই তারা আসত।

'Nabob' হতে পারুক না পারুক চেষ্টা করতে দোষ কি? কিন্তু এসে তাদের ভুল ভাঙত। তাদেরও কাজে লাগতে হ'ত। শ্রম দাও, সময় দাও, ইংলণ্ডকে ধনী কর। ব্যক্তির জন্যে ঐশ্বর্য চেও না, মহারাণীর দেশকে সমৃদ্ধ কর। এ দেশে পৌঁছে আর নিজের কথা ভেব না। 'একজাতি-এক-প্রাণ-একতা'র কথা মনে রেখে দেশের জন্যে শ্রম কর।

সেই দিনে, কোম্পানীর রাজত্ব বিস্তারের দিনে চন্দন হ'ল সিপাহী।

ভাগ্যক্রমে সে এমন একজন সাহেবের কাছে রইল যিনি এদেশে এসে এ দেশকে, এ দেশের মানুষকে ভালবেসে ফেলেছেন। এ দেশে আসবার সময়ে তাঁকে বলা হয়েছিল, 'তুমি যে দেশে যাচ্ছ, সেটা সাপ, বাঘ, সন্ন্যাসী, মহারাজা রোপট্রিকের দেশ। সে দেশের মানুষ বর্বর। তারা অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করে এবং পাতার কুটিরে বাস করে। তাদের পুরুষরা বহুবিবাহ

করে এবং সত্যোবিধবাদের আগুনে পুড়িয়ে মারে। তাদের মেয়েদের শৈশবে বিবাহ হয় এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েরা প্রথম জাতককে নিজে হাতে জলে ফেলে দেয়। সে দেশের মাটিতে সূর্য অবিরাম তাপবর্ষণ করে কিন্তু সে দেশের মানুষের মন অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন। তোমার কর্তব্য হবে সেই অসভ্য বর্বর ও অন্ধকার স্থবির দেশের মানুষকে সুসভ্য করা। তুমি এক মহৎ ও উদার সভ্যতার আলোক অন্তরে বহন করে নিয়ে যাচ্ছ।'

ম্যাকমোহন এ দেশে আসবার অনেক পরে, তাঁর ডায়েরীতে এই কথাগুলির নিচে নিজে কতকগুলি কথা লিখেছিলেন।

কিন্তু সে অনেক পরে।

তখন সিপাহীদের প্রায় বছরভোর যুদ্ধ করতে হ'ত।

ছোট ছোট ব্যাটালিয়ন, ছোট ছোট দলে বিভক্ত সিপাহীদের প্রত্যেককে তাদের অফিসার, ব্রিগেডিয়ার-রা চিনতেন। তারা বীরত্ব দেখালে সে কথা তাঁরা মনে রাখতেন।

চন্দনকে ম্যাকমোহন লক্ষ্য করেছিলেন। সপ্রতিভ, অত্যুৎসাহী ছেলেটির ওপর তাঁর নজর পড়েছিল। পরে ধীরে ধীরে তার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি বা তাঁর মতো অফিসার-রা বছরভোর শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গ পেতেন না। তাঁরা যুদ্ধ করতেন, ক্যাম্প করতেন। জুডিসিয়াল অফিসার-রা, কমিশনার-রা ঘুরে ঘুরে ক্যাম্প ফেলে ফেলে গ্রামে গ্রামে বিচার-কার্য চালাতেন। অনেক সময়ে ম্যাকমোহনকে গ্রামের লোকরা এসে নালিশ শোনাত, সালিশ মানত। বলত 'এসেছ যখন, আমাদের নালিশটা শুনে যাও।'

অনেক নালিশ, বিচিত্র সব অভিযোগ।

লখপতিয়ার স্বামীর মামাতোবোন লখপতিয়াকে জাঁতা ধার দিয়েছিল। কেননা লখপতিয়ার জাঁতা ভেঙে গিয়েছিল। জাতাটা শক্ত পাথরের ছিল, সহজে ভাঙত না। কিন্তু বুধুয়ার লাল গাইটার গায়ে শনিবারের দুপুরবেলা খারাপ বাতাস লাগল। শনিবারের দুপুরবেলা শনিচরী ডাইনী মাঠে মাঠে বাতাসের সঙ্গে গা মিশিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর বাঁশবনের ভেতর বসে সোঁ সোঁ করে ডাকে, এ কে না জানে? কিন্তু বুধুয়ার লেংড়ী বৌ-টা ত' হ্যাকা। সে দুপুরবেলা গর্ভিনী গাইটাকে ছেড়ে দিয়ে দাওয়ায় পড়ে ঘুমোচ্ছিল। গাইটার গায়ে শনিচরীর আঁচলের খারাপ বাতাস লাগল। গাইটা অমনি

খোঁটা উপড়ে দাপাতে দাপাতে লখপতিয়ার উঠোনে এসে লখপতিয়ার জাঁতাটার ওপর চাট মারল। বাপ্‌রে, গাইটার খুরে নিশ্চয় ডাইন্ ভর করেছিল। চাট্ লাগতেই জাঁতাটা ভেঙে গেল। জাঁতাটা ভাল পাথরের ছিল, অমন জাঁতা এ গ্রামে কারো ছিল না। লখপতিয়া গিয়ে বুধুয়া আর তার সোহাগী খোঁড়া বৌ-টাকে গালাগালি দিয়ে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দিয়ে এল। হ্যাঁ হ্যাঁ, লখপতিয়ার জিভে খুব ধার। সাহেবের সামনে সে মুখ খুলতে লজ্জা পাচ্ছে, কিন্তু গ্রামে কারু বাড়ীতে কোঁদল হলে লখপতিয়াকে মানুষ ডেকে নিয়ে যায়। সে পিতৃপুরুষের নাম গালি দিয়ে ভুলিয়ে দিতে পারে। তা তারপর লখপতিয়া তার ননদের কাছ থেকে জাঁতাটা ধার চেয়ে আনল। ননদকে জাঁতাটা ফেরত দেবার ইচ্ছে-ও তার ছিল। কিন্তু সে অবলা মেয়েমানুষ, পাথরের জাঁতা কি সে টানতে পারে? তার স্বামীর সঙ্গে আবার ইতিমধ্যে তার একটু মনকষাকষি হ'ল। স্বামী সিদ্ধির নেশা ক'রে ঘরে ঢুকে লখতিয়াকে রুটি বেল্‌বার বেল্‌না হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাতজোড় ক'রে তাকে 'মা' বলে স্তব করতে সুরু করে। তাই লখপতিয়া বেশী কিছু করে নি, বেলনা-টা দিয়ে মাথায় দু'বার ঠোকর দেয়। তাতেই পুরুষের মান খোয়া গেল। বৌ-য়ের হাতে মার খেয়ে সে আর ঘরে থাকল না। গিয়ে উঠল ঐ হতভাগা বুধুয়ার বাড়ী। লখপতিয়ার ননদ কি কম! জাঁতাটা চেয়ে চেয়ে না পেয়ে একদিন দুপুরবেলা লখপতিয়ার ছাগলটা খুলে নিয়ে গিয়ে একটাকায় বেচে দিল হাটে। এখন সাহেবের বিচার করতে আজ্ঞা হয়, লখপতিয়ার ছাগলটা সে কোন্ আক্কেলে বেচে এসেছে? তার বিচার হোক। লখপতিয়া তার ছাগল ফেরত পাক। আর ঐ যে হতভাগা নেশাখোর স্বামীটা, তার নাকে খত দিয়ে তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

লখপতিয়ার বক্তব্য শেষ হতে না হতে লখপতিয়ার মামাতো ননদ রণরঙ্গিনী মূর্তিতে গাছ কোমর বেঁধে এসে উপস্থিত হ'ল। ননদ-ভাজের ঝগড়া মিটতে মিটতে দুপুর গড়াল। তারপর আর একজন আসল আর এক নালিশ নিয়ে। তার বিয়ের সময়ে তার শ্বশুর তাকে যে গাইটা দিয়েছিল, সেটা নিয়ে তার মামাশ্বশুর পালিয়েছে। মামাশ্বশুরের খুড়তুতো ভাইয়ের এক সম্বন্ধী বলেছে গাইটা কামধেনু। মামাশ্বশুর কামধেনু দেখিয়ে বাজার থেকে 'তোলা' তুলছে।

কেউ বা এসে ম্যাকমোহনের পা ধরে শুয়ে পড়ত। তার গাছের লেবু লক্ষ্মণের ছেলে পেড়ে নিয়ে গেছে, আবার তারই উঠোনে গর্ত খুঁড়ে মাটির গুলী খেলেছে। সেই গর্তে আছাড় খেয়ে তার হাতটা ভেঙেছে। আবার তার হাতে মালিশ না করে তার আট বছরের পুত্রবধূ ছাগল চরাবার নাম ক'রে লক্ষ্মণের বাড়ী গেছে। চুরিকরা লেবু-র আচার মেখে খেয়ে এসেছে খুশী হয়ে। লক্ষ্মণের ছেলের কান ধরে ঘোড়দৌড় করানো হোক, আর লক্ষ্মণের পরিবারকে শায়েস্তা করা হোক, জ্ঞাতিদের বৌ-কে যেন এমন ক'রে প্রশ্রয় না দেয়।

ম্যাকমোহন সাধ্যমতো বিচার করতেন। চম্মন এবং অন্যরা তাঁর বিচারে সাহায্য করত। পরিণামে সবাই খুশী হয়ে বাড়ী চলে যেত। ম্যাকমোহন ঘুষ নিতেন না। কিন্তু চম্মনরা যখন একটা খাসী, ক'সের দুধ আদায় ক'রে আসত, তিনি দেখেও দেখতেন না। তিনি আর চম্মন মাঝে মাঝে বেরুতেন। ছিপ ফেলে মাছ ধরতেন। পাখী বা হরিণ শিকার করতেন। বড় হরিণ পেলে গ্রামের সকলকে মাংস দেওয়া হ'ত। রাতে কাঠের আগুনে হরিণের মাংস রান্না হ'ত ক্যাম্পে। রাঁধুনী প্রচুর কাঁচা লঙ্কা দিত। ম্যাকমোহন বলতেন—'হ্যাঁ, খুব লঙ্কা দিও, খুব ঘি-ও দিও। লঙ্কা দিলে ঝাল হবে, স্বাদ হবে। ঘি দিলে ঝালের দোষটা কেটে যাবে।'

শিকারে চম্মনের খুব ঝোঁক ছিল। জঙ্গলের গাছ, পাতা, পশু, পাখী, সব চিনত সে, সব জানত। জঙ্গলের পথ দিয়ে সাপের মতো নিঃশব্দে চলতে পারত। ম্যাকমোহন তাকে শিকারের সময়ে সঙ্গে রাখতে ভালবাসতেন। হরজী নামে তাঁর নিজের আর্দালীটি ছিল মোটাসোটা। একবার তাকে সিদ্ধি খাইয়ে অচেতন করে, চম্মনরা রাতারাতি তার খাটিয়া নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে রেখে এসেছিল। ঘুম ভেঙে সকালবেলা সে দেখেছিল একটা ছোট ভালুক অবাক-চোখে দাঁড়িয়ে তার নাকের গর্জন শুনছে। দেখে সে ভয়ের চোটে ছুটতে ছুটতে ক্যাম্পে আসে। ম্যাকমোহন সেদিন চম্মনদের খুব বকেছিলেন। পরে অবশ্য হরজীকে হেসে হেসে বলতেন 'শোবার সময়ে মেঝেয় খুঁটো পুঁতে নিজেকে বেঁধে রেখ। নইলে পরীতে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।' চম্মন হরজী-কে শপথ করে বলেছিল 'সত্যি ভাই, আমি কিছু জানি না। তবে তোমার মতো রূপ ত' কারুর নেই! আকাশ থেকে পরী বোধ হয় তাই দেখে তোমায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।'

হরজী-ও তা' বিশ্বাস করেছিল। ম্যাকমোহন যখন বলেছিলেন 'কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে?' সে বলেছিল, 'হুজুর, পরী আমায় উড়িয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল!'

তখন ম্যাকমোহনের মতো মাহুষদের ভারতীয়দের সঙ্গে এমনি ক'রে একটা হৃদয়ের বন্ধন গড়ে উঠত। বড় শহরে, ক্যাণ্টনমেণ্টের ক্লাবের প্রতিবেশে ম্যাকমোহন অস্বস্তি বোধ করতেন। তিনি চম্মনকে বলেছেন 'ওরা অনেক বড হবার, অনেক ওপরে ওঠবার স্বপ্ন দেখে।'

'হুজুর আপনি?'

'আমি?' ম্যাকমোহন আশ্চর্য হয়ে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করতেন। সত্যিই ত! তাঁর ত কোন উচ্চাশা নেই! তিনি ত ক্যাপ্টেন হবার, কমাণ্ডার লেফ্‌টেনাণ্ট হবার স্বপ্ন দেখেন না! তিনি যেন সব উচ্চাশা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর মধ্যে যেন তৃপ্তি এসে গিয়েছে। কোয়ার্টার মাস্টার সার্জেণ্ট থেকে সার্জেণ্ট মেজর-এর পদ পেরিয়ে অ্যাড্‌জুটেণ্ট হযেছেন। সেকেণ্ড কম্যাণ্ডিং অফিসার, কম্যাণ্ডিং অফিসার কবে হবেন সে কথা ত' মনে হয় না! তারও ওপরে, আরও অনেক ওপরে উঠবেন কি না সে স্বপ্ন-ও দেখতে তিনি ভুলে গিযেছেন।

চম্মন ম্যাকমোহনকে যত ঘনিষ্ঠ ভাবে জানছিল, ততই তার আনুগত্য ও ভালবাসা প্রগাঢ় হয়।

সে মাসে সাত টাকা পেত।

ম্যাকমোহনের কোম্পানীতে যে বেনিয়ামুদী ছিল, সে এবং বাজার চৌধুরী-ই সিপাহীদের ডালরুটির মালিক। বেনিয়ামুদী মাসভোর ডাল, লবণ, ঘি, আটা চাল দেবে। বাজার চৌধুরী ভ্রাম্যমাণ কোম্পানীর শাক, সবজী, দুধ, মাছ, মাংস যোগায়। চম্মনরা কোন শহর বা গ্রামের বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারবে না। ফৌজ পৌছলেই বাজারে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেবেন অফিসার—'কোন সিপাহীকে ধারে জিনিস বিক্রয় করিলে সরকার দায়ী হইবে না। ফৌজ চলিয়া গেলে ডিক্রিজারী করিয়াও লাভ হইবে না।' মাসের শেষে বাজার চৌধুরী বেনিয়ামুদীর কাছে ব'সে হিসাব ক'রে পাওনা কেটে নেবে। সিপাহিদের হাতে বাকি টাকা তুলে দেবে। কেউ পাবে এক আনা, কেউ বা পাবে এক টাকা বা দেড় টাকা। বাজার চৌধুরী আর বেনিয়ামুদী নিরক্ষর সিপাহীদের ঠকিয়ে লাভবান হয়।

ম্যাকমোহনের কোম্পানীতে তা হবার জো ছিল না। দূরে দূরে ঘুরবার সময়ে সিপাহীরা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনত। শিকারের মাংস খেত। হাট থেকে ম্যাকমোহন নিজে দর করে সব তরিতরকারী কিনে বাজার চৌধুরীর সাহায্যে সিপাহীদের তরিতরকারী দিতেন। চার আনা, ছ'আনা দিয়ে খাসী কিনতেন। হরিণ মেরে হাটে আনলে গোটা হরিণটা কিনতেন। মাছ পেলে দু'পয়সা একআনা সেরে মণ মণ মাছ কিনতেন। সবাইকে ভাগ করে দিতেন। তাঁর সিপাহীরা তাঁকে ভালবাসত। সিপাহীরা জুয়া খেললে কান ধ'রে ছুট করাতেন। বাড়ীতে টাকা না পাঠালে ভর্ৎসনা করতেন।

নেপাল যুদ্ধের সময়ে খুব বর্ষা নেমেছিল।

জোঁক আর সাপের উপদ্রব ভয়ানক। পানীয় জল পাতা পচে দূষিত হয়ে আছে। চম্মনদের জ্বর আর রক্তামাশা লেগেই থাকত। তখন, বাঙালী ডাক্তারবাবুর ওপর ভারতীয় সৈন্যদের সব ভার ছেড়ে দিয়ে সার্জন-মেজর হব্‌স নিশ্চিন্ত থাকতেন না। তিনি নিজে হসপিটাল টেণ্ট্-এর সামনে বড় বড় চুল্লীতে পানীয় জল ফোটাতেন। সেই জল পুরো কোম্পানীর সবাই ব্যবহার করতেন। ম্যাকমোহন নিজে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে সাহায্য করতেন, ডুলিবেয়ারা এবং ডুলি কম পডলে, নিজে গাছের ডাল কেটে ডুলি বানাতেন। দরকার হ'লে আহতদের বইতে কাঁধ দিতেন। শুধু কারো মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে তিনি টুপি খুলে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাকে আর ছুঁতেন না। তার স্ব-জাতীয় কারুকে বলতেন—'ওর মুখে জল দাও।' সেই মৃত্যু-পথ-যাত্রী কিন্তু তাঁকেই ডাকত। বলত—'সাহেব, তুমি আমার মা বাপ। তুমি আমার বাড়ীতে খবর দিও। আমার ছোট ভাইটিকে ফৌজে ভর্তি করে দিও।' ম্যাকমোহন আশ্বাস দিতেন। হব্‌স সাহেব-ও ইংরেজ। কিন্তু তাঁর ভারী ভূতের ভয় ছিল। তিনি ক্রুশ হাতে না নিয়ে রাতে বেরুতেন না। বলতেন—'ম্যাকমোহন, তুমি জান না, এখানে সব স্পিরিট ঘুরে বেড়াচ্ছে।' চম্মনরা-ও ভয় পেত। গভীর জঙ্গল। সুদূর বিদেশ। মৃতের ত' সৎকার হয়নি। তারা মুখে আগুন দিয়ে দেহটা গর্তে পুঁতে দিয়েছে—নিয়ম রক্ষার্থে মৃতের জামাকাপড়টা পুড়িয়েছে শুধু। তারা যে ভূত হবে, তাঁবুর আশেপাশে ঘুরবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! ম্যাকমোহন কিন্তু ভয় পেতেন না। শান্ত, বিষণ্ণ গলায় বলতেন 'বেচারা শান্তি পেয়েছে, স্বর্গে চলে গিয়েছে, ভগবানের কাছে চলে গিয়েছে!'

পিণ্ডারীদের দমন করবার সময়ে বুন্দেলখণ্ডে চম্মনরা বড কষ্ট পেয়েছিল। পিণ্ডারীরা বড অত্যাচারী, বড নৃশংস। চম্মনরা দেখেছে জলাশয়ের ধারে, দুই হাত দুই পা কেটে মানুষটাকে আধখানা পুঁতে তারা পালিয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায়, তেষ্টায় জিভ ফুলে তারা মারা গেছে। কখনো বা বড গর্ত খুঁডে দেহ পুঁতে, মাথা বের করে রেখে তারা পালিয়েছে। হাত পা বাঁধা অবস্থায় মানুষ কি অসহায় ভাবে তিলে তিলে মরেছে। দেখে দেখে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে, এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গলকে দমন করতে হবে। ঠগী আর পিণ্ডারীদের অত্যাচারে অঞ্চল জনশূন্য। ঠগীরা লুকিয়ে মানুষ মারে। পিণ্ডারীরা এসে সমৃদ্ধ জনপদকে শ্মশান ক'রে দিয়ে চলে যায়।

সব সময়ে রসদ মেলেনি।

রসদ মেলেনি। টাকা গেছে ফুরিয়ে। শেষে ম্যাকমোহন নিজের দায়িত্বে কোন ভূম্যধিকারী বা জোতদারের কাছে টাকা ধার চেয়ে পাঠিয়েছেন। যতদিন না উত্তর পেয়েছেন, ততদিন সিপাহীদের সঙ্গে ভাগ ক'রে লবণ আর রুটি খেয়েছেন। তারপর টাকা এসেছে। ধনী ব্যক্তিটি হয়তো প্রচুর চাল, ডাল, লবণ, ঘি, আলু পাঠিয়েছেন। সেদিন ম্যাকমোহন সকলের সঙ্গে-ই আনন্দ ক'রেছেন।

ম্যাকমোহন কি যত্ন করে-ই যে হিন্দী, রাজস্থানী, বুন্দেলখণ্ডী ভাষা শিখেছেন! চম্মনের মনে পড়ে, একটি ব্রাহ্মণ ছেলের কথা শুনে তিনি খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন—'তুমি নিশ্চয় মথুরার লোক? তুমি এই কথাগুলো কেমন ক'রে উচ্চারণ কর? পেঁড়, পেঁডা—দাগা, দাগাবাজি—ধুনিয়া, ধুন? তুমি কি 'ড'-এর উপর জোর দাও?' এইসব পাগলামি ছিল তাঁর।

একবার বান্দায়, একটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শুদ্ধ ও সুন্দর উচ্চারণে রামায়ণ পড়বেন জেনে তিনি শুনতে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণটির গ্রামে পৌঁছতে তাঁকে এগারো মাইল হাঁটতে হয়েছিল। যুক্ত প্রদেশের জেলায় জেলায় উচ্চারণ করবার পদ্ধতিতে কি কি পার্থক্য আছে, তা তিনি লিখে নিতেন। কত কি যে লিখতেন, কত কি যে সঞ্চয় করতেন।

নেপালের জঙ্গলে নীল রঙের অর্কিড, নতুন ফার্ণ, অচেনা প্রজাপতি সব কিছু দেখে দেখে খাতায় সে বিষয়ে লিখে রাখতেন। বাবুই জাতীয় একরকম পাখী সুন্দর বাসা তৈরী করে জেনে, পুরো চারদিন রোজ ছ'ঘণ্টা

নিশ্চুপ হয়ে বসে তাদের বাসা বানাবার পদ্ধতি দেখতেন। গোখরো সাপের বিষ থেকে মুসলমান হাকিম ওষুধ করবেন জেনে, তাই দেখতে হাকিমের বাড়ী গিয়ে তিনদিন কাটিয়েছিলেন।

চন্দনকে তিনি শিকার বিষয়ে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন। জঙ্গলে কেমন করে নিঃশব্দে চলতে হয়; কেমন ক'রে স্থির হয়ে বসে থাকতে হয়; বাঘের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে কেমন করে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়; কোন্ সাপ বিষাক্ত আর কোন্ সাপ নির্বিষ; ছোট ছোট পশু পাখীর গতিবিধি দেখে বা ডাক শুনে কেমন ক'রে বোঝা যায় এ পথে চিতা না বড় বাঘ গেছে কি না।

তিনি বলতেন, 'দেখ, হলদোয়ানিতে যে সাফাখানা আছে, তার আশেপাশে নাকি অপূর্ব জঙ্গল, অজস্র শিকার! আমি সে জায়গার নাম অনেক শুনেছি, কখনো যাইনি। আমি আর তুমি একবার যাব। আমি লক্ষ্ণৌএর উত্তরের ঝর্ণায় মহাশোল মাছ ধরেছি। শুনেছি হলদোয়ানির কাছে নদীতে মহাশোল মাছ ধরবার খুব সুবিধে! 'আমি তোমাকে শেখাব কেমন করে বিশ পাউণ্ড, তিরিশ পাউণ্ড মাছ ধরতে হয়!'

চন্দন সম্মতি জানাত। সে তত দিনে ম্যাকমোহনকে এত ভালবেসে ফেলেছে যে ম্যাকমোহন যদি তাকে বলতেন—'চল, আমরা বিলেত যাব!' সে কথাও সে বিশ্বাস করত। ম্যাকমোহনের কথাটা বিশ্বাস্য না অবিশ্বাস্য সে কথা সে একবারও ভাবত না। ম্যাকমোহন এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন।

বলতেন, 'জান, গীতা পড়ব বলে আমি সংস্কৃত শিখেছি। গীতা খুব মহৎ জিনিস। তোমাদের যদি ভাল লাগে আমি কিছু কিছু পড়ে শোনাব।'

চন্দন চিন্তিত মুখে বলেছিল, 'হুজুর, গীতা পড়তে হলে খালি গায়ে ধুতি প'রে বসতে হবে। আমরা আপনাকে চাল, সুপারী আর হলুদ দিয়ে তবে বসব। গীতা শুনবার নিয়ম আছে।' ম্যাকমোহন সে কথা শুনে খুব হেসেছিলেন। তারপর খাতা খুলে লিখেছিলেন—'চাল, হলুদ, সুপারী, গীতা পাঠ, রেফারেন্স টু চন্দন!'

নানারকম নোটে তাঁর খাতা বোঝাই ছিল—'রাতে হরিতকী, সুঁচ ও তিল বিক্রয় নিষিদ্ধ, রেফারেন্স টু হেড্‌বাবু মনোমোহন গাঙ্গুলী, বসতি পানিহাটি, জেঃ হুগলী, বেঙ্গল। মামাশ্বশুর ভাগ্নে বৌ-এর মুখ দেখার অপরাধে খড়মপ্রহার, রেফারেন্স কুন্দন মিশির, জেলা ছাপরা। গ্রামে আলু বা টম্যাটো নিষিদ্ধ কেননা তাহার নাম বিলাতী বেগুন, বিলাতী আলু; দুর্গাপূজা, বিবাহ

বা অন্য পূজায় স্ত্রীলোকের নারায়ণ শিলা স্পর্শ নিষিদ্ধ, বোথ রেফারেন্স টু মুৎসদ্দি সাতকড়ি সেন বাবু, গ্রাম ক্ষীরসুকুল, জেলা বর্ধমান। সুবেদার যশোবন্ত সিং, জেলা আজমীর, গ্রাম চিরুহই, রাতে দই ভক্ষণ নিষিদ্ধ এবং মুক্তা বা সোনার দানাকে সেখানে 'লড়িয়াঁ' না বলিয়া 'লটিয়াঁ' বা 'লড়্‌হিয়াঁ' বলা হয়। পাত্রপক্ষ ঘোড়ায় চড়িয়া বিবাহ করিতে যাওয়া বাধ্যতামূলক, রেফারেন্স সেম্‌। কচ্ছপের পিঠে প্রদীপ বসাইয়া দিতে পারিলে অতিবৃষ্টি বন্ধ হয়, মথুরার চাষীদের বিশ্বাস।' এই সব তথ্য তিনি গভীর অভিনিবেশে সন্নিবেশিত করতেন।

ফৌজী জীবন দুঃখের এবং যন্ত্রণার। ফৌজী জীবন অপমান এবং লাঞ্ছনার। এ সব কথা কখনো কখনো শুনেছে চম্মন, কিন্তু বিশ্বাস করেনি। তার নিজের অভিজ্ঞতায়, ফৌজী জীবনটা তার কাছে ধীরে ধীরে একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছে। যারা চাকরী করতে করতে বুড়ো হয়ে যায়, তাদের পেনশান হয়ে যায়। চম্মন ভেবেছে, সে কোনদিনই পেনশান নিতে পারবে না। সে চেয়ে চিন্তে ভিক্ষে ক'রে ঠিক একটা কাজ যোগাড় ক'রে নেবে। সে বলবে 'আমি কাজ না করে থাকতে পারব না। আমাকে যেমন ক'রে হোক একটা কাজ যোগাড় করে দাও।'

সে বলবে, 'আমি আমার সাহেবকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

সে সাহেবকে অনেকদিন জিজ্ঞাসা করেছে, 'সাহেব, আপনি কি পরে বিলেত চলে যাবেন?'

'কেন?'

'যারা ডাকাতদের হারিয়ে দেয় তারা যে পরে বিলেত চলে যায়! ঠগীর যম সিরিরাম সাহেব যে চলে গিয়েছিলেন?'

'স্লীম্যান সাহেবের হয়ত দেশে সবাই আছেন!'

'আপনার কে আছেন?'

'আমার কেউ নেই, দেশে কেউ নেই।'

চম্মন শুনেছে, যে সব সাহেবদের দেশে কেউ থাকে না, তারা ফিরে গিয়ে বড় কষ্ট পায়। তাদের আর নিজেদের দেশ তেমন ভাল লাগে না। এদেশে যখন তারা আসে, তখন তাদের মা, বোন, বুড়োবাবা ভাবে, ছেলে ফিরবার সময়ে নিশ্চয় অনেক কিছু নিয়ে আসবে। সোনার দেশ ইণ্ডিয়া। সে দেশের পথে-ঘাটে সোনা ছড়ানো। সে দেশে নেটিভ-রা মণিমুক্তোর দাম

বোঝে না। তাই ত লণ্ডনে ফিরবার সময়ে এক একজন অজস্র সোনা রূপোর টাকা, রূপোর ডিনার-সেট, শরবত-সেট, কাশ্মীরি কার্পেট, হাতীর দাঁতের আসবাব, খেলনা, এমনকি ইণ্ডিয়ার বাঁদর, ময়ূর, চিতাবাঘ অবধি নিয়ে আসে। ছেলেকে তারা শিখিয়ে দেয় যেমন ক'রে পার 'ন্যাবব' হয়ে এস।

কিন্তু এদেশের মাটিতে পা দিয়ে সাহেবরা দেখে, না, এ ত' ধূলোমাটির দেশ। এ দেশের মাটিতে সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে নেই। মাদ্রাজ আর বোম্বাইয়ের পোর্টে রাজামহারাজারা তাদের অভ্যর্থনা করতে দাঁড়িয়ে নেই। আস্তে আস্তে তারা এদেশের সঙ্গে মিশে যায়।

তারা এদেশে সুখে দুঃখে অনেক বছর কাটিয়ে দেয়। কাজকর্মের অবসরে তারা শুধু 'হোম'-এর কথা বলে। নতুন কোন অতিথি এলে তাকে প্রশ্ন করে 'হোম'-এ শীত এবার কেমন পড়েছিল, বড়দিনে কেমন জাঁকজমক হয়েছিল, ব্রাইটনে এখনো ভিড় হয় কি না, ব্রাডফোর্ডের ডাচেস-কে যে খুন করল সেই ডাক্তারটির ফাঁসি হ'ল কি না, ফুটবল ম্যাচের কি হালচাল, লণ্ডনে নতুন কি থিয়েটার হচ্ছে—এইসব। তাদের কথা শুনলে মনে হয় 'হোম'-এর খবর ছাড়া অন্য কিছু তারা জানতে চায় না, চিন্তা করতে চায় না। তারা বলে ইণ্ডিয়ান-সামার বড় বিশ্রী, মাছি মশা-র উপদ্রব সাংঘাতিক, বিশ্রার অবধি গরম হয়ে ওঠে, বিশ্রী দেশ, বাস করা চলে না এখানে।

তারপর একদিন তাদের-ও 'হোম'-এ যাবার সময় হয়।

কিন্তু দেশে ফিরে তাদের ভাল লাগে না। তারা অবাক হয়ে দেখে জীবনের অনেকগুলো বছর তারা যে দেশে কাটিয়েছে, সেই দেশের জন্যেই তাদের মন কেমন করছে। তারা বিস্মিত হয়ে দেখে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কেউ কিছু শুনতে চায় না। একদিন ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংলণ্ডের মানুষের কৌতূহল ছিল। সেদিন ভারতবর্ষকে তারা চিনত না। তাদের মনে হ'ত না জানি কত রহস্য, কত বিস্ময় নিহিত হয়ে আছে ভারতবর্ষের মাটিতে। আস্তে আস্তে ভারতবর্ষের চা, পাট, কাঁচা চামড়া আর অভ্রের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'ল। ভারত থেকে এল দ্য বয়েন্-এর মতো দুঃসাহসী, যে অনেক টাকা নিয়ে ইউরোপে ফিরল। ভারত থেকে ফিরল মারিআনকে নিয়ে হেস্টিংস। পার্লামেন্টে তার বিচার হ'ল। হেস্টিংস বলল, 'আমি শুধু লুণ্ঠন আর

অত্যাচার করিনি। আমি ভাগবদ্‌গীতার অনুবাদ করিয়েছি—যে গীতা এমনই এক অমর গ্রন্থ যে ইংরেজী ভাষা হয় তো একদিন মানুষ ভুলে যাবে। ইংরেজী ভাষার এই অপ্রতিহত প্রতাপ হয়তো আর থাকবে না। তবু গীতাকে মানুষ মনে রাখবে। আমি উইলিআম জোন্‌সের সহযোগিতায় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেছি। আমি পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে ভারতের অমর মহাকাব্য মহাভারতের অনুবাদ করাতে চেষ্টা করেছি। আমি ভারতকে চেনাতে চেষ্টা করেছি।' তারপর প্রথম গভর্নর জেনারেল ওআরেন হেস্টিংস ইংলণ্ডে বুড়ো হ'ল। আর ততদিনে ইংলণ্ড জেনে ফেলল ভারতবর্ষ দ্রুত ইংলণ্ডের সবচেয়ে সমৃদ্ধ উপনিবেশে পরিণত হতে চলেছে।

ভারত প্রত্যাগত সাহেবরা তখন দেখল, না, ভারত সম্পর্কে তাদের কথা কেউ জানতে চায় না। তারা তখন নিঃসঙ্গতায় নির্বাসিত হ'ল। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় বসে বসে তারা ভারতবর্ষের কথাই ভাবল। তারা ভাবল এর চেয়ে সেই চির-সূর্যের দেশে কেন রইলাম না!

ম্যাকমোহন চম্মনকে বলেছেন, 'আমি সে জীবন চাই না। আমি এ দেশেই থাকতে চাই।'

চম্মন ম্যাকমোহনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বছর কাটিয়েছে। সাত টাকার সিপাহী থেকে সে হাবিলদার হয়েছে। সে ভেবেছে এর পর সে জমাদার হবে। তারপর সুবাদার হয়ে অবসর গ্রহণ করবে। হাবিলদার হবার পর তাকে পে-হাবিলদারের সম্মানিত পদ দেওয়া হয়েছে। সে যখন সিপাহী ছিল, সে ম্যাকমোহনের আর্দালীর কাজ-ও করতো। পরে পদোন্নতি হবার পর-ও ম্যাকমোহনের কাজকর্ম নিজেই করেছে। পে-হাবিলদার হবার পর তার দায়িত্ব বেড়েছে। অনেক টাকার হিসাব রাখতে হয়েছে। সাহেবদের টাকা ধার দিতে হয়েছে। আবার টাকা গুনে গুনে ফেরত নিতে হয়েছে। দেশে তার সম্মান বেড়েছে। আত্মীয়-স্বজন তাকে খাতির করেছে।

তারপর একদিন তার ওপর কঠোর শাস্তি নেমে এসেছে।

এত সম্মান, এত প্রতিপত্তি সব সে হারিয়েছে। অথচ ঈশ্বর জানেন সে নির্দোষী।

ম্যাকমোহন একদিন তাকে বলেছেন, 'আমার ভাগ্নেকে আনাচ্ছি। আমার ভাগ্নে ব্রাইট। ওর মা নেই, বাবা-ও মারা গেছে। এখন আমাকেই ওর সব ভার নিতে হবে। আমি সংসারী মানুষ নই। জানি না ওর ওপর

সুবিচার করতে পারব কিনা। ও ভালবাসা পায়নি। আমি কি ওকে ভালবাসতে পারব?'

চম্মন তখন থেকে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। শুধু চম্মন কেন, সকলেই। ম্যাকমোহন যাকে ভালবাসেন, তারা-ও তাকে ভালবাসবে।

ব্রাইট এসেছে। সুন্দর দেবকান্তি তরুণ। স্বপ্নদর্শী নীল চোখ, খাড়া নাক, ঈষৎ পুরন্ত ঠোঁট, গোঁফের রেখা সবে দেখা দিয়েছে।

ব্রাইটকে দেখেই চম্মন ভালবেসে ফেলল।

সে কানাঘুষো শুনেছিল, ম্যাকমোহনের ভাগ্নের রক্তে নাকি বেশ খানিকটা ভারতীয় ভেজাল আছে। সেই জন্যেই নাকি বোনের সঙ্গে সাহেবের মুখদেখাদেখি ছিল না।

সে ধীরে ধীরে ব্রাইটের মনের চেহারাটাকে স্পষ্ট হতে দেখল। সে দেখল মামার সামনে ব্রাইট চুপ করে থাকে। কিন্তু অন্য সময়ে তার কথা-বার্তায় বিজাতীয় একটা ভারতীয় বিদ্বেষ ফুটে ওঠে। ম্যাকমোহন নিজে মনে রাখেন না যে তিনি শ্বেতাঙ্গ। সেজন্য ব্রাইট মামাকে-ও পছন্দ করে না। ব্রাইটের বন্দুকের হাতটি খুব পাকা।

হাসতে হাসতে সে বহুদূরের লক্ষ্যভেদ করতে পারে। উড়ন্ত হাঁসকে বিঁধতে পারে বুকে। চম্মন তার সঙ্গে শিকারে গিয়ে বড আনন্দ পায়। সে বলে, 'ছোটসাহেবের যখন বয়স হবে, তখন শিকারে তার জুড়ি থাকবে না।' একদিন সে ব্রাইটের সঙ্গে শিকারে যায়।

হরিনের খোঁজ করতে করতে তারা যে আহার-রত চিতাবাঘের ওপরে গিয়ে পডবে তা তারা বোঝেনি। ব্রাইট গুলী করে। কিন্তু চিতাবাঘটা ছুটে পালায়। আহত চিতাবাঘকে ছেড়ে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। পরদিন ভোরেই তারা আবার যায়। দুপুর গড়িয়ে যায়, বিকেলের ছায়া-ছায়া ভাব নেমে আসে জঙ্গলে। তারপর দিনের শেষে সোনালী আলো যখন পাকা বেতবনের ওপর লাল হয়ে ঢলে পড়ছে, তখন তারা বাঘটাকে খুঁজে পায়। ব্রাইটের জন্য অপেক্ষা না করে-ই চম্মন গুলী করে। বাঘটা পড়ে যেতে সে আরো একটা গুলী ক'রে নিশ্চিত হয় যে বাঘটা মরেছে। তারপর কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। উত্তেজিত গলায় বলে 'ছোটসাহেব, ছোটসাহেব, এ সেই বাঘটা। দেখ, গুলকানীয়া গ্রামের গোয়ালার মেয়েটাকে এ-ই মেরেছে। সোনচরীর বাচ্ছাটাকে-ও এ-ই-ই নিয়েছে। এই সেই শয়তান। দেখ

ছোটসাহেব, সামনের বাঁ পায়ের তিনটি আঙুল নেই। ঘাড়ের কাছে ভালার দাগ। ওঃ কি জোরেই না সোন্‌চরীর বরটা ভালা মেরেছিল। মনে হয় লোহার ফলাটা বোধ হয় ওর ঘাড়ের হাড়ে এখনো বিঁধে আছে।'

এমনি অনেক কথাই বলে চলে চম্মন, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে ব্রাইটকে দেখে সে হতবাক হয়ে থেমে যায়। ব্রাইটের মুখখানা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। ব্রাইট বলে 'উল্লুক, তুই আমাকে ছোটসাহেব বলবি না। আমি ঐ বুড়োটার মতো আহম্মক নই। তুই একটা নেটিভ। ব্লাডি নেটিভ। মনে রাখিস্!' বলে ব্রাইট চলে যায়।

চম্মন অপমানে ও আঘাতে বিমূঢ় হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে না কি অপরাধ করেছে। অনেক পরে উঠে দাঁড়ায়। গাদাবন্দুকটা তুলে নেয়। চারিপাশে আঁধার হয়ে এসেছে। কারা যেন ফিসফিস ক'রে কথা কইছে। মৃদু, অতি মৃদু একটা আওয়াজ। পাতার শব্দ। চম্মনের হাতের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। হয়তো নিহত বাঘটার প্রেতাত্মা তার পেছনে পেছনে আসছে। অভ্যাস বশতঃ থুথু ফেলে বলে, 'তোর মুখে থুথু ফেলি। তোর মুখে প্রস্রাব করি। যা, তুই যা! আমাকে মা ভবানী রক্ষা করেছেন!' অনুভব করে থুথুটার স্বাদ তেতো হয়ে গেছে। আঃ! ব্রাইটের গাল খেয়ে তার মুখের ভেতরটা কি তেতো হয়ে গেল? হঠাৎ একঝলক গরমজল তার চোখ দিয়ে উছলে আসে। সে বিড়বিড় ক'রে বলে, 'আমি বুড়ো উল্লুক। আমি ব্লাডি নেটিভ! ভগবান!'

চোখটা মুছে ফেলে চম্মন। মনে মনে বলে, ব্রাইটের সঙ্গে সাতহাত তফাৎ রেখে চলবে।

ক'জন মিলে পরে বাঘটা নিয়ে আসে। সবাই দেখে। সবাই তারিফ ক'রে বলে সোন্‌চরীর বর তোকে নিশ্চয় একটা ছোরা দেবে খুশী হয়ে। তুই খুব তাক ক'রে গুলীটা মেরেছিলি। বেঁচে থাকলে এই শয়তানটা নিশ্চয় মানুষ খেতে শুরু করত। ঘাড়ে চোট খেয়ে কমজোরী হয়ে পনরো দিনের মধ্যেই দুটো মানুষ মেরেছিল ত! বাঁচলে আর দেখতে হ'ত না।'

চম্মন সব শোনে। কিন্তু সে খুশী হতে পারে না। তার সঙ্গীরা বলে গ্রামের বুড়ীরা এসেছে। বাঘের নখ চাইছে। তাবিজে ভ'রে পরিয়ে দেবে বাচ্চাদের। কি করবি চম্মন?

সে বিরক্ত হয়ে বলে, 'যা খুশী কর্‌গে যা! আমি জানি না।'

কিন্তু তারপরও ব্রাইট তার কাছে আসে।

টাকা ধার নিতে আসে। পে-হাবিলদারের কাছে সিন্দুক থাকে, চাবি থাকে। সাহেবরা তার কাছে টাকা ধার নেয়। এমন ভাবে টাকা ধার নেওয়া বে-আইনী। কিন্তু আইন মেনে কাজ করা চলে না। সাহেবদের যে হরদম টাকার দরকার হয়। জুয়া খেলে টাকা ফুরিয়ে যায়। দেশী বিবিদের টানা দেওয়া নথ, মাথার সোনার বাগান দিতে টাকা ফুরিয়ে যায়। সাহেবরা তাই টাকা ধার নেয়, টাকা শোধ দেয়। টাকার ওপর সুদটা পে-হাবিলদারের লাভ। সেই সুদের টাকা দিয়ে পে-হাবিলদার হিসেব ঠিক রাখে। সাহেবরা, ভারতীয় অফিসাররা, বাইরে থেকে টাকা ধার নিলে রেজিমেণ্টের বদনাম। রেজিমেণ্টের কর্তারা তাই জেনেও না জানবার ভান করেন।

ব্রাইট ধীরে ধীরে কোআর্টার মাস্টার সাহেব হয়েছে। তার সবসময়ে টাকার দরকার। রেজিমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর অনুমোদিত কয়েকজন বেশ্যা থাকে। ব্রাইট তাদের তাঁবুতে-ও যায়। সে যে কেন একজন ভাল দেখে সভ্য ভব্য বিবি রাখে না, তা ভেবে চমন অবাক হয়। ব্রাইট কি ঐ মেয়েগুলোর কাছে গিয়ে কোন আনন্দ পায়? ওদের মধ্যে গুলাবী নামে একজন প্রৌঢ়া আছে। সে অন্য-মেয়েগুলোকে শাসন করে, আর কি ইংরেজ কি ভারতীয় সকলের জন্যেই কুটনীর কাজ করে। সে ব্রাইটকে নানারকম স্ত্রীলোকের স্বাদ চেনাল। চমন বুঝল ছেলেটা অধঃপতনে যাচ্ছে। কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না। ব্রাইটকে-ও না, গুলাবীকেও না। গুলাবীকে সবাই খুব মানে। গুলাবী নানারকম ওষুধ-বিষুধ মন্ত্র-তন্ত্র জানে। বাঙালী ডাক্তারবাবু যদি বলেন ভূপবাহাদুরের আমাশা হয়েছে, আর গুলাবী যদি বলে ভূপবাহাদুরের পেটে বাচ্চাভূত ঢুকে নজর দিয়েছে, কেননা ভূপবাহাদুর কানে পৈতে না দিয়ে সন্ধ্যাবেলা পিপুল গাছের নীচে প্রস্রাব করতে গিয়েছিল—তবে ভূপবাহাদুর নিঃসন্দেহে গুলাবীর দেওয়া শেকড়টা পেটে বাঁধবে আর ডাক্তারবাবুর ওষুধটা ফেলে দেবে। এমন কি সুবাদার সাহেবের মতো রাশভারী লোকও বাতের ব্যথার জন্যে গুলাবীর কথামত শুকনো আকন্দপাতা গোবরে ফুটিয়ে মালিশ করেন। মনের মতো স্ত্রীলোককে বশীভূত করবার জন্যে গুলাবীর কাছ থেকে

সিক্কা চার আনা দিয়ে সিপাহীরা মাদুলী কেনে। গুলাবী দিনরাত লতাপাতা কুড়োয়। আগুনে কি সব জ্বাল দেয়। লাল সুতো দিয়ে মাদুলীর দড়ি পাকায় আর সন্ধ্যে হলেই একটি বোতল নেশা করে। টকটকে লাল চোখে ব'সে ব'সে কে জানে কার সঙ্গে কথা বলে, 'হ্যাঁ জানি জানি, তুই বড় জাত, আমি ছোট জাত, তাই ত' তুই আমাকে এমন করে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলি। হায় রাম! আমি শুধু ভেসে চলেছি। হায় রাম। আমার দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে! তোকে আমি খুঁজে বের করব, যেখানেই থাকিস না তুই! তুই যদি মরে থাকিস, ত' চিতা থেকে উঠে এসে আমার খোঁজ নিবি! তোকে নিতেই হবে!'

চন্দন গুলাবীকে কিছু বলে নি।

কিন্তু ব্রাইট ধীরে ধীরে তার ঋণের অঙ্ক বাড়াতে বাড়াতে যখন সাতশো টাকা ক'রে তুললো, তখন চন্দন মহা বিপদে পড়ল।

হিসেব দেবার সময় এল। চন্দন বল্লল, 'হুজুর, আপনি আসলটা দিয়ে দিন, সুদ চাই না।'

কিন্তু কোথায় কি! ব্রাইট একপয়সাও দিতে পারল না। অগত্যা শেষ অবধি চন্দন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ম্যাকমোহনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মাটিতে বুড়ো আঙুল ঘষে ঘষে সব কথা বলল।

ম্যাকমোহন দু'জনের একজনকেও ক্ষমা করলেন না। ব্রাইটের হয়ে টাকাটা তিনি দিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু চন্দনের কোর্ট-মার্শালও রোধ করা গেল না।

অনেকদূর অবধি গড়াল ব্যাপারটা। হেড্-কোআর্টার্স নির্দেশ পাঠাল রেগুলেশন অনুযায়ী চন্দনের শাস্তি হবে। ব্রাইট সই করে টাকা নেয়নি। চন্দন তাকে সরল বিশ্বাসে টাকা দিয়েছে। চন্দন দায়িত্বহীনতার কাজ করেছে। এ ধরনের ব্যাপার ভেতরে ভেতরে মিটে যেতে পারতো। পে-হাবিলদার টাকা ধার দেয়, শোধ নেয়, এ সবাই জানে। তবে ব্যাপারটা যখন কোর্ট-মার্শাল অবধি গড়িয়েছে তখন চন্দনকে শাস্তি নিতেই হবে। তার আর প্রমোশান হওয়া সম্ভব নয়। পেনশান অবশ্য বন্ধ থাকবে না।

ম্যাকমোহন সহসা ফেটে পড়লেন।

চন্দন যখন জানল তার আর প্রমোশান হবে না, কোম্পানীর কাছে তার বদনাম হয়ে গেল, সে খুবই ভেঙে পড়ল।

লজ্জায় অপমানে সে কি করবে ভেবে পায় নি। উপোস করে প'ড়ে থেকেছে। মাঝে মাঝে পাগলের মত বুক চাপড়ে কেঁদেছে। নেহাত মহাপাপ, নইলে সে নির্ঘাৎ গিয়ে জলে ঝাঁপ দিত।

সে সময়ে ম্যাকমোহন তার পাশে না দাঁড়ালে যে কি হ'ত তা চন্দন আজও জানে না।

ম্যাকমোহন ব্রাইটকে শিক্ষা দিতে চাইলেন। ব্রাইটকে নিয়ে তিনি একদিন জঙ্গলে গেলেন। বললেন ডেভি, তোমার মাথার ওপরে আকাশ, নিচে মাটি। ঈশ্বর তোমায় দেখতে পাচ্ছেন। তুমি তাঁকে ফাঁকি দিও না। তুমি বল, বুকে হাত রেখে বল, টাকাটা কি তুমি নাওনি? আমি জানি তুমি নিয়েছ, তুমি আমার সামনে স্বীকার কর।'

'কে বলে আমি নিয়েছি! আমার সই দেখাতে পেরেছে বুড়োটা?'

'কিন্তু আমি জানি সে মিথ্যা কথা বলেনি।'

'আপনি একটা নেটিভের কথা বিশ্বাস করতে চান?'

'হ্যাঁ ডেভি। তুমি যাকে নেটিভ বলছ, সে তোমার চেয়ে অনেক খাঁটি, অনেক সৎ।'

'আমি জানি আপনি আমাকে ঘেন্না করেন।'

'তোমাকে! এমিলির ছেলেকে!'

'হ্যাঁ। আর এ-ও জানি, তার কারণ আমার বাবা, আমার বাবা...'

ম্যাকমোহন বলেন, 'শোন মূর্খ! তোমার বাবাকে আমি সহ্য করতে পারি না, কেননা সে আমার বোনকে চূড়ান্ত কষ্ট দিয়েছিল। সে তোমাকে অনাথাশ্রমে ফেলে রেখেছিল, সেজন্যে তাকে ঘৃণা করি। তার রক্তের জন্য নয়......মানুষকে চামড়া দিয়ে বিচার আমি করি না, করব না! আমি চাই তোমার মধ্যে সে সৎসাহস আসুক যাতে তুমি তোমার অন্যায় স্বীকার করতে পার।'

'কেন?'

'আমি চাই তুমি সে কথা লিখে দাও। আমি সে রিপোর্ট পাঠাব। তা'হলে চন্দনের প্রমোশান আটকে থাকবে না।'

'ও, নেভার! আমি ওকে ঘেন্না করি।'

'দেন টেক ছাট, অ্যাণ্ড ছাট! অ্যাণ্ড ছাট! য়ু, গাটারস্নাইপ!' ম্যাকমোহনের চাবুক ব্রাইটের হাতে কেটে বসে। ম্যাকমোহন ফুঁসতে

ফুঁসতে ফেরেন। ব্রাইট বদলী হয়ে যায়। আর ম্যাকমোহন তাঁর উইল বদলে কানপুর-অনাথাশ্রমে সব টাকা দিয়ে দেন। চন্দনকে তিনি বলেন, 'তোমাকে আমি অন্য কাজে দিতে চাই। এখানে থাকলে সব সময়ে অপমানিত বোধ হবে নিজেকে। তুমি মাথা তুলে চলাফেরা করতে পারবে না।'

ম্যাকমোহন চন্দনকে চমৎকার একটি সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। বললেন, 'নৈনীতালের নিচে কুমায়ুনের জঙ্গলে হলদোয়ানি নামে একটা সুন্দর জায়গা আছে। সেখানে একটা সাফাখানা (হাঁসপাতাল) আছে। ওষুধ-বিষুধ আছে, একটি ড্রেসার আছে। তা ছাড়া সাহেবরা প্রায়ই সেখানে শিকার করতে যান। সেই সাফাখানাকে তাঁরা ডাকবাংলো হিসেবে ব্যবহার করেন। তার উত্তরে কাঠ গোদাম আর রাণীবাগ। তার পূর্বদিকে গৌলা নদী বয়ে গেছে। অ্যাণ্ডু-ফ্রিজার সাহেব ঐ সাফাখানার বাগানে নানারকম গাছ লাগিয়েছিলেন। জায়গাটা খুব নির্জন, খুব সুন্দর। আমি তোমাকে ঐ সাফাখানায় কীপার ক'রে দিতে চাই।'

'হুজুর আপনার দয়া।'

'চন্দন, তুমি আট টাকা মাইনে পাবে। কাশীপুরের শিবরাম মিশ্রের ওখানে একটি জঙ্গল আছে, কাঠের গোলা আছে। আমি তাঁকে লিখেছি, তুমি তাঁর হিসেব রাখলে আরো ছ'টাকা মাইনে পাবে। ডাক-রানাররা ওখানে ডাক জমা রাখতে আসে। তাদের হয়ে তুমি ডাক জমা রাখবার ভার নিও। নৈনীতালের পোস্টমাস্টার তোমাকে দু'টাকা দেবেন।'

চন্দন এবার কাঁদতে শুরু করলো। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ম্যাকমোহন অন্যদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, 'চন্দন, ওখানে জ্বালানীর কোন খরচ নেই। ওখানে নদীতে অনেক মহাশোল মাছ। জঙ্গলে পাখী আর হরিণ অগুণতি। ওখানকার পাহাড়ীরা যেমন ধর্মভীরু তেমনই সরল। একপয়সায় তুমি দু'সের আলু পাবে। এক টাকায় এক মণ চাল পাবে। চন্দন, ওখানে তুমি আমার জন্যে নদীতে পাথর দিয়ে জল আটকে রেখ। ছোট্ট নদী, জল বাঁধলে তাতে মাছ ধরা পড়বে। আমি যাব। আমি আর তুমি মাছ ধরব, হরিণ মারব। তুমি জান না ওখানে কতরকম পাখী, কত জাতের প্রজাপতি, কত রকম অর্কিড দেখতে পাবে। আমার জন্য সংগ্রহ ক'রে রেখ। আমি যাব। চন্দন, সার্টিফিকেটে আমি তোমার শিকারের কথা লিখে দিলাম।'

ম্যাকমোহন অল্প অল্প হাসতে লাগলেন, 'চম্মন, মানুষ বড় ভুল করে। যেমন আমি ভেবেছিলাম, কাঁটাগাছের গোড়ায় দুধ আর ঘি ঢাললে সে গাছে মিষ্টি আম ফলবে। যেমন আমি ভেবেছিলাম, জন্মের সঙ্গে মানুষ যে-সব প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়—স্নেহ ভালবাসা দিয়ে সে-সব প্রবৃত্তিকে জয় করা চলে। চম্মন, আমার চুল পেকে গেছে, তবু আমার বুদ্ধি হয়নি দেখলে ত?'

তিনি চুপ ক'রে গেলেন। চম্মন চোখ মুছে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'সন্ধে বেলা স্নান করবার সময়ে কানাইকে বলবেন, জলগরম ক'রে দেবে। মাক ফুরিয়ে গেলে লক্ষ্মৌ থেকে আনিয়ে নেবেন। সাহেব আপনি মা প, সূর্যকান্ত দেশে গেছে। তাকে আমার দরুন তিনটি টাকা দিয়ে বেন। হুজুর আমি কোন অধর্ম করিনি, আপনার এগারো টাকার জ্গী ঐ ওষুধের বোতলে রেখে গেলাম। আর মাঝে মাঝে আমাকে একটু ন করবেন। আপনার অনেক কৃপা হুজুর, আমি কোম্পানীর চাকরই লোম। চাকরী হারিয়ে দেশে গেলে আমার মন টিকত না।'

হঠাৎ চম্মন হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেলল। ম্যাকমোহন উঠে গেলেন। ছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাইপে তামাক ভরতে গিয়ে দু'বার হাত াঁপে গেল তাঁর। কিছুক্ষণ বাদে পেছনে ফিরে দেখলেন চম্মন বেরিয়ে গেছে।

সাফাখানার জীবনটা চম্মনের আস্তে আস্তে সয়ে গেল।

অত্যন্ত নির্জন পরিবেশ। আশে পাশে জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম। াামবাসীরা অতি সরল, অতি নিরীহ। চম্মনকে তারা খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে। মন তাদের বলে—'জঙ্গলের হরিণ মেরেছিস? মধু এনেছিস? জানিস, নী কোম্পানী বাহাদুরের জঙ্গল? কোম্পানী বাহাদুরের চোখ খুব কড়া। ব দেখতে পায় জানলি?'

গ্রামবাসীরা সভয়ে শোনে। তারা মাঝে মাঝে চম্মনকে এসে ধরে, বাই মিলে একটা টাকা দেব গুলীখরচা। একটা বাঘ গরু-বাছুর মেরে বে নাজেহাল করল। দয়া কর।'

চম্মন গাদাবন্দুকে পলতে লাগিয়ে বাঘ মারে। গ্রামবাসীরা খুব বড় লা ক'রে গল্প করে, 'আরে ব্বাপ, চম্মন জী একটা গুলী ছুঁড়ল, আর শন্ শন্ 'রে উড়ে গিয়ে গুলীটা শয়তানটার কপাল ফুটো ক'রে দিল!

তারা দুধ, ঘি, মধু মাছ আনে। চম্মন আস্তে আস্তে টাকা জমাতে শুরু করল। এদের কাছ থেকে সম্মান পেয়ে তার চাল-চলনও রাশভারি হল। সাহেবদের সঙ্গে মাঝে মাঝে শিকারে বেরিয়ে তার সম্মান আরো বাড়ল। সাহেবরা কেউ বা তাকে সার্টিফিকেট লিখে দিল। কেউ বা একটা কাজ করা ছুরি, কেউ একজোড়া বুট, কেউ বা অন্য কোন ছোট বাক্স উপহার দিল। ডাকরাণার-রা অবধি চম্মনকে চিনে ফেলল। আস্তে আস্তে কাঠগোদাম, রানীবাগ সব জায়গায় রটে গেল, হলদোয়ানির সাফাখানায় চম্মন নামে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছে। কোম্পানীর মানসম্মান রাখবার ভার তার হাতে। হাটে, বাজারে সবত্র সে মানুষকে কোম্পানীর নাম ক'রে শাসিয়ে বেড়ায়। গ্রামের পঞ্চায়েতে তাকেই সবাই ডেকে নিয়ে যায়। সে বলে 'আরে রামধনিয়া, বুড়োবাবাকে খেতে দিবি না? কোম্পানীর রাজত্বে বাস করছিস না? আরে পুতলী, শাশুড়ীকে তুই পেতলের বালা দিয়ে মারিস? কোম্পানী বাহাদুরের রাজত্বে এত বড অনাচার? দে, নাকে খত দে। দাঁতে খড় নিয়ে মাপ চা!'

কিছুদিন পরে, একটা বাঘ মারবার পর গ্রামের লোকেরা চম্মনের নামে একটা 'দাওৎ' দিল। ফরাস পেতে চম্মনকে বসিয়ে তারা গান বেঁধে চম্মনের জয়গান গাইল। একজন গান গায়, সবাই ধুয়া দেয়।

'গাইবাছুর মরলে আমরা কাকে ডাকলাম রে কাকে ডাকলাম?
(সমবেত) চম্মন জী রে চম্মন জী!
দন্ দন্ গুলী চালিয়ে কে মারল রে শয়তানকে?
(সমবেত) চম্মন জী রে চম্মন জী!
আরে বুড়ো শয়তানটা রে, বুড়ো শয়তান!
এক চোখ কানা তার, এক চোখে আগুন!
তার গর্জনে আকাশ ফাটে রে গর্জনে আকাশ ফাটে!
কার গুলী খেয়ে ল্যাজ উলটে পড়ল শয়তান।
(সমবেত) আরে চম্মন জী রে চম্মন জী'

'বোল বোল ভাই চম্মন জী কি জয়!' বলে সবাই বসে পড়ল। সা
চম্মনের খুব আনন্দ হ'ল। বাড়ীতে চিঠি লিখল, 'আমি রাজার হালে আ
আমাকে হাল, গরু, বাছুর, বীজধান, এ সবের খবর দিয়ে বিরক্ত ক'রো
কোম্পানীর নিমক খাচ্ছি, কোম্পানীর কাজ করছি!'

দেশে মাঝে মাঝে যায় বটে, কিন্তু তার ভাল লাগে না। তার নিজের বী বহুকাল মারা গিয়েছে। ছেলে প্রতাপ এখন প্রৌঢ়। প্রতাপ আর দুর্গা তাকে শুধু ফিরে আসতে বলে। সে রেগে বলে, 'কেন, টাকাগুলো আমাদের দরকার নেই বুঝি? বেশ, ক্ষেত আর হাল বলদ ত' অনেক কিনেছ! এবার আমার টাকাগুলো ওতে-তা'তে খরচ ক'রো না। দুর্গা বেটি। তুমি বরং জমিও। ঐ টাকা দিয়ে চন্দনের বিয়ের সময়ে আলো জ্বলবে, বাজি পুড়বে, নাঙ্গা বাজবে।'

দুর্গা শ্বশুরকে খুব সেবা যত্ন করে। রাতে শ্বশুরের পায়ে তেল মালিশ ক'রে দেয়। বলে, 'আপনি ঘরে ক'দিন থাকুন। প্রাণ ভরে আপনার সেবা করি। মেয়ে হয়ে আপনার সেবা করতে পারলাম না, এ দুঃখ আমার মলেও যাবে না।'

প্রতাপের ছেলে চন্দন পিতামহকে ছাড়তে চায় না। সে শুধু বলে, 'দাদা, কর্নেল সাহেবের কথা বল।'

চম্মন বলে, 'তোকেও ঢুকিয়ে দেব ফৌজে। তুই রিসালায় সওয়ার হবি। পরে রিসাল-মেজর হয়ে যাবি। বুঢা সাহেবের কাছে নিয়ে যাব, সে তোকে ভর্তি ক'রে দেবে। দেখবি বুঢা সাহেবের সার্টিফিকিটের কি ক্ষমতা। তুই যুদ্ধে যাবি, লড়াই করবি—দম দম কামান ছুটবে, ঝম্ ঝম্ বন্দি বাজবে, দেখবি সব!'

চন্দন বলে 'বড় কবে হব? কবে যাব তোমার সঙ্গে?'

পাঁচ

বড় হবার পর সত্যিই চন্দন একদিন চম্মনের কাছে এল।

গ্রামের একটি লোকের কাছে সব খবর শুনে অবাক হয়েছিল চম্মন। রাগ করে সে বারবার মাটিতে থুথু ফেলতে লাগল। 'কি কাণ্ড, কি কাণ্ড দেখো! সুবজ তার মেয়ের সঙ্গে চন্দনের বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে!'

'মা আর মেয়েকে তোমরা সায়েস্তা করতে পার না? এতগুলো পুরুষ মানুষ আছ কি করতে? কেশবরাম কি করে? ঘাস খায়? কেশবরামের বাবা লছমানারায়ণ ছিল তেজী মানুষ। সে এ সব গোলমাল এক ধমকে থামিয়ে দিতে পারত। মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দেয় না কেন?"

লোকটি বললো, 'চাচা, বিয়ের চেষ্টা করা হয়েছিল। সুরজের সে পাত্র পছন্দ হ'ল না।'

'তাজ্জব!' বলে চন্দন মাথা নাড়ল। তারপর সে ভাবতে বসল কেন চন্দনটা এমন গোঁয়ার আর জেদী হ'ল? মেয়েটাকে তার এত পছন্দ হ'ল কেন? অনেক ভেবে চিন্তে সে ঠিক করল নিশ্চয় তার পুত্রবধূ দুর্গার বাপ বা ভাইদের কাছ থেকে চন্দন এইসব দোষ পেয়েছে। সবাই জানে ছেলেরা মামাদের মতো হয়। তার মনে হ'ল দুর্গার পাটোয়ারী ভাই দুটো যেমন কুটিল তেমনই ধূর্ত দেখতে। সে বিড়বিড় ক'রে বলল, 'দাঁড়া, তোর বিষদাঁত আমি ভাঙছি। পুরুষ মানুষ কাজ কর্ম করবি, কাজের মধ্যে ভাল থাকবি। তোর মা দুধ ক্ষীর খাইয়ে তোকে ননীগোপালটি বানিয়েছে।'

গ্রামের লোকটিকে সে বলল, 'কেশবরামটা একটা গাধা। ওর মামা লছমীনারায়ণ থাকলে যেমন ক'রে হোক অনন্ত-র বৌটাকে শায়েস্তা করত। হাবিলদার শোভালালের কথা আমার মনে আছে ত! যমুনা পার হবার সময়ে সে যে নৌকায় উঠেছিল তাতে এক ভিস্তিও ছিল। সেই খবর পেয়ে লছমীনারায়ণ বলল—'আরে সত্যনাশ হো গিয়া, ধর্মনাশ হো গিয়া! অনেক টাকা খরচ করতে হ'ল শোভালালকে। প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তবে সে জাতে উঠেছিল। অনন্ত-র বৌ-টাকে তেমনি একটা ছুতো ক'রে জব্দ করা যায় না?'

গ্রামের লোকটি বলল—'কাকা, অনন্ত-র বৌটার রূপ আছে কি না! সুন্দর মুখের জোরে ও সকলকে উপেক্ষা করে।'

'রূপ নিয়ে কি করবে? বৌ-টা ত' পোড়াকপালী।'

'বৌ-টা নয়, মেয়েটা। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাপের বংশের সব মরে গেল।'

'যা বলেচ, মেয়েটাই বজ্জাত।' একটু চুপ ক'রে থেকে চন্দন প্রশ্ন করল, 'মেয়েটা কি মা-র মতো সুন্দর হয়েছে?'

'না না, সে রঙ-ই পায়নি!'

তবে কি দেখে ভুলল চন্দন! চন্দন আবার ভাবতে চেষ্টা করে। অনেক ভেবে কোন হদিশ না পেয়ে বলল হয়তো ছেলেটার দোষ নেই। গ্রামে একটুতেই যা কথা ওঠে! তা তুমি গিয়ে পাঠিয়ে দিতে ব'লো ওকে। ওর বাপ যেন ওকে নিয়ে আসে।'

'আসতে অনেক খরচ কাকা। প্রতাপ কি আসবে?'

'খরচ করেই আসবে। প্রতাপটার স্বভাব বেণেদের মতো। দুটো টাকা খরচ করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।'

প্রতাপ এল না। চন্দনই এল। চন্দনকে দেখে চম্মন মনে মনে খুশী হ'ল। না। বাপের মতো চেহারা হয় নি। চম্মনের নিজের মতোই হয়েছে। চম্মনের থেকে মাথায় লম্বা। শক্ত সমর্থ চেহারা। সবে গোঁফ উঠেছে। চাল-চলন ও চাউনী কেমন যেন বে-পরোয়া, দুর্বিনীত।

চম্মন তার প্রণাম করবার ভঙ্গী দেখেই চটে গেল, 'আরে হতভাগা, বুড়োদের সম্মান জানাতে হয় কেমন ক'রে তা জানিস না? তোর মা শেখায়নি?'

তারপর তাকে বকতে শুরু করল, 'হতভাগা ছেলে, কাজকর্ম ছেড়ে বদমায়েসী করতে শিখেছ? বাপ দাদার নাম ডোবাতে বসেছ? তোমার কি বিয়ে করবার বয়স হয়েছে? না শখ গিয়েছে এই বয়সে বিয়ে ক'রে চাষী হতে? ছি ছি, তোমাকে দেখে আমার লজ্জা করছে।'

কিছুক্ষণ শুনে চন্দন বিরক্ত হয়ে বলল, 'তবে তুমি বকবক কর। বাজে কথা বল। আমি চললাম।'

'চললাম! কোথায় যাবি তুই?'

'যে দিকে দু'চোখ যায়। তিরিশ মাইল হেঁটে এসেছি দু'দিনে, পেটে দানাটুকু-ও পড়েনি, তোমার বকবকানি শুরু হ'ল!'

চম্মন থেমে গেল। তারপর নিজের অপ্রতিভতা ঢাকতে খুব চড়া গলায় বলল, 'ঐ ঝর্ণা আছে, তাতে হাত মুখ ধুয়ে এসে একটু দুধ-মিষ্টি খেয়ে আমাকে কৃতার্থ কর। ঝর্ণার ভেতরে নেম না। গর্ত আছে!'

চন্দন চলে গেল। সাফাখানার রান্নাঘর আর কাঠ রাখবার চালাটার পেছনে একটু ঢালুতে ঝর্নাটা। এখান থেকে কুলগাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বয়ে শ'খানেক হাত গিয়ে গেটলা নদীতে পড়েছে। নদীর কাছে আরো ভীষণ কাঁটাঝোপ। যেতে হলে বনের ভেতর দিয়ে আধমাইল দূরে যাওয়াই শ্রেয়। সেখানে নদীটা একটু চওড়া হয়েছে। দু'পাশে তীরভূমি-ও পরিষ্কার।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, চন্দন তবু আসে না দেখে চম্মন উদ্বিগ্ন

হ'ল। সে রান্নাঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকবে, না নিজেই নেমে যাবে তাই ভাবছে, এমন সময়ে চন্দন চিৎকার ক'রে ডাকল, 'দাদা!' ডাকটার শেষ রেশ আ—আ—আ ক'রে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে গেল। চম্মন 'কি হ'ল?'—বলে তাড়াতাড়ি নেমে গেল। তার বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। কি হ'ল! ডুবে গেল গর্তে! কেন বকতে গেলাম, কেন সঙ্গে গেলাম না, বিড়বিড় করতে করতে হাঁপাতে হাঁপাতে চম্মন পৌঁছল।

ঝর্ণাটা মাঝখানে বেশ চওড়া। চন্দন সেইখানে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'একটা কাছিম আমার কাপড় কামড়ে ধরেছে। ছাড়াতে পারছি না।'

'জলে কাছিম নেই।'

'তবে কি? আমি ধরতে যাচ্ছি, শক্ত ঠেকছে হাতে?'

'কত বড?'

'বেশ বড়।'

'তু—ই সাঁতরে আয় না!'

'টানছে যে!'

'জল কত? তুই মাটি পাচ্ছিস?'

'পাচ্ছি!'

'কাপড়ের খুঁট ছিঁড়ে ফেল!'

'পায়ের তলে পাথর যে, পিছলে যাচ্ছে!'

'কি ওটা? তোকে কামড়াচ্ছে?'

'অল্প অল্প।'

'নামতে গিয়েছিলি কেন হতভাগা?'

'দাদা, সাঁতার দিয়ে কতদূর যাওয়া যাবে?'

'যেতে পারবি না। একটু বাদেই খাদের দিকে নামছে জল। শব্দ পাচ্ছিস না?'

'না। কানে জল ঢুকেছে।'

'হারামজাদা, সাত শয়তানের এক শয়তান' বলে গালি দিয়ে উদ্বিগ্ন চম্মন নিজেও লাফাতে যাবে এমন সময়ে চন্দন 'ধরেছি ধরেছি' ব'লে চেঁচিয়ে পাড়ের দিকে এসে পড়ল।

বেশ বড় একটা মহাশোল মাছ। চম্মন মালীটাকে ডাকল। মালী

এল, কাঠ বেচতে এসেছিল যে মেয়েটা সে-ও বললে খুব বুড়ো মাছ, দেখছ না গায়ে শ্যাওলা হয়ে গেছে কতখানি!'

মাছ ধরবার হৈ চৈ-এ সেদিনকার মতো চন্দনকে শাসন করবার প্রসঙ্গটা ভুলল চম্মন। পরদিন চন্দন বলল, 'আমাকে বন্দুকটা সাফ করতে দাও। আমি শিখব।'

ক'দিন বাদে বলল, 'কবে আমাকে নিয়ে যাবে সাহেবের কাছে! কবে আমি রিসালায় ঢুকব?'

চম্মন ছুরি দিয়ে গাছের ডাল চেঁছে মাছের জাল বাঁধবার একটা ফ্রেম তৈরী করছিল। তার মুখটা একটু সরু দেখাচ্ছিল, জিভের ডগাটা একটু দেখা যাচ্ছিল! চোখটাকে কুঁচকে ডালটার দিকে নিবিষ্ট করে রেখেছিল চম্মন। চোখ না তুলে সে বলল, 'রিসালায় গেলে তিনশো টাকা লাগবে! তা ছাড়া ঢুকলে আর বেরুতে পারবি না।'

'তাতে কি?'

'তোর বাপ-মা তোকে ছেড়ে দেবে?'

'তুমি বললে দেবে।'

'হুঁ, আমার কথায় তোর বাবা তোকে ছেড়ে দেবে?'

'দেবে। তোমাকে বাবা ভয় করে।'

'তুই করিস্ না?'

চন্দন কিছু না বলে জাল বানাবার সুতোটা ধরে পাকাতে লাগল। চম্মন মুখ না তুলেই বলল, 'রিসালায় ঢুকতে হলে আঠারো বিশ বছর বয়স হওয়া দরকার। তুই রং-রুট হতে পারিস! সিপাহী হতে পারিস্।'

'তাই হব। আমি গ্রামে যাব না।'

'কেন?' মনে মনে চম্মন খুব খুসী হয়েছে।

'গ্রাম ভাল লাগে না। কিছু করবার নেই।'

'বেশ তোকে সিপাহী বানিয়ে দেব আমি। তবে শীতকালটা কেটে যাক। তার আগে নামতে পারব না। শীতকালে নৈনীতাল থেকে সাহেব মেমরা নেমে আসবে।'

'গরম কালে?'

'গরম কালে তারা নৈনীতাল চলে যাবে। গরম কালে কেদারবদরীতে কত যাত্রী যাবে, তারাও সামনের রাস্তা দিয়ে যাবে দেখবি।'

'গরম কালে আমায় নিয়ে যাবে দাদা !'

এতক্ষণে চম্মন মুখ তুলল। বলল, 'নিয়ে যাব। যদি তুই ভাল হয়ে থাকিস তবে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। কিন্তু আমায় তুই কথা দে তুই তোর চাল-চলন ভাল করবি।'

চন্দন তার দিকে তাকাল না। আস্তে বলল, 'আমি কি করেছি এখনো তাই বুঝলাম না। কিন্তু বাবা মা দুজনেই ধরে নিয়েছে আমি মস্ত দোষ করেছি। বাবা নিজে কিছু বোঝে না। মা যা বলে তাই বিশ্বাস করে। মা নিজের সংসার ছাড়া, নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। তুমিও দেখছি কিছুই বুঝতে চাও না। তোমাদের দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। আমার কিছুই বলবার নেই।'

চম্মন তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হ'ল চন্দন যেন খুব পরিণত খুব বয়স্ক হয়ে গিয়েছে। গ্রামে একটা সংকীর্ণ পরিবেশে বয়স্কদের সান্নিধ্যে বড় হয়েছে বলে চন্দন এইরকম অকালে বয়স্কতা পেয়েছে না কি? ভাবল সে।

চন্দন চম্মনের ছুরিটা তুলে নিয়ে হাতে একটু ঘোরাতে থাকে। ছুরির ফলায় রোদ পড়ছে, আলো ঝল্কে উঠছে, আবার আলোটা সরে যাচ্ছে। চন্দন নিজের চোখটা হাত দিয়ে সেই আলো থেকে আড়াল ক'রে বলল, 'আমার দেখে দেখে আশ্চর্য লেগেছে। চম্পার মা আমাদের বাড়ীতে সারাদিন দুধ, ঘি জ্বাল দেয়। মা-র সংসারে কত জিনিস পচে যায়। মা ওদের হাতে কোনদিন এতটুকু ঘি, মিষ্টি বা দুধ তুলে দিতে পারে না। শীতের সকালে চম্পা তার মা-র সঙ্গে ছেঁড়া কাপড় পরে আসে। শীতে ঠকঠক ক'রে কেঁপে বাসন মাজে। বড় বড় ঝুড়ি, পরাত, চৌকি ধোয়। মা কোনদিন, এমন কি পরব-পূজোর দিনেও ওদের একখানা নতুন কাপড় বা গরম চাদর দিতে পারে না। আমাদের ঘরে কত গরম চাদর কাপড় পোকায় কেটে দেয়। তা ছাড়া, গরীব বলেই বোধ হয়, ওদের কোন আত্মসম্মান আছে তা কেউ ভাবে না। সবাই ওদের উপদেশ দেয়, ওদের নিয়ে কথা বলে। আমার দেখে দেখে খুব আশ্চর্য লাগে। 'তুমি, তুমিও বুড়ো হয়ে যাচ্ছ। এর-তার মুখে শোনা কথা বিশ্বাস কর, আমাকে যা-তা বল। তুমি বুঝতে পারছ না, মা বাবা-ও বোঝে না, আমি তোমাদের কোন কথারই জবাব দেব না। কেন-না, তোমরা কেউই বুঝবে না, বুঝতে চাও না!'

চন্দন উঠল। চম্মনের তৈরী ফ্রেমটায় জালটা বাঁধল। তারপর সেটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলে গেল।

চম্মন তখনো বসে রইল। সে চিন্তিত হয়েছে। চন্দন তাকে তার নিজের জীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, প্রথম যৌবনের ছোট ছোট বিচ্যুতি নিয়ে তাকেও অনবরত অপমান সহ্য করতে হয়েছে। সেই জন্যেই বোধ হয় মনে মনে তার আত্মীয়পরিজন, একান্ত-আপনদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। সেই জন্যেই বোধ হয় ম্যাকমোহন সাহেবের কাছে গিয়ে তার মনটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছিল। ম্যাকমোহন সাহেব বহু রংরুট, বহু যুবকের বহু বিচ্যুতি সহ্য করেছেন। তিনি তাদের দূরে সরিয়ে দেননি। কাছে টেনে এনে তাদের ভ্রম-প্রমাদ ক্ষমা করেছেন। তিনি বলেন, 'মানুষ যখন দুঃখ পায়, তখন তাকে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। আর পনরো ষোল বছর বয়সের ছেলেদের চট ক'রে শাসন করা উচিত নয়। তাদের অযথা প্রশ্রয় দিতে নেই কিন্তু শাসন করবার সময়ে সত্যিই তারা দোষ করেছে কি না, কি দোষ করেছে, তার গুরুত্ব কতটা, তা বোঝা দরকার।'

চম্মনের সে-সব কথা মনে পড়ল। তার মনে হয় যে-কোন কারণেই হোক, চন্দনের মনে যখন আঘাত লেগেছে, তখন তাকে খোঁচাখুঁচি ক'রে লাভ নেই। চন্দন যে তার বাবা মা-কে আপনজন মনে করতে পারছে না, তার-ও নিশ্চয় কোন কারণ ঘটেছে। চন্দন যে তাকেও বিশ্বাস করতে পারছে না, তাতে সে আশংকিত হয়। সে নিজেকেই 'নির্বোধ! বুদ্ধিহীন!'—বলল তারপর উঠে চন্দনের খোঁজে গেল।

চন্দন নদীর ধারে চওড়া একটা পাথরের ওপর উপুড় হয়ে শুয়েছিল। পাথরটা খুব মসৃণ এবং প্রশস্ত। এর ওপর আছড়ে মেয়েরা কাপড় কাচে। পাথরের খাঁজে খাঁজে ক্ষার গোলা জল আটকে আছে। তাতে রোদ পড়ছে এবং রামধনুর মতো রঙের আভা দেখা যাচ্ছে। চন্দন জলের ভেতর একটা ডাল নাড়াচ্ছিল। জল তরতর ক'রে বইছিল। চম্মন এসে তার পাশে বসল। চকমকি পাথর ঠুকে কাঁচাপাতার বিড়িটা ধরায়। তারপর বলে, 'শোন, রাণীবাগে একজন মুন্সীজী আছেন। তাঁর কাছে তুই ভাল ক'রে লিখতে পড়তে শিখে নে। কাঠগোলার হিসেব আমি রাখতে পারি না। সব বুঝি না। লেখাপড়া শিখলে মানুষের সম্মান বাড়ে। আমি মূর্খ, বেশী পড়লাম

না, শিখলাম না। আমার মতো সিপাহীরা সবাই মূর্খ। তুই ভাল ক'রে লিখতে পড়তে শিখলে ভাল কাজ পাবি। আমার মতো বোকা কেন হবি তুই? আমাদের ঘরে খাবার পরবার অভাব নেই। কোম্পানীর ফৌজে আমাদেরই ভাল ভাল কাজ হতে পারে। আর ভাল কাজ না করলে সম্মান নেই। সিপাহী থেকে হাবিলদার হতেই জীবন কেটে যায়, আর সে জীবনেও সম্মান নেই।'

হলদোয়ানির সাফাখানার শান্ত, সুন্দর পরিবেশে চন্দনের কিছুদিন কেটে গেল। শীত পড়লে নৈনীতালে বরফ পড়ে। পৌষ ও মাঘের শীতে হলদোয়ানিতে জলের ওপর কঠিন বরফের আস্তরণ পড়ে। গাছের পাতায় শিশির সাদা তুষারবিন্দু হয়ে জমে থাকে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় অজস্র মুক্তো ছড়িয়ে আছে।

রানীবাগের মুন্সীজী বৃদ্ধ সৌম্য দর্শন মানুষ। তিনি মাঝে মাঝে হলদোয়ানিতে সাফাখানায় আসেন। হলদোয়ানির ছোট গ্রামটিতে তাঁর কিছু জমি আছে। আগে রেভিনিউ-বিভাগে কাজ করেছেন। এখনো পেনসন পান। তিনি এই ভাবারের বনভূমি সম্পর্কে আশ্চর্য সব কথা বলেন। হিমালয় পাহাড় নাকি দেবতাদের বাসভূমি। ভাবারের এই বনভূমি— কোশী, মণ্ডল, রামগঙ্গা, গৌলা, সারদা এই সব নদী, এ সব নাকি অতি পবিত্র। এখানে বনভূমির গহনে, পাহাড়ের গুহায় সাধক পুরুষরা বাস করেন। তাঁদের জ্যোতির্ময় দেহ, অনায়াসে তাঁরা আকাশ-পথে যেতে পারেন, মাটির মানুষ যে সব প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তাঁদের ওপর সেগুলি কোন কাজই করে না।

শত শত বছর ধরে এই সব অঞ্চল থেকে যাত্রীরা কেদারনাথ বদ্রীনাথ দর্শনে যান। তাঁদের পুণ্যে-ও এই বন-অঞ্চল পবিত্র। রাতে দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে জ্যোতিঃশিখা দেখা যায়, সেগুলি সিদ্ধ সাধক পুরুষদের তপস্যার আলো। রাতে এখানে বনে বনে বীণা-ধ্বনি শোনা যায়, কেন না এই অঞ্চল গন্ধর্ব ও কিন্নরদের বাসভূমি। তাঁরা রাতে এখানে এসে নৃত্য গীত করেন। শীতের সময়ে যখন বনভূমিতে কেউ আসে না, তখন তাঁরা এই সব নদীতে স্নান করেন। সকালে নদীর জলে ঈষৎ সুগন্ধের স্পর্শ লেগে থাকে যেন তাঁদেরই দিব্য দেহের গন্ধ।

তিনি বলেন, 'মুনি ঋষি যোগী সন্ন্যাসীর বাস সেখানে। হিমালয় স্বয়ং মহাদেবের আবাস, আমি জানি, এই জঙ্গলের গভীরে নির্জন গহনে আমি গিয়েছি। আমিই এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।'

'কি হয়েছিল বলুন।' চন্দন তাঁর কথায় আকৃষ্ট হয়। তার মনের সামনে এই বনভূমির নতুন এক রূপ প্রতিভাত হয়েছে। মুন্সীজি একটু হেসেছেন। বলেছেন, 'সব কথা বলতে নেই। তবে যদি কেউ সাহস ক'রে যেতে পারে, বনের গভীরে খুব গহনে, আর একা থাকতে পারে ধুনী জ্বেলে এই শীতকালে, তবে সে নিশ্চয় দেখতে পাবে। বাজনার শব্দ, মন্ত্রের শব্দ শুনতে পাবে। পাহাড়ের ধারে আকাশে জ্যোতিঃশিখা দেখতে পাবে। জলের সুগন্ধ, এবং বনভূমি থেকে ধূপের সুরভি দুই-ই সে অনুভব করবে।'

চন্দনের নবজাগ্রত চেতনার মূলে মুন্সীজীর কথাগুলি এক আশ্চর্য রহস্যের অঞ্জন লাগিয়ে দিল।

শীত যখন প্রখর হ'ল, পথে যখন মানুষ চলে না, সকালে তুষারের হাল্কা আবরণে চারিদিক পবিত্র এবং গম্ভীর দেখায়। তখন মাঝে মাঝে চন্দন এই সব কথাগুলি ভেবেছে। তখন শীতের এবং বুনো জন্তুর ভয়ে ঘরে আগুন জ্বালতে হয় সারারাত। রাতে মস্ত বড় তামার চুল্লীতে আগুন জ্বলে। আগুনের তাপে তামাটা গনগনে লাল হয়ে ওঠে। কাঁচের দরজার বাইরে আকাশ দেখা যায়। যখন রাত বেড়েছে, যখন চমন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন মুন্সীজীর হাতে লিখে দেওয়া রামায়ণ পুঁথিটা বন্ধ ক'রে চন্দন দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে বনভূমি গম্ভীর। মৌন, প্রশান্ত। কোন জীবজন্তু, কোন প্রাণীর সাড়া নেই। আকাশে নক্ষত্রের দিকে চেয়ে চন্দন ভেবেছে এই রকম রাতে, ঐ অরণ্যের গহনে, আর একটা আশ্চর্য, অলৌকিক জীবন তা হলে জেগে ওঠে? সেখানে জ্যোতির্দেহ ধারণ ক'রে দেবতারা এবং সিদ্ধ সাধকরা আকাশ-পথে ভ্রমণ করেন? গন্ধর্ব এবং কিন্নর নরনারী রাতে বীণাধ্বনি সহযোগে নৃত্য গীত করেন? প্রভাতে বনভূমিতে মৃদু মৃদু ধূপগন্ধী বাতাস বয়? চন্দন নিশ্চয় একদিন ঐ বনের গভীরে যাবে।

ছয়

গ্রামের সকলকে উপেক্ষা ক'রে মেয়ের বিয়ে দেবার সময়ে স্বরজের মনে বেশ সাহস ছিল। কোথা থেকে সাহস পেয়েছিল তা সে-ই জানে। সে ভীরু, গরীব। অনাথা স্বরজের সাহস দেখে গ্রামের সবাই অবাক হয়েছিল।

স্বরজ নিজে বলেছিল, 'দরকার হলে এ গ্রামের বাস তুলে দেব আমি।' কিন্তু তারপরই তাকে রূঢ় বাস্তবকে স্বীকার করতে হ'ল। এ গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও সে যেতে পারবে না। এ গ্রাম ছাড়া অন্য কোথাও তার জায়গা নেই।

মেয়ের বিয়ে নিয়ে তাকে বার বার আঘাত পেতে হ'ল। যতবার যত জায়গায় সে চেষ্টা করল বিয়ে ভেঙে গেল। অনেক কলঙ্ক ইতিমধ্যেই রটে গেছে। যে মেয়ের বিয়ে ভেঙে যায়, যার জন্যে ঘরের ছেলেকে ঘর ছাড়তে হয় তার বিয়ে দেওয়া বড় কঠিন।

প্রতাপের বউ দুর্গা-ই শত কথা বলতে লাগল। চম্পার জন্যে তার ছেলেকে বিদেশে যেতে হয়েছে এ কথা সে ভুলতে পারে নি। ঘরে তার মন বসে না। ছেলের জন্যে দুঃখ উথলে ওঠে। সে কেঁদে বলে, 'শূন্য ঘরের দিকে আমি চাইতে পারি না। ঐ সর্বনাশী বাপকে খেয়ে নিজের বাড়ী ছারখার ক'রে আমার ছেলেটাকে বিষনজর দিলে। ভগবান ওকে কেন শাস্তি দাও না!'

স্বরজ দেখতে পেল তাকে কেউ একঘরে না করলেও গ্রাম-সমাজের সংকীর্ণ দরজাগুলো একটা একটা ক'রে তার সামনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দুর্গার বাড়ীর কুয়োতে সে জল আনতে যেতে পারে না। দুর্গা তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেয় না। স্বরজ এ-বাড়ী ও-বাড়ী কাজ চেয়ে চেয়ে ফেরে। শীতের দিনে, সন্ধে হলে স্বরজ চম্পাকে নিয়ে নদীর ওপারে যায়। সন্ধে হলে বাঘের ভয় আছে। কিন্তু ভয় করলে তার চলে না। নদীর ওপারে বুনো কুলের জঙ্গল। মা আর মেয়ে ঝুড়ি ভরে কুল তুলে আনে। কৌশল্যার নাতিটা সেই কুল বাজারে বেচে আসে। কোনদিন একটা ঢেবুয়া পয়সা পায়। কোনদিন বা ঝুড়ি এনে রেখে দেয়। বলে 'কেউ নিল না।' ধীরে ধীরে স্বরজ স্বাস্থ্য হারায়, লাবণ্য হারায়।

চম্পার বয়স বাড়ে। সুরজ যত তার দিকে চায় তত তার বুকটা শুকিয়ে ওঠে। মেয়েকে আজকাল সে কথায় কথায় গালি দেয়। বলে, 'তোর জন্যে আমি নরকে যাব।'

চম্পার দুঃখ হয়। সে বলে, 'বেশ। কাজে যা তুই। কাজ থেকে এসে দেখবি আমি জলে ডুবে মরে আছি।'

সুরজ গ্রামের অন্য প্রান্তে লালাদের বাড়ী যায়। লালা বৈজনাথের অনেক বৈভব। লালার মা এখনও জীবিত। তারই সম্পত্তি, তার নামেই কারবার। লালার মা-র কাছে সুরজ কাজ করে। উঠোন নিকিয়ে দেয়, ডাল ঝাড়ে, চাল ঝাড়ে। মস্ত যাঁতায় ডাল ভাঙতে বুকের ভেতরটা ব্যথা করে, চোখের সামনে আঁধার দেখে। লালার বৌ-টি মানুষ ভাল। তার অনেকগুলি ছেলে মেয়ে। সে নিজে গরিবের মেয়ে। গরিবের দুঃখ সে বোঝে। শাশুড়ীকে লুকিয়ে সে সুরজকে কাপড়টা জামাটা দেয়। কখনও ঝিকে দিয়ে সিধে পাঠিয়ে দেয়। বলে, 'ছেলের অসুখের জন্যে মানত করেছিলাম বোন'। কখনো ব্রতপূজো ক'রে সুরজ আর চম্পাকে ডাকে। কাছে বসিয়ে খাওয়ায়। বলে, 'চম্পা এই কাপড়টা পরিস। সখ ক'রে কিনেছিলাম। আট আনা নিয়েছিল। তা এমন গোলাপী শাড়ি আমাকে মানায় না।' কোনদিন বা বলে, 'সুরজ বোন, আজ আমার মাথাটা বেসম দিয়ে দেবে? একলা পারি না।' পুকুর ঘাটে বসে সে নিজেই সুরজের মাথায় বেসন মাখায়, তেল দেয়। সুরজের ঘাড় গলা বেসন দিয়ে ঘসে দেয়। স্নানের পর সুরজ যখন কাচা কাপড়টা পরে একপিঠ চুল মেলে দেয়, সে বলে, 'কেমন রাণীর মতো দেখাচ্ছে। এমন চেহারা তোমার, তবু ত এতটুকু যত্ন কর না।'

সুরজ বলে, 'যত্ন করব বোন, যেদিন চিতায় উঠব।'

'ছি! অমন কথা কি বলে?'

সুরজ একটু ম্লান হেসে বলে, 'যেদিন পাঁচ জন আমার সব দোষ ভুলে আমায় একখানা নতুন কাপড় পরাবে, আমাকে ঘি মাখাবে, হলুদ দেবে, সেদিন আমি যত্ন পাব। যতদিন বেঁচে থাকব, তুমি ছাড়া কেউ দেখবে না।'

এই কথাগুলো সুরজ আজকাল প্রায়ই বলে। এক একদিন বুকের ব্যথায় হেঁটে আসতে পারে না। পথের ধারে একবার বসে, একবার গাছটা ধ'রে, দেওয়ালটা ধ'রে দাঁড়ায়। কোনমতে ঘরে পৌঁছে মাটিতে শুয়ে পড়ে। চম্পা তখন কাঁদে।

বলে, 'কাজ ছেড়ে দে মা! কাজ করিস

'না খেয়ে মরবি?'

'কাজ করলে তুই মরে যাবি মা!'

'মরতে আর বাকি কি বল?'

'আমায় যেতে দে কাজে!'

'তোকে ওরা ঢুকতে দেবে না। বলবে…' চম্পাকে জড়িয়ে সুরজ খুব কাঁদে। কেঁদে কেঁদে বুকটা হাল্কা হয়। মা মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল বেলা চম্পার ঘুম ভাঙে না। ঘুম থেকে উঠে দেখে মা কাজে গেছে। চম্পা কৌশল্যার নাতীটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চম্পা লালাদের ক্ষেতে যায়। লালাদের চৌকিদার চম্পার চেনা মানুষ। ছোটবেলা থেকে দেখেছে। চম্পা তাকে বলে, 'কাকা, ক্ষেত ঝাড়ু দিয়ে মকাই নেব?' চৌকিদার বলে, 'চম্পা, মালিক খেতে গেছে। বিকেলে আসবে। তুই যেন সব নিস না।' তাহলে ধরে ফেলবে। মকাই সব তুলে নিয়ে গেছে চাষীরা। ভাঙা, আধভাঙা, জমিতে নষ্ট করা মকাইগুলো পড়ে আছে। চম্পা তাই তুলতে থাকে। তোলে আর ভয়ে ভয়ে চায়। কে দেখবে, কে ধরে ফেলবে।

বাড়ী ফিরে সুরজ দেখে মেয়ে হেসে হেসে মকাই পোড়াচ্ছে কৌশল্যার নাতির সঙ্গে। মা-কে দেখে সে হেসে মা-কে জড়িয়ে ধরে। বলে 'মা, বড় খিদে পেয়েছিল মা। কাকাকে বলে তুলে এনেছি।'

'তোকে চোর বলে ধরুক ওরা। ধরে মারুক! তার চেয়ে তুই মরিস না কেন?' চম্পা আরো হাসে। বলে, 'কেমন করে মরব মা? নদীতে পা দিয়ে দেখলাম ডুব জল-ও নেই। কেমন ক'রে মরব বল্? তার চেয়ে তুই আমায় কাজে যেতে দে!'

'হতভাগী তোর কাজ কেউ নেবে না।'

এক একদিন বসে চম্পা ভাবে: তার কাজ কেউ নেবে না। সে হতভাগ্য। সে যদি বাসন মাজে ত সেই বাসনে খেলে মানুষের অসুখ হবে। সে যদি ঘর নিকিয়ে দেয়, ত' সেই ঘরে আগুন লাগবে। যদি জল এনে দেয়, ত' সেই জলে স্নান করলে মানুষ মরে যাবে। সবই তার খারাপ! তখন তার মনে হয় চন্দন বোধ হয় তাকে ভালবাসত। চন্দন তাকে চুরি ক'রে জিনিস এনে খাওয়াত। চন্দন তার সঙ্গে খেলত। চন্দন তার হাতের

জল খেত। সে আলুর শাক ভাজলে চন্দন আনন্দ ক'রে খেত। চন্দন কখনো তাকে এড়িয়ে চলত না।

সে যদি দুর্গার কাছে যায়? কতদিন হ'ল চলে গেছে চন্দন! চার বছর হয়ে গেল। দুর্গা আর প্রতাপ গিয়ে চন্দনকে দেখে এসেছে। সে যদি দুর্গাকে বলে, 'চন্দন ভাল আছে চাচী? সে কত বড় হয়েছে? সে কি আমার কথা একবারও জানতে চেয়েছিল?'

কেমন করেই বা জানতে চাইবে। জানতে চাইলেও ত' দুর্গা তাকে বলবে না। জানতে চাইবেই বা কেন? চম্পা কে? চম্পা ত' একটা গরিব বাগদি মেয়ে। চম্পা গ্রামে আছে বলেই হয়ত' দুর্গা তাকে আসতে দেয় না। দুর্গার যে অনেক টাকা। টাকার জোরে সে হয় ত' খুব ভাল একটা বৌ আনবে চন্দনের জন্যে। আলো জালিয়ে, বাজনা বাজিয়ে কত ধুমধাম করবে। চম্পার মনটা খারাপ হয়ে যায়।

চম্পা সেদিন আর মকাই চুরি করতে যায় না। নদীর ধারে বট গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। নদী পেরিয়ে যে পথটা উত্তর দিকে এগিয়ে গেছে সেই পথেই একদিন চলে গেছে চন্দন। হয় তো একদিন সে আসবে। কিন্তু চম্পাকে আর মনে রাখবে না। একটু মুখ ফিরিয়ে একবার চেয়ে দেখবে না।

নিজের দুঃখে নিজেই কাঁদে চম্পা। ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যায়। আকাশে তারা ওঠে। চম্পা সচকিত হয়ে ঘরের দিকে ফেরে। ঘরে ফিরতে হঠাৎ মনে হয় ঝোপের ওপাশ থেকে যেন কোন কচি ছেলে 'ওঙা ওঙা' করে কাদছে। মা গো! ওখানেই ত' সদ্যোজাত মৃত শিশুদের পুঁতে ফেলে সবাই। কত প্রবাদই যে আছে! অমনি কেঁদে কেঁদে কাছে ডেকে পথচারীকে ওরা মেরে ফেলে। চম্পা তাড়াতাড়ি চলে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে চন্দন বলেছিল, শীতের একরকম পাখী আছে, ও তাদের ডাক। হয়ত' তাই, হয়ত' অন্য কিছু। সে কোন দিকে না চেয়ে রাম-সীতাকে ডাকতে ডাকতে বাড়ী আসে।

বাড়ী এসে অবাক হয়ে যায়। তার মা আজ রান্না চড়িয়েছে। তার মা তবে লালাদের বাড়ী থেকে রুটি আর শাক নিয়ে আসেনি। লালার বৌ তবে সিধে পাঠিয়েছে? চম্পার মনটা খুশী হয়ে যায়। তাদের বাড়ীতে উনোন ধরিয়ে রান্না করাটা এমন কালে ভদ্রে হয় যে মা উনোনে আগুন

দিলেই চম্পার মনে হয়, আজ খুব বিশেষ একটা উৎসবের দিন। সে বাড়ী এসে মা-র কাছে বসে পড়ে। বলে, 'কি দিয়েছে মা লালার বৌ? ওঃ, মুগের ডাল, আলু, ঘি, চাল! মা আজ শুধু ভাত আর আলুর ভর্তা বানা। ডালটা আমরা কাল খাব, কেমন?'

সুরজের মুখটা-ও খুসী দেখায়। সুরজ বলে, 'লালার বৌ বলেছে, এখন থেকে রোজ সিধা দেবে। রোজ রান্না ক'রে খাব আমরা।'

চম্পা মা-র কাছে বসে। বলে, 'মা, সেই গল্পটা বল না? সেই তোর কাকার ছেলেকে কুমীরে নিয়েছিল?'

সুরজ উনোনে কাঠ ঠেলে দিয়ে বলে, 'আমার চেয়ে এক বছরের ছোট ছিল সে। আমার কাকী বড় পরিষ্কার মানুষ ছিল। আমাদের নাওয়াত, হাত ধোয়াত বারবার। সেদিন আমি আর গোপাল বসে খেলছিলাম। গোপাল হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। বলল, 'দিদি, তুই আমার পুতুলটা দিসি ত? আমি সেদিকে চেয়ে যেন পষ্ট দেখলাম আমায় কুমীরে নিচ্ছে! সবাই খুব হাসল। সবাই বলল—গোপাল, আমাদের গাঁয়ে কি নদী আছে?'

সুরজ ভাতের চাল ছেড়ে দিল হাঁড়িতে। তারপর আলু কুচোতে শুরু ক'রে বলল, 'তার অনেক পরে। আমার তখন বিয়ে হয়েছে। গোপাল তখন বড় হয়েছে। একদিন কাকা আমায় নিতে আসবে, আমি কাপড় পরেছি, চুল বেঁধেছি। এমন সময় কাকা কাঁদতে কাঁদতে এল, তাকে তোর বাবা, তোর দাদা দু'জনে ধরে আনছে। দেখে আমার বুকটা ফেটে গেল। আমি সব ভুলে ছুটে গেলাম। মা নেই, বাবা নেই, গরিব কাকাই আমায় মানুষ করেছিল। কাকা বলত আমার একটা মেয়ে, দুটো ছেলে। কোন দিন বলেনি—ও আমার মেয়ে নয়! হায় রাম, হায় ভগবান, তাদের কেন এমন ক'রে টেনে নিলে, আমায় কেন অনাথ করলে! সুরজ শেষের কথা ক-টা নিজের মনে বলে একবার নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলতে লাগল, 'শুনলাম গোপাল তার মামার সঙ্গে কোথায় ঢোলপুরে গিয়েছিল। রাজার তালাওয়ে বড় কুমীর আছে সবাই তাকে দেখে, সে-ও দেখছিল। হঠাৎ সে পড়ে যায় আর কুমীর তাকে ধরে! কুমীর ধরে তাকে জলে চুবিয়ে আবার যখন তোলে, তখন গোপাল নাকি দিদিরে! মারে! বাবারে! ব'লে ডেকেছিল। ওঃ! ভাবলে বুকটা ফেটে যায় রে, গোপাল যদি থাকত!

আহা কাকা চলে গেল, কাকী চলে গেল, শুকদেবটা কোথায় বিদেশে চলে গেল। গোপাল থাকলে সে তার দিদিকে ঠিক দেখত! সে তোকে-ও দেখত। সে বলত, 'দিদি, তোর শ্বশুর তোকে আসতে দেয় না, আমি অনেক টাকা রোজগার ক'রে তোকে গাড়ী চড়িয়ে নিয়ে আসব। গোপাল রে! তুই কোথায় গেলি, দেখ, তোর দিদির দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে!'

নিশ্বাস ফেলে স্বরজ ভাত নামাল। চম্পা মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল মা আলু ভাজল, হলুদ, লঙ্কা, লবণ, ঘি আর জল দিল। মা উনোনে কাঠ ঠেলে দিল। ঝোলটা ফুটলে পরে মা তরকারী নামাল। তারপর চম্পার দিকে চেয়ে একটু হেসে পিতলের হাঁড়িতে মুগের ডালও চড়িয়ে দিল।

উনোন নিবে এসেছে। মা মেয়ে খেতে বসল। উনোনের আলোয় ঘরের ভাঙা চাল দেখা যাচ্ছে। শূন্য ঘরের এক কোণে ঘরের ওপর চট পাতা। ঘরের দেওয়ালে পচা একটা মাথাল ঝুলছে। চম্পা খেতে খেতে একবার শীতে পিঠটা কুঁকড়ে বসল। স্বরজ উনোনে আরো ক'টা ডালপালা গুঁজে দিল। বলল, 'হাত পা বেশ ক'রে সেঁকে নিবি, তারপর ভুষির বস্তাটা গায়ে চাপা দিবি, দেখবি কেমন গরম লাগে!'

বাইরে পেঁচা ডেকে উঠল। স্বরজ বিড়বিড় করে বললে, 'দূরে যা-দূরে যা শত্তুরের ঘরে গিয়ে ডাক্!'

দূরে আর কাছে শেয়াল ধুয়া ধরলো। রাত অনেক হয়েছে।

সাত

এ বছর ফসল খুব ভাল হলো। চাষীদের হাতে টাকা এল। ঘরে ঘরে নতুন খড়ের ছাউনী পড়লো। পেটের জ্বালায় হাটে গোরু ছাগল বেচতে এল না মানুষ। বৌয়ের হাত গলা খালি করে রুপোর গয়না কেড়ে নিল না কেউ। তিন বছর বাদে গ্রামে একটা সুখ ও শান্তির নিশ্চিন্ত বাতাস বইছে। তীর্থ দর্শনের কথা শোনা যেতে লাগল।

অভাব অনটনের সময়ে, রোগ শোকের সময়ে কতজন কত প্রার্থনা করেছে। কত মানসিক জানিয়েছে কাশীর বিশ্বনাথ, অম্বরের শিলাদেবী আর পুষ্করের সাবিত্রী দেবীর কাছে। এখন সে-সব কথা মনে পড়তে লাগল। এখন সবাই সঙ্গী সাথী খুঁজতে লাগল। দল ছোট হলে পথে ডাকাতের ভয়। আরো কত বিপদ আছে, লৌকিক এবং অলৌকিক।

আলেয়া পথ ভুলিয়ে পথিকদের বিভ্রান্ত করতে পারে। এমন কি এছেন আশ্চর্য কাণ্ড হতে পারে, যা মানুষ ভাবতে পারে না, অথচ যা সত্যিই ঘটে। সে আশ্চর্য ঘটনার একজন সাক্ষী আজ-ও বেঁচে আছেন। তেওয়ারী-গিন্নীর অতি বৃদ্ধ খুড় শ্বশুর। এখন তাঁর বয়স একশো এক। চুল, ভুরু, বুকের লোম সব পাকা! লোলচর্ম বৃদ্ধ কানেও শোনেন না, চোখেও কম দেখেন। তীর্থে তীর্থে ফল মিষ্টান্ন সব সুখাদ্যই তিনি দান করে এসেছেন দেবতাকে। এখন দিনান্তে একবার দুধ পান করেন। একটি জীর্ণ গীতা কোলে নিয়ে লাল চাদর গায়ে দিয়ে খাটে আধশোয়া হয়ে বসে থাকেন। গ্রামের মানুষ তাঁকে বড় শ্রদ্ধা করে।

যখন তিনি যুবক, তখন একবার তিনি গয়া গিয়েছিলেন পিতৃপক্ষে। রাজগীরের তপ্তকুণ্ডে স্নান করে গয়া যাবার পথে তাঁরা বিখ্যাত বেহুয়া-জঙ্গলের প্রান্তে আশ্রয় নেন। রাত যখন বারোটা, তখন বহু মানুষের কোলাহল ও মন্ত্রোচ্চারণ শুনতে পান। দলছুট হয়ে পেছিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এমন কেউ ছিল না যে এই পথ চেনে। মনে করেন গয়া তাহলে সামনেই। তাঁরা পথ চলতে থাকেন। এগিয়ে এসে সহসা একটি নদী, নদীতীরে উঁচুতে মন্দির, এবং মন্দির ঘিরে পাথরের বাসন, গালার চুড়ির দোকান দেখতে পান। অনেক মানুষ চলছে পথে, অনেক আলো জ্বলছে। একজন পাণ্ডা এগিয়ে এসে বলেন, 'এস, এস।'

সবাই অবাক হয়ে দেখেন বিষ্ণুপাদ মন্দিরে বহু যাত্রী শ্রীবিষ্ণুর পাদচিহ্ন দর্শন করছে। সকাল হয়, তাঁরা-ও সেই পাণ্ডার সঙ্গে পিতৃতর্পণ করতে জলে নামেন। কিন্তু তাঁদের হাতে সেই পিণ্ডের অন্ন অচিরে হাড় ও বিষ্ঠায় পরিণত হয়, ফল্গুর জল সহসা রক্তাভ হয় এবং সেই পাণ্ডা সহসা অট্টহাস্য ক'রে 'দে, আমার হাতে দে' ব'লে শূন্যে লাফিয়ে উঠে আকাশে অবতরণ করে। হাতের পিণ্ড ফেলে দিয়ে রাম ও সীতার নাম ক'রে সকলে সভয়ে চোখ বোঁজেন। তারপর দেখেন কেউ নেই, কিছু নেই। সকালের আলোয় নির্জন বনভূমি এবং প্রান্তর ধূ ধূ করছে।

পরে শুনেছিলেন, আত্মহত্যা ও অপঘাতে মৃতদের যে সব প্রেতাত্মা কোনদিনই পিণ্ড বা তর্পণ পায় না, তারা এই ভাবে অনভিজ্ঞ পথচারীদের বিভ্রান্ত করে। কখনো বিভীষিকা দেখায়। কখনো বা আর্তস্বরে করুণ ক্রন্দন ক'রে ক'রে বলে, ফল্গুর জল আর বালি দিয়ে যা! দয়া কর তোরা। আমরা

আগুনে পুড়ে, জলে ডুবে, বিষপান ক'রে, উদ্বন্ধনে মরেছি। এখন নিরাশ্রয় নিরালম্ব প্রেতযোনি হয়ে কষ্ট পাচ্ছি।' যাত্রীরা তাদের 'যা! যা!' ব'লে তাড়ায়। তখন সেই সব প্রেত হা হা ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

গ্রামের লোকেরা তাই যাত্রী খোঁজে, সাথী খোঁজে। সঙ্গে একজন ধনী ও সম্মানিত লোক থাকলে সুবিধা হয়। এবার তাদের সঙ্গে লালা বৈজনাথের মা যাবেন।

লালার মা সুরজকে ডাকলেন। তিনি সুরজকে বললেন, 'শোন, আমার বয়স হয়েছে। একটি সেবাযত্ন করবার মানুষ সঙ্গে থাকলে আমার সুবিধা হবে। তা ছাড়া তোর মেয়েকে পুষ্কর তীর্থে নিয়ে সাবিত্রীতিলক দিয়ে আনলে বেশ হয়।'

'দাদী, সাবিত্রীতিলক দিলে কি হবে?'

'চম্পার মা, সাবিত্রী মন্দিরের বটগাছের মধ্যে নারায়ণ আছেন। তাঁর সঙ্গে চম্পার বিয়ে হবে। তারপর সাবিত্রীতিলক পরলে তোর মেয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ হয়ে রইল। তোর মেয়ের যদি তারপর বিয়ে হয় তাতে দোষ নেই। ভগবানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, মানুষের মধ্যে ত ভগবানের অংশ আছে—ভগবানের ঘরনী মানুষের ঘর করতে পারে। আর যদি তা না-ই হয়, তবু তোর মেয়ের আইবুড়ো নাম খণ্ডে গেল।'

হাতের হুঁকোয় টান দিয়ে লালার মা বললেন, 'চম্পার বয়স হয়েছে। পাড়ার ওপর এর পর সে নজর দেবে। নিন্দে কলঙ্করও কিছু বাকি নেই। দেখ, এতে কোন দোষ নেই। আমার নিজের মাসীর জন্মকালে কুষ্ঠিতে ছিল বিশ বছর হওয়ার আগে বিয়ে দিলেই মেয়ের বৈধব্য যোগ, পিতৃবংশ নির্বংশ। আমার মাসী তাই বিশ বছর অবধি সাবিত্রী-তিলক পরেছিল। পরে তার বিয়ে হলো, কই কেউ ত নিন্দে করেনি!'

সুরজ ক'দিন ধরে ভাবলো। তারপর বলল, 'তাই হোক দাদী। ওর দিকে চেয়ে আমার বুকটা ব্যথা করে, চিন্তায় চোখে ঘুম আসে না। ওর একটা ব্যবস্থা না হ'লে আমি মরেও শান্তি পাব না।'

চম্পা খুব খুশী হলো।

তীর্থ যাত্রার এখনো দেরী আছে। লালাদের বাড়ী থেকে সে নতুন

জামা কাপড় পেল। তার লালচে চুলগুলোতে তেল পড়লো। ক'দিন ধরে গ্রামে মানুষের আনাগোনা বেড়েছে, চম্পা তাই দেখতে গেল।

কানপুর এবং আকবরপুর থেকে দুটো রাস্তা এসে ডেরাপুরের আগেই মিলিত হয়েছে। তারপর ডেরাপুর হয়ে, সেঙ্গার নদী পেরিয়ে সে পথ আরো দক্ষিণে যমুনা নদী পেরিয়ে কাল্পীর দিকে চলে গেছে। এই পথ চওড়া, ইঁট-পাথরে বাঁধানো। কোম্পানী সরকার ডাকচলাচল, এবং মানুষের যাতায়াতের সুবিধের দিকে চেয়ে পথটিকে চওড়া ক'রে দিয়েছেন। এই কোম্পানী-সড়কে আরো অনেক ছোট বড় পথ এসে মিলেছে। আকবরপুর, ঘাটমপুর, কোরা, কটৌরা, হামীরপুর, হিন্দ্‌কী, ফতেপুর, এইসব গ্রাম ও জনপদ থেকে ছোট-বড় রাস্তা এসে বড় রাস্তাটিতে মিলেছে। এক একটা পথের সঙ্গে কত না ইতিহাস জড়ানো!

চম্পার মনে পড়ে, সে শুনেছে, তার বাবা হাজিপুরের পথে পা দিয়েই নিহত হয়েছিল। বাবা কেন রসুলাবাদের পথে যায়নি? রসুলাবাদের পথ যে গাজী সাহেবের পথ। সে পথে কারো কোন বিপদ হয় না। সে পথে কেউ অপঘাতে মরে না। তার বাবা কি সে কথা জানত না? অনেক, অনেকদিন আগে, রসুলাবাদ আর ডেরাপুরের মধ্যে চোদ্দ মাইল কোন পাকা রাস্তা ছিল না। পথ ছিল কাঁচা। বর্ষাকালে কাদা এবং শীত গ্রীষ্মে ধুলোয় মানুষের পা ডুবে যেত, গরুর গাড়ীর চাকা যেত আটকে।

রসুলাবাদের গাজী সাহেব ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক মহাপুরুষ। তিনি কখনো ধর্ম নিয়ে বড়াই করতেন না। তিনি নিজের ক্ষমতা প্রচার করতেন না। অথচ তাঁর অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। সর্প-দংশন চিকিৎসায় সুনাম ছিল। দূরদূরান্ত থেকে লোক সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাটুলী ক'রে বয়ে আনত। সেই গাজী-সাহেব বৃদ্ধ হলেন। আস্তে আস্তে একদিন রোগশয্যা নিলেন। সবাই বুঝল তিনি আর এ শয্যা ছেড়ে উঠবেন না।

সেই সময়ে ডেরাপুরের মহম্মদ রসুলের একমাত্র ছেলেকে সাপে কাটল। ঘোর বর্ষা নেমেছে। পথে পা চলে না। গাজীসাহেব নিজেই অন্তিম শয্যায়। মহম্মদ রসুল, তার স্ত্রী এবং আর সকলে ছেলেটিকে ঘিরে রইল। ছেলেটা দেহ নীল হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এল।

রাত হলো। সবাই মৃদুগুঞ্জনে কাঁদছে। এমন সময়ে দরজা ঠেলে গাজী সাহেব ঢুকলেন। বললেন, 'মহম্মদ রসুল, আমি চোদ্দ মাইল পথ তোমা

জন্য হেঁটে আসছি, তুমি দরজা বন্ধ করে রেখেছ কেন ?' তাঁর সাদা আলখাল্লার প্রান্ত কাদামাখা। তিনি কোন দিকে না চেয়ে সোজা মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন। তার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বেটা বিছানা ছেড়ে ওঠ। পৃথিবীতে এসে তুই একটা কর্তব্যও করিসনি। তোর জীবন একটা সবুজ মাঠের মতো পড়ে আছে। তুই একটা সৎকাজও করিসনি, তাই সে মাঠে ফসল ফলল না, সে ফসলের দানা, তোর কর্মের ফল কারু ভোগে লাগল না। বেটা, ঈশ্বর তোকে দেহ দিয়েছেন তাঁর কাজ করবার জন্যে। ওঠ। মিথ্যে ঘুমে জড়িয়ে থাকিস না।' আশ্চর্য, ছেলেটি বিছানা থেকে উঠে বসলো। কৃতজ্ঞ পিতামাতা গাজী সাহেবের পা জড়িয়ে ধরল। বলল, 'যাবেন না। আপনি বিশ্রাম করুন।'

'বিশ্রাম করব ? তোর মতো কতলোক আজ আমাকে রসুলাবাদের দরগায় ডাকছে তা জানিস ?'

'পথে যে অন্ধকার। আমি আলো নিয়ে আপনার সঙ্গে যাব।'

'আমি যে পথে যাচ্ছি, তাতে তুই আলো দেখাবি ? সরে যা!' রূঢ় গলায় তাকে ধমক দিয়ে হাজী সাহেব চলে গেলেন।

পরদিন সকালে মহম্মদ রসুল রসুলাবাদের দরগায় পৌঁছল। কোথায় গাজী সাহেব! তিনি আগের দিন সন্ধ্যায় দেহ রক্ষা করেছেন। তাঁর কাফন ঘিরে কত নরনারী আকুল ক্রন্দনে বুক ভাসাচ্ছে। মহম্মদ রসুলও কেঁদে আকুল হ'ল। পরে গাজীসাহেবের স্মৃতিতে এই পথটি সে বানিয়ে দেয়।

এ পথে যে চলে, সে অন্ধকারে ভয় পেলে জ্যোতির্ময় দেহ ধরে গাজীসাহেব তাকে পথ দেখান। এ পথে যাত্রীকে আক্রমণ করলে গাজীসাহেব ডাকাতের হাতকে অচল করে দেন।

চম্পা ভাবে তার বাবা যদি সেদিন এই পথে যেত, তবে কি তার কোন বিপদ হ'ত ? নিশ্চয় নয়।

বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে চম্পা এই সব কথা ভাবে আর পথ দেখে। সেই পথ ধরে একদিন তিনটে বয়াল-গাড়ী এল। বড় বড় চাকা। মস্ত গাড়ী। গাড়ীর ছাউনীতে লাল শালুর ঝালর। বলদগুলির গলায় বড় বড় নীল স্ফটিকের মালা।

বিকেলে কৌশল্যার নাতি ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল প্রতাপের বৌ দুর্গা হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে পরাত-ভরা মিষ্টান্ন বিতরণ করছে

এ-বাড়ী ও-বাড়ী। প্রতিবেশীরা প্রতাপের বাড়ী যাচ্ছে। আলো জ্বালা হচ্ছে, ফরাস পড়ছে উঠোনে। সে বলল, 'প্রতাপ সিংহের বৌ আজ কি রকম যেন হয়ে গেছে। নিজে সে আমার হাতে মিষ্টি তুলে দিল। ছেলে এসেছে ব'লে তার খুব আনন্দ হয়েছে।'

ছু'দিন কি তিন দিন চম্পা চন্দনের আর কোন খবরই পেল না। তারপর দিন সকাল বেলা চন্দন নিজেই এল দেখা করতে। দরজা থেকে ভারী, অপরিচিত গলায় ডাকল, 'সুরজ কাকী! দেখা করতে এসেছি, আমি চন্দন।'

আট

লালাদের বাড়ী থেকে অনেকগুলো ছেঁড়া মেরামতি কাজ দিয়ে গিয়েছিল। চম্পা নিচু হয়ে বসে সেলাই করছিল, চন্দন কথা বলছিল। চন্দন বলছিল, 'জান, তোমাকে প্রথম দেখে আমার মনে হচ্ছিল তুমি আমাকে চিনতে পারবে না।'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাদের ভুলে গিয়েছ।'

'ভুলে যাব কেন?'

চম্পা একটু চুপ ক'রে রইল। চন্দনের দিকে তাকাতে তার কেন যেন লজ্জা করছিল। তারপর সে বলল, 'দেখেছ, জামগাছটা কত বড় হয়েছে!'

'হ্যাঁ। আমিই ত' লাগিয়েছিলাম।'

'মনে আছে, সেদিন দুর্গা কাকী কি বকেছিল? কত বেলায় তোমাকে ধরে নিয়ে গেল আমাদের বাড়ী থেকে?'

'হ্যাঁ। সেদিনই ত' আমার হাতে ইঁট মেরেছিলে?'

'তুমি আমার চুল ছিঁড়ে নিয়েছিলে না?'

'হ্যাঁ। তুমি যে পাখীটা ছেড়ে দিলে?'

'বা! পাখীটা উড়ে গেল আমি কি করব?'

দু'জনেরই কথাই যেন ফুরিয়ে গেল। চম্পা লালসুতো দিয়ে জামার বোতাম বসাতে লাগল। একটু পরে চন্দন বলল, 'তুমি ঝুলনের মেলায় যাবে না?'

'না।'

'কেন ?'

'আমি ত' ক'দিন পরে চলে যাব। লালারা কত কাজ দিয়েছে, এ-গুলো সারতে হবে ত !'

'সন্ধেবেলা একবার যাবে না ?'

'না। সন্ধেবেলা গেলে কারসঙ্গে ফিরব ? মা ছাড়া মেলায় কার সঙ্গে যাব ? লোকে কত কথা বলে, আমার ভাল লাগে না।'

'এ গ্রামের লোকগুলো বড় ছোট। ছোট ছোট কথা নিয়ে ভাবে, ঘোঁট পাকায়।'

'শহরের লোকেরা তা করে না বুঝি ?'

'না।'

ঝুলনের দিন গৈবীনাথের মন্দিরের কাছে গাছে দোলাটাঙিয়ে মুরলী-মনোহরকে বসান হল। মেলা বসল। গ্রামের সবাই সেখানে গেল। অনেকক্ষণ পরে বাঁশী আর ভেঁপুর শব্দ শোনা যায়।

চম্পার একা ভয় ভয় করছিল। মা বাড়ী নেই। কৌশল্যা নাতিকে নিয়ে মেলায়। চম্পা উনোন ধরাতে চেষ্টা করছিল। আগে খেয়াল হয়নি। দুপুরে কাঠকুটো সব ভিজে গিয়েছে। চম্পা ঘরের চালের ভেতর দিক থেকে একগোছা খড় ছিঁড়ে নিল। বাঁশের চোঙা দিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দিতে তবে দপ্ করে আগুন জলে উঠল। কুপীটা ধরিয়ে। উনোনে হাঁড়িটা বসিয়ে সে মুখ ফেরায়। চন্দন একটু হাসল। বলল, 'খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল, জান ?'

'বা! কতক্ষণ এসেছ ? ডাকনি কেন ? এসো, এই চৌকিটাতে বসো।' অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাতে চম্পা অনেকগুলো কথা বলল। তারপর অবাক হয়ে বলল, 'বা! এ কি !'

'তোমার জন্য এনেছি।'

'কত সুন্দর চুড়ি, চন্দন! কোথা থেকে এনেছ ?'

'[illegible]-এর চুড়ি। একে বলে জরির চুড়ি।'

'দাও।'

চুড়িটা একপাশে রেখে চম্পা কাজ করে।

চুপ ক'রে ব'সে থাকা কি অস্বস্তিকর।

'তোমার মা যখন গিয়েছিল, আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল ?' প্রশ্নটা

ক'রে চম্পা হাঁড়িটা নামিয়ে ডালে ফোড়ন দিল। ডালটা বাটিতে ঢেলে ভাত চড়িয়ে দিল। তারপর একটা ভাঙা পাথর বাটিতে তেঁতুল, পুদিনা পাতা, লঙ্কা, নুন, গুড় আর তেল মাখতে লাগল। চন্দন বলল, 'মা আমাকে গালি দিয়ে উঠল।'

চম্পা হাতটা ধু'ল। তারপর ছোট্ট একটা নিশ্বাস পড়লো তার। সে বলল, 'চন্দন, তোমার মা জানলে আবার রাগ করবে।'

'রোজই ত' রাগ করছে, চম্পা!'

'তবে তুমি এস না চন্দন। তুমি জান না, তুমি গ্রামে আসতে না বলে তোমার মা আমাদের নামে কত কথা বলেছে!'

'জানি।'

'আমাদের অনেক লাঞ্ছনা হয়েছে চন্দন। আমাদের ত' টাকা পয়সা নেই। নইলে হয়তো আমরা অন্য কোথাও চলে যেতাম।'

চন্দন আস্তে আস্তে বলল, 'তোমাকে ওরা মিছেমিছি, একেবারে শুধু শুধু এতদিন ধরে দোষ দিয়েছে।'

'মিথ্যে নয়, আমার ভাগ্য বড় খারাপ।'

'আমি বলছি সে-সব কথা মিথ্যে। সুখে তোমারও অধিকার আছে' তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর।'

হঠাৎ ভয় পেল চম্পা। হঠাৎ সে কাঁপতে লাগল। সে বলল, 'এ সব কথা তুমি বল না চন্দন। তুমি যাও! ইস্. কত রাত হয়ে গেছে। তুমি জান না, জানতে পারলে আমাদের আবার সবাই কত অপমান করবে। হয়তো এবার লাল্লাদের বাড়ী কাজ করতে দেবে না ওরা। মা আর কষ্ট করতে পারে না. চন্দন। আবার কোন কথাবার্তা শুনলে মা হয়তো মরেই যাবে। আমি তখন কোথায় যাব? চন্দন তুমি যাও!'

চন্দন শুধু বলল, 'তুমি ভয় পেয়েছ চম্পা!'

'হ্যাঁ চন্দন। আমি ভয় পাচ্ছি। তুমি ত' জান না, তুমি চলে যাবার পর ...'

হঠাৎ চম্পা কেঁদে ফেলল। চন্দন ব্যথিত বিস্ময়ে একবার তাকাল। তারপর কোন কথা না বলে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চম্পা তাড়াতাড়ি চুড়িগুলো ঘরের কোণে গমের ভুষির নিচে রাখল। তারপর

চোখ মুছল। মুখটা আঁচলে ঘষে নিল। কুপীটা কাছে এনে সে আবার জামাটা তুলে নিল হাতে।

চন্দন ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগল। সে চলে যাবার পর তা হলে চম্পাকে অনেক লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। তাদের বাড়ীতে চম্পার মা আর আসতে পায় নি। চার বছর ধরে অনেক কষ্ট পেয়েছে ওরা। ভাঙা খড়ের চাল, নিরাভরণ শূন্য ঘর, কুপীর ধোঁয়া, জঙ্গলের কাঠ-কুটোর আগুন, মাটির হাঁড়ি, চম্পার ছেঁড়া তালি দেওয়া জামা, ঘাগরা, ওড়না! হঠাৎ তার নিজের ওপর ঘৃণা হ'ল চম্পাদের বিরুদ্ধে সকলেই অপরাধ করেছে, কিন্তু সে নিজে-ই যেন সবচেয়ে বড় অপরাধী।

ধীরে ধীরে চন্দন চম্পাদের লাঞ্ছনার ইতিহাস জানতে পারল।

তাকে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে তার দাদা চমন ফিরে গেল। যাবার সময় সে ছেলেকে বলে গেল, 'যদি পার, ওকে ভাল একটি মেয়ে দেখে বিয়ে দাও। ও বড় একরোখা, বড় জেদী। ও রংরুট থেকে সিপাহী হতে পারল না। ড্রিল হাবিলদারের মেজাজ ও সইতে পারল না। ও লেখাপড়া শিখেছে। শহরে কাবকুণ, পেকারের কাজ ও পেতে পারে। করবে কিনা জানি না। তোমরা ওকে বিয়ে দাও। বিয়ে দিলে ওর ঘরে মন বসবে। নইলে ওকে তোমরা ঘরে রাখতে পারবে না।'

চম্পাদের সব কথা জেনে চন্দনের মনটা ব্যথায় বিমূঢ় হয়। সে বুঝতে পারল, চম্পার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার জন্যে সে-ই পরোক্ষে দায়ী। আর আজ, চম্পাকে মন্দিরে নিয়ে তিলক পরিয়ে আনার অর্থ, সারাজীবন চম্পাকে এক নিদারুণ বঞ্চনার মধ্যে রাখা। অথচ এটা যে অন্যায়, মস্ত বড় অন্যায়, তা কেউ বুঝতে চাইছে না।

নদীর ধারে ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে চন্দন ভাবতে লাগল ক'দিন ধরে। কি করতে পারে সে? একদিন দেখল চম্পা নদীর ধারে এসেছে। এক বোঝা জামা কাপড় এনেছে। বোধ হয় লালারা ধুতে দিয়েছে। সে অনেকক্ষণ ধরে বটগাছের গোড়ার পাথরটায় আছড়ে আছড়ে কাপড় কাচল। কাপড়গুলো ঘাসের ওপর মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো ভিজে কাপড় টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। হয়তো শুকিয়ে নিয়ে তবে বাড়ী যাবে। চন্দন সাড়া দিতে সঙ্কোচ বোধ করল।

সে এখানেই আছে জানলে চম্পা হয় ত ভয় পাবে। ওর মুখটা শীর্ণ, চুলগুলো উড়ছে। অনেকক্ষণ বাদে চম্পা কাপড়গুলো তুলল। কাপড়গুলো জড়ো করে রেখে নিচু একটা গাছ থেকে ডাল ভাঙতে লাগল। অনেকগুলো ডাল একসঙ্গে রেখে সে কাপড়গুলো নিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে সে আবার এল। এবার সে একটা দড়ি এনেছে। দড়ি দিয়ে ডালগুলো বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

আর একদিন দেখল চম্পা অনেক বেলায় একটা পিতলের কলসী নিয়ে বাড়ী ফিরছে। চন্দন তাকে দেখে সরে দাঁড়াল। চম্পা একটু হেসে বলল, 'ছোলা নিয়ে যাচ্ছি। জাঁতায় ভেঙে, হামানদিস্তায় কুটে ছাতু বানিয়ে দিতে হবে।' চন্দন কি বলবে ভেবে পেল না।

'মার অসুখ হয়েছে।'

'কি হয়েছে?'

'জ্বর হচ্ছে। কাশিও আছে। হাত পা ফুলে উঠেছে।'

'ওষুধ দিয়েছ?'

'মৌলভী সাহেব বলেছে কবিরাজী বড়ি দিতে।'

'দিয়েছ?'

'কোথায় পাব?'

চম্পা ত্রস্ত গতিতে চলে গেল। চন্দন বাড়ীতে ফিরল। খেতে বসে থালার চারপাশে সাজানো বাটি, তার মার হাতে সোনার বালা দেখতে দেখতে সে বলল, 'মা, চম্পার মার খুব অসুখ। তোমরা কেউ কোন খবর নাও না কেন?'

দুর্গা আজকাল চন্দনকে একটু সমীহ করে।

'আমার সংসার নিয়ে আমি ব্যস্ত, কার খবর নেব?'

'খুব অসুখ শুনলাম।'

'তবে হাকিম ডাকিয়ে ওষুধ খেলেই পারে।' দুর্গা অপ্রসন্নভাবে একটা বাটি এগিয়ে দিল। চন্দন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে খেল। তারপর বলল, 'যাদের কেউ নেই, তাদের একটু দেখতে হয়।'

'তোমার সময় আছে তুমি ও-সব ভাব বাছা। আমার সময় কোথায়? বিষ্টি পড়ে সাত সের আটা পচে গেল, হাঁড়িতে তোলা হয়নি। তা সবটা

নিয়ে গরুর চাড়িতে ঢেলে দিতে হলো। দইবড়া করব বলে ডাল ভিজিয়েছি. তা কি আর পিষতে সময় পাচ্ছি?'

চন্দন আর কিছু বলল না। কিন্তু বিকেলে সুরজকে দেখতে গেল। ময়লা বিছানায় মুখ ঢেকে শুয়ে আছে সুরজ। চম্পা জলভরা ঘটি গরম করে তার হাতে পায়ে সেঁক দিচ্ছে। চন্দন দেখল, সুরজের বিছানার নিচে পচা নরম ভিজে খড় পাতা। ঘরের কোণে জল জমে আছে। বিষ্টি হয়েছিল সকালে।

চন্দন উঠে গেল। পরদিন সে আবার এল। গোরুর গাড়ী ক'রে সে নতুন খড় এনেছে। গোয়ালাদের কাছে খড় কিনেছে। বাজার থেকে কম্বল এনেছে দুটো। মিছরী সাবু এবং ওষুধও এনেছে। রান্নার কাঠ, এক বস্তা চাল, এক ঝুড়ি আটা, এ সব-ও দেখা গেল। ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করে এসেছিল। কৌতূহলে দু'একজন উঁকি দিচ্ছিল। চন্দন তাদের সরিয়ে দিল। নতুন খড় পেতে কম্বলের বিছানায় সুরজকে শোয়াল।

চম্পা কোন জিনিসে হাত দেয়নি। সে দরজার কপাটে হাত রেখে বিস্ফারিত চোখে দেখছিল। চন্দন তার কাছে এসে দাঁড়াল।

'এ তুমি কি করলে চন্দন?'

'খুব বেশী কিছু করিনি চম্পা। আমার নিজের রোজগারের টাকা আমি খরচ করছি।'

'চন্দন!'

সুরজ তাকে ডাকল। শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখ। বড় বড় চোখ জলজ্বল করছে। সুরজ বলল, 'তুমি কি আমাদের গ্রাম ছাড়া করবে চন্দন! তুমি কি জান না এরপরে কি হবে?'

'জানি।'

চন্দন তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়লো। বলল 'সুরজ কাকী, আমি কথা দিচ্ছি, কোন কথা হবে না।'

'কথা দিচ্ছ. কেমন করে কথা দিচ্ছ তুমি বেটা! তুমি কি স্বাধীন? তুমি কি তোমার বাবা, মা, গ্রামের আর সকলের মুখবন্ধ করতে পারবে? তোমার কাছ থেকে এত সাহায্য আমি নিতে পারব না চন্দন। সবাই বলবে যে চম্পার মা প্রতাপসিংহের ছেলেকে ভুলিয়ে···তারা আমার মেয়ের

নামে আবার কলঙ্ক দেবে! আমি না খেয়ে মরছি, ঐ মেয়েটাকে ভিক্ষে করে বাঁচাতে হচ্ছে, এরপর আরো অপমান আরো কলঙ্ক আমি সইতে পারব না।'

'স্বরজ কাকী, আমি চম্পাকে বিয়ে করব।'

'চন্দন!'

'হ্যাঁ স্বরজ কাকী। তোমায় কথা দিলাম, যে যা বলুক, বাবা মা আমাকে তাড়িয়ে দিক বা অপমান করুক, আমার কথা আমি রাখব।'

'তোমাকে ওরা বিয়ে করতে দেবে না।'

'স্বরজ কাকী, এবার আমি চেষ্টা করব। আমি কাজ জোগাড় করব। চম্পা তীর্থ থেকে ঘুরে আসুক, আমিও কাজ জোগাড় করে নেব। আমি তোমায় কানপুরে নিয়ে যাব, তোমাকে এ গ্রামে থাকতে হবে না!'

'তোমার মঙ্গল হোক চন্দন! তুমি শতজীবী হও! কিন্তু আমাদের জন্যে তুমি বাবা মাকে দুঃখ দিও না। তোমার এই রকম মন প্রাণ যেন চিরদিন থাকে। আমার অভাগা মেয়েটাকে তোমার পায়ে জায়গা দিতে হবে না। সে অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা, তুমি সইতে পারবে না।'

স্বরজ আর কথা বলতে পারে না, শুয়ে পড়ে। চন্দন বাইরে এসে দাঁড়াল। তার গরম বোধ হচ্ছিল। তার ঘাড়, গলা ঘামছিল। চম্পা এসে কোন কথা না বলে চাদরটা এগিয়ে দেয়।

চন্দন বলল, 'চম্পা। তুমি কাঁদছ?' চম্পা জবাব দিল না।

চন্দন বলে, 'চম্পা, ভালবাসলে তোমার দায়িত্বও যে নিতে হবে, তোমার দুঃখের ভাগও নিতে হবে, সে আমি বুঝতাম না। এখন বুঝেছি। তুমি আর ভয় পেও না, কেমন?'

চম্পা নিরুত্তর!

চন্দন আবার এল। স্বরজ যতদিন না সুস্থ হয়ে উঠল, সে বারবার এল। চন্দন নতুন করে চম্পাদের ঘর ছেয়ে দিল। বাঁশ কাটিয়ে নিচু একটি মাচা বেঁধে দিয়ে গেল। বললো, 'মাটিতে শুয়ো না।' সে বেশীক্ষণ থাকে না। বেশী কথা বলে না। এমন কি পথে-ঘাটে চম্পাকে দেখলেও একটু হেসে বা দুটো একটা কথা ব'লে নিজের কাজে চলে যায়।

কিন্তু ঝড় থেমে রইল না।

প্রতাপ এবং চন্দন, দুর্গা এবং চন্দন, বাদ প্রতিবাদ করে অস্থির হলো। দুর্গা মাথায় হাত দিল। ক্ষোভ ও রাগে সে জ্বলছিল! সে কি করবে, কেমন করে চম্পাকে শাস্তি দেবে ভাবছিল। তারপর, একদিন সে পথে দাঁড়িয়ে গালি দিতে শুরু করলো। স্বরজ তখন সবে সুস্থ হয়েছে। ঐ পথ দিয়েই সে লালাদের বাড়ী যাচ্ছিল। দুর্গা চীৎকার ক'রে বলল, 'ঐ যে সবনাশী যাচ্ছে! মা মেয়েতে মিলে রূপের ব্যবসা খুলে বসেছিস? জোয়ান ছেলেটাকে দেখেই তোর বিষনজর দিলি? ওরে সর্বনাশী, আমি যে আমার ছেলের মুখখানা-ও ভাল ক'রে দেখলাম না! তাকে খাওয়ালাম না, মাখালাম না, তার গায়ে নতুন জামাটা দিয়ে দেখলাম না কেমন মানায়। এরই মধ্যে তুই তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলি? পোড়াকপালী, নিজের শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীকে খেয়েছিস! রূপের আগুনে গাঁয়ের পুরুষগুলোর বুক জ্বালিয়েছিস। নিজের ত সব গেছে, এখন আমার ছেলেটাকে খেতে চাস? সে তোকে নিয়ে যাবে, সে তোকে মা ডাকবে। আমার বুকে আগুন জেলে দিতে চাস?'

'দুর্গা বহিন, তুমি আমার কথা শোন!'

'আমি কারো বোন নয়! আমি তোর মতো খারাপ মেয়ে মানুষের বোন নয়! তুই আমার শত্রু! তুই আমার শত্রু, তোর মেয়েটা আমার শত্রু! আচ্ছা রে, এই তোর মনে ছিল তাই মেয়েকে বিয়ে দিস নি! এই তোর মনে ছিল?' হাতের আঙুল মট মট করে মটকে দুর্গা বলল, 'ভগবান যদি থাকেন, তবে তুই মর, তোর মেয়েটা গলায় রক্ত উঠে মরুক! মর, মর তোরা!'

অপমানে ভয়ে স্বরজ থরথর ক'রে কাঁপছিল।

রাস্তায় ভিড় জমে ছিল। প্রতাপ এবং অন্য পুরুষরা-ও এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময়ে সকলের সামনে দিয়ে এগিয়ে এল চন্দন। স্নান করতে গিয়েছিল সে, কাঁধে ভেজা গামছা। চুলে কপালে, ফোঁটা ফোঁটা জল।

সে সকলের সামনে এসে স্বরজকে ধরল। স্বরজ পড়ে যাচ্ছিল। ভয়ে, লজ্জায়, সে এর ওর দিকে করুণ ভাবে চাইছিল। চন্দন তার হাত ধরে মা-র মুখোমুখি দাঁড়াল। মুখটা টকটকে লাল। কপাল ও গলার শিরা ফুলে উঠেছে। চন্দন বলল, 'মা তোমাকে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছে স্বরজ কাকী!'

'মা মিথ্যেবাদী হলো? আরে শয়তান, তুই একেবারে নিজেকে বিকিয়ে বসে আছিস?' দুর্গার কথা শেষ হবার আগেই চন্দন বলল, 'ভগবান সাক্ষী, তোমরা সবাই শোন, আমি যদি মায়ের দুধ খেয়ে থাকি, আমার কথার নড়চড় হবে না। স্বরঙ্গ কাকী আমার সাহায্য নিতে চায় নি, আমাকে ঘরে ঢুকতে দিতে চায় নি। আমি নিজে শপথ করেছি, কসম খেয়েছি, আমি ওর মেয়েকে বিয়ে করব! বিয়ে করব, আর যদি কোথাও ঠাঁই না হয়, তবে আমি ওদের নিয়ে যাব! স্বরঙ্গ কাকী, তুমি নির্ভয়ে চলে যাও। কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।'

দুর্গা চীৎকার করে কেঁদে বাড়ীতে ঢুকল।

সে লাথি মেরে উনোন ভেঙে দিল। থালা বাসন, রান্না-বান্না সব ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে। তারপর উঠোনে আছড়ে প'ড়ে মূর্ছা গেল।

চন্দন অভুক্ত অবস্থায় গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। বলে গেল, 'কাজ জোগাড় করব, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবে ফিরব। চম্পাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাব।'

প্রতাপ তার স্ত্রীর ওপর ফেটে পড়ল। বলল, 'দু'গাড়ী খড়, দুটো কম্বল, তাই দিয়ে সাহায্য করেছিল, তা তোমার সইল না। দু'দিন বাদে মেয়েটা চলে যেত, ছেলেটাও ভুলে যেত সব। তোমার জিভ তুমি সামলাতে পারলে না। ছেলেকে হারালে!'

তারপর তীর্থে যাবার দিন এল।

চম্পা এ ক'দিন গ্রামে বেরোয় নি, মুখ দেখায় নি কারুকে। তীর্থযাত্রীর জন্যে যেখানে গরুর গাড়ী সমবেত হয়েছিল, সেখানে 'রামগান' হচ্ছিল। তীর্থযাত্রীরা পুণ্য সঞ্চয় করতে যায়, তাদের ভাল ভাবে যাত্রা করানো পুণ্য কাজ। গ্রামের সবাই এসে দাঁড়িয়েছিল। চম্পা এক পাশে দাঁড়িয়েছিল।

দুর্গা এসে দাঁড়াল। লালার মা-র হাতে মিষ্টি, তামাক, নারিকেল ও সুপারি দিল। কাশীর বিশ্বনাথের জন্যে সোনার বেলপাতা এবং পুষ্করের সাবিত্রী মন্দিরের জন্যে রুপোর পান, রুপোর সুপারি দিল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। রোদ পড়ে তার গায়ের গহনা জ্বলছে, চোখের দৃষ্টিতে-ও আগুন! তীব্র যন্ত্রণায় মুখটা কুঁচকে বলল, 'এই যে! তুই-ও আছিস! যা, যা! গাঁ থেকে দূর হ! শহরে গিয়ে রমজানী হ! রূপের ব্যবসা খোল!

ভেবেছিস আমার ছেলেকে তুই হাত করেছিস? ভুল! তার জন্যে অন্য বৌ আসবে। তুই যা! গ্রাম থেকে আপদ দূর হোক! সব আপদ বালাই তোর সঙ্গে যাক!'

লালার মা দুর্গার হাত ধরে। বলে, 'মেয়েটা অনেক দূর দেশে যাচ্ছে। কেন আর ওকে অপমান কর? যাও, ঘরে যাও!'

'ঘরে!'

দুর্গা কঠিন হাসি হেসে বলল, 'ঘর কি আমার আছে দাদী? আমার ঘরে ও আগুন দিয়েছে। আগুন দিয়ে নিজে সরে যাচ্ছে। শয়তানী! রূপ বেচনেওয়ালী! আমাকে যত জ্বালা ও দিয়েছে, তার দ্বিগুণ জ্বালায় ও জ্বলবে। জ্বলে জ্বলে মরবে, তাই দেখে আমি শান্তি পাব। সেদিন আমি ভাল কাপড় পরব, গৈবীনাথকে দুধে স্নান করাব।' হঠাৎ কেঁদে ফেলল ও, কাপড়ে মুখ ঢেকে চলে গেল। তারপর বিদায়-গ্রহণের পালা শুরু হ'ল। কান্নাকাটি, প্রণাম, আলিঙ্গন, শুভকামনা। ধীরে ধীরে গরুর গাড়ী চলতে শুরু করে। চম্পার দিকে চেয়ে লালার মা বিড়বিড় ক'রে বলে, 'দুর্গা ঠিকই বলে। মেয়েমানুষের এত রূপ ভাল নয়। নে, আর ঢং করে কাঁদিস্ না! আমাকে সুপুরির থালাটা দে, জাঁতি দে!'

চম্পা চোখ মোছে। সে লালার মা-কে পরিচর্যা করতে এসেছে সে-কথা যেন না ভোলে। মা'র আদেশ। সুপুরির থালাটা নিয়ে জাঁতি দিয়ে সুপুরি কুচোতে লাগল। চোখ থেকে টপ টপ ক'রে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে বুকের আঁচল ভিজতে থাকে, চম্পা দেখে না।

নয়

আজমীরে গিয়ে সাবিত্রী তিলক নেওয়া হ'ল না চম্পার। সম্ভবতঃ ভগবানের ইচ্ছে ছিল না সে দেবতার আশীর্বাদ পাক। লালার মা চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ অবধি মানুষের চেষ্টায় কিছু হয় না, হয়ত' ভাগ্য-ই বড় হয়।

আজমীর পৌঁছবার আগেই তীর্থযাত্রীদের দলে ডাকাত পড়ে।

লালার মা এবার-ও তাঁর পুরনো সেথো হীরুয়াকে নিয়েছিলেন। হীরুয়ার বয়স হয়েছে। তার চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়েছে। সে কথা দিয়েছিল দুপুরের আগেই কান্তপাগুার আড্ডায় যাত্রীদের পৌঁছে দেবে।

তার হিসেবে হয়ত' ভুল হয়েছিল। হয়ত' মরুভূমির মধ্যে দূরত্বের সঠিক অনুমান পায় নি। বালি, পাথর, মাঝে মাঝে কাঁটা মনসার গাছ। দূরে পাহাড়ের গায়ে আজমীর দুর্গের বুরুজ ও প্রাকার দেখা যাচ্ছিল। মরুভূমিতে চোখের ভুলে কত সময়ে অনেক দূরের জিনিসকে কাছে মনে হয়। হয়ত' সে বিভ্রম ক্লান্ত যাত্রীদের উৎসাহ জোগায়। এই ত' এসে গেছি, মনে ক'রে তারা পথ চলতে পারে।

চম্পাদের দলটি দুপুর কেন, বিকেলেও কান্ত পাণ্ডার আড্ডায় পৌঁছতে পারে নি। অবশেষে তারা হীরুয়াকে গালি দেয়, এবং ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়ে গাড়ীতেই ঘুমিয়ে পড়ে। হীরুয়া এবং দু'একটি পুরুষ জেগে থাকে। অবশেষে তারাও একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙে অনেক পরে। ভীষণ ঝাঁকুনি, যাত্রীদের আতঙ্কিত আর্তনাদ, গরুর হাম্বা রব, এবং কয়েকটি সঞ্চরমান ছায়ামূর্তির আস্ফালন দেখে তারা বোঝে যে ডাকাত পড়েছে।

ডাকাতরা মেয়েদের গা থেকে গহনা কেড়ে নেয়। লালার মা-কে লাঠি মারে। গাড়োয়ানদের ও দু'জন পুরুষকে মারাত্মক জখম ক'রে তারা চলে যায়। কান্না, আর্তনাদ, পুরুষদের চিৎকার, ডাকাতদের হুঙ্কারের মধ্যে বোঝা যায় নি। পরে সকালের আলো ফুটতে সর্বনাশের চেহারাটা স্পষ্ট ক'রে চোখে পড়ল। তারা চম্পাকে নিয়ে গিয়েছে।

একজন যাত্রিনী অনেক গয়না এনেছিল সঙ্গে। রুগ্ন দেহ, বিধবা মানুষ। সে-ই গয়নার পুঁটুলি খুলে চম্পাকে সবগুলি রুপো ও সোনার গয়না পরিয়ে দিয়েছিল, নিরাপদে থাকবে বলে। পেটের যন্ত্রণার জন্যেই সে তীর্থে পূজো দিতো যাচ্ছে। যন্ত্রণায় নিঝুম অজ্ঞান হয়ে থাকে প্রায়ই, গয়নার পুঁটুলিটা পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তাই চম্পার গায়ে গয়নাগুলি সুরক্ষিত রেখেছিল।

ডাকাতরা গয়না কেড়ে নিয়ে চম্পাকে ফেলে যায়। তার মাথায় তারা লাঠি মেরে অজ্ঞান ক'রে রেখে যায়। জেগে চম্পা প্রথমেই দেখে শূন্যে ভাসমান একটা চিল তাকে দেখছে। তারপর সে দেখে ধূ ধূ মাঠ একটা নিম গাছ এবং ফণী মনসার ঝোপ। আচ্ছন্ন বিমূঢ় ভাবটা কাটতে বেশ সময় লাগে। তারপর নিজের অসহায় অবস্থা দেখে তার কান্না পায়। কাঁদতে গিয়ে সে চুপ ক'রে যায়। সে নির্জন প্রান্তরে তার কান্না কেউ শুনতে পেত কি না সন্দেহ।

কোম্পানির সার্ভে বিভাগের একটি দল তাকে খুঁজে পায়; তারা তাকে রাজস্থান ও মধ্য ভারতের সার্ভে বিভাগের রাইটার অফ এ্যাকাউণ্ট্‌স স্টর্ক সাহেব ও তাঁর স্ত্রী-র কাছে নিয়ে যায়।

তাঁরা তাকে যত্ন ক'রে সুস্থ করে তুললেন।

জোনাথান স্টর্ক মানুষটি সাদাসিধে এবং মিতব্যয়ী। দুশো কুড়ি টাকা মাইনেয় অনেক অসুবিধে ক'রে চালাতে হয়। তিনি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, তাই জাত সাহেবের মহলে বিশেষ পাত্তা পান না। তাঁর স্ত্রী লুইসা মার্গারেট রোগা, খিটখিটে এবং গোঁড়া ক্যাথলিক। এ দেশে সতরো বছর কাটিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে মধ্যভারত ও রাজপুতানার জেলায় জেলায় ঘুরেছেন। এখনো সাপ, নেড়া মাথা আদিবাসী, সন্ন্যাসী দেখলে তিনি ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। আয়া, খানসামা, রাঁধুনী, আবদার, ডোরিয়া, পাংখাকুলী এদের বার বার খ্রীষ্টধর্মের উপকারিতা ব্যাখ্যা করে শোনান। তোমরা কি এই পুতুল পূজা ছেড়ে উন্নত ও সভ্য ধর্মকে আলিঙ্গন করবে না? ব'লে সাগ্রহে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকেন। সতরো বছরের মধ্যে তিনি চারটি আদিবাসীকে ক্রীশ্চান করতে পেরেছেন। আরো অনেককে ধর্মান্তরিত করবার আশা রাখেন। তাঁর এই ধরনের কার্যকলাপ স্বামীর উপরিতন অফিসাররা পছন্দ করেন না।

লুইসা'র অধ্যবসায় অসাধারণ। চম্পাকে তিনি চুল বাঁধতে শেখালেন। তার নখ কেটে দিলেন। কাপড়ের জুতো পরতে শেখালেন। তারপর তাকে বাইবেলের গল্প শুনিয়ে বললেন, 'বালিকা, তোমাকে সবাই পরিত্যাগ করলেও আমার প্রভু পরিত্যাগ করবেন না। চল, কানপুরে নিয়ে তোমাকে ক্রীশ্চান করে দেব এবং তুমি জোয়ান স্টপফোর্ড মেম সাহেবের 'দেশীয় ক্রীশ্চান অনাথাশ্রম-এ' স্থান পাবে।

স্টর্ক বললেন, 'তোমার গ্রামে তোমার মা-র কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি। তিনি হয়তো ভেবেছেন তুমি মরে গেছ। তোমার খবর না পেয়ে চিন্তা করছেন।'

চম্পা সায় দিল। তার মা-র নামে দু'টাকা ডাকমাশুল দিয়ে চিঠি পাঠান হল। স্টর্কের মুন্সী চিঠি লিখে দিল।

তারপর অনেক ঘুরে ঘুরে, স্টর্কের অনুসরণ করে চিঠির উত্তর এল কানপুরে। লালা বৈজনাথের লেখা। সংক্ষিপ্ত চিঠি। সুরজ নেই।

মেয়েকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গেছে এবং তার কোন খবর পাওয়া যায়নি এ খবরটা স্বরূজ দেরিতে পেয়েছিল। তারপর সে শয্যা নেয়। জর ও শোকে ভুগে ভুগে মারা গিয়েছে। চম্পার না ফেরাই বিধেয়, কেননা গ্রামে কোথাও তার স্থান মিলবে না।'

চম্পা ভাগ্যের এ আঘাতটাকে অত সহজে মেনে নিতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে লুইসার পা ধ'রে সে বলল, 'তবে আপনার পায়ে একটু জায়গা দিন!'

জোনাথান এবং লুইসার দয়া হয়। কিন্তু তাঁরা কি করবেন চম্পাকে নিয়ে? সে খ্রীশ্চান হলে এখনি আশ্রয় পেতে পারে। অনাথাশ্রমে তার জায়গা হয়। কিন্তু ধর্মান্তরে সে রাজী নয়। তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন।

একদিন গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে এসে চম্পা তাঁদের কাছে বিদায় চাইল। মুন্সী গঙ্গারাম-ও বলল, 'ওকে ছেড়ে দিন।' সম্পূরণ ওকে আশ্রয় দেবে।'

সম্পূরণের নাম শুনে জোনাথান সতর্ক চিন্তিত হলেন। সম্পূরণ কানপুরে একজন বিখ্যাত লোক। সবাই তাকে চেনে। সে কি করে তা কেউ জানে না। অনেকে অনেক কথা বলে। সে নাকি সোনা, তামাক এবং মদের চোরাই ব্যবসা করে। গঙ্গাতে অনেক নৌকা থাকে। বর্ষাকালে নৌকাপথে কলকাতা অবধি যাওয়া চলে। নৌকার মালিকরা ধনী। সম্পূরণকে তারা নৌকাপিছু তোলা দেয়। কানপুর, কাশী, মির্জাপুর ও লক্ষ্ণৌ-এর বিখ্যাত গুণ্ডাদের সঙ্গে না কি তার যোগাযোগ আছে। অন্তত কানপুরের গুণ্ডা বদমাশরা সম্পূরণকে যে রকম সমীহ করে তা দেখে এ সব জনশ্রুতিকে বিশ্বাস করতে সাধ যায়। সম্পূরণ প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করে। গঙ্গার তীরে সতীচৌড়া ঘাটে বসে থাকে। সে ঘন ঘন মগনলাল, জোয়ালাপ্রসাদ প্রমুখ ধনী শেঠদের বাড়ী যায়। লোকে এমন কথাও বলে, সম্পূরণের আসল টাকা পয়সা এবং প্রতিপত্তির মূল অন্যত্র। দিল্লীতে মোগল বাদশাহের চরম দুর্দিনে তাঁরা যে সব হীরে জহরৎ বেচেছেন, সেগুলো কেমন করে যেন সম্পূরণ-ই কিনেছে। সে সেইসব হীরে জহরৎ চড়া দামে বিক্রি ক'রে অনেক টাকা ক'রেছে। বর্তমানে সে সেই টাকা তেজারতি কারবারে খাটায়।

মুন্সী বলল, গঙ্গার ঘাটে ব'সে সম্পূরণ না কি লক্ষ্য ক'রে দেখেছে। চম্পা যে ভাবে শূন্য দৃষ্টিতে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে, তাই দেখে সে হয়তো ভেবেছে মেয়েটি সুযোগ খুঁজছে, আত্মহত্যা করতে চায়।

সে মুন্সীর কাছ থেকে খোঁজ খবর নিয়েছে। তারপর চম্পাকে বলেছে, 'বেটি, যদি আমাকে বিশ্বাস করতে পার, আমার সঙ্গে এস। আমার ঘরে থাকবে।'

'তোমার ঘরে আমি কোন্ পরিচয়ে থাকব?' চম্পা জিজ্ঞাসা করেছে।

'আমার মেয়ে, সেই পরিচয়ে থাকবে।'

'আমি যাব কেন?'

'আশ্রয় না পেয়ে তুমি ক্রীশ্চান হয়ে যাবে সেটা আমি চাই না। তুমি যুবতী। তোমার বয়স তোমার শত্রু। সম্পূরণের আশ্রয়ে থাকলে কেউ তোমার ছায়া মাড়াবে না। আর, শক্ত কোন খুঁটিতে নৌকা না বাঁধলে নৌকা কেমন করে ভেসে যায় তা ত তোমার জানা উচিত।'

'তুমি আশ্রয় দিতে চাইছ কেন? তুমি ত আমাকে জান না!'

সম্পূরণ হেসেছে। তার একটা দাঁত লম্বা। হাসলে তাকে ভীষণ এবং নিষ্ঠুর দেখায়। সে বলেছে, 'তুমি অনাথ। তোমার কেউ নেই। গঙ্গার ঘাটে বসে তুমি ডুবে মরবার সংকল্প করছ তা কি আমি বুঝিনি? দেখ, তিনদিন থেকে তোমার পেছনে লোক লেগেছে। হরনাথ তোমাকে নজরে রেখেছে। হরনাথ মগনলালের ভাতিজা-র ভাড়া করা লোক। মগনলালের ভাতিজা যার ওপর নজর দেয়, সে স্ত্রীলোক তাকে এড়াতে পারে না।'

'বুড়া, যতজনকে হরনাথ এমনি করে নজরে রেখেছিল, তুমি কি তাদের বাঁচিয়েছিলে? আশ্রয় দিয়েছিলে?'

'না। তোমার কপালে এমন কোন চিহ্ন আমি দেখেছি, যা দেখে আমার তোমাকে বাঁচাতে ইচ্ছে হয়েছে। তোমার মতো, ঠিক তোমার মতো কারুকে আমি খুঁজছিলাম। ঠিক এই রকম কপাল আমি একজনের দেখেছি।'

'সে কে?'

'সে একটি হারামজাদী, সে বেশ্যা। সে গয়না টাকার লোভে একটা বিধর্মী কুকুরের ঘর করছে।'

'আমি যদি না যাই তোমার সঙ্গে?'

'তবে তুমি জাহান্নমে যাবে। তোমার ঐ কপাল নিয়ে তুমি যেখানে যাবে, সেখানেই তুমি আগুন দেবে।'

'আমি জানি আমি অলক্ষণা!'

'অলক্ষণা নয়, তুমি পরম সুলক্ষণা। কিন্তু তোমার ভাগ্য তোমাকে অন্য কাজের জন্যে গড়েছে। যে তরবারিতে মাথা কাটা যায় তাই নিয়ে ঘাস কাটতে গেলে বিপদ হয় না? যে আগুন দিয়ে দাবানল জ্বালানো যায়, তাই নিয়ে ঘরের বাতি জ্বালতে গেলে ঘর জ্বলে ওঠে না? সেটা আগুনের বা তরবারির দোষ নয়। যে জিনিসের যা ব্যবহার। তুমি অনেক বড কাজ করবে। তাই তোমার ভাগ্য তোমাকে টেনে এনে এই গঙ্গার ঘাটে বসিয়েছে।'

সম্পূরণের কথা শুনে চম্পা বিস্মিত হয়েছে। ভয় পেয়েছে। তারপর বুঝেছে, সে যখন বানের মুখে ভেসেছে তখন ভয় করা নিরর্থক। কি আর করার আছে?

সে স্টর্কদের কাছে বিদায় চেয়েছে। মিসেস স্টর্ক তাকে বিদায় দিতে দুঃখিত হয়েছেন। জোনাথান স্টর্ক একটু ইতস্তত করে তাকে একটি থলি দিয়ে বলেছেন, 'পঞ্চাশটা টাকা তুমি কাছে রাখ। আমি সামান্য অবস্থার লোক, বেশী দিতে পারলাম না।'

তাঁদের কাছ থেকে চলে আসবার সময়ে এই নিঃসন্তান, স্নেহশীল দম্পতির জন্য চম্পার চোখ দিয়ে জল পড়েছে। তার চোখে জল দেখে সম্পূরণ পরুষ, রুক্ষ গলায় বলেছে, 'জল মুছে ফেল। তুমি অনেক কেঁদেছ, আর কেঁদ না।'

অনেক, অনেক দিন পরে চম্পা বুঝেছিল, সম্পূরণ মেয়েদের চোখের জল সহ্য করতে পারে না। সে অস্থির হয়ে পড়ে।

সম্পূরণ তার জন্যে একটি বাড়ী ভাড়া নিল। ছোট উঠোন দিয়ে মুখোমুখি দু'খানা ঘর। পাকা মেঝে, পাকা দেওয়াল, খড়ের চাল। এক পাশে রান্নাঘর এবং কুয়োতলা। চম্পার জন্যে সে একটি দাসী রাখল। নিজে নিল ছোট ঘরটা।

তারপর সে চম্পার জন্যে সারেঙ্গীবাদক, তবলচি এবং সঙ্গীত-শিক্ষক ঠিক করলো। সঙ্গীত-শিক্ষক আনন্দরামকে বলল, 'রমজানী হতে যারা আসে, তাদের কাজ-চালানো গোছের তৈরী করে দিতে তুমি নাকি পটু! তুমি ওকে সামান্য শেখাও। যতটুকু না শিখলে চলে না।'

চম্পাকে সে ভাল জামা কাপড় এবং গহনা কিনে দিল। তার নির্দেশে দাসী চম্পাকে বেসম মাখিয়ে স্নান করাল। দরজা বন্ধ করে সমস্ত শরীরে

মোটা করে বেসম গোলা মাখাল। তারপর বেসম শুকিয়ে যখন চামড়ায় টান ধরছে, তখন গরম জল এনে ভাপ দিয়ে শরীর থেকে বেসম তুলল। স্নানের পর দুধ ও চন্দনবাটা দিয়ে মুখ, গলা, হাত ঘষে ঘষে মোলায়েম করল। সরম্পুণ বলল, 'এখনো হয়নি। ওর পা ফাটা। তুমি মেম সাহেবদের আয়ার কাজ করেছ, কিছুই শেখনি ?'

দাসীটি স্থূল দেহ, কালো এবং সদাই অপ্রসন্ন তার মুখ। সে চম্পার হাত পা দুধের সর ঘষে ঘষে নরম করল। চম্পার লালচে, ফাটা চুলে সরষের খোল ঘষে ধুয়ে নরম করল। তারপর মশলা ভেজানো নারকেল তেলে মাথার চুল কালো করল। সারাদিন চম্পাকে রূপচর্চায় ব্যস্ত থাকতে হল। সন্ধ্যে ও সকালে গান শিখতে হল, নাচও শিখতে হল সামান্য। মাঝে মাঝে সে বিদ্রোহ করে। একদিন সম্পূরণকে গালি দিয়ে বলে বসে—'তুমি আমাকে বাজারের মেয়ে বানিয়ে টাকা রোজগার করাতে চাইছ বুঝি ?'

সম্পূরণ হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে তার দম আটকে যায় আর কি, বলে, 'খুব চিনেছিস আমাকে তুই! তুই আমাকে কত টাকা দিবি ? একবার মুখ ফুটে চাইলে আমি লক্ষ টাকা পেতে পারি।'

সে মুন্সী রেখে চম্পাকে মোটামুটি অক্ষর চিনতে শেখাল। তা ছাড়া আয়ার কাছে কথা বলা, হাঁটা চলা, এ সবের সহবৎ আদব কায়দা শিখতে হ'ল।

তারপর একদিন দর্জি এসে নতুন পোশাক দিয়ে গেল। চম্পা কালো রেশমের ওপর লাল পাড়, চুমকি বসানো ঘাগরা ও আঙিয়া পরল। ওড়না গায়ে দিল। চুলে সোনার ঝাপটা পরিয়ে দিল দাসী। নাকে মুক্তোর নথ, কানে ও গলায় গহনা। হাতভরা চুড়ি এবং পায়ে নাগরার ওপর তোড়া। সম্পূরণ দেখে বলল, 'ঠিক হয়েছে।'

সম্পূরণই বায়না এনেছিল। ক্যান্টনমেন্টে ভারতীয় অফিসারদের সামনে একটি জলসায় চম্পাকে গাইতে হল। গাইতে গিয়ে তার গলা বুজে এল, নাচতে গিয়ে সে মাঝপথে থেমে ছুটে পালিয়ে গেল। সবাই খুব হাসল, আবার আসরে টাকা-ও পড়ল অনেক।

আস্তে আস্তে সংকোচ কাটল। চম্পার নাম কানপুরে ছড়াতে আরম্ভ করে। বেরিলীর বিখ্যাত রমজানী পান্নাবাঈয়ের মুখের হাসিটুকু দেখলে সাহেবরা নাকি দশ হাজার টাকা দিতে পারেন। লক্ষ্ণৌ-এর সুন্দরবাঈ

পান খায়, গলা দিয়ে পানের পিক নামছে তা দেখা যায়। সুন্দরবাঈ হিন্দী রাগ-সঙ্গীত গাইতে পারে। কাঁচের উপর আবীর ছড়িয়ে দিলে নাচতে নাচতে আবীরে পদ্মফুল এঁকে দিতে পারে। পায়ের একশো ঘুঙুরের তোড়াকে এমন কৌশলে বাজাতে পারে যে, প্রতিটি ঘুঙুর আলাদা আলাদা বাজে। চম্পা সে সব কিছুই শিখল না। তবু তার নাম হল। এমনকি বিঠুরের রাজপ্রাসাদে, ধন্দুপন্থ নানার সামনে-ও নাচ দেখাবার ডাক পড়ল মাঝে মাঝে।

চম্পার নাচগান সবাই উপভোগ করে, কিন্তু কেউ-ই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পায় না। চম্পা সকলের সঙ্গে-ই হাস্যকৌতুক করে, কিন্তু কারো সঙ্গে-ই সে অন্তরঙ্গ হয় না। সম্পূরণ চম্পাকে পাহারা দিয়ে রাখে।

দু'চারটি বড় বড় বায়না ফেরত দেবার পর তার নামে অনেক গল্পকথাও রটতে লাগল।

রিসালা ও ইন্‌ফ্যান্ট্রির আমন্ত্রণে সে নাকি বলেছে এক হাজার টাকা দিক, তবে যাব!

সে নাকি মুলচাঁদকে দিয়ে আসল হীরের হার আনিয়েছে।

সে নাকি গোলাপের আতর কুয়োর জলে ঢেলে দেয় গোলাপগন্ধী জলে নাইবে বলে।

ধীরে ধীরে কয়েক বছরেই চম্পার নাম ও খ্যাতি একটা প্রতিষ্ঠা পেল।

সেদিন সম্পূরণ তাকে বলল, 'তোর রোজগারের টাকা জমিয়ে দেড় হাজার হয়েছে। চম্পা, আয়, তোকে টাকা রাখতে শিখিয়ে দিই!'

ঘরের মেঝের ইঁট তুলে গর্ত করে সেখানে টাকা রেখে দিল সম্পূরণ। রাখবার আগে চম্পা একবার টাকাগুলো হাত দিয়ে নেড়ে দেখতে চাইল।

আঁজলা ভরে তুলে সে রুপোর টাকা মেঝেতে ফেলল। সম্পূরণ হাসল। জুতো খুলে চম্পা টাকার ওপর পা রাখল। পায়ের আঙুল দিয়ে সে টাকা তুলল, টাকা ফেলল। তারপর হেসে বলল, 'বুঢ়া, তুমি কি ভাবলে আমি পাগল হয়ে গেছি? না বুঢ়া। টাকা দেখে আমি পাগল হইনি।'

একটি মোহর তুলে নিয়ে চম্পা দেখল। তারপর বলল, 'বুঢ়া, আমার কথা কিছু কিছু তুমি জান, অনেক কথাই জান না। একটা পয়সা, একটা তামার পয়সার অভাবে আমার মা দিনের পর দিন উপোস করত। শেষ সময় যদি একটা টাকা হাতে থাকত, তবে বোধ হয় আমার মা অমন ক'রে মরত

না। সে-সব কথা আমার মনে হয়। তাই আমি টাকায় পা রেখে দেখলাম, টাকায় হাত রেখে দেখলাম। টাকা ছুঁতে কেমন লাগে তাই দেখলাম। দেখে আমার ঘেন্না হলো। টাকা রোজগার করা এত সোজা, তবু এত কঠিন? আমার মা যদি দেখত, দেখতে পেত………।'

চম্পা চুপ ক'রে যায়। তার মুখখানা বিষণ্ণ। তারপর মুখ তুলে, একটু হেসে বলে, 'না। ভেবে দেখলাম মা খুসী হত না। মনে করত এ পাপের টাকা। ভিক্ষে করতে লজ্জা পেত, গতরে খেটে চাল গম নিয়ে আসত। আমার রোজগারের টাকা দেখে সে বোধহয় ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিতে যেত। বিধবা হবার পর একজন বলেছিল—দাঁড়াও তোমার মুখখানা দেখি। এ কথা শুনে রাগে লজ্জায় মা নদীতে ডুব দিয়ে তবে বাড়ী ফেরে। সেই মা'র মেয়ে হয়ে আমি…'

'ও সব কথা ভাবিস না চম্পা!'

'ভাবতে চাই না। তবু মনে হয়।'

'তোর মা শান্তি পেয়েছে চম্পা।'

হঠাৎ চম্পা হাসতে লাগল। বলল, 'আমায় বোকা পেয়েছ তুমি? মা শান্তি পেয়েছে? বেঁচে থাকতে যে একদিনের তরে সুখ স্বস্তি জানল না, আমার কথা ভেবে যে মরতে চাইত না, সে পাবে শান্তি? বুড়া, আমার মা-র কি রূপ ছিল। আমি যখন ছোট ছিলাম, মা-র মুখে রোদ পড়লে চেয়ে দেখতাম। মনে হত মা-র রূপ যেন জ্বলছে। কি রং, কি মুখ, কি বড় বড় চোখ! মা ঘুমোলে মনে হতো চোখের পাতা যেন কে এঁকে দিয়েছে। চোখের সামনে দেখলাম সেই মা শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেল। চুল উঠে শরীরের হাড় বেরিয়ে গেল। চোখের নিচে কালি, নিশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ। আমি যদি না থাকতাম তবে হতভাগী মরে সব জ্বালা জুড়োত। কিন্তু আমি যে ছিলাম! না সম্পূরণ, আমার মা শান্তি পায়নি। শান্তি পেয়েছে আর একজন!'

'সে কে, চম্পা?'

'সে আমায় রমজানী হতে বলেছিল। রূপ বেচতে বলেছিল। পুণ্যবতী, তাই তার কথা সত্যি হয়েছে।'

'সে তোর কে?'

'বড় কৌতূহল তোমার! নাও, টাকা তোল। দরজা বন্ধ করে আমি থাকতে পারছি না, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

দশ

কানপুরে ক্যান্টনমেন্ট এবং শহরে, ব্রিজদুলারীকে সবাই ঘেন্না করে। ব্রিজদুলারী ব্রাইটের বিবি। আসলে তারা ব্রাইটকে ঘেন্না এবং ভয় করে। ব্রাইটকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। তার তুল্য মদ্যপ, নিষ্ঠুর এবং কুৎসিত চরিত্রের মানুষ কচিৎ দেখা যায়। ব্রাইটের সম্পর্কে সকলের উষ্মা তাই ব্রিজদুলারীর ওপর এসে পড়ে।

ব্রাইট খাস ইংরেজ নয়। তার রক্তে বেশ খানিকটা মাদ্রাজী ভেজাল আছে। যদিও তাকে দেখলে তা বোঝা যায় না।

তার বাবা, একজন মাদ্রাজী কনকাম্মা এবং একজন জাহাজী গোরা-র জারজ সন্তান। সে অরফানেজে বড হয়। পরে ক্লার্ক হয়ে রেজিমেন্টে যোগ দেয়। জৌনপুরে ম্যাকমোহনের বোন এমিলির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এমিলির বয়স তখন ত্রিশ হয়েছে। দেখতে সে সুন্দর। তবে নীতিপরায়ণ, ধর্মান্ধ এক পিসীমার কাছে মানুষ হওয়াতে সে কোন দিনই জানতে পারেনি যে তার রূপলাবণ্য আছে।

পিসীমা বলতেন, 'মেয়েদের সৌন্দর্যটা হচ্ছে শয়তান, পুরুষদের আকর্ষণ করে এবং তার ফলে মেয়েরা বিপথগামী হয়।' তিনি এমিলিকে সরল পুরুষদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতেন। এমিলি পুরো হাতা, গলা ঢাকা, কুশ্রী বেঢপ পোশাক পরতো। চুল বেণী করে মাথার ওপর পেঁচিয়ে রাখত। তার পিসীমা মারা গেলেন। দাদা এমিলিকে আসতে লিখলেন। এ দেশের ইংরেজ সমাজে অবিবাহিতা মেয়েদের খুব কদর। ভারতের মাটিতে পা দিতে না দিতেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। এমিলি এল। সামান্য পরিচয়ের পরেই সে ভিকটর ব্রাইটের প্রেমে পড়ে। তার দাদা এ বিয়েতে মত দেবেন না সে জানত। তাই পালিয়ে লক্ষ্ণৌ গিয়ে সে ভিকটরকে বিয়ে করে।

এমিলির অবিমৃষ্যকারিতা দেখে ডিকেন্স ও জর্জ এলিয়ট পড়া মেম সাহেবরা স্মেলিংসল্ট শুঁকে মূর্ছা যাবার উপক্রম হলেন। ম্যাকমোহন প্রথমে অপমানিত বোধ করেন। তারপরই বোনের জন্যে তাঁর চিন্তা হয়।

এমিলি সুখী হয়নি। মোটা টাকা সঙ্গে আনতে পারেনি সে। পিসীমার দেওয়া ব্রুচ, মুক্তোর মালা এবং সোনার চেন-ঘড়ি-ও ফেলে এসেছিল। ভেবেছিল, তাকেই ভালবাসে ভিক্টর, তার গহনাকে নয়।

কিন্তু ভিক্টর অন্য ধাতুতে গড়া। অনভিজ্ঞ, ভালমানুষ স্ত্রী-কে সে অসহ্য কষ্ট দেয়। দেড়বছর বাদে, আলেকজাণ্ডার ডেভিড ব্রাইটকে জন্ম দিয়ে এমিলি মারা গেল।

প্রথমে দুপ-ধাই, তারপর লক্ষ্ণৌ-এ মিসেস ব্লুমের অনাথাশ্রম, শেষে সে নিজের অফিসের তহবিল তছরূপ ক'রে সরে পড়লো।

খোঁজখবর নিয়ে ম্যাকমোহন ভাগ্নের জন্যে টাকা পাঠাতে লাগলেন। হাজার হলেও এমিলির ছেলে! এমিলি যখন নেই, বাপ যখন অমানুষ, তখন তাকে মানুষ করবার সবটুকু দায়িত্ব তাঁর। ছ' বছর বাদে ভিক্টর ব্রাইটের মৃত্যুসংবাদ এল বোম্বে থেকে। ভিক্টর হঠাৎ বড়লোক হবার চেষ্টা করেছিল। তাই সে পোর্টে চোরাইমাল কেনা-বেচার কাজে মনোনিবেশ করে। ১৮৩০ সাল। জাহাজে চড়ে পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান, ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ, সব দেশের মানুষ-ই আসে। ভারত, চীন ও সিঙ্গাপুরের বন্দরে নামে। জাহাজের খালাসীদের সঙ্গে এরা দোস্তি করে। ভারত থেকে চামড়া, পাট, চা, চিনি বিদেশে যায়। বিলেত থেকে সৌখিন সুগন্ধি, মদ, সিল্ক, কাঁচের জিনিস আসে। ভারতের বন্দরে কাদায় পাঁকে ভারতীয় কুলীরা সে-সব মাল নামায, মাল তোলে। ফিরিঙ্গী কুলি কন্ট্রাকটার চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে মাল নামান-ওঠান'র তত্ত্বাবধান করে। তাকে ঘুস দিলেই দুটো একটা গাঁটরি, বাক্স বা পিপে এদিক ওদিক সরিয়ে ফেলা যায়। তারপর সেই চোরাই মালবেচা পয়সায় সুখ কেনা যায়।

ভিক্টর ব্রাইট-ও সুখ কেনবার চেষ্টা করেছিল। তারপর, মাতাল জুয়াড়ীদের আড্ডায় মারামারি ক'রে সে পিঠে ছুরি খায়। দাতব্য হাসপাতালে মারা যায় এবং দুঃস্থদের জন্য নির্দিষ্ট গোরস্থানে তাকে কবর দেওয়া হয়।

তখন ম্যাকমোহন ব্রাইটের সব ভার তুলে নেন। তিনি তাকে লক্ষ্ণৌ-এ লা-মার্তিনের স্কুলে রাখেন। ভাবেন স্নেহ দিয়ে যত্ন দিয়ে ওকে অন্য মানুষ ক'রে তুলবেন।

তাকে ষোল বছর বয়সে নিজের কাছে আনেন। তারপর, ধীরে ধীরে তাঁকে স্বীকার করতে হয়, শিক্ষার চেয়ে, দীক্ষার চেয়ে, মানুষের রক্তের অনুশাসন অনেক বেশী শক্তিশালী। ব্রাইটের অনিন্দ্যসুন্দর চেহারা, সরল

নিষ্পাপ চাহনি শুধু একটা মুখোশ। তার নিচের মানুষটা যেমন কুৎসিত, তেমনি নিষ্ঠুর।

চন্দনকে নিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়, তাতেই ম্যাকমোহনের বুকটা ভেঙে যায়। ব্রাইটের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন। অবসর নিয়ে এলাহাবাদের সন্নিকটে পাপা মৌ-য়ে চলে যান। চলে যাবার সময়ে তিনি অনেক পুরনো চিঠিপত্র পুড়িয়ে ফেলেন। ব্রাইটের স্কুলের মাস্টারদের লেখা চিঠি। অনেক কথা তাঁর মনে পড়ে। ব্রাইটের মাস্টার বলেছিলেন, 'সাত বছরের শিশু, সে ঢিল মেরে, খুঁচিয়ে কুকুরছানাটাকে কি ভাবে যে মারল।'

'বন্ধুর সঙ্গে মারামারিতে হেরে গিয়েছিল। তারপর প্রথম সুযোগ পেতেই বন্ধুর ডান হাতের আঙুলগুলো পাথর দিয়ে ছেঁচে দেয়।'

'স্কুল-হলের ঘড়ি চুরি করেছে, বিক্রি করেছে। তেরো বছরে ওর এত টাকার দরকারই বা কিসে হল, এ প্রবৃত্তিই বা এল কোথা থেকে?'

ম্যাকমোহন বলেছিলেন, 'চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করে ওকে ভাল ক'রে তুলতে হবে।'

'সার, আমরা যত চেষ্টাই করি, we cannot make a silk purse out of a sow's ears.'

'চেষ্টা করলে রক্ত থেকে নীচতা নিষ্ঠুরতা লোভ, সব মুছে ফেলা যায়'—ম্যাকমোহন বলেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁকে স্বীকার করতে হয়, যত চেষ্টাই করা যাক না কেন, ব্রাইটের রক্ত থেকে তার বাবার প্রভাবকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

ব্রাইট যখন জানল সে মামার টাকাকড়ি পাবে না, সে নিজে কেরিয়ার গড়তে বদ্ধপরিকর হয়।

সে বুঝল যেহেতু সে খাস-ইংরেজ নয়, সেহেতু সে অন্যদের সমান মর্যাদা কোনদিনই পাবে না। হিন্দী ভাষায় পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতা-মূলক। ব্রাইট যখন হিন্দীতে ভালভাবে পাশ করলো, উর্দু পরীক্ষা দিল, 'উর্দু অখ্‌বর' কাগজ পড়ে ফেলল, সবাই মুচকি মুচকি হেসে বলে, 'ব্রাইটের দেখছি দেশী ভাষার ওপর বেশ দখল আছে?'

সে বুঝল তার জন্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

যখন ব্রিজদুলারীকে নিয়ে বসবাস করতে শুরু করে, তখন থেকে

তার মধ্যে একটা উন্নাসিক তাচ্ছিল্য দেখা গেল। সে ইংরেজ অফিসারদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে লাগল। বুঝতে দিল—হ্যাঁ, আমার বাবা ভারতীয় ইংরেজের জারজ সন্তান। আমি নিজেও ভারতীয় মেয়েকে ঘরে এনেছি। আমি লজ্জিত নই। ব্রাইট জুয়া খেলে, এবং তহবিল তছরূপ করে। সে টাকা নিয়ে ইন্‌ফ্যান্ট্রি ও রিসালার সওয়ার সিপাহীদের ধার দেয়, সুদশুদ্ধ টাকা আদায় করে। জুয়াতে সে পারত পক্ষে হারে না। তহবিলের টাকাও সে পুরিয়ে দেয়।

টাকা দিয়ে সে সোনা কেনে। ব্রিজদুলারীর গয়না গড়িয়ে রাখে।

সিপাহী ও সওয়ারেরা সুদের টাকা দিতে পারে না। অফিসাররা জুয়াতে হেরে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। সবাই বলে, ঐ মেয়েটা অর্থপিশাচ। ওর বড় সোনার লোভ। তাই ওর জন্যে ব্রাইট এমন করে টাকা জোগাড় করে। ঐ মেয়েটা শয়তান।'

ব্রাইট মনে মনে হাসে।

ব্রাইট ব্রিজদুলারীকে কোথা থেকে পেয়েছে, কেমন করে পেয়েছে তা কেউ জানে না। কেউ কেউ বলে—মাত্র পঞ্চাশটি টাকার জন্যে ব্রিজদুলারীর বাপ আর ভাই নাকি মেয়েটাকে ব্রাইটের কাছে বিক্রি ক'রে গিয়েছে।

ব্রাইট ব্রিজদুলারীকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে। ব্রিজদুলারীর আয়া সকলকে গল্প করে, 'জান, সাহেব চুরোট দিয়ে বিবির পা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেয়। মুখটা চেপে রাখে, বিবি চেঁচাতে পারে না।'

কোনদিন বলে, 'সাহেব মাঘ মাসের শীতে কাল বিবিকে বের ক'রে দিয়েছিল। বিবি কুকুরের মতো বসেছিল দরজার সামনে। অনেক পরে দোর খুলে ঘরে ঢুকিয়ে নিল।'

সবাই মজা পায়। সবাই বলে, 'কেন সাহেব মারে কেন?'

'কেন আর?' বলে আয়া ইংগিতপূর্ণ হাসি হাসে।

সত্যিই ব্রাইট মারে।

ব্রাইট ব্রিজদুলারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। সাতবছরের সম্পর্ক তাদের সাতটি সন্তানকে পৃথিবীতে এনেছে ব্রাইট, রাখতে পারেনি। কখনো ছ'মাসে কখনো আট মাসে মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় ব্রিজদুলারীর। বিছানায় মিশে যায়, দু'তিন মাস প'ড়ে থাকে। আবার একটি শিশুর সম্ভাবনা যেদিন অনুভব করে নিয়েছে দেহে, সেদিন দুঃখে, গ্লানিতে ফুলে

ফুলে কাঁদে ব্রিজদুলারী। ব্রাইট তার কান্নাটা উপভোগ করে। সে জানে, যতই কাঁদুক, নিজেকে যতই ধিক্কার দিক, ব্রিজদুলারী কিছুই করবে না। তাকে ছেড়ে পালাবে না, বা ঘেন্নায় বিষ খাবে না। জানে ঐ মেয়েটির সমস্ত মনুষ্যত্ব সে ভেঙে পিষে দিয়েছে। ব্রিজদুলারী তার কাছে বাঁধা।

ব্রিজদুলারীর রং ফর্সা এবং ফ্যাকাশে। তার দুই চোখে ভীরু পশুর মতো আর্ত চাহনি। তার চোখের নীচে কালি। তামাক ও পান খেয়ে তার ঠোঁট কালো। তার কানে, নাকে, গলায়, হাতে মোটা মোটা সোনার গহনা। কোমরে মোহরের গোট। সর্বদা তাকে গহনা পরে থাকতে হয়, একটাও সে খুলতে পারে না। তার কানে একটা ফুটো ছিল। আটটা সোনার ফুল গড়িয়ে এনে ব্রাইট নিজে ছুঁচ পুড়িয়ে তার দু'কানে চারটে করে ফুটো করে ফুল পরিয়ে দিয়েছিল। আর একবার স্ত্রী-উলকিদার এনে ব্রিজদুলারিকে চিৎ করে ধ'রে জামা খুলে ব্রিজদুলারীর বুকে ও গলায় নিজের নাম দেগে দিয়েছিল। ব্রিজদুলারী একবার পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। ব্রাইট শাসিয়েছিল তা'হলে তাকে উলঙ্গ ক'রে দিনের বেলা রাস্তায় বের ক'রে দেবে।

ব্রিজদুলারী আর পালাতে চেষ্টা করে নি। পালাতে চেষ্টা করে নি, মরতে চেষ্টা করে নি। যেই বুঝল, এই তার বিধিলিপি, এবং এই জীবন অতিক্রম করে সে কখনো কোথাও যেতে পারবে না, অমনি সে সঙ্কুচিত হ'য়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করল।

তার কাছে ভারতীয় সিপাহী-সওয়াররা আসে। ব্রাইটের কাছে যখন সুদ মকুবের জন্য সুপারিশ করতে হয়, যখন অনেক টাকার দরকার হয়, তারা বলে, 'বিবিজী, তুমি দয়া না করলে ত' গরিব বাঁচে না।'

ব্রিজদুলারী যেন ধন্য হয়ে যায়। ব্রাইটের পা ধরে। তাদের লুকিয়ে টাকা দেয়, বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিয়ে তবে তার স্বস্তি।

তার পর, তারাই তাকে উপেক্ষা করে। দেখলে কথা বলে না। পথে দেখলে সম্মান জানায় না। ব্রিজদুলারীর কাছে যে আয়াগুলো থাকে, তারা ব্রিজদুলারীর কাজকর্ম করে বটে, কিন্তু উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য দেখাতে ছাড়ে না। প্রয়োজন হলেই এসে দাঁড়ায় 'বিবিজী, মেয়েটার বড় অসুখ। ওর শ্বশুরবাড়ীতে পাঁচটা টাকা পাঠাব।' ব্রিজদুলারী টাকা দেয়।

পরে, ব্রিজদুলারী যদি প্রশ্ন ক'রে, 'আয়া, তোমার মেয়ে ভাল আছে ত?' আয়া গম্ভীর, অপ্রসন্ন মুখে বলে, 'কেন থাকবে না? গেরস্ত ঘরের বৌ, সে শাক রুটি খেয়েই সুখে আছে। সে ত' বাজারের মেয়ে নয়, যে সোনাদানা না পরলে সুখ হবে না!'

ব্রিজদুলারী কিছুই বলতে পারে না। চুপ ক'রে যায়। অসহায় হয়ে ভাবে, কোন মানুষের সঙ্গে এক মুহূর্তও সহজ হওয়া যাবে না, এ কি ভীষণ শাস্তি? সারাদিন সে নিঃসঙ্গতার নির্বাসনে কাটায়। একবার ভাবে ন'মাসে যে ছেলেটা হলো, একবার 'ট্যাঁ' করেই চোখ বুজলো। সে যদি থাকত, তা'হলে আমি বোধ হয় একটু শান্তি পেতাম। আবার ভাবে, না, ভালই হয়েছে সে বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে তার কি পরিচয় দিত ব্রিজদুলারী? জারজ সন্তান! না না, সে বড় দুঃখের, বড় লজ্জার হত।

ব্রিজদুলারী সব ছেড়ে ভগবান্‌কে অবলম্বন করেছে।

সে উপবাস, ব্রত, পূজা ও গঙ্গাস্নান করে। কি শীত, কি বর্ষা, প্রতিদিন গঙ্গায় যায়। ভাবে, 'গঙ্গামাঈয়ের জলে স্নান করে কত পাপী, কত তাপীই ত' পরিত্রাণ পেল, আমিও কি পাব না? নাকি যারা আমার মতো পাপী হয় গঙ্গামাঈ তাদের কোল দেন না?'

গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে সে সূর্যপ্রণাম করে। হাত জোড় ক'রে থাকে। সাদা পাথরের মূর্তির মতো দেখায় তাকে। চুলে, কপালে জল চিকচিক করে। গায়ে ভেজা কাপড় লেপটে থাকে। উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ গৌরবর্ণ, কুচকুচে কালো চুল, বড় বড় চোখ। অন্য স্নানার্থিনীরা তাকে শুনিয়ে বলে 'দেখ্, দেখ, গঙ্গা নাইতে এসে-ও রূপ দেখাচ্ছে দশজনকে! কত ঢং-ই না জানে!'

ব্রিজদুলারী শুনেও না-শোনার ভান করে। তারপর ত্রস্তে স্নান সেরে ঘটিতে জল নিয়ে সে উঠে আসে। কোন দিকে তাকায় না।

এগারো

গঙ্গার ঘাটে একদিন ব্রিজদুলারীর সঙ্গে চম্পার পরিচয় হয়। শিবরাত্রির পরদিন।

সতীচৌড়ার ঘাটে সেদিন অনেক লোকের ভিড়। বড একটি ছাতার নিচে চৌকি পেতে ঘাট-পাণ্ডা বসে আছেন। স্নান করে উঠে এসে সকলে তাঁর সামনে প্রণামী রেখে যাচ্ছে।

চম্পা চোখ বুজে ডুব দিয়ে ঘটিতে জল ভ'রে উঠে এল। পুরোহিতের সামনে একটা টাকা রাখল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন নিচু হয়ে দুটো টাকা রাখল। চম্পা অবাক হয়ে তার দিকে চাইল। সে কিন্তু চাইল না। চোখ নামিয়ে নিল। ঘাট-পাণ্ডা হেসে বললেন, 'মাতাদের জয় হোক। দু'টি পয়সা পেলে এ ব্রাহ্মণের দিন চলে যায়। তিনটি টাকায় আমার একমাস চলে যাবে।' চম্পা দু'তিন ধাপ সিঁড়ি উঠল।

অন্ধ একটি কিশোরকে তার মা হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে গেছে। হাঁটু মুড়ে বসে আছে সে। ঝুঁকে ঝুঁকে গান করছে, 'বসো মেরে নৈয়ন মে নন্দলাল!'

এক কলি গান গাইছে আর বলছে, 'সুরদাসকে দয়া কর!' মাঝে মাঝে সে চোখ তুলে আকাশের ওপর রাখছে। চোখে সূর্যের তাপ পড়ছে। রোদটা তার চোখের সামনে যখন ঘোলা ঘোলা হয়ে উঠবে, চোখের অন্ধকারটা যখন তরল হবে, সে তখন বুঝবে বেলা হয়েছে। হঠাৎ তার হাতে কে কোমল হাত রাখলো। বলল, 'সুরদাস, টাকা নে!'

চম্পার হাত থেকে সে টাকা নিল। ব্রিজদুলারী ভিখারীদের কাউকে একটি কাউকে দুটি পয়সা দিচ্ছিল, এখন দাসীকে বললো, 'ঐ অন্ধ ছেলেটিকে টাকা দুটি দিয়ে আয়!'

চম্পা তার দিকে চাইল। তারপর একটু ধারালো হাসি হেসে সে ঘাটের ওপর উঠল। সতী-চিতার উপর ছোট ছোট শিলের মতো পাথর। তার উপর জল দিচ্ছিল ব্রিজদুলারী। চম্পাকে দেখে একটি ব্রাহ্মণ বালক এগিয়ে এল। নগদ কিছু প্রাপ্তির আশায় গাল ও গলা ফুলিয়ে বলতে লাগল, 'জল দাও জল দাও! এইখানে সতীরা স্বামীদের পা ধরে আগুনের রথে চ'ড়ে স্বর্গে গেছেন! জল দাও, পুণ্য হবে!'

চম্পা হাসল। তারপর বলল, কেন রে, পুণ্য দিয়ে কি হবে, আমি কি পাপ করেছি? যারা পাপী তারা পুণ্য করুক গে যাক।'

ব্রিজদুলারী হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। চম্পার দিকে একবার আহত, আর্ত চোখে চাইল। তারপর হাতের জল মাটিতে ঢেলে দিয়ে চলে গেল।

চম্পা অবাক হয়ে বলল, 'কি রে, কে মেয়েটি?'

বালকটি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'ব্রিজদুলারী, সাহেবের বিবি! তোমার কথা শুনে চলে গেল, নইলে আমি ওকে সতী-স্তোত্র শিখাতাম, ও আমাকে চারটে পয়সা দিত।'

হাঁ, দিত! তোকে বলেছে!'

'হাঁ, রোজ দেয় যে।'

চম্পা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরল। শিবরাত্রির পরদিন। আজ সে নিজে রান্না করবে। সে দাসীকে চৌকা ধরাতে বলল। তারপর পিঠে চুল ছড়িয়ে রোদে এসে বসল। সম্পূরণ দড়ির খাটিয়া পিটিয়ে ছারপোকা বের করছিল। চম্পা বলল, 'ওসব রাখো। একটা কথা শোন।'

সব শুনে সম্পূরণ বলল, 'চম্পা, ওই তো ব্রিজদুলারী। ব্রাইটের বিবি। আমি চাই তুই ওর সঙ্গে ভাব কর।'

'কেন?'

'কেন তাতে তোর কি দরকার? ওর সঙ্গে ভাব কর।'

একটু ভেবে সম্পূরণ বলল, 'ওর অনেক টাকা ও গয়না আছে।'

চম্পা হাসতে লাগল। বলল, 'আমি কি ওকে গয়না পরে আসতে বলব এখানে? তুমি কি ওর গয়না কেড়ে নেবে?'

সম্পূরণ-ও হাসল। বলল, 'না। তবে ওকে যদি আনতে পারিস তো ভালই হয়। তবে ওকে বোকা ভাবিস না। খুব চালাক মেয়ে। ও জানে এই আঠারোশ' ছাপান্ন সালে যার ঘরে সোনা আছে সে-ই বুদ্ধিমান। দেখনা, একটু একটু ক'রে প্রায় একশোভরি সোনার গয়না ও গায়ে রাখে।'

'কেন?'

'যদি পালাতে পারে, ত সাহেবকে ফতুর করে রেখে যাবে। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে সাহেব কার কাছে বিশ্বাস ক'রে টাকা রাখে। আমার জানতে ইচ্ছে করে, সাহেব এবং অন্য সাহেবেরা রুপোর টাকার বদলে মোহর

নিচ্ছে কি না। আমার জানতে ইচ্ছে করে ব্রাইট সাহেব রেজিমেণ্টের বাইরে কার কার সঙ্গে তেজারতি কারবার করে। তারপর দেখ, আরো অনেক কথা আমার জানতে ইচ্ছে করে, আমি জানতে পারি না। চম্পা, তুই ব্রিজদুলারীর সঙ্গে ভাব কর!'

সম্পূরণ রীতিমতো আবদারের সুরে শেষ কথাটা বলল। বললে, 'যা না, টাকা ধার চা! ও তো দেয়, অনেককে দেয়!'

চম্পা পালকি চড়ে গেল ব্রিজদুলারীর বাড়ী।

ব্রিজদুলারী তাকে কার্পেট, কৌচ সোফা, বিলিতি ছবি ও টানাপাখা সজ্জিত ঘরে বসাল। বলল, 'পান খাবে? তামাক খাবে?'

চম্পা হাতজোড় করে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলো প্রস্তাব। বললে, 'আমাকে তুমি একশোটা টাকা ধার দিতে পার?'

'টাকা ত' নেই। মোহর দিতে পারি।'

'তাই দাও। আমার বালাটা রাখো। যখন টাকা দেব, তখন নেব।'

'ছি, আমায় তুমি লজ্জা দিচ্ছ!'

চম্পা এ-কথা সে-কথা বলল। ব্রিজদুলারী তাকে নিজের বাড়ী দেখাল। চম্পার পালকী বেহারাদের এবং দাসী-দাসীকে মিষ্টি পাঠাল; চম্পাকে একটি রেকাবী ধ'রে বলল, 'অন্তত একটা পান খাও!' চম্পা একটি পান নিল।

সে যাবার সময়ে ব্রিজদুলারী বলল, 'একটা কথা বলব?'

'বল।'

'সত্যিই কি টাকা ধার নিতেই এসেছিলে?'

'না। তোমার সঙ্গে ভাব করবার ইচ্ছেও ছিল। শুধু যদি টাকাই দরকার হতো, তা হ'লে ত' একটা খত্-ই পাঠিয়ে দিতে পারতাম, বালা-ও দিয়ে দিতাম সঙ্গে।'

'সত্যি আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলে?'

'হ্যাঁ। এবার তুমি এসো একদিন।'

সত্যিই ব্রিজদুলারী এল। পালকী চড়ে, আম্মা সঙ্গে নিয়ে। তারপর চম্পা একদিন গেল। আবারও গেল। কিছুদিনের মধ্যেই দু'জনের বেশ ভাব হল।

সম্পূরণ খুব খুশী হলো। নিজের ঘরটা সে ছেড়ে দিয়ে সরে যায় জদুলারী এলেই। বাজার থেকে খাবার পাঠিয়ে দেয়।

ব্রিজদুলারী একদিন বলল, 'বেশ মজার ব্যাপারই হলো! আমাকে াই ঘেন্না করে. তোমাকে সবাই ভালোবাসে। আমাদের দু'জনের বন্ধুত্ব খে সবাই না জানি কি ভাবে।'

একদিন ব্রিজদুলারী পালকী চ'ড়ে সিধা সাজিয়ে নিয়ে এল। বলল, পা, আজ আমি আর তুমি রান্না ক'রে খাব। কেমন?'

'সাহেব বুঝি নেই?'

'আছে। আমি বলে এসেছি। শোন, আমি আমার ঠাকুরকে দিয়ে আনিয়েছি! তুমি রান্না ক'রো, আমি খাব। আমি না হয় তোমার রান্নাঘরে ঢুকব না।'

'কেন?' একটু ভেবে তবে চম্পা বুঝল। সে হাসল। বলল, 'তুমি ঝি ভাবছ তুমি আমার জাত মারবে? না গো, আমি একমাস সাহেবের র, সাহেবের চাকরের রান্না খেয়ে এসেছি। তোমার হাতে জাত দেব ই জন্যে কি আর অপেক্ষা করেছি আমি? অনেক অনেক আগেই ছোঁয়াছুঁয়ির চাব ফেলে এসেছি। কে জানে, তাতে জাত আছে, না গেছে!'

ব্রিজদুলারী খুশী হয়ে মাটিতেই বসে পড়ল।

সে ছুরি দিয়ে আলুর শাক কুচোতে লাগল। উৎসাহে অধীর হয়ে সে লে নুন দিল না, তরকারীতে দু'বার লবণ দিল। আলুর শাক এবং কপির াজি বাসনে না ঢেলে অন্যদিকে চেয়ে গল্প করতে করতে খানিক মাটিতে, নিক বাসনে ঢালল। হাঁড়ি বসিয়ে তাতে চাল দিতে ভুলে গেল এবং াতটা নামাই' বলে ভাত নামাতে গিয়ে শুধু জল ফুটছে দেখে হেসে কুটি-টি হ'ল। দামী শাড়ী ঘি, তেল ও মশলায় মাখামাখি হ'ল।

খাওয়াদাওয়ার পর চম্পার উঠোনে নিমগাছের ছায়ায় বসে তারা গল্প রতে লাগল। অনেকদিন ব্রিজদুলারী এমন আনন্দ পায়নি। চম্পার ঘুম চ্ছিল, তবে সে কথা ব্রিজদুলারীকে বলতে তার মাথা হয়। খুব রীব একটা মেয়েকে খুব দামী একটা খেলনা দিলে যেমন খুশী দেখায়, জদুলারীকে তেমনিই দেখাচ্ছিল। যেন এমন আনন্দের, এমন নিশ্চিন্ততার ন তার জীবনে আর আসেনি। মনে হচ্ছিল ওর বয়সটা কমে গিয়েছে।

চম্পা, একটা কথা বলতে সাধ হচ্ছে, বলব?'

'আমার নিজের কথা বলতে ইচ্ছে করছে!'

চম্পা কৌতূহলী হয়ে চেয়ে রইল। ব্রিজদুলারী থেমে থেমে, অগোছালো ভাষায় বলতে থাকে, 'জান, খুব ছোট্ট আমাদের গ্রাম সিধারণ। সেই গ্রামের ঠাকুরসাহেব আমার বাবা। বাবার জমিজমা নেই। বাবা বড় টাকা ভালবাসেন।' তাড়াতাড়ি কৈফিয়ত দেবার সুরে সে বলে, 'বাবার দুই বিয়ে কি না! অনেক ভাইবোন আমরা। টাকা না হলে চলবে কেন বল?'

একটু চুপ করে থেকে সে বলে, 'জান, শুনেছি খুব ছোটবেলায় আমার বিয়ে হয়েছিল। আর সেই ছোট বেলাতেই আমি বিধবা হয়েছি।'

খুব হাসল ব্রিজদুলারী। বলল, 'চারমাসের মেয়ে আর একবছরের ছেলের বিয়ে, ভাব ত, সে কি বিয়ে? আবার পাঁচবছরে না পড়তে বর গেল মরে! আমি তখনো কাপড় পরি না। শীতকালে মা গলা বুক ঢেকে একটা কাপড়ের টুকরো বেঁধে দেয় শুধু! কোন জ্ঞানই নেই। তা তখনই আমার কপাল পুড়লো!'

হেসে হেসে কথাগুলো বলে ব্রিজদুলারী। যেন এটা একটা হাসির কথা। যেন তার জীবনের মস্তবড় একটা দুর্ঘটনার কথা নয়! বলে, 'ছ'বছর আগে সাহেব গ্রামে তাঁবু ফেলল। আমাকে বুঝি কেমন করে দেখেছিল।'

'তারপর? তারপর কি হ'ল? কেমন করে তোমাকে সে তুলে নিয়ে এল, কেমন ক'রে তোমাকে তিলে তিলে, প্রতিদিন একটু একটু করে মারবার অধিকার ও পেল?' এই সব কথা জানতে ইচ্ছে হ'ল চম্পার। তার ইচ্ছে হ'ল চীৎকার করে এসব কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সে একটি শব্দও করল না। ব্রিজদুলারী বলে, 'আমার বাবাকেও অনেক টাকা দেয়। আমার ভাইকে ও চাকরি দেয়। আমি, আমি দেখতে খুব সুন্দর ছিলাম, ওর খুব পছন্দ হয়েছিল!'

ব্রিজদুলারী চম্পার মুখটা দেখে বুঝতে চেষ্টা করল চম্পা কিছু ভাবছে কি না! তারপর বলল, 'তুমি হয়ত ভাবছ আমার বাবা আমাকে বেচে দিয়েছে। টাকার লোভে সাহেবের হাতে তুলে দিয়েছে। না না, তা ভেব না। বাবা আমাকে খুবই ভালবাসত। আমি রোজ বাবাকে তামাক সেজে দিতাম। বাবাকে দুধ জাল দিয়ে দিতাম। বাবা আফিং খেত কি না! আমার মা, আমার ছোট-মা সবাই আমায় ভালবাসত।

আমার মা-র পেটে আমরা চারজন। ছোট-মার বছর বছর ছেলে হত। ছেলেদের ত আমিই রাখতাম! সবাই দুঃখ পেয়েছিল। বাবা কি করবে বল, সংসারে টাকারও ত দরকার হয়!'

'তোমার বাবা, ভাই, কেউ আসে না?'

'আমার ভাই মাঝে মাঝে আসে। টাকা নিয়ে যায়।'

'তোমাকে নিয়ে যায় না কেন?'

'ছি, তা কখনো পারে? এখন আমি গেলে কি বাবা আমায় ধরে তুলে নিতে পারবে? জাত যাবে না? গ্রামে বাবার যে খুব সম্মান।' ব্রিজদুলারী একবার নিশ্বাস ফেলে। বলে, 'আমার ভাই ছোট বোনটির বিয়ের জন্যে আমার কাছে একছড়া হার চেয়েছিল। আমার গহনা ত একটিও দেবার হুকুম নেই! আমি দিতে পারলাম না। ভাই কত রাগ করল। সেই থেকে আজ একবছর আসেনি। আমার কত জানতে ইচ্ছে করে, ওদের খবর নিতে ইচ্ছে করে, কি করব বল!'

'আর কেন আসবে বল, তোমাকে বিক্রি ক'রে ওরা চাকরি কিনেছে, সুখ কিনেছে, তোমাকে দিয়ে ওদের আর কি দরকার আছে বল। চম্পা হঠাৎ একটা কড় প্রশ্ন করল, 'তোমার মরতে ইচ্ছে হয় নি?'

ব্রিজদুলারী অবাক হয়ে চাইল। শিশুর মতো বিস্মিত তার চাহনি। সে বলল, 'ইচ্ছে হয়েছিল ত! কিন্তু মরতে নেই। আমাকে একজন বলেছিল।'

'কি বলেছিল?'

'সে বলেছিল মরবার কোন মানে হয় না। বলেছিল কেমন করে বাঁচতে হয় তা সে জানে। আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।'

'গেলে না কেন?'

'সে আমাকে অনেক আশ্চর্য কথা বলেছিল। আমার মধ্যে, সব মানুষের মধ্যেই নাকি দেবতা আছেন। সে যা বলেছিল তার অর্থ আমি বুঝিনি। শুধু কথাগুলি তোমাকে বলছি। তুমি যদি বুঝতে পার বুঝে নিও। বলেছিল যে-জীবন যাপন করতে গিয়ে মানুষের মানব-জীবনের ওপরেই ঘেন্না হয়, মরতে ইচ্ছে যায়—সে-জীবন যাপন করতে নেই, তাতে দেবতাকে অপমান করা হয়। সে আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল।'

'গেলে না কেন?'

'চম্পা, আমার সাহস ছিল না। আমি ভয় পেতাম।'

'কেন?'

'চম্পা, ভয় পেতে পেতে আস্তে আস্তে আমি সব সাহস হারিয়ে ফেলেছি তা আগে বুঝিনি। যখন তার সঙ্গে যাবার সময় হ'ল তখন আমি এতটুকু সাহস খুঁজে পেলাম না।'

ব্রিজদুলারী নিমগাছের একটি পাতা আনমনে কুচি কুচি করে ছিঁড়ল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'জান, ভেবেছিলাম তাকে ভুলে গেছি। কিন্তু ক'দিন ধরে তার কথা, শুধু তার কথাই মনে পড়ছে।'

'ব্রিজদুলারী, সে কি অনেক দূরে থাকে?'

'না চম্পা। সে এখন এই শহরেই এসেছে।'

'তার সঙ্গে দেখা করতে পার না?'

'না চম্পা। সে আমার ঘরের কাছে আছে, সে আমার মনের মধ্যে আছে। তাকে দেখতে প্রাণ চায়। তবু তাকে আমি দেখতে পারি না। আর, কাছে যেতে পারব না যখন তখন চোখে দেখে লাভ কি বল?'

'আর যেতে পারবে না কেন?'

'আমার যে সাহস নেই। আমি যে ভীরু হয়ে গেছি আরো। সে আমাকে দেখলে আরো কষ্ট পাবে।'

চলে যাবার সময়ে ব্রিজদুলারী তার হাত ধ'রে বলল, 'আজকের দিনটা বড় ভাল লাগল। এ দিনটার কথা আমার খুব মনে থাকবে।'

সে চলে যেতে যেতে পালকীর পর্দা সরিয়ে আবার একটু হাসল। চম্পার বুকটা বেদনায় ভারী হয়ে রইল কিছুক্ষণ। সে ব্রিজদুলারীকে ভালবেসেছে। ব্রিজদুলারীর জন্যে তার কষ্ট হ'ল, খুব কষ্ট হ'ল।

বারো

তারপর চম্পা সত্যিই একদিন ডেরাপুর গ্রামে চলে এল।

সে সম্পূরণকে সঙ্গে নিয়ে এল। আসবার সময়ে নিজের সবগুলি গহনা পরল। ব্রিজদুলারীর কাছ থেকে তার সাত-লহরী হারটি চেয়ে নিল দু'দিনের জন্যে। মেঝের ইঁট তুলে টাকা নিল, মোহর নিল।

গ্রামে আসবার জন্যে হাজিপুর থেকে বড় একটা পালকী ভাড়া করল। বড় পালকী, দু'জনে মুখোমুখি বসল।

চম্পাদের ঘরটা ভেঙ্গে পড়েছে। কৌশল্যার ঘরেই উঠল সে। চম্পাদের উঠোনে গ্রামের লোক ভিড় ক'রে এল। তারা অবাক হয়ে দেখল চম্পা উঠোনে শতরঞ্জি বিছিয়ে বসেছে। রুপোর ডিবে থেকে পান খাচ্ছে। তার দুই হাতের আঙ্গুলে আটটা আংটি। গলায় সাত-লহরী হার, পরণে লাল রেশমের শাড়ী, ভেলভেটের আঙিয়া। ভারী রেশমের চাদরের প্রান্তে ছোট ছোট রুপোর ঝুমকো দুলছে।

চম্পা সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান জানাল। প্রথমে লালার মা কাঁদতে কাঁদতে ঢুকল। সে আগে সুরজের নাম ক'রে খুব কেঁদে নিল। চম্পাকে কেঁদে কেঁদে বলল, 'তোকে রেখে এসে আমারও শান্তি ছিল না! হীরুয়া আর গাড়োয়ানদের নিয়ে কত খুঁজলাম!' তারপর কান্না থামিয়ে চম্পার হাতের গয়না নেড়ে নেড়ে আন্দাজ করতে চেষ্টা করল—সোনা, না গিলটি!

আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ল। এ-বাড়ী ও-বাড়ীর মেয়েরা এল। ছোট ছেলে মেয়েরা ভিড় ক'রে রইল। কৌশল্যা খুব গর্ব অনুভব করল। এত লোককে বসতে দেবার মত আসন নেই তার। তেওয়ারীদের বাড়ী থেকে খাটিয়া আনা হ'ল। সকলেই খুব কৌতূহলী। চম্পা, তাদের পরিচিত চম্পা, ডাকাতরা যাকে ধরে নিয়ে গেল— ডাকাতরা ধরবার আগের দিনও লালার মা-র সুপারির কনোই-টি হারিয়ে ফেলে যে বকুনি খেয়ে কেঁদেছিল, সে কোথা থেকে এত ঐশ্বর্য পেল? খাঁটি সোনার ভারী গয়না, রুপোর পানবাটা, মাথায় আসল মুক্তোর সিঁথি। তারা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে চাইল কিন্তু সাহসে কুলোল না।

শেষ অবধি কেশবরাম-ও এল। কৌতূহলকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। কেশবরাম এসেই বলল, 'আমি জানতাম তুই একদিন রাণী হবি, তোর মা-কে আমি সে কথা বলেছিলাম।'

চম্পা মুখ নিচু করে হাসি গোপন করে। তারপর আস্তে আস্তে বলতে শুরু করে, 'আজ আমার বড় সুখের দিন। আজ আমার ঘরে তোমরা এতজন পায়ের ধুলো দিয়েছ! আমি ধন্য হলাম। আমার কয়েকটি নিবেদন আছে। গ্রামের পাঁচজন যদি অনুমতি দেয় ত' বলি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বল তুমি! তুমি আমাদেরই মেয়ে, আমাদের কাছে কথা বলবে, তাতে কি হয়েছে!'

'আমি এই মোহরটি গৈবীনাথের নামে কেশবকাকার হাতে দিলাম। আর এই মোহরটি দিলাম, এটি পাথরে বাঁধিয়ে আমার মায়ের নাম সে পাথরে লিখে দিতে হবে। পাথরটি সিঁড়িতে থাকবে। মা-র তাতে পুণ্য হবে। গৈবীনাথের মন্দিরে দেশ-দেশ থেকে মানুষ আসে। তারা কত তীর্থ ঘুরে আসে। তারা যখন এই পাথরে পা রাখবে আমার মা-ও তাদের পুণ্যের অংশ পাবে।'

'বা! বেশ, বেশ! ভাল কথা বলেছে চম্পা! ভাল কাজ করেছে!—' এক একজন এক একটি মন্তব্য করল।

'পণ্ডিতজীর ঘরটি দেখলাম ভেঙ্গে পড়েছে। পণ্ডিতজী, আপনার পাঠশালায় ভাল পোড়ো ছিলাম না। আমি আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি। অমৃত আর চন্দনকে মারবেন বলেছিলেন, আমি আপনার বেত চুরি ক'রেছিলাম। অনেক দোষ করেছি ছোটবেলায়। তখন জ্ঞান ছিল না। আপনি এই দুটি টাকা রাখুন, আমার প্রণামী। আর এই তিনটি টাকা, ঘর সারিয়ে নেবেন। পণ্ডিতজী, আমি জানি ভাঙাঘরে থাকবার কি জ্বালা! কি শীত, কি বর্ষা, ভাঙাঘরে যারা থাকে, তারা সব সময়েই কষ্ট পায়!'

পণ্ডিতজী অভিভূত হলেন। তিনি তাঁর স্থবির, কম্পমান হাতটি তুলে চম্পাকে আশীর্বাদ করলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'কত ব্যাটা আমার কাছে লিখতে পড়তে শিখে তেজারতি কারবার করে। শ'য়ে শ'য়ে টাকা কামায়। কেউ মনে রাখে না, কেউ মনে রাখে না!'

চম্পা একটু চুপ ক'রে রইল। গলাটা পরিষ্কার করল। তারপর চোখ তুলে চাইল। না, এতজন এসেছে, প্রতাপ বা চন্দন আসেনি। ওরা আসবে না। কেন আসবে? সোনা, দানা, রেশম, পশম, সে-সব ওরা অনেক দেখেছে। তা ছাড়া, চম্পাকে বোধ হয় ওরা এখনো ঘেন্না করে, চন্দন-ও! সে বলতে থাকে, 'আমার বাবার যে দু'বিঘে জমি লালা কাকা কিনে নিয়েছিল, তার দাম কত জানি না। আমি কৌশল্যার নাতিকে পঁচিশটি টাকা দিচ্ছি।'

'পঁ-চি-শ টাকা!'

'বাপ্ রে, একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়!'

'পাঁচটা দুধ-গাই হয়!'

'কৌশল্যার এক বছরের খরচ!'

চম্পা সব শুনল। তারপর বলল, 'কৌশল্যাকে দেব না ত' কাকে দেব?

ও আমার মা-কে দেখেছে, আমায় দেখেছে। ওর নাতি পরের ক্ষেত থেকে, গাছ থেকে, মকাই-কুল-পেয়ারা এনে আমায় খাইয়েছে দুঃখের দিনে। তোমরা পাঁচজন আছ, তোমরা দেখ, ও যেন না ঠকে। সে দু'বিঘা জমি ওকে কিনিয়ে দাও। ও সেই জমি ভোগ করুক, ঘর সারিয়ে নিক, একটু সুখে থাক! ওরা পেট ভরে খেতে পেলে, নতুন ঘরে শুতে পেলে আমার মা শান্তি পাবে।' চম্পা হাত জোড় করে বলল, 'আমার আর একটি মাত্র কথা আছে। আর দু'টি মোহর আমি কৌশল্যার নাতির হাতেই দিলাম। আমার মা-র নামে একটা ইঁদারা ক'রে দিতে হবে। তার গায়ে লিখে দিতে হবে, ঈশ্বর সুরজকুমারী, ঈশ্বর অনন্তরামের বিধবা-র ইঁদারা। সেই ইঁদারা থেকে সবাই জল নেবে। গরমের দিনে পরের ঘর থেকে জল আনতে আমার মা বড় কষ্ট পেয়েছে।'

কেশবরাম গলা খাঁখারি দিল। বলল, 'চম্পা, তুই যা বললি, ভালই বললি। তবে আমার একটা কথা আছে। তোদের বাড়ী ত' একপাশে! ক'জনই বা এখানে জল নিতে আসবে? পণ্ডিতজীর বাড়ীর সামনে জ্ঞাবতলীর পথে যে ইঁদারাটা আছে, ওটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওর পাড় ভেঙে গেছে, ওর গর্ত বুজে যাচ্ছে। ও ইঁদারাটা তুই নতুন করে সারিয়ে দে! ও ইঁদারা গ্রামের কারো নয়। অনেক আগে তালুকদারের বিধবা ও-টি করিয়ে দিয়েছিল পাঁচজনের জন্যে। হাটে বাজারে আসতে যেতে মানুষ জল পায় না, বৈশাখের রোদে তারা লালাদের বাড়ী যায়!'

'বেশ, তাই হোক!'

চম্পা ক্লান্তি বোধ করছিল। সে ভেবেছিল এই সব মানুষের সম্পর্কে তার মনে অনেক অভিযোগ আজ-ও জমে আছে। এদের সে ক্ষমা করতে পারবে না। কিন্তু দেখল, না, এদের আঘাত দেবার মত জোর সে খুঁজে পাচ্ছে না।

লালার মা মুখ খুলল। সে বলল, 'চম্পা, তুই দিলি, তা ভালই করলি। তোর কাজ তুই করলি। কিন্তু আমি এবার পুরুষদের একটা কথা শুধোব। আমি শুধোই, তারা কি টাকা মোহর আগে চোখে দেখেনি? তারা কেউ ত জানতে চাইল না কেমন ক'রে তুই এত টাকা, এত মোহর পেলি? এ টাকা পাপের টাকা কি না?'

চম্পা তীক্ষ্ণ হাসল। বলল, 'দাদী, আমি জানি এ কথাটা উঠবে। আমি শুধু ভাবছিলাম কে কখন কথাটা তোলে! দাদী, আমার টাকা পাপের কি না, আমি সে জবাব দেব না। তবে এবার বলি, কেশবকাকার কাছে বারবার আমরা শুনেছি সোনায় রুপোয় দোষ নেই! ঐ গৈবীনাথের নাম ক'রে ওর হাতে, ঘাটমপুরের ঠাকুরসাহেবের মেয়েমানুষ সেই বাইজী পাঁচটা মোহর দিয়েছিল। তার ছেলের অসুখে সে মানত করেছিল। সে মোহর নিয়ে যখন কথা হয় কেশবকাকা বলল, সোনায় রুপোয় দোষ নেই!'

'ঠিক ঠিক!' সবাই প্রতিধ্বনি করল।

'আমি সে কথা মনে রেখেছি। দাদী, আমি মন্দিরে মোহর দিয়েছি! ইঁদারার জন্যও মোহর দিয়েছি। কেন দিয়েছি? না সোনা দিলে সবাই নিতে পারে। দাদা, আমি যা দিয়েছি ভক্তি করেই দিয়েছি, ভালবেসে দিয়েছি। পণ্ডিতজীর ভাঙা ঘর তোমরা সবাই দেখেছ, কেউ ত' বুড়ো অসহায় মানুষটার ঘর সারিয়ে দাওনি? তোমার মতো আরো কতজনের ঘরে কাহন কাহন খড় আছে, বস্তাভরা গম আছে, জালা ভরা দুধ ঘি আছে। কৌশল্যার নাতিটার নাম ক'রে কেউ এককাহন খড়, এক মুঠো গম কি দেয়? দাদী তোমরা সংসারী মানুষ। তোমরা ফেলে-ছুঁড়ে দিতে পার না। তাই আমি দিয়েছি। আমি আর একটা কথা-ও বলি, আমি তোমাদের মেয়ের মতো, আমি ভালবেসে দিলে তোমরা সে দান যদি ফিরিয়ে দাও, শুধু কি আমারই কষ্ট হবে? তোমাদের কষ্ট হবে না?'

লালার মা বিভ্রান্ত হয়ে চুপ ক'রে গেল। বলল, 'বাপ রে চম্পা! তুই এমন ক'রে গুছিয়ে কথা কইতে শিখেছিস? আমি একটা উত্তরও দিতে পারলাম না?'

সবাই সভাভঙ্গ করল। চম্পাকে কেউ যেতে বলল না বটে, কিন্তু এ-বাড়ী ও-বাড়ী থেকে তার জন্যে মিষ্টি, আচার, কাঁচা দুধ, পাঁপড় এবং ঘি এল। কৌশল্যা দেখে অবাক হ'ল। চম্পা বলল, 'অবাক হ'স কেন নানী? এ-ত' আমাকে দেয়নি ওরা! আমার কাপড়কে গহনাকে দিয়েছে!'

গ্রামের পথে চম্পা প্রতাপকে দেখল। প্রতাপ তার দিকে তাকায়নি। চাষীদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছিল, চম্পা দেখল, প্রতাপের কানের পাশের চুলে পাক ধরেছে। তার গায়ে ময়লা জামা। পিঠ সামনে ঝুঁকে

পড়েছে। পায়ের পেতলের ফুলতোলা ভারী নাগরা ধুলোয় ভরা। চম্পা অবাক হ'ল। প্রতাপ কোনদিন ময়লা কাপড় জুতো পরত না। প্রতাপ চিরদিন সোজা হয়ে হাঁটত। কোন্ দুঃখে সে এমন শীর্ণ হয়ে গেল, কোন্ ভাবনার বোঝা বহন করে তার শরীর নুয়ে পড়ল চম্পার জানতে ইচ্ছা হ'ল।

চম্পা বটগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু বটগাছের পাশে ও কে দাঁড়িয়ে আছে? শীর্ণ মুখ, ক্লান্ত চাহনি। হাতে চুড়ি বালা ঢল ঢল করছে। এক হাত কপালে রেখে সামনের দিকে চেয়ে আছে!

চম্পা থমকে দাঁড়াল। নিঃশব্দে সে সরে আসতে চাইল। ঐ মানুষটিকে সে কাল থেকে খুঁজছে। ওকে শোনাবে বলে মনে মনে কথাগুলি চম্পা বার বার উচ্চারণ করেছে—'দুর্গাকাকী, দেখ তোমার কথা সত্যি হয়েছে। দুর্গাকাকী, আমি রমজানি হয়েছি। আমাকে তোমার অভিশাপে বাজারে দাঁড়িয়ে রূপ ও যৌবন বিক্রি করতে হয়েছে। তুমি এমন অভিশাপ আর কাউকে দিও না। তোমার মুখের কথা ভগবান শোনে, সে কথা সত্যি হয়। দেখ, আমার বুক হা হা ক'রে জ্বলছে। তুমি শান্তি পাবে বলেছিলে যে। আমার জ্বালা দেখে তোমার যে শান্তি পাবার কথা ছিল।'

চম্পা কিছুই বলতে পারল না। পালিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু দুর্গা তাকে দেখেছে।

'চম্পা।'

চম্পা কানে আঙুল দিল। 'দুর্গাকাকী, তুমি যদি আমাকে ডাকবে তবে তোমার সেই ভীষণ, রুক্ষ গলায় ডাক! আমাকে এমন দীন এমন ভীরু স্বরে ডেক না। আমি সইতে পারব না!'

'চম্পা!'

কাছে এল দুর্গা। মাথার আঁচল খসে পড়েছে। সে বলল, 'চম্পা, আমি জানতাম তুই এখানে আসবি। তুই এসেছিস শুনে আমি তোকে একবার দেখব বলে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। চম্পা, চন্দন কোথায়?'

'কাকী, আমি জানি না।' চম্পা কাঁদছে।

'জানিস না?' হা হা করে কেঁদে উঠল দুর্গা, 'তুই জানিস চম্পা, তুই তাকে একবারটি ফিরিয়ে দে, আমি তারপর তোর হাতেই তাকে দিয়ে দেব। আমি তাকে ধরে রাখব না।'

'কাকী, আমি তোমার ছেলের নামে শপথ করছি, আমি জানি না!'

'তুই জানিস না?'

'না কাকী!'

'আমি যে ভেবেছিলাম তোর কাছে তার খবর পাব। আমি যে ভেবেছিলাম সব কথা ভুলে গিয়ে তোর সঙ্গে তার বিয়ে দেব। এ তুই কি করলি চম্পা, তোর জন্যে সে ঘর ছাড়া হয়ে গেল!'

চম্পা চলে এল। চলে আসতে আসতে সে শুনতে পেল দুর্গা বলছে, 'তোদের ছোটবেলার জোড়ী, কেন আমি ভাঙতে গেলাম? আহা সে যে রাগ করে চলে গেল, আমি দোর খুলিনি—তার মুখ দেখিনি! তোকে ডাকাতে নিয়ে গেছে শুনে সে যে কত দুঃখ করে চলে গেল। সে আমাকে একবার 'মা' বলে ডাকল না! আমি যে তার গায়ে একবার হাত দিলাম না, তাকে আদর করলাম না। এমন কেন হ'ল?'

চম্পা গ্রামে আর থাকতে পারল না।

সে ফিরে এল। সে ফিরে এল, আঠার শ' সাতান্ন সালের জানুআরীতে সে কানপুর থেকে বিঠুরে গেল। বিঠুরের উপান্তে এক পরিত্যক্ত মন্দিরে চন্দনের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। সেখানে, বিঠুরেই ইভান্‌স তাকে দেখল।

তারপর চম্পা, চন্দন এবং ইভান্‌স ফিরল কানপুর। চম্পা চন্দনকে নিয়ে ডেরাপুর ফিরে যেতে চাইল, কিন্তু সম্পূরণ তার হাতে হাত রেখে বাধা দিল। বলল, 'চম্পা, এখন কোন কারণেই তুই কানপুর ছাড়তে পারবি না।'

'কেন সম্পূরণ?'

'ইভান্‌স সাহেব তোকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। চম্পা, আমি তোকে এতদিন ধরে একটু একটু করে সব বিপদ থেকে বাঁচিয়ে এসেছি—এখন তুই আমার ঋণ শোধ দে।'

'তুমি আমার সব টাকা সব গহনা নাও সম্পূরণ। আমাকে যেতে দাও।

'না, তোকে থাকতে হবে।'

'যদি না থাকি?'

'দেখিস, ঐ চন্দনই তোকে থাকতে বলবে। চন্দনই বলবে এখন ...রাপুরে যাবার সময় নয়। চম্পা, চন্দনের বুদ্ধি আছে।'

আশ্চর্য, চন্দনও চম্পাকে সে কথাই বলল। চন্দন বলল, 'এখন যাবার ...ময় নয় চম্পা। এখন আমি যেতে পারি না।'

'চন্দন, তোমার বাবা, তোমার মা? তাদের কথা ভাব।'

চন্দন অতি দুঃখে বিষণ্ণ মলিন হাসি হাসল। বলল, 'চম্পা আমাকে ...রা যেতে দেবে না। আমি জড়িয়ে পড়েছি।'

'কিসে, চন্দন?' চম্পা-ও ভয় পেয়েছে।

'জানি না চম্পা। আমি নিজেই জানি না।'

'যদি আমরা চলে যাই?'

'বিশ্বাসঘাতককে ওরা বড কঠিন শাস্তি দেয়। সালেহ্‌ মাহ্‌মুদের ...ত লোক-ও ওদের এড়াতে পারে নি।'

সরকারের রেণ্ট কালেকটার সালেহ্‌ মাহ্‌মুদের গুপ্ত হত্যার খবরে ...খন সবাই বিস্মিত বিহ্বল। সালেহ্‌ মাহ্‌মুদ, একটি হিন্দু উকিল এবং ...কটি নিঃসম্বল সন্ন্যাসী পরপর নিহত হয়েছে। কে মেরেছে, কেন মেরেছে ...কেউ জানে না। ইংরেজ পুলিশ কালেকটর তিনটি মৃত্যুর মধ্যে কোন ...সূত্র রয়েছে কি না তাই বের করবার চেষ্টা করছেন। তিনটি মৃতদেহ-ই ...চডায় পাওয়া গেছে। তিনটি মৃতদেহের পেটেই ছোরা দিয়ে ক্রুসের ...কারে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

চম্পা স্তিমিত শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'থাক চন্দন, তুমি যেও না। কিন্তু যারা ...রেছে তাদের কি তুমি চেন?'

'চম্পা, চিনলেও আমার কিছু বলবার উপায় নেই।'

'আমি আর জানতে চাইব না।'

'তুমি শুধু আমার ওপর বিশ্বাস রেখ।'

'নিশ্চয়ই রাখব। কবে রাখিনি চন্দন?'

'সম্পুরণ যদি বলে, সাহেবের সঙ্গে ভাব ক'রো।'

'তুমি বলছ?'

'হ্যাঁ। নির্ভয়ে বলছি। আমি তোমায় চিনি। তুমি যে আমাকে ...লবাস চম্পা।'

তেরো

১৮৫৭-র জানুয়ারীতে কানপুরে তিনটি বেঙ্গল নেটিভ ইন্‌ফ্যান্ট্রি রেজি ছিল—ফার্স্ট, ফিফটি থার্ড এবং ফিফটি সিক্স। আর্টিলেরীতে একম ইংরেজ ছিল। কম্যাণ্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর-জেনারেল সার হুইলার কে. সি. বি। দেশীয় গোলন্দাজও মুষ্টিমেয় ক'জন ছিল। কানপু অবস্থানকারী গ্যারিসনে সবশুদ্ধ তিনহাজারের কাছাকাছি পদা অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সেনা ছিল। ইঞ্জিনীআর সংখ্যায় কম। থিও এফ. ইভান্‌স ব্রিগেড-ইঞ্জিনীয়ার-এর পদে নিযুক্ত হয় ছ'মাস আগে।

ইভান্‌স-কে দেখে এবং ইভান্‌স-এর সঙ্গে মিশলে তাকে লাজুক, অপ্র এবং দুর্বল-চরিত্র বলে বোধ হয়।

বয়স বছর ছাব্বিশ হবে। দীর্ঘ, একহারা, খুব সাধারণ চেহারা তা চোখ দুটি যেন সকাতর মিনতি জানাচ্ছে। ইভান্‌সকে অন্য ইংরে 'ইন্‌করিজিব্‌ল ড্রীমার' এবং 'অবোধ স্বপ্নদর্শী' বলে থাকেন।

তার অনেক কিছু-ই তাঁদের কাছে আশ্চর্য বোধ হয়। ইভ ভারতবর্ষ সম্পর্কে অদ্ভুত সব রোমান্স ও রোমাঞ্চ পোষণ করে।

আফগান ও পাঞ্জাব-ফেরত পাকাচুল জঙ্গী বুড়োরা তাকে বোঝাতে করেন, 'ওহে এটা আঠারোশ' সাত্তান্ন সাল। এদেশটা নেহাত-ই মা এদেশের মাটিতে সোনারুপো ছড়িয়ে নেই। পথে ঘাটে বাঘ, সাপ, যে মহাপুরুষ, বা সুন্দরী নাচ-গার্ল এখানে কিলবিল করে না। তোমার ম পুঁথি-পড়া বোকা ত' আর দেখিনি!'

কেউ বলে, সবসময় আকাশের দিকে চেয়ে আছ কেন? ম্যাজিক-কার্পেট ঐ পাঞ্চ বা টাইমসের কার্টুনেই দেখা যায়। অন্য কো নয়।'

ইভান্‌স লজ্জা পায়। বলে, 'তোমরা আমাকে কি ভাব? সব সময়ে কর কেন?' বন্ধুরা বলে, 'ওহে, ইঞ্জিনীআরের কাজ ছেড়ে দাও! চুল রাখ আর কবিতা লেখ।'

'হ্যাঁ, থিও, তোমার কবিতাটা শোনাও না!'

ইভান্‌স রেগে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যায়। বিঠুরের প্রাসা একটি নর্তকীকে দেখে তার ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল বার্টে

রব্যরজনী'-র পাতা থেকে দিনারজাদী বেরিয়ে এসেছে। তার দোষ নেই। সাহেবের প্রাসাদের জাঁকজমক দেখে সে বিহ্বল হয়েছিল। চম্পাকে খ তার উত্তপ্ত কল্পনায় ধরেছিল রং। কানপুরে ফিরে এসে O, Lotus-d maiden,—thou stealest my sleep কবিতাটি লিখে ফেলে। বন্ধুরা দেখল। টমসন এবং ফ্রেডরিক হেসে গড়িয়ে গেল। বলল, 'ওহে স্বপ্নদর্শী, জড়িয়ে পড়ো না যেন! তাহলে ব্রাইটের মতো ফেঁসে যেতে হবে! টো হাফ-নেটিভ। ও যা করে আমাদের কি তা করা পোষায়! হয় তো মেয়েটাকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কর।'

'ছি, সে একজন মহিলা! তার সম্পর্কে ও সব মন্তব্য করো না।' ইভান্স ল।

চটে উঠে টম্সন বলল, 'একটা নেটিভ নাচ-গার্ল, তাকে মহিলা বলছ কি?' র একজন বলল, 'বেশী ভালমানুষী দেখাতে যেও না ইভান্স। তা'হলে লাটি তোমায় হাফ-নেটিভ কয়েকটা বাচ্চা উপহার দেবে। ওরা তোমায় ডি ড্যাডি করবে। দেশে ফিরবার সময় মাইনের টাকা ক'টি রেখে ফতুর ফিরতে হবে, বুঝলে?'

ইভান্স বলল, 'তোমরা কি চুপ করবে?' তার গলা খুবই রুক্ষ নাল।

তারা চুপ করল। কিন্তু রাতে মশারী তুলে সে বিছানায় একটি ছবি তে পেল। ছবিটি একটি নর্তকীর। তার চোখের জায়গায় দুটি পদ্মফুল, ব জায়গায় মেঘ এবং হাতের বদলে চাঁপাফুল আঁকা। পাশে নতজানু স্থায় একটি যুবক। তার বুকে হাত। সে বোধহয় কোন শপথ করছে। ান্স বন্ধুদের মনে মনে গালি দিল।

থিওডোর. এফ. ইভান্স পঁচিশ বছর আগে লণ্ডনের ঈস্ট-এণ্ড-এ এক দ্র পরিবারে জন্মায়। বাবা মা-র কথা তার মনে নেই। জন্মের আগেই র বাবা মারা যান। সে শুনেছে তিনি ভদ্রপরিবারের সন্তান। তার বিয়ে ক'রে বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন। মাত্র দেড়বছর দ দরিদ্র এক পল্লীতে তিনি মারা যান। মা তার জন্মের ক'মাস মারা যান, তা সে জানে না। যে অনাথ-আশ্রমে শৈশব কাটে তার রচালকদের কাছে শুনেছে সে তখন দাঁড়াতে পারত। পরিচালক

মহাশয়ের স্ত্রী বলেছিলেন, 'ছোটবেলার কথা জানতে চেও না। সেবার আঠারোশ' বত্রিশ সালে আমরা আঠারোটি ছেলেকে নিয়েছিলাম।'

'তাদের কি হয়েছিল?'

'তাদের এগারো জনের কোন নাম জানা যায় নি। ছ'জনকে আমরা টম, এবং বাকি পাঁচজনকে পার্সি নাম দিই। মিস্টার হেওয়ার্ড (তাঁর স্বামীকে তিনি সর্বদাই মিস্টার হেওয়ার্ড বলতেন) বলেছিলেন, মেরীঅ্যান, এতগুলো পার্সি আর এতগুলো টমকে ডাকতে পারবে ত? আমি বলেছিলাম আগে থেকে যে-সব টম এবং পার্সি আছে তাদের সঙ্গে গোলমাল হবে না। দেখ থিওডোর, ঈশ্বরের কি বিবেচনা দেখ। সেই বছরই বসন্ত এবং স্কার্লেটফিভারে চারজন টম, তিনজন পার্সি মারা যায়। এক নামে অনেক বাচ্ছা থাকলে যে অসুবিধে হত তা আর হ'ল না।'

'ম্যাডাম, থিওডোর নামের বাচ্চারা কি মারা যায় না?'

'দুষ্ট বালক! তুমি কেন মৃত্যুর কথা ভাবছ? না। থিওডোর নামের বাচ্চারা মারা যায় না, তার কারণ ঐ নামের খুব কম বাচ্চাই অনাথ-আশ্রমে আসে।'

তিনি ইভান্সকে এই বলে সান্ত্বনা দেন, 'তুমি ঠিক অন্য বাচ্চাদের মত নও তো! তুমি একজন প্রপারলি ব্যাপটাইজড চাইল্ড।'

'ম্যাডাম, তাতে কি হয়?'

'তাতে কি হয়? দুষ্ট বালক, তুমি কি বাইবেল পড না? যে শিশু ব্যাপটাইজড না হয়, সে পরিণামে নরকে যাবে।'

ইভান্স এই কথা শুনে কয়েকদিন ধরে খুব ভেবেছিল। তাদের প্রত্যেক দিন ধর্মপুস্তক পড়তে হত। ধর্মপুস্তকে কি কি পড়ত সব কথা তার মনে নেই। তবে নরকবাস ও পাপীর অনন্ত লাঞ্ছনার কথাটা মনে আছে।

শৈশবের কথা মনে করতে গেলে ইভান্সের শুধু একটা পাঁচিলের কথা মনে পড়ে। একটা মস্ত, উঁচু, লাল রঙের পাঁচিল। সে পাঁচিলটা এত বড় যে দোতলা, স্যাঁৎসেঁতে বাড়ীটার ঘর, বারান্দা সব যেন ছায়া-ছায়া হয়ে থাকে। লণ্ডনের ঘোলাটে আকাশ থেকে সূর্য কিছুতেই এ বাড়ীটায় একটু রোদ দিতে পারে না। পাঁচিলটার ওপাশে রাস্তা থেকে কতরকম শব্দ শোনা যায়। সেই শব্দ শুনে শুনে ছোটবেলায় ইভান্স বাইরের জগৎ সম্পর্কে মনে মনে ছবি আঁকত। মাতালের চীৎকার শুনত সে, আপেল, মাফিন এ

অন্য জিনিস ফেরির ডাক আসত, নাবিকদের গলায় গান শুনত, রাস্তায় বয়ে যাওয়া ছেলেদের শিস, হুল্লোড়, শিশুর কান্না, খেঁকি কুকুরের ডাক, পুলিশের সঙ্গে মাছওয়ালী বুড়ীর ঝগড়া, এই সব শুনে শুনে তার অনেক নিঃসঙ্গ সময় কেটেছে। যখন তারা ঘুমোতে যেত, তখন হার্প বাজিয়ে কে কেন চলে যেত পথ দিয়ে। সেই বাজনাটার কথা এখনো মনে পড়ে। কিন্তু সে-দিনগুলোর কথা সে মনে করতে চায় না।

মনে করতে চায় না, তবু মনে পড়ে।

একটা ছোট রোগা ছেলের মুখ মনে পড়ে। তার বয়স বছর নয় কি দশ। রোগা ফ্যাকাশে মুখ, বড় বড় ফ্যাকাশে চোখ, গালে জলের দাগ। ছেলেটা ঘরের মেঝে সাবান-জল দিয়ে ধুচ্ছে। সুপার তাকে শাস্তি দিয়েছেন। দরজায় দাঁড়িয়ে একটা চোদ্দ বছরের ষণ্ডামার্কা ছেলে তারিয়ে তারিয়ে আপেলে কামড় দিচ্ছে। ইভান্স জানে ঐ ছোট ছেলেটার কাজ ঠিকমত হচ্ছে কি না, বড ছেলেটা তাই দেখছে।

মনে করতে চায় না, তবু মনে পড়ে।

ঐ ছোট ছেলেটা রাতে শক্ত ঠাণ্ডা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি ভাবত তাই মনে পড়ে। ছেলেটা ভাবত কেমন করে এই পাঁচিল পেরিয়ে বাইরের জগতে চলে যাওয়া যায়! তার মনে হত, কত ছেলেকে তাদের আত্মীয়-স্বজন খোঁজ ক'রে ক'রে নিয়ে যায়। সে-সব ছেলে হয়তো বাইরে গিয়ে কয়লার খনিতে কাজ করে, নয়তো নোংরা কালিঝুলি মেখে চিমনি পরিষ্কার করে। সে জীবন অনেক ভাল। রোজ তিনবার জলের মতো স্যুপ আর শক্ত কালো রুটি খেয়ে বেঁচে থাকা যায় না।

অথচ প্রতি রাতে ছেলেটাকে এই অনাথ-আশ্রমের জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হত। বলতে হত—'Hallowed be thy name.' জয়দীপ্ত হোক তোমার নাম, হে ঈশ্বর।

জয়দীপ্ত হোক তোমার নাম এই স্যাঁৎসেঁতে ঘরের জন্য। ঠাণ্ডা শক্ত বিছানা এবং পাতলা গরম শার্টের জন্য। জ্বর ও কাশিতে মৃত, সস্তার কফিনে শায়িত ছোট ছোট শিশুদের জন্য, তুমি জয়দীপ্ত হও। তোমার নাম ধন্য হোক।

ইভান্সের মনে পড়ে সেই ছোট ছেলেটা ভাবত মরে না গেলে এই অনাথ-আশ্রম পেরিয়ে সে বেরুতে পারবে না।

অথচ একদিন একজন আধবুড়ো ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে একজন বৃদ্ধা মহিলা এলেন। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল ছেলেটা। ভদ্রমহিলার গোঁফ ছিল, তিনি লম্বা চওড়া ছিলেন, তাঁর হাতে সোনার নস্যিদানী এবং স্মেলিংসল্ট-এর শিশি ছিল। তাঁর গলা গম্ভীর এবং খনখনে। ভদ্রলোকটি ভীতু এবং তিড়বিড়ে। এক মুহূর্ত-ও তিনি স্থির হয়ে বসতে পারছিলেন না। ভদ্রমহিলা যা বলছিলেন তাতেই তিনি— 'হ্যাঁ মিস জেন, নিশ্চয় মিস জেন' ব'লে সায় দিচ্ছিলেন।

ভদ্রমহিলা ছেলেটার বাবার পিসিমা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে তাঁর সামান্য শেয়ার ছিল। তেষট্টি বছর বয়সে তাঁর মনে হয় মৃত ভ্রাতুষ্পুত্রের ছেলের জন্যে তাঁর কিছু করা দরকার।

ইভান্‌সের অনেক কথা মনে পড়ে।

ভদ্রমহিলা তাকে ভালবাসতেন কি না তা সে কোনদিনই বোঝেনি। তবে তিনি তাকে প্রথম দিনই বাড়ীতে এনে গরমজলের টবে ডুবিয়ে দাসীকে দিয়ে স্নান করিয়ে দেন। তাঁর ভাইয়ের একটি পাজামা সুট ছিল। দর্জি এসে ইভান্‌সকে নতুন জামাকাপড় না করে দেওয়া পর্যন্ত তাকে ঐ বড় ঢলঢলে জামা পরে থাকতে হয়।

ভদ্রমহিলার একটি দাসী ছিল। ঠাকুমার চেয়ে ঐ পামেলার সঙ্গে ইভান্‌সের ভাব বেশী হয়। তার ঠাকুমা এবং পামেলার সম্পর্কটা ছিল সেনাপতি এবং তাঁর বিশ্বাসভাজন কোন সচিবের মতো।

বাড়ীর প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁরা পরামর্শ করতেন। পামেলা গম্ভীর ভাবে, গোপন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানাবার ভঙ্গীতে বলত, 'মাস্টার থিওডোর, কাল পুডিং ভালবেসে খেয়েছিল। আজ তাকে চকোলেট পুডিং করে দেব কি?' তার ঠাকুমা বলতেন, 'পামেলা, আমি এ বিষয়ে ভেবে দেখব।' ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি বেল বাজিয়ে পামেলাকে ডাকতেন। গম্ভীরভাবে বলতেন, 'আমি ভেবে দেখলাম আজ চকোলেট পুডিং করা-ই সমীচীন।'

পেটভরে খাওয়াতেন তিনি ইভান্‌সকে। নিজে মিষ্টি খেতে ভালবাসতেন বলে ইভান্‌সের জন্যে নানারকম পুডিং, সিরাপ, কেক, ফল ও পিঠে-র আয়োজন করতেন। ইভান্‌স প্রথম প্রথম বিশ্বাস করতে পারেনি অত খাবার, মাংস, আলু, পুডিং এবং সাদা রুটি সবই তার জন্য। সে প্রথম কয়েকদিন লুকিয়ে ফল ও কেক বিছানায় নিয়ে যেত। শুয়ে শুয়ে খেত।

তার ঠাকুমাটির অনেক বাতিক ছিল।

তিনি চেয়ারের পিঠে সাদা ঢাকনী পরিয়ে রাখতেন। চেয়ারে কেউ হেলান দিয়ে বসলে তিনি চটে যেতেন। বলতেন, 'তোমার জ্যাঠা আলবার্ট চেয়ারে হেলান দিয়ে বসত। ভারি আলসে ছিল। শেষ অবধি তার কিছু হ'ল না।'

তাঁর দুটো বেড়াল আর একটা কাকাতুয়া ছিল। বেড়ালদের ঠাণ্ডা লাগবে বলে তিনি তাদের থাবায় মোজা পরিয়ে রাখতেন। সাদা কাকাতুয়া পোলি ভারি রাগী ছিল। মাঝে মাঝে তার খেয়াল হ'লে সে চেঁচিয়ে বলত, 'হ্যাপী বার্থ ডে টু ইউ।' কাকাতুয়ার খাঁচা হাতে নিয়ে, বেড়ালদের পাশে বসিয়ে ইভান্সকে নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন ঘোড়ার গাড়ী চড়ে।'

খুব মাপাজোকা জীবন ছিল তাঁর। খুব হিসেব করে চলতেন। স্নেহ মমতা প্রীতি বা দয়া কোন অনুভূতির সঞ্চয়-ই বেশী ছিল না তাঁর। কথাবার্তা একটু রুক্ষ-ই ছিল। তবু, ইভান্সের মনে হয় তিনি বোধহয় তাকে ভালবেসেছিলেন। তাকে গরম জামাকাপড় করিয়ে দিতেন, জুতো কিনে দিতেন। তাকে লাট্টু কেনবার পয়সা দিতেন। পামেলা-কর্ত্রীর এই ভাবান্তর দেখে দুধবিক্রেতা বুড়োর সঙ্গে রান্নাঘরে বসে গল্প করত—'ম্যাডাম বুড়োবয়সে বদলে গেলেন! মাস্টার থিওডোরকে উনি বড্ড ভালবাসেন।'

ইভান্সের মনে পড়ে মাঝে মাঝে তাঁর টাকার টানাটানি হত। তখন তার ঠাকুমা আর পামেলা নিচুগলায় ফিসফিস করে কি সব পরামর্শ করতেন। তার ঠাকুমার কাছে পুরনো একটা সোনার ঘড়ি ছিল। সেই ঘড়িটা বের করে পামেলাকে দিতেন তিনি। হব্‌স নামে একজন বেঁটে বুড়ো লোকের জিনিসপত্র বাঁধা রেখে টাকা ধার দেবার কারবার ছিল। সে এসে রান্নাঘরের টেবিলে বসত। চীনেমাটির ছিপিআঁটা জাগ-এ অ্যাপল-সিডার থাকত। তাই হব্‌সকে দেওয়া হত। হব্‌স তারপর রসিদ লিখে দিয়ে কিছু টাকা দিয়ে ঘড়িটা নিয়ে যেত। সেই সব সময়ে, ইভান্সের মনে আছে, খাবার টেবিলে শুধু তার জন্য একটি ল্যাম্বচপ বা অন্য কিছু থাকত। তার ঠাকুমা শুধু স্টু খেতেন, আলু খেতেন, এবং তাকে বলতেন, 'টেডি, আমি ত এখন বুড়ো হয়ে গেছি, বাত হয়েছে, আমার এখন মাংস একটু কম খাওয়াই ভাল।'

কিছুদিন পরে কেমন করে যেন সব ঠিকঠাক হয়ে যেত। আবার পামেলা বাস্কেট হাতে বাজারে যেত। আবার খাবার সময়ে ভাল ভাল জিনিস দেখা যেত। চকচকে কালো সাইডবোর্ডের ওপরে ফল সাজানো থাকত। ইভান্‌সকে লাড্‌স-এ পাঠিয়ে ইঞ্জিনীআর করতে চেয়েছিলেন তিনি। ইভান্‌স তার পড়া শেষ করতে পারেনি। তার আগেই তার ঠাকুমা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে কিছুদিন ইঅকশায়ারে কয়লার খনিতে কাজ করে। কয়লার খনি দেখে তার মনটা খুব বিষণ্ণ এবং বিমর্ষ হয়েছিল। খনিতে কেবলই গ্যাস জমতো, জল উঠতো, নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। একবার একটা দুর্ঘটনা হয়।

ইভান্‌স কর্তৃপক্ষকে বলেছিল সে সময় মত বারবার জানিয়েছে। তবু পিট-এর অবস্থা সম্পর্কে কোন সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নি। এমন কি জল সেঁচে ফেলবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন নি কেউ। ইভান্‌স, তিনটি শ্রমিকের মৃত্যুর জন্যে পরোক্ষে কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করে। ফলে তার চাকরি যায়।

তখন তার ঠাকুমা আরো বুড়ো হয়েছেন। বেড়াল দুটো পালিয়ে গেছে। পোলি তখন ঘাড় গুঁজে রাতদিন ঝিমোয় আর মাঝে মাঝে খনখনে গলায় বলে, 'হ্যাপী বার্থ ডে টু ইউ।'

তার ঠাকুমা তখন শ্রীমতী জেরালডাইন জেরাল্‌ড নাম্নী একজন মহিলার সঙ্গে বসে কেবলই প্ল্যাঞ্চেট করেন ও পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। ঘরের জানালা দরজা বন্ধ। কর্পূর ও ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ বাতাসে ভেসে থাকে। কাগজ পেনসিল নিয়ে বসে থাকেন তার ঠাকুমা আর সে সময়ে তাঁর সঙ্গে কেউ কথা কয় না, সে ঘরে কেউ ঢোকে না। কিন্তু খেতে বসে তার ঠাকুমা একদিন ফোঁস ফোঁস করে কাঁদলেন। বললেন, 'জান টেডি, আমার বোন ম্যাগী আজ সাঁইত্রিশ বছর হ'ল মারা গেছে। সে আমাকে রুপোর কেটলিটা নিয়ে নেবার জন্যে কি রকম শাসাল। অথচ বাবা আমাকে কেটলিটা দিয়েছিলেন, তাঁর চীন-ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন, ওকে একটা রুপোর ড্রাগন-ব্রুচ দিয়েছিলেন।'

কোনদিন বা তিনি চার্চে সেণ্টফ্রান্সিস-এর বাক্সে টাকা ফেলতে যান। বলেন, 'এড্‌ কাকা এখনো তাঁর বদ অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি। তিনি সমানে আমাকে বারমেইড আর সিংগিং গার্লদের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

কোনদিন বা ফিক ফিক করে হাসেন। বলেন, 'পামেলা, রোজি-র মা ছিল। বলল, রোজির বাবা তিন বছর হলো গিয়েছে—ওদের রোজ গা হচ্ছে!'

ইভান্স দেখছিল ঠাকুমার পোশাক জীর্ণ হচ্ছে, তাঁর চশমার কাঁচটা বা মোটা হয়েছে। ইভান্স দেখেছিল সেই সোনার ঘড়িটা হব্স-এর থেকে আর ফিরে আসেনি। সে পামেলার কাছে শুনেছিল তার মার বয়সের সুযোগ নিয়ে তাঁর এ্যাটর্ণী তাঁকে কষ্ট দিচ্ছেন। বুড়ো র্ণী মারা গেছেন। তাঁর পার্টনারের ভাইপো এখন ফার্মের মালিক। ন্সকে পামেলা আরো কতকগুলো রসিদ দেখায়। হব্স জিনিস বাঁধা য় টাকা দিয়েছে। সেই রুপোর ছোট কেটলী, সোনার নস্যিদান, জোড়া বাতিদান, দামী কোট, সবই একে একে চলে গেছে। ইভান্স ছিল সে-সব জিনিস আর ফিরবে না।

তার নিজের ওপর রাগ হয়েছিল। নিজে জেদ না করলে হয়তো কাজটা থাকত। আবার এসে এই অসহায় বৃদ্ধার গলগ্রহ হতে না।

সে কাজের চেষ্টা করে। এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে অতি সামান্য ার ৭াকার ফলে ইভান্সের ঠাকুমা তাকে ভারতে পাঠান। কাজ গাড় করে দেন।

সে চলে আসবার দিন তার ঠাকুমা কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন, 'টেড, য ত' তোমাকে সেই বর্বর দেশে পাঠাতে চাইনি, সে দেশে গেলে মানুষ শ হয়ে মরে যায়, তাদের সাপে কামড়ায়, বাঘে ধরে। টেড, সে দেশে থেকে যায় তারা চার-পাঁচবার মাংস আর মদ খায়, বিশ্রী গালাগালি য, আর আস্তে আস্তে সভ্যতা ভুলে যায়।' তিনি তাকে কাছে লেন।

তাঁর ড্রয়ার খুলে তাকে একটি ছোট্ট মুক্তাখচিত সোনার ক্রশ দিলেন। লেন, 'আমার আর কিছু নেই।'

তাছাড়াও তাকে দশ পাউণ্ড দিলেন। কোথা থেকে দিলেন, কেমন করে লন, তা ইভান্স জানে না। বললেন, 'চিঠি লিখো। অবশ্য আমি আর দিন নেই। আর, একটা কথা রেখো আমার, খবরদার, ও দেশে যেসব লোরা আছে তাদের মেয়েদের কারুকে বিয়ে কোর না। তোমার বংশের

যাঁরা স্বর্গত হয়েছেন, তাঁরা যেন একথা না মনে করেন যে তুমি তাঁদের নামকে কোনভাবে অসম্মানিত করেছ।'

ঘোলাটে চোখ তুলে তিনি একটু হাসলেন। বললেন, 'কাল থেকে প্ল্যাঞ্চেটে তোমার বাবা আর ঠাকুর্দা বারবার আসছে কি না! তারা তোমার জন্যে খুব চিন্তিত।'

ইভান্‌স কি বলবে ভেবে পেল না। তবে পরদিন ভোরে যখন জাহাজ ছাড়ল, তখন কুয়াশাচ্ছন্ন মলিন বন্দরের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনটা ব্যথিত হ'ল। সে বুঝল তার ঠাকুমার সঙ্গে তার আর দেখা হবে না। আর মনে হ'ল, এই একটি মানুষই তার আত্মীয়। এখন সে এই বিশাল পৃথিবীতে একেবারে একা।

সমুদ্রের ঢেউয়ে মাথা ঘুরে বমি করে সে অসুস্থ হয়ে-ই পড়ে রইল ক'দিন। সেই ক'দিন তার মন খুব বিষণ্ণ হয়ে রইল। তারপর একদিন তাদের জাহাজ-কে সাবধান করে দূরের লাইট-হাউস থেকে গম্ভীর ভোঁ শব্দ শোনা গেল। বোম্বাই কাছে আসছে। আরবসাগরের এইখানে অনেক পাহাড়ে দ্বীপ, এবং জলের নিচে চোরা পাহাড় আছে।

জাহাজের গতি শ্লথ হলো। কৌতূহলী ইভান্‌স এসে দাঁড়াল। দূরে, সবুজ সমুদ্রের শেষে, সবুজ নারকেল গাছের মাথা এবং সাদা ঘরবাড়ী দেখা যাচ্ছে। ইভান্‌স ভারতে এল।

বোম্বাই তার ভালো লাগেনি।

বোম্বাই-এ সে বেশীদিন থাকেনি। রুড়কীতে ইঞ্জিনীয়ারদের শিক্ষাকেন্দ্র দেখতে তাকে পাঠানো হয়। তারপর সে বেরিলী ঘুরে কানপুর আসে।

ইংলণ্ডে থাকতেই বই পড়বার ঝোঁক ছিল তার। ওআলটার স্কটের উপন্যাস সে-সব পড়ে ফেলেছিল। সস্তা দামের রোমান্স-ও অনেক পড়েছিল। ভারতবর্ষে এসে প্রথমটা অবশ্য ধুলো, পালকী, মাছি, মশা, ভারতীয়দের উচ্চকণ্ঠে কথাবার্তা বলবার অভ্যাস—এইসব দেখে সে বিরক্ত হয়। মন্দিরের বাজনা শুনে তার কানে তালা লাগত। বোম্বাই-এ গণেশচতুর্থীর শোভাযাত্রা দেখে সে হাসি চাপতে পারেনি। হাতীর মতো শুঁড় এবং স্ফীতোদর দেবতাটিকে তার কৌতুকাবহ বোধ হয়েছিল।

তারপর আস্তে আস্তে সে ভারতবর্ষের প্রেমে পড়ল। বোম্বাই থেকে

গরুরগাড়ী, ঘোড়া, উট ও পালকীতে উত্তর ভারতে যেতে যেতে সে দেখল কি বিশাল এই দেশ ! ছোট ছোট শহর, গ্রাম, পাথরে গাঁথা দুর্গ, সামন্ত রাজাদের রাজধানী, এইসব দেখে তার চোখ বিস্মিত ও মুগ্ধ হ'ল। তারপর তার মনে হলো সে কয়লা খনির ইঞ্জিনীআর হতে পারে নি, কেননা সেখানে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি। হার ম্যাজেস্টি-র ভারতে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনীআর হবার মতো মন বা রুচি তার আছে কি না, তার নিজেরই সংশয় হ'ল। তার হঠাৎ নিজেকে কবি এবং শিভ্যালরি যুগের নাইট মনে হতে লাগল। পাথরের এই দুর্গগুলি যদি শত্রুরা অবরোধ করত, তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে একজন অনিন্দ্যসুন্দরী রাজকন্যাকে বাঁচাতে তার মন্দ লাগত না। ইভান্স ক্লাব-লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে রিচার্ড বার্টনের 'এ পিলগ্রিমেজ টু এল্-মদিনা অ্যাণ্ড মক্কা' এবং ভারতের পটভূমিতে লেখা অন্য লেখকদের আরো কয়টি সস্তা রোমান্স ও ফ্যান্টাসী পড়েছিল।

তারপর চম্পাকে দেখে সে মুগ্ধ হ'ল।

এ-সব মেয়েদের তার বন্ধুরা সোজাসুজি 'মাগী' বা 'বেশ্যা' বলে থাকে। কিন্তু শিভ্যাল্রি-র ধর্মে দীক্ষিত ইভান্স তা পারে না। তার মন, তার রুচি তাকে বাধা দেয়।

সে চম্পার কথা ভাবল। চম্পা যত না সুন্দর, তার চেয়ে তাকে অনেক সুন্দর বোধ হ'ল। তার বন্ধুরা পরমর্শ দিল, ভাল দেখে একটি নিপুণা দৈনা বুড়ীকে টাকা দিলেই সে ভাল দেখে অন্য একটি 'নাচ-গার্ল' যোগাড় করে দেবে। চম্পা-কে সহজে পাওয়া যাবে না।

ইভান্স চম্পার প্রতি দ্বিগুণ আকৃষ্ট হ'ল।

চৌদ্দ

এই সময়ে রেজিমেণ্টে একটি জলসা হয়।

ভারতীয় অফিসাররাই উদ্যোগ করে জলসাটির আয়োজন করেন। চম্পার কাছে-ও আমন্ত্রণ যায়। চম্পা রাজী হয়।

চম্পা ব্রিজদুলারীর সঙ্গে কথা বলছিল।

গঙ্গার ঘাটে বসে দুজনে গল্প করছিল। সেদিন গঙ্গার ঘাটে খুব ভিড় হয়েছে। একটি যুবকের মৃতদেহ ঘাটে এসে লেগেছে, তাই দেখতে সবাই ভিড় করেছে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল মশারী টাঙানো একটি ভেলা ভেসে আসছে। তখনই সবাই উৎসুক হয়। কাছে আসতে দেখা গেল বাঁশের ভেলায় নূতন মশারীর নিচে নতুন মাদুরে একটি বছর সতরোর ছেলে শুয়ে আছে। তার হাতে হলদে সুতো বাঁধা। তার পরণে নতুন কাপড। তার পাশে সরাবাঁধা হাঁড়ি। একছড়া কলা আর তিল হলুদ-ও দেখা গেল।

ব্রিজদুলারীর দাসী বলল, 'বিয়ের রাতে সাপে কেটেছে। দেখ ঐ হাঁড়িতে বোধ হয় সাপটাকে মেরে পুরে দিয়েছে। এই মনে ক'রে ভাসিয়ে দিয়েছে যে কোনো গুণীন যদি দেখতে পায় তবে ওকে তুলে নিয়ে প্রাণ বাঁচাবে।'

'কেমন করে ওকে কাছে আনবে?' বেসম দিয়ে পা ঘসতে ঘসতে চম্পা বলে।

'গুণীনরা মন্ত্র পড়ে চম্পাবাঈ, মন্ত্র শুনলে সোঁ সোঁ করে ঐ ভেলা কাছে আসে। গুণীন তখন মড়া নিয়ে নির্জন বনে চলে যায়। তার যদি মন্ত্রের জোর থাকে তবে ঐ মরা সাপ জ্যান্ত হয়ে উঠে বিস শুষে নেয়, জানলে?'

'মরামানুষ বেঁচে কি ঘরে ফিরে যায়?'

দাসীটি চম্পার অজ্ঞতায় হাসল। সে তামার বাসন থেকে বেসমের গোলা নিযে ব্রিজদুলারীর পায়ের পাতা দুটি মাজল। তারপব বলল, 'চম্পাবাঈ, গুণীন ওকে জীবন দেয়। তারপর বলে—তুই মানুষের সংসারে আর ফিরিস না। তোকে দিয়ে আর কারু কোন কাজ হবে না। আমি তোকে জীবন দিযেছি। তুই আমাব কাছে থাক। যাসনি। তখন মানুষটা বলে—আমাব প্রাণটা যে কাঁদবে, গুণীন। তুই আমাকে ধরে রাখবি জানি। প্রাণটা ত' তুই দিয়েছিস, আমি তোর কেনা গোলাম। কিন্তু আমার প্রাণটা যে ছটফট করবে। গুণীন, তুই আমায় যেতে দে! গুণীন তখন হেসে বলবে, যা, তুই যা। তখন সে মানুষটা ফিবে যাবে। কিন্তু সে দেখবে তাকে দেখে তার বাবা, মা, ভাই, বউ ছেলে সবাই ভয় পাচ্ছে। তারা বলছে, ওরে, তোর জন্যে আমাদের প্রাণটা একটু একটু ক'রে পুড়ছে। কিন্তু তোর নামে আমরা শ্মশানে নিশান পুঁতেছি, তোর বৌটা রাঁড়ী হয়েছে। এখন তোকে ঘরে কেমন করে নিই? সংসারে কেমন করে নিই?'

দাসীটি চুপ করল। তার চোখটা জলে চিকচিক করছে। গলাটা ভার-ভার। চম্পা বলল, 'তুই কার কথা বলছিস?'

'কারো কথা নয় চম্পাবাঈ, সাপেকাটা মানুষ আর একটা গুণীনের কথা। একজনের কথা মনে পড়ছে।'

'তার কথাই বল্।'

'চম্পাবাঈ, সে মানুষটা অনেকদিন দেখে-শুনে মেয়েটাকে বিয়ে করে। অনেক সাধ ছিল তাদের, মেটেনি। মেয়েটার 'গওনা' হ'ল। তার শরীরে বয়সের জল লাগল। তার গা থেকে নতুন কাপড়ের গন্ধ যায়নি, তার হাতের মেহেদী ছাপ ফিকে হয়নি, তখন মানুষটাকে সাপে কাটে। মানুষটা বেঁচে ফিরে এসেছিল। তখন বৌ-টার শ্বশুর ছেলেকে উঠোনে কুঁড়ে বেঁধে দেয়। তিন মাস সংযমে থাকতে বলেছিল গুণীন। গ্রামের পুরুতরা বলেছিল, হ্যাঁ, ছেলেকে তুমি তিনমাস সংযমে রাখ।'

দাসীটি চুপ করল। সে বেসমের বাটিটি ধুয়ে নিল। তারপর ঘটি ভরে জল তুলে মাথার কাঁটা দিয়ে ব্রিজদুলারীর পায়ের গহনা থেকে বেসম খুঁটে তুলতে লাগল।

চম্পা বলল, 'তারপর কি হ'ল?'

দাসীটি মুখ তুলল না। বলল, 'কি হবে চম্পাবাঈ। তারা সে সংযম রাখতে পারে নি। তারপর সবাই মিলে তাদের দোষ দেয়। তারা দু'জন জঙ্গলে পালিয়ে যায়।' 'তবে ত ভালই হলো। তারা এক সঙ্গে ত' রইল।'

'তাই বলছ চম্পাবাঈ। ছেলেটার উপর যে গুণীনের মন্ত্র কাজ করতে শুরু করলো। তারা দু'জন জঙ্গলে লুকিয়ে রইল কতদিন। বনের জানোয়ারের মতো তারা রাতের আঁধারে হাঁটত। বউটা গ্রাম থেকে রাতে রাতে ভিক্ষে করে খাবার আনত। ভুট্টাক্ষেত থেকে ভুট্টা চুরি ক'রে আনত। এমনি করে দুঃখে কষ্টেও তারা সুখে ছিল। কিন্তু শেষে ছেলেটা যেন কেমন হয়ে গেল। আস্তে আস্তে সে সব ভুলে যেতে থাকল।'

'তারপর?'

'এমনি ক'রে দুটি বছর কাটে। ছেলেটা পাগল হয়ে যায়। একটা পাগল আর তার বৌ জঙ্গলে থাকে তা সবাই জানত। চাষারা কখনো কখনো বৌটাকে দেখত। দেখত পাগলটাকে নদীর জলে নাইয়ে দিচ্ছে। ঘাস দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। ভিক্ষের অন্ন খেতে দিচ্ছে। জঙ্গলে পাতার ঘরে ওরা থাকত কি না!'

'তারপর?'

'তারপর একবছর খুব বর্ষা নামে। ক'দিন বিষ্টি থামে না। দুর্যোগে গ্রাম ভেসে যাচ্ছিল। নদীর জল পাড ভাসিয়ে নিচ্ছিল। সেই দুর্যোগ যখন থেমে যায়, তখন ক'জন ভিনদেশী পুরুষ সেই পাগলের খোঁজ করতে আসে। সবাই মিলে জঙ্গলে যায়। একটি বুড়োমানুষ খুব কাঁদে আর খুঁজতে থাকে। তারা দেখে সেই ঘরটার খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে, মাটির দেয়াল গলে গেছে। তারা দেখে ঘরের সামনে একটা কবর গলে পাগলটার শরীর বেরিয়ে পড়েছে। দেখে মনে হয় যেন ও আগের দিনই মরেছে। কবরের পাশে একজোড়া রুপোর চুড়ি পড়ে ছিল। সেদুটো নিয়ে বুড়োটা কত কাঁদে।'

'কেন, বল ?'

'ছেলে বৌয়ের জন্যে কাঁদবে না ? বুড়োটার মন যে আর মানেনি। সে যে ছেলে বৌ-কে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল।'

'বৌটার কি হয় ?'

'কেউ বলে সে মরে গেছে। আবার কেউ বলে, সে শহরে গেছে. কাজ করছে। গ্রামঘরের মানুষ দেখলে নাকি সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর সাপেকাটা মড়া দেখলে তার মনটা বড খারাপ হয়ে যায়। অনেক, অনেক বছর পরে-ও !'

সবাই নিশ্বাস ফেলল। ব্রিজদুলারী এতক্ষণ ঘাড় ফিরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে ছিল। তার বড বড কালো চোখে কোমল বিষাদ। দু'টি চোখে আকাশের ছায়া মাখামাখি। তার ফর্সা হাত দুখানা কোলের উপর এলিয়ে পডেছিল। এবার সে ঘাড ফেরাল। সস্নেহ কোমল গলায় বলল, 'দেখ, মতিয়া দেখ, বাঁশ দিয়ে মাঝিরা ভেলাটা ঠেলে মাঝনদীতে দিচ্ছে।'

'দেখেছি বিবিসাহেব।'

দাসীটি তাডাতাডি ব্রিজদুলারীর পায়ে জল ঢেলে দিল। ব্রিজদুলারী আর চম্পা ডুব দিয়ে উঠে এল। ঘাটের সিঁডি ভাঙতে ভাঙতে ব্রিজদুলারী বলল, 'চম্পা, তুমি একটা কথা জান ?'

'কি ?'

ব্রিজদুলারী বলল, 'বলব। মতিয়ার সামনে বলব না। দাঁডাও, ওকে পাঠিয়ে দিই। তুমি আমার পালকীতে এস। তোমাকে আমি বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

'ভিজে কাপড়ে তোমার অসুখ করবে না?'

'আমার?' ব্রিজদুলারী হাসল। তারপর বলল, 'না চম্পা। আমি আগুনে পুড়ব না, বানে ভাসব না—আমার বড় শক্ত প্রাণ। মাঘমাসের শীতে ভোররাতে রোজ নাইতাম। তখন প্রয়াগে কি শীত! কই, কিছু ত' হয়নি।'

দু'জনে পালকীতে বসল।

পালকী একটু একটু দুলছে আর চলছে। পা দু'টি মুড়ে বসেছে দু'জনে। ব্রিজদুলারী গরম তিলকুট কিনেছে একঠোঙা। চম্পা একটা খাচ্ছে, একটা সে তুলে নিচ্ছে। কথা কইতে কইতে তারা চেঁচামেচি শুনতে পেল।

একটা লোককে চৌকিদার ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে পেছনে কাঁদতে কাঁদতে আর চেঁচাতে চেঁচাতে যাচ্ছে একটা বুড়ী। অনেকগুলো ছোটছেলে মজা দেখতে সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। একটা লালকুকুর খুব ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে পাশে পাশে চলেছে।

পালকী চলছে আর চলছে।

ব্রিজদুলারী বলল, 'নাকে কাপড় দাও চম্পা। মাছের গন্ধ, মাছের বাজার।'

দু'জনে নাকে কাপড় দিল। ব্রিজদুলারী বলল, 'রেজিমেণ্টে ওরা কেন মাছ খায় কে জানে!'

তারপর একটু ভেবে নিজেই জবাব দিল, 'মাছ খেলে বুদ্ধি খুব সাফ হয়।'

চম্পা অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল। পথে কত মানুষ, কত কাজে চলেছে। খচ্চরের পিঠে চামড়া বোঝাই দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওরা চামড়ার ব্যাপারীদের লোক। বাসনের দোকানে হাপরের আগুনে রাঙা মুখ করে একটা বুড়ো কি যেন ঠুকছে ঠং ঠং ক'রে। ঐ মেয়েছুটো ধোপানী। মাথায় কাপড়ের বস্তা! সঙ্গে ছোট ছেলে। এখন ওরা ঐ দূরে, গঙ্গার নালাটার কাছে বড় পুকুরে কাপড় কাচবে। গঙ্গার জল এখন ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। ও জলে কাপড় কাচে না।

পালকী চলছে আর চলছে।

মিঠাইয়ের দোকান থেকে ঘি-এর গন্ধ আসছে। পথে শালপাতা উড়ছে। নেড়াকুকুর ধুলো শুঁকছে, ছোট ছেলে জিলেপী খাচ্ছে। অনেকদিন আগে

সে জিলেপী খেতে চেয়েছিল। চন্দন তার জন্যে জিলেপী এনেছিল। কিন্তু একদিনের বাসি জিলেপী নরম আর বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। চম্পার মনে হ'ল আজ চন্দন আসতে পারে। কাল আসেনি। তার একটা কথা আজকাল প্রায়ই মনে হয়। জীবনটা যেন একটু একটু করে কেমন হয়ে গেল! ভাবতে গেলে কেমন লাগে। একদিন তার জীবনে আর চন্দনের জীবনে কোন ভিড়, কোন বাইরের গোলমাল ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে, দিনে দিনে, তাদের দু'জনের জীবনে কত মানুষ, কত ঘটনা, কত কোলাহলই না এসে পড়ল! এখন চম্পার অনেক সময় মনে হয়, অলক্ষ্যে যেন কি এগিয়ে আসছে। একান্ত অজানা এবং অচেনা পরিণতি, যা সে দেখতে পাচ্ছে না। তার মনে হয় চন্দন যদি তাকে নিয়ে চলে যেত তাহ'লে ভাল হত। কিন্তু চন্দন যে কি সব কাজে জড়িয়ে পড়েছে। কি করছে চন্দন, কি করছে সম্পূরণ, তা চম্পা বোঝে না। শুধু মনে হয় এমন একটা ঘটনার জালে ওরা নিজেদের জড়িয়েছে যা গোপন রাখা একান্ত প্রয়োজন।

চম্পা ধাক্কা খেয়ে মুখ ফেরাল। সে আশ্চর্য হ'ল। ব্রিজদুলারী তাকে কি সব বলছে। নিজের ভাবনায় ডুবে ছিল তাই শুনতে পায় নি।

ব্রিজদুলারী বলল, 'হাঁ। আমিও জানি, আমি তোমায় সাবধান করে দেব মনে করেছিলাম।'

'কাকে সাবধান করবে?

'চম্পা, তুমি আমার একটা কথাও শোননি।' ব্রিজদুলারী অভিমানে গলা ভারী করল। চম্পা অবাক হয়ে তাকায়।

ব্রিজদুলারীর ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক। মুখখানা হাসি-হাসি। তিলকুটের ঠোঙাটি হাতে ধরে আছে। চম্পার মনে হ'ল তার সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পেলে ব্রিজদুলারীর মুখ থেকে অসহায় কারুণ্যের ছায়াটা আস্তে আস্তে সরে যায়। ব্রিজদুলারীর জন্যে ভারি মমতা হ'ল।

'তোমায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

ব্রিজদুলারী হেসে একটু প্রগল্ভ ভাবে বলল, 'তোমার নিজের কথা ভাব। তোমাকে দেখে একজন মুগ্ধ হয়েছে। তোমার কথা ছাড়া নাকি তার মুখে অন্য কথা নেই।'

'কে সে? সে কে?' চম্পার কণ্ঠে কিছুমাত্র কৌতূহল নেই।

'ইঞ্জিনীআর ইভান্‌স।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ চম্পা।' ব্রিজদুলারী একটু গম্ভীর হ'ল। তারপর ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমাকে সে বিবি বানাতে চায়!'

'তাই নাকি ? আমার ভাগ্য তাহ'লে ফিরছে ?'

'কি জানি! তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছ না। ওদের মাথায় যখন একটা কথা ঢোকে, ওরা সে-কথা ভোলে না।'

চম্পা চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'বেশ ত।'

'কথাটা পছন্দ হল ?'

'হবে না ? অনেক গয়না ত পাওয়া যাবে। সম্মানও বাড়বে।'

'সুখ পাবে না চম্পা।'

চম্পা ব্রিজদুলারীর হাতে একটু চাপ দিল। বলল, 'তুমি আমার জন্যে ভেব না। আমার সঙ্গে কেউ যদি মিশতে চায় তাকে আমিই বুঝিয়ে দিতে পারব।'

'কি বোঝাবে ?'

'তাকে বুঝিয়ে দেব, চম্পার মনের ঘরের দরজা তার কাছে কোনদিনও খুলবে না। বাইরে থেকেই ফিরতে হবে তাকে।'

ব্রিজদুলারী আস্তে বলল, 'সবাই যে ভেতরে আসতে চায় না, চম্পা। বাইরে থেকেই আনন্দ লুটে নিতে চায়।'

'না ব্রিজদুলারী। আমি তাকে ঘেঁষতেই দেব না কাছে।'

বাড়ী ফিরে সম্পূরণের সঙ্গেও তার কথা হ'ল। সম্পূরণ খুব খুশী হয়ে বলল, 'আজ চন্দনের সঙ্গে দেখা হবে। কোন কথা বলবে কি ?'

'না। সে আসবে।'

চন্দন এল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমেছে আকাশে। চন্দন ঘরে ঢুকেই নাগরা দুটো ছুঁড়ে দিয়ে গড়িয়ে পড়লো বিছানায়। বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

সত্যিসত্যিই চন্দন ঘুমিয়ে পড়ল। চম্পা দাসীকে বলল খাবার নিয়ে আসতে। ঘরের মেঝেতে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে সে চন্দনের মাথার কাছে বসল। তারও ঘুম পাচ্ছিল।

চম্পার চমক ভাঙল যখন তখন রাত হয়েছে। চন্দন বাতির সামনে বসে কি যেন ভাবছে। চম্পা বলল, 'আমাকে ডাকনি কেন?'

'এমনি।'

'সম্পূরণ এসেছে?'

'না। আজ সে আসবে না।"

'সে কি! আমাকে ত বলেনি।'

'আমায় বলেছিল।'

'লখপতিয়া কোথায়? চাকরটা-ই বা কোথায়?

'লখপতিয়াকে ছুটি দিয়েছি। চাকরটা যাত্রা শুনতে গেল।'

'কোথায় যাত্রা হচ্ছে?'

'চৌকে। বড় বড় মোমের মালা টাঙিয়েছে দেখলাম।'

'তুমি যাবে না?'

'না। তোমায় পাহারা দেব।'

রাতে চন্দনের পাশে বসে চম্পা চন্দনের কথা শুনছিল। অন্ধকারে চম্পার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। চন্দন আস্তে আস্তে কথা বলছিল। মাঝে মাঝে আমগাছ থেকে কি একটা পাখী ডেকে ডেকে ওঠে। গঙ্গার দিক থেকে বাতাস ভেসে আসে। চন্দন বলছিল, 'চম্পা, আমি আজ ঠিক করেছি তোকে সব কথা বলব।'

চন্দন তাকে 'তুই' বলল। অনেকদিন পরে বলল। চম্পা ছোট একটা নিশ্বাস চাপল। বলল, 'বল।'

'চম্পা, একদিন বলেছিলাম আমি একটা কাজে বড় জড়িয়ে পড়েছি। আজ বলি তুই-ই আমাকে টেনে এনেছিস।'

'কেন চন্দন?'

'পরে বলব। চম্পা, এখানে কিছুদিনের মধ্যেই মস্ত বড় একটা হাঙ্গামা হবে, জানলি?'

'তুমি মারামারির মধ্যে যেও না চন্দন!'

'চম্পা, আমার কথাগুলো একটু বোঝ্। ঐ ছোট-খাটো হাঙ্গামা নয়। শোন্, এখানে যেমন ফৌজ আছে তেমনি দিল্লী, মীরাট, আগ্রা সব জায়গায় সাহেবদের ফৌজ আছে ত?'

'আছে। সাহেবরা যে কোম্পানী সরকার।'

'শোন্, সাহেবরা আসবার আগে দিল্লীর বাদশা-র রাজ ছিল। আমাদের রাজাদের রাজ ছিল। সাহেবদের কোম্পানীরাজ কেউ চায় না।'

'কে চায় না? আমি ত এতলোককে জানি, কেউ ত বলেনি যে কোম্পানীর রাজ, সাহেবদের রাজ চায় না!'

'অনেকে সত্যিই চায় না। তাদের আমি আগে চিনতাম না। আমি ত' জানতাম, কোম্পানীর রাজে গরীব লোকের সুখ আছে। ডাকাত ঠগীদের ওরা শাস্তি দেয়। রাস্তাঘাট বানায়। পরে জানলাম—না, ওরা বিধর্মী। ওরা আমাদের জাত মারছে, রুটি-ও মারছে, আমরা বুঝিনি সে কথা!'

'এ সব কথার মানে কি আমায় বুঝিয়ে দাও চন্দন।'

'এখন, যারা কোম্পানীর রাজ চায় না, তারা হিসেব করে দেখেছে এদেশে সাহেব আছে মাত্র ক'জন। তারা হিসেব করে এ-ও দেখেছে কোম্পানীর ফৌজে যত ভারতীয় সিপাহী সওয়ার গোলন্দাজ আছে সবাইকে তারা দলে পাবে।'

'কেন চন্দন?'

'সবাই যে সাহেবদের ওপর চটা। অযোধ্যার তালুকদাররা জমি হারিয়ে ক্ষেপে আছে। বিঠুরের রাজার মত যে সব রাজারা তাদের রাজগীদৌলতী সব হারিয়েছে তারা ক্ষেপে আছে। শহরে শহরে বড় বড় টাকাওয়ালা লোক অনেকেই ক্ষেপে আছে। শোন, তাই সাহেবদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে এবার।'

'চন্দন!'

'সবাই বলে, সতরোশ' সাতান্ন-তে সাহেবরা বাংলা দেশে এক যুদ্ধে জিতেছিল। একশো বছর হয়েছে। ওদের রাজ নাকি এবার চলে যাবে।'

'তবে তুমি যুদ্ধ করবে?'

'হ্যা, চম্পা। তুই! তুই-ই ত' আমাকে এর মধ্যে টানলি।'

'কেমন করে?'

'তোকে খুঁজে খুঁজে যখন এলাম, তখন দেখলাম তুই এদেরই দলে।'

'সে কি? আমায় বুঝিয়ে দাও।'

'সম্পূরণ যে ওদের একজন পাণ্ডা। সম্পূরণ তোকে নিয়ে এসেছে তোকে

দিয়ে কাজ করাবে বলে। আমি যদি এদের দলে না ঢুকতাম তবে এক শহরে বাস করেও তোর কাছে আসতে পারতাম না।'

'কেন?'

'সম্পূরণ তা'হ'লে আমাকে শেষ ক'রে দিত। ওর হাতে অনেক লোক, অনেক টাকা। সালেহ্ মাহমুদ আর অন্যদের ত' ও-ই খুন করিয়েছিল।'

চম্পা কথা বলল না। চম্পা সম্পূরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয় থেকে এ পর্যন্ত তাকে যতটুকু জেনেছে তা ভেবে দেখল। না। সম্পূরণকে সে বুঝতে পারেনি। একসঙ্গে সে খেয়েছে, কথা বলেছে, মিশেছে। কিন্তু তাতে সম্পূরণকে বোঝা যায় না। সে বলল,

'সম্পূরণকে আমি বুঝতে পারিনি।'

'সম্পূরণকে আমিও বুঝি না। শুনেছি ও ছোটবেলা নাকি বাড়ী ছেড়ে পালায়। ওর বাপ ছিল না। ওর মা ওকে বেশ্যাবৃত্তি করে মানুষ করছিল। ওর মাকে নাকি কে খুন করে। তারপর, বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে ও এক সাধুর কাছে যায়। সেই সাধু ওকে বলেছিল, ও নাকি পূর্বজন্মে শিবাজী মহারাজ ছিল। এ জন্মে ও ম্লেচ্ছ বিধর্মীদের তাড়িয়ে হিন্দুস্থানের মানুষের রাজ আনবে।'

'অদ্ভুত কথা।'

'অদ্ভুত কথা। কিন্তু ও সে-কথা বিশ্বাস করে। ও যাদের সঙ্গে দল করছে, সেই মগনলাল, জোয়ালাপ্রসাদরা নিজেদের স্বার্থ দেখছে। তারা তালুক মুলুক চায়। তারা এখানে বিঠুরের রাজাকে বসিয়ে সব ক্ষমতা নিজেদের হাতে টানতে চায়। চম্পা, সম্পূরণ কিছু চায় না। তাই ওকে ভয় হয়। ও গুণ্ডাদের সর্দার। খুন জখম ওর হাতধরা। শোন, যার টাকার লোভ নেই, এমনিতে যে মানুষ খুন করতে পারে, সে মানুষকে ভয় করা উচিত।'

'তুমি কি সম্পূরণকে ভয় কর?'

'আমি? না। আমি কেন ভয় করব?'

'তবে তুমি কেন ওদের সঙ্গে মিশলে। শুধু আমার জন্যে?'

'না। শুধু যে তোর জন্যে তা বোধ হয় সত্যি নয়। আমার নিজের-ও যে নেশা লেগেছে চম্পা।'

'নেশা! কিসের নেশা?'

'না, রোজ রোজ শুনছি, আমিও যে বিশ্বাস করি এবার সাহেবদের আমরা হটিয়ে দিতে পারব। ভাবতে গেলে নেশা লেগে যায় চম্পা। কোথায় ছিলাম আমি, কোথায় ছিলি তুই। কত পথ ঘুরে আমরা এ কোন্ জীবনে এসে পড়লাম যেন! এই বিশ্বাসে জোর পাই, এই মনে হয় সব কল্পনা। জানি না কোন্‌টা ঠিক!'

'চন্দন, তুমি খুব বদলে গিয়েছ।'

'সম্পূরণের মধ্যে একটা জিনিস আছে জানিস? ওকে আমি খুব ভাল করে দেখেছি। ওর মধ্যে মায়া, দয়া, বিচার বিবেচনা কিছু নেই। কিন্তু ও কারু চোখের জল, বিশেষ করে মেয়েদের চোখের, মোটে দেখতে পারে না। ও মেয়েদের গালি দেয়, থুথু ফেলে সামনে থেকে সরে যায়। আর কি জানিস? অন্যদের কথাও শুনেছি, ওর কথাও শুনি। ও হাঁটু গেড়ে বসে একটু একটু দোলে। ওর চোখদুটো লাল হয়ে ঝিমিয়ে থাকে। ও বলতে থাকে, মনে হয় ওর ভেতর থেকে কে যেন কথা কইছে। ও বলেছে মগনলাল বেশী লোভ করবার জন্যে নিজের লোকের হাতে খুন হবে। জোয়ালাপ্রসাদ নাকি এদের বেইমানী করে ধরিয়ে দিয়ে ইংরেজের কাছে ইনাম নেবে, আবার ইংরেজদের সঙ্গে-ও বেইমানী করবে। ওর কথা সবাই বিশ্বাস করে। ও নাকি ভবিষ্যৎ দেখতে পায়।'

'আমাকে ত' সেইজন্যেই এনেছিল।'

'তোকে সেইজন্যেই এনেছিল। ও আশ্রয় না দিলে তোর অবশ্য খুব অসুবিধে হতো, তুই ভেসে যেতিস।'

'আমি ওদের কি কাজ করব?'

'অনেক কাজ করতে পারিস তুই। এখন যে আমিও আছি। আমি তোর সঙ্গে আছি এ কথা মনে করলে তুই পারবি না চম্পা?'

'পারব।'

'তুই ইঞ্জিনীআর সাহেবের সঙ্গে ভাব করতে পারিস?'

'চন্দন, তুমি এ কি কথা বলছ? তুমি কি ব্রিজদুলারীকে দেখনি?'

'চম্পা, তোর কি ভয় করে?'

'চন্দন, মিশতে শুরু করলে এর যে শেষ নেই।'

'তুই ওর সঙ্গে অল্প অল্প ভাব করবি। ওর কাছ থেকে তুই অনেক কথা জানতে পারবি।'

'চন্দন, তুমি আমাকে খারাপ হতে বলছ।'

'হায় ভগবান ! এর নাম যদি খারাপ হওয়া হয়, তুই তাই হ !'

'ওকে কি খারাপ হওয়া বলে না ?'

'না। তুই ওর সঙ্গে মিশবি, কথা বলবি, যখনই তোর মনে হবে যে, না, সাহেবকে আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না, তুই সরে আসবি।'

চম্পা চুপ করে রইল। তারপর একটু হেসে বলল, 'আমি জানতাম।'

'কি জানতিস চম্পা ?'

'আজই আমার মনে হচ্ছিল আমাদের জীবনটা যেন বড় বেশী হট্টগোলে ভরে গেছে। আমরা যেন বাজারে এসে দাঁড়িয়েছি। অনেক মানুষ, অনেক কথা, অনেক ঘটনার মাঝখানে। এর থেকে আমরা আর সরে যেতে পারব না।'

'চম্পা !'

'সব যেন কেমন হয়ে গেল। আমি আর তুমি চলে যেতে পারতাম; তোমার মা-র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারতাম।'

'পরে হবে, সব হবে।'

'কোনদিন হবে না।'

'না হলে-ও আমি আর তুই একসঙ্গে রইলাম।'

'এর নাম কি একসঙ্গে থাকা ?'

দু'জনে চুপ করে রইল। তারপর চম্পা বলল, 'তোমাকে যদি ভুলতে পারতাম, তাহ'লে সব পারতাম। মনে এতটুকু লাগত না, বাজত না।'

'জানি।'

'তোমাকে ভুলতে পারি কই। তোমার ওপর আমার আজকাল রাগ হয় চন্দন। মনে হয় তুমি আমার ভেতরে চলে এসেছ। আমি না মরা পর্যন্ত তোমাকে আর সরিয়ে দিতে পারব না।' আরো কিছুক্ষণ কাটল।

তারপর চন্দন বলল, 'রাত কেটে যাবে। দেখ, আকাশ ফরসা হচ্ছে।'

'তবে আর তুমি সম্পূরণের ঘরে যেও না। বাকি রাতটুকু কথা বলে কাটিয়ে দিই।'

দুটো একটা কথা বলে কথা যেন ফুরিয়ে গেল। দুজনে চুপ করে রইল। ভোরের দিকে চন্দন ঘুমিয়ে পড়ল। চম্পা উঠে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে বসল। বারন্দার থামে মাথা রাখল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে তার কপালটা, শরীরটা একটু একটু করে জুড়িয়ে এল।

পনরো

মার্চ শেষ হয়েছে। শীত এখনো কাটেনি। রেজিমেণ্টের এই জলসাটি করবার অনুমতি দেবেন কি না, তা' নিয়ে হুইলারকে চিন্তায় পড়তে হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী ও মার্চে যে-খবর পেয়েছিলেন তিনি, সে-খবর 'ফৌজী আখবর'-এ ছাপা হয়নি এবং ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া হয়নি সে দুঃসংবাদ। উচ্চপদস্থ অফিসার-রা একসঙ্গে জড়ো হয়ে নিচু গলায় সে খবর নিয়ে আলোচনা করেন। বহরমপুরে একটি রেজিমেণ্টের অবাধ্য ব্যবহার এবং ব্যারাকপুরে একটি সিপাহীর মূর্খতার কথা তাঁরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলোচনা করেছেন। না। গুরুত্ব দিতে পারেননি। হুইলার-এর বয়স হয়েছে।

বয়সে প্রবীণ, অভিজ্ঞতায় প্রৌঢ়। তবু ভেবে পাচ্ছিলেন না, কি সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন তিনি। এমন কি করতে পারেন যাতে ভারতীয়দের মনে অযথা সংশয় না জাগে। একটা কথা মনে হতেই তিনি শহরের পুলিশ কমিশনারকে ডেকে এনে বুঝিয়ে বললেন, 'দেখুন, প্রত্যেকবার মহরম এবং দোল-এর সময়ে বাজনা বাজানো বা শোভাযাত্রার সময়ে হৈ চৈ হয়। এবার দোলের সময়ে হয়তো ওরা শুকনো কাঠ-পাতা জ্বালাবে; সং বের করবে; গানবাজনা ক'রে অতিষ্ঠ করবে। এবার একটু সহ্য করুন। ওদের বারণ করতে যাবেন না। হাজার হলেও এটা একটা মস্ত উৎসব ওদের।' এবার তিনি নিজে হোলির কয়েকটি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

শহরের সম্ভ্রান্ত হিন্দুবাড়ী থেকে যে সব নিমন্ত্রণ আসে, তা গ্রহণ করেন এবং নিজের হিন্দু উকীলকে পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন।

হোলির সময়ে এই জলসাটি হবার কথা ছিল।

হুইলার যদিও তেমন কোন নির্দেশ পাননি, তবু নিজের বুদ্ধিতে-ই এই সময়টা কোন গোলমাল বা হট্টগোল এড়িয়ে চলতে চাইছিলেন। এই জলসা উপলক্ষে ভারতীয়রা জমায়েত হবে, তাদের মধ্যে আলগাভাবে মেলামেশা কথাবার্তা চলবে, এটা তিনি চাইছিলেন না। অথচ নিষেধ করতেও ভরসা হয় না।

তারপর, তাঁর মনে হল যে—না, কোথাও কোন অশান্তি নেই। মীরাট, ফৈজাবাদ, দিল্লী, কোথাও কোন গোলমাল হচ্ছে না! তাঁর মনে হ'ল

যা হয়েছে তা বাংলায়। 'বাংলা অনেক দূরে' তিনি ভাবলেন। তারপর যেন মনটা একটু প্রসন্ন হ'ল।

হুইলার ভারতীয়দের বোঝেন, ভালবাসেন। তিনি এদের ভাষাকে নিজের ক'রে নিয়েছেন। এদেশের মেয়েকে বিয়ে ক'রে বিবাহিতা স্ত্রী-র মর্যাদা দিয়েছেন। কারু বিরুদ্ধ সমালোচনায় কান দেননি।

দীর্ঘদিন কানপুরে আছেন। পেন্সন-প্রাপ্ত বহু বৃদ্ধ সিপাহীর নাম জানেন তিনি। তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশেন।

ভারতীয়দের মনের ও প্রাণের খুব কাছে আসতে পেরেছেন তিনি, একথা ভাবতে বড় ভাল লাগে। ভারতীয়দের উৎসব পালপার্বণ, আমোদ-প্রমোদও বেশ ভালই লাগে। অনেক আগে মনে হত, এটা যেন 'হোম' নয়। তাঁর নিজের দেশ আছে। কিন্তু দীর্ঘ জীবনের তিনভাগ এখানে কাটাবার পর এখন আর সে কথা বলতে পারেন কই? এদেশের গ্রীষ্ম বর্ষা, সব কিছুর সঙ্গেই যেন গাঢ় একটি অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে। এ তাঁর নিজের, একান্তই নিজের।

হ্যাঁ, জলসার অনুমতি তিনি প্রসন্ন মনেই দিলেন। ভারতীয় অফিসারটিকে বললেন, 'সুন্দর ওয়েদার। এপ্রিল-শাওয়ারটা যদি সময়মত হয়, তাহ'লে ঠাণ্ডাটা আরো একটু থাকবে।'

তাঁর মধ্যে এখনো একটি বালকমন জাগ্রত আছে। এপ্রিলে কালবৈশাখীর বৃষ্টি হলে গাছপালার ধূলি-ধূসর ম্লান চেহারা যখন সবুজ, ভিজেভিজে হয়ে ওঠে, চেয়ে দেখতে খুব ভাল লাগে। মালীর সঙ্গে তখন অন্তরঙ্গ ভাবে আলাপ করেন এবার আমের মুকুল যত ধরেছে, তত আম হবে কি না! বৈশাখী বৃষ্টি কতটা হলে আমের বোঁটা শক্ত হবে! বৃষ্টি হলে যখন ধুলো ভিজে যায়, সোঁদাগন্ধ ওঠে, এই পাকাচুল সম্বলিত মানুষটির চোখ খুশীতে ভরে যায়। তিনি নিজের মনেই বলেন, 'বিউটিফুল! ভারী চমৎকার।'

তারপর একসন্ধ্যায় সত্যিই জলসার আসরে বাতি জলল!

সাহেবরা এলেন। মেমসাহেবরা এলেন। তাঁরা চেয়ারে বসলেন। ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে যাঁরা উচ্চপদস্থ তাঁরাও চেয়ারে বসলেন। মেমসাহেবরা প্রচুর গহনা পরে এলেন। একদিকে চিকের আড়ালে ভারতীয় অফিসারদের কতিপয় সঙ্গিনী বসলেন। ব্রিজদুলারী সসঙ্কোচে তাঁদের

একপাশে বসলো। তার গহনা দেখে মেমসাহেবরা কানাকানি করলেন। সাহেবদের পানীয় পরিবেশন করা হলো।

ভারতীয়রা ক্ষীর, পেস্তা ও বরফের কুচি সহযোগে সিদ্ধির শরবত খেলেন।

জলসাতে প্রথম গায়িকাটি মনমরা হয়ে বসেছিল।

সে ভাবছিল এখানে গাইবার মতো কোন গানই আমি জানি না। এরা কি গান বোঝে? এ সব জায়গায় হালকা ঠুংরী আর টপ্পা ছাড়া অন্য কি গানই বা চলতে পারে!

তার মনের কথা সারেঙ্গীবাদকটি বুঝতে পারল। সে গলা নামিয়ে খিশখিশে কফবসা গলায় বলল, 'রেশম! যারা চন্দন গাছের ছায়ায় বসেনি তারা তেঁতুলের ছায়াতে বসেই মনে করে স্বর্গ পেলাম!'

রেশম ভ্রূকুঞ্চন করলো।

সে বলল, 'বাজে বকবক করছ কেন? ওদের কাছ থেকে সিদ্ধি নিয়ে খেয়েছ?'

সারেঙ্গীবাদক বিড়বিড় ক'রে বলল, 'একটা ভাল কথা বলব, সে জন্যে সিদ্ধি খাবার দরকার হবে কেন?'

রেশমের হঠাৎ বড় কষ্ট হল। নিজের জন্যে, সারেঙ্গীবাদকের জন্যে, সবাইয়ের জন্যে। এই মানুষটিকে একদিন সে ভাল বেসেছিল, বিয়ে করেছিল। যখন রেশমের যৌবন ছিল, এই লোকটি তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। এমন কি অন্য মানুষের কাছে বাঁধা-ও রেখেছে। মানুষটার মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল না। তবু কি যেন ছিল, রেশম তবু তাকে ভালবাসত। তারপর অনেকদিন হয়ে গেল। একদিন রেশম আবিষ্কার করল সে প্রৌঢ় হয়েছে। ঐ মানুষটি স্বাস্থ্য এবং টাকা হারিয়ে হীনবল হয়েছে। রেশম ভেবেছিল কিছু টাকাপয়সা দিয়ে ওকে বিদায় করে দেবে, নিজে নিজের মত থাকবে। কেমন ক'রে যেন তা আর হ'ল না। এখন রেশম ওকে ছাড়তে পারে না। ও-ই এখানে ওখানে গানের বায়না-র যোগাড় করে। ও-ও রেশমকে ছাড়তে পারে না। রেশম বিড়বিড় করে বলল, 'সব রংছুট হয়ে গেছে, বিশ্রী হয়ে গেছে। কতদিন কেউ একটা ভালবাসার কথা বলে না। আমিও শুনি না!'

প্রথমে রেশম গান গাইল। রেশম ভেবেছিল সে গান খুঁজে পাবে না,

এবং গাইলেও শ্রোতাদের খুশী করতে পারবে না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল আজ মদ খেলাম না কেন। একটু খেলেই ত' ভাল গাইতে পারতাম!

কিন্তু মদ ছাড়াই সে গাইতে পারল। অনেক ভেবেচিন্তে সে 'নদীয়া কিনারে হিরায়ে আঈ কঙ্গনা' গাইল। গানটা মনে পড়ল। এই গানটা যৌবনে সারেঙ্গীবাদক ভালবাসত। যৌবনে রেশম-ও গানটি ভালই গাইত। আজ গাইতে গাইতে তার মনে হলো, তাদের দুজনের যৌবনই চলে গেছে। পৃথিবীতে যৌবনের রঙে এতটুকু কম্‌তি পড়েনি। চম্পাকে দেখে তার এই কথা মনে হল।

তার পরে সে শৌরীমিঞার পাঞ্জাবী টপ্পা এবং আরো একটি গান গাইল। তার সাধ্যমতো ভালই গাইল। তবে আসর বেশী তাত্‌ল না। আসর আরো কিছু চাইছিল।

চম্পা তাদের আরো কিছু দিতে পারল।

সে গাঢ় হলুদ রঙের ঘাঘরা এবং ওড়না পরেছে। নিজের যত গহনা সব শরীরে চাপিয়েছে। ভাল নাচ বা ভাল গান, কোনটার ওপরই তার দখল নেই তা সে জানে। আসরের মাঝে একটি শালুর চাদরের ওপর আবীর ছড়িয়ে দিল। তারপর হাতে ঘুংরু বাঁধা একটি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সে রীতিমতো কোলাহল তুলে নাচতে শুরু করলো। তার শরীর কোলাহল তুললো, গহনায় গহনায় বেজে শব্দ তরঙ্গ উঠলো, হাতের বাজনাটি, পায়ের ঘুঙুর সব বাজতে শুরু করল। চম্পা হাসতে লাগল, আবীর উড়তে লাগল, সাহেবরা হাসতে হাসতে রুমাল দিয়ে নাক ঢাকলেন এবং আসর জমে গেল। তারপর চম্পা গান ধরল।

ভাঙা-ভাঙা মিষ্টি গলায় সে যে-সব গান গাইল, তা শুনে রেশম ঘাড় কাৎ ক'রে অন্যদিকে চেয়ে রইল। চম্পা তারপর নাচল। রেশম বিড়বিড় ক'রে অসন্তোষ প্রকাশ করল। সারেঙ্গীওয়ালাকে বলল, 'আজ রাতে আমি মদ খাব। আমাকে মদ খাওয়াতেই হবে।'

ইতিমধ্যে সাহেবরা উঠে গেলেন। ভারতীয় অফিসাররা ও মহিলারাও সরে গেলেন। গায়িকাদের বিদায় দেওয়া হল। সিপাহীরা এবার একটু গা আল্‌গা ক'রে ফূর্তি করবে। একজন পুরুষ এবং একজন মেয়ে সেজে এসে নাচতে শুরু করল। মেয়েটি ঘোমটা তুলে মুখ দেখিয়ে, ঘোমটা ঢেকে মুখ

লুকিয়ে নাচতে লাগল। তার ভারী গোঁফজোড়া দেখে সবাই আনন্দে শেয়ালের মতো ডাকল এবং বাহবা দিল।

জলসার রাতে বাঙালী কর্মচারীরা আসরে মুখ দেখিয়েই চলে যান। রিসালার বড়বাবু হরবিলাস মুখুজ্জে মহাশয়ের প্রথম পুত্রলাভের জন্য একটা খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। ডাক্তার ভবানীশঙ্কর চৌধুরী অকৃতদার মানুষ। তাঁর বাসাটি একজনের পক্ষে খুবই প্রশস্ত। চারটি ঘর, টানা বারান্দা, ওদিকে রান্নাঘর। ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন গোসলখানা। সর্বসম্মতিক্রমে এই বাড়ীতেই ভোজের আয়োজন হয়েছে। মিলিটারী কমিসারিয়েট ভুক্ত বাঙালীরা প্রায় সকলেই এসেছেন। উঠোনে একটি সামিয়ানা খাটান হয়েছে। তার নিচে শতরঞ্জিতে বসে সবাই গল্প গুজবে সময়ক্ষেপণে ব্যস্ত। কেউ কেউ সপরিবারে এসেছেন। চাকুরীস্থলে পরিবার সকলে আনেন না। তবে রামলাল চাটুজ্জে, সখারাম মিত্তির প্রমুখ যাঁরা এখানে ছুইপুরুষ ধরে বসবাস করছেন তাঁদের পরিবারবর্গকে আনা হয়েছে।

মহিলারা দিনের বেলা বঁটি নিয়ে বসে তরকারী কুটেছেন, যোগাড় দিয়েছেন। হরবিলাস মুখুজ্জের ছোট ভাই কপালী মুখুজ্জে রান্নার ভার নিয়েছেন। কপালী মুখুজ্জে রান্নাবান্নায় সুপটু। তিনি সদাচারী ব্রাহ্মণ। তিনসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করে থাকেন। রান্নাবান্না ও খাওয়াবার ব্যাপারে গোলযোগ প্রায়ই ঘটে। বিশেষত রামলাল চাটুজ্জের কাকা মহাশয় ক্রোধপরায়ণ মানুষ। একবার পোস্ট অফিসের বড়বাবু নন্দলাল গাঙ্গুলীর মেয়ের বিবাহে পাঁঠাবলি না দিয়ে বাজার থেকে মাংস আনা হয়েছিল শুনে তিনি পংক্তিভোজন পণ্ড করে দেন। হিন্দু বিক্রেতার কাছ থেকে কেনা মাংস শুনেও তিনি নন্দলালবাবুকে ক্ষমা করেননি। সবদিক বাঁচাতে হলে কি করা প্রয়োজন, তাই নিয়ে হরবিলাস মুখুজ্জে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময়ে কপালীবাবু এসে উপস্থিত। সবাই নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

মেয়েরা ভেতরের ঘরে শতরঞ্জিতে গা ঢেলে গড়াচ্ছিলেন। দাসীরা কাছে বসেছিল। কেউ কচি ছেলে সামলাচ্ছিল। কেউ কর্ত্রীদের পানজর্দা এগিয়ে দিচ্ছিল। অল্পবয়সী বৌ-ঝিরা একপাশে বসে গল্প করছিলেন। নন্দলালবাবুর মা পাকাচুলে সিঁদুর পরেন। তিনি কলহপরায়ণা মহিলা।

সকলে তাঁকে মান্য করে চলেন। তিনি এখন পুত্রবধূটির গুণ ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত ছিলেন। নন্দলালবাবুর দুই বিয়ে। বড-বৌয়ের মেয়ের গত বছর বিয়ে হয়েছে। ছোট-বৌয়ের দুটি ছেলে। বর্তমানে তিনি অনুপস্থিত এবং শাশুড়ী তাঁর কথাই বলছিলেন—

'দেশ থেকে মাটির হাঁড়িতে মুখবেঁধে কত যত্ন করে খুড়ীমা বড়ি পাঠালেন। অমন মটর ডাল এ দেশে মেলে না। আর দেশের সোনামুগের ডাল; এ দেশের ডালে মোটে স্বাদ নেই, জানলেন ফুলুর মা? তা আমার গুণবতী বলে কি না, বড়ি অযাত্রা তাই পথে ফেলে দিয়েছি। শুনেছেন? আরে, যে দিয়েছে সে ত গুরুজন। তার চেয়ে বেশী শাস্ত্র জানিস তুই? মটর ডালের বড়িতে দোষ লাগে না। তা সে কথা তাকে কে বলবে?'

ফুলুর মা সমবেদনায় কি যেন বললেন। ডাকবাবুর মা আর একটু জর্দা মুখে ফেলে বললেন—'বড বৌ-কে বললাম ঠারেঠোরে জেনে নাও পথে বাপের বাড়ী নেমেছিল কি না! শ্যাওড়াফুলীর ওপর দিয়েই ত আসা। তা বড় বৌ আর পেরে উঠলেন না। আমি নির্ঘাত জানি ও নিশ্চয় বাপের বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। আমার, জানলেন মহাজ্বালা! এই আজই নন্দ বললে নিমঝোল খাবে! তা দুটি সজনে ডাঁটা আর বেগুন যদি বা যোগাড় করলাম, বড়ির জন্যে মনটি খুঁত খুঁত করতে লাগল।'

তাঁর বড বৌ মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপলেন। শাশুড়ী ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন 'হেস না বৌমা! বছরে তিনমাস তোমাদের কাছে থাকি, তা একটু ভালমন্দ করে না খাওয়াতে পারলে কি আর মনটা মানে! তা ফুলুর মা, ননদ এলেন না কেন?'

'আমাদের কথা বলেন কেন দিদি? একটা লোকের ওপর জানেন ত' কি বড় সংসার! ঠাকুরজামাই কতকাল আসেন না। ঠাকুরঝির বড মেয়েটি এসেছে আমার কাছে ছেলে হতে! তা ঠাকুরজামাইয়ের কি মতি হল এবার, এসে দু'মাস থাকলেন। পরশু তিনি গেছেন। আবার কতকাল এ মুখো হবেন না। তা আজ সকাল থেকে ঠাকুরঝি কাঁদছে। আমি বলি ঠাকুরঝি, দাদা কি তোমার নিজের লোক নয়? না, আমি তোমার তেমনি ভাজ যে হেনস্তা করে রেখেছি? তা ভাতের থালায় বসে যে চোখের জল ফেলছ, গেরস্তের কল্যেণ অকল্যেণটা ত' দেখতে হয়। এই আমার কোলেরটা সেদিন গেল। বাবু আমাশায় ভুগে উঠলেন। আমার

কি সুখ শান্তি আছে ? তা ঠাকুরঝি বলে, বৌ ! দুঃখের কথা আর কি বলব, আমার বিনোদের ঢেঁড়িঝুমকো জোড়া পাচ্ছি না। বলুন, শুনে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে কি না।'

'সে কি ? কে নিলে ? ঝি কি তোমার ঘরে ঢোকে ?' এইসব প্রশ্ন করলেন সবাই।

ফুলুর মা নথটা তুলে দাঁতে মিশি দিলেন। বললেন, 'না গো না। আপনারাও যেমন। এ ঘরের লোকের কাজ !'

'বাপ হয়ে মেয়ের…'

'কি আক্কেল গা !'

'তোমার ননদের মেয়ে-ও বাপু ট্যালা !'

'বাপের স্বভাব ত' জানিস্, সাবধান হতে কি ?'

'সেই আপনারাই বলুন। এখন ঠাকুরঝি বলে দাদাকে বল ! আমি বলি পারব না। সে মানুষ একেই নানা দেনায় ডুবে আছে। ঠাকুরঝি বলে বিনোদবালার শাশুড়ী ওকে খোয়ার করবে। আমি বলি, ছেলে হোক, যাবার সময় হোক, পরে দেখব। তা এই নিয়ে হয়ে গেল একচোট। আমি ভাতপাতে বসলুম না, ঠাকুরঝিও খানিক খেয়ে ভাত বেড়ালকে ধরে দিলে। আর বলেন কেন ? উপুসী থাকলে সকলেরই খোয়ার হয়। শেষকালে আমিই উঠলুম। উনোন ধরাই, পরোটা ভাজি, তরকারী করি। নিজে খেলুম, ওকে খাওয়ালুম। ছেলেদের জন্যে রইল। এত পাট সেরে তবে আসতে পেরেছি জানেন দিদি।' তিনি আঁচল ঢাকা দিয়ে কনিষ্ঠ সন্তানটিকে দুধ খাওয়াতে ব্যস্ত হলেন।

নন্দবাবুর মা এতক্ষণ এদিকে ওদিকে চেয়ে পুনর্বার গল্প আরম্ভ করবার জন্য একটি মানুষ খুঁজছিলেন। এবার তিনি সখারামবাবুর ভাগ্নে-বৌকে দেখতে পেলেন।

ঘরে যতজন আছে তাদের মধ্যে সে-ই সুন্দরী। তার রং ধপধপে। মোটা কটা। মুখ নাক বিশেষত্বহীন, বপুটি মাংসল। সখারামবাবু আবগারীর দারোগা। তাঁর অঢেল রোজগার। ভাগ্নেই তাঁর উত্তরাধিকারী। সখারামবাবু নিঃসন্তান। তিনি এদেশে বসবাস করে এদেশের মানুষ-ই হয়ে গেছেন। ভাগ্নে অকালে বখে গেল। তাই দেখে শুনে কলকাতা-বাগবাজার থেকে সুন্দরী মেয়ে খুঁজে এনেছেন। দত্তবাড়ীর মেয়েদের রূপের

খ্যাতি আছে। তাদের যেমন রং, তেমনি চর্বি। নন্দবাবুর মা বেশ গলা ছেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ বৌ, হ্যাঁ নয়ন, তা তোমার মামী এল না কেন গা?'

'মামীর পা যে মচকে গেছে!' বৌ-টি হাসি চাপতে মুখে আঁচল দিল। কথায় কথায় হাসা তার রোগ।

'সে কি? পা মচকাল কি করে?'

মুখ নিচু করে খোঁপায় সোনার বাগানটি চেপে বসিয়ে নিয়ে বৌ বলল, 'কাল লক্ষ্মীবার ছিল ত! পুজোর বাসন জানেন ত' বামুনদিদিকে নইলে মাজা হয় না। তা বামুনদিদির বড় শরীরটা খারাপ হয়েছে। আমি বললুম, মামীমা, আমি অম্বল দিয়ে মেজে দিই, বামুনদিদি নয় গঙ্গাজল দিয়ে তুলে নেবেন। তা আমার মাজা কি পছন্দ হ'ল! জলের দাগ রয়েছে, জলের দাগ রয়েছে বলে যেমন কুয়োতলায় যাওয়া অমনি...কানুটা বুঝি তেল ফেলেছিল, মোটা মানুষ ত!'

'আহা।'

বৌ-টি একটু হেসে, একটু হাসি চেপে বলল, 'আমি ত' কত করে বললুম, মামীমা, কানু বলু দুরন্ত ছেলে, নিয়ে যাই! তা হবে না! ওঁর নাতিদের নিজে হাতে করে না খাওয়ালে হবে না! আবার এই সময়টুকু থাই যে চুণহলুদ দেবে পায়ে তা-ও হবে না। আমি যাব, আংরায় চুনহলুদ গরম করব, দেব, তবে হবে!' নন্দবাবুর বিবাহিতা মেয়ে তাড়াতাড়ি বৌ-টির হাত টেনে নিল। সে চুড়ি দেখতে লাগল।

এরপর নানা রকম কথাবার্তা হ'ল। এক সন্নেসী এসেছেন, তিনি না কি আশ্চর্য সব ওষুধ দিচ্ছেন! সখারামের ভাগ্নে-বৌ যত গয়নাই পরুক না কেন, তার বরটি ত' একেবারে বয়ে গেছে। সে বাগানবাড়ীতে কাকে যেন নিয়ে আছে! প্রহ্লাদবাবুর ছেলেটি আর বাঁচবে না, কবরেজ বদ্যি 'এলে' দিয়েছে। তবে ওদের পয়সা আছে, ওরা 'সূচিকাভরণ' করালে পারত। বাঁড়ুজ্জে মশায়ের পুত্রবধূটির আর ছেলে হবে না। বৌয়ের বয়স বাইশ বছর হ'ল। এগারো বছর বাদে কি ছেলে হয়? তা ছেলেটির আর একটি বিয়ে করা দরকার। কিন্তু বৌ বলে তাহ'লে আপিম খাবে। এ কালের বৌ-রা বিদেশে এসে সকলের মাথায় পা রেখে হাঁটতে চায়। বিন্দুবাসিনীর শাশুড়ী বড় দজ্জাল। মেয়েটাকে এমন মার মারল, যে মরেই গেল সে। বিন্দুর বাপের দুর্বুদ্ধি। চাকরি করেন কানপুরে, মেয়ের বিয়ে দিলেন সেই

বাঁশবেড়ে-তে। বিন্দুর খোকাটিকে বিন্দুর মা নিয়ে আসবেন। বড়ঘরের বড় ব্যাপার, এখন বিন্দুর বাপ-ই বলছেন মেয়ের ওলাওঠা হয়েছিল। এবার কানপুরে মাছের দর বেড়েছে। তিন আনা রুই মৃগেলের সের এ কথা কেউ শোনেনি। খোট্টা মাঝিরা কি মাছের মর্ম বোঝে? মাছ আনতে চায় না। সেদিন নাকি এক নৌকো আড ও চিতল মাছ এসেছিল তা খবর পেয়ে বাবুরা যেতে না যেতে সব উঠে গেল। সাহেবদের বাবুর্চিগুলো আজকাল আড়মাছের 'ফেরাকিসি' আর 'ফেরাই' করতে শিখেছে। কলকাতায় বিদ্যেসাগরের জালায় আর টেঁকবার জো নেই, রামবাবুর শালার কথায় জানা গেল, বিদ্যেসাগর নাকি মেয়েছেলে মাত্তরেই লেখাপড়া শেখাবে। লাটসাহেব-ও সেই বামুনকে ভয় পায়, যদি আইন পাশ করে, তবেই চিত্তির। ঘরে বসে পণ্ডিতানী বা আচার্যি ঠাকরুণের কাছে বাংলা পড়া নয়, গাড়ী চড়ে পড়তে যেতে হবে! এ বছর কাশীতে নাকি লিচুকাটা বালা উঠেছে। কাশীর কথায় মনে পড়লো ভুবনের বরের খোঁজ পাওয়া গেছে। সে কাশীতে গিয়ে টোল খুলেছে। বলেছে বড়লোকের ঘরজামাই হবার মুখে সে জোড়া লাথি মারে।

বাইরে বসে পুরুষরা গল্প করছিলেন।

নন্দবাবু হেঁকে বললেন, 'কপালী ভায়া, কতদূর?'

'পোলাওয়ের এই ডেকচিটা নামলেই হয়। আপনাদের বসিয়ে দিতে পারব।'

'কপালী থাকতে আপনি চিন্তা করবেন না দাদা।' হরবিলাসবাবু তাস ভাঁজতে ভাঁজতে বললেন, 'ভায়া আমার এক হাতে একশোটি মানুষকে রেঁধে খাওয়াতে পারে। রামরাজাতলায় যার বাড়ীতেই ব্যাপার হোক না কেন, কপালীকে নিয়ে যায় সবাই। তৈরী বামুন থাকলেই হয় না। একজন করিয়ে কর্মিয়ে নেবার লোক চাই ত।'

'আপনার বামুনটিকে আনেননি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। বামুন দুটো আছে। তবে কপালী মাছটা মাংসটা নিজে করলে।'

'কপালী কি এখন মাছ মাংস খায়?'

'না না! খায় মোটে একবেলা, তা সে নানান বায়নাক্কা। আমার পিসিমা ওরটা রেঁধেবেড়ে রাখেন।'

কথায় কথায় প্রহ্লাদবাবুর ছেলেটির কথা উঠল। রামলাল চাটুজ্জে বললেন, 'ওরা স্বচিকাভরণ করলে না কেন! বড় কব্‌রেজ আনাল কাঁহা থেকে।'

তাঁর কাকা বললেন, 'ওহে, কবরেজ বড় হলেই হয় না। তারা আর ওষুধ করবে কি! খাঁটি মুক্তো, খাঁটি প্রবাল এ সব না হলে কি ভস্ম-টস্ম হয়?' কবিরাজ ছিল সেকালে। সে আমরা দেখেছি গঙ্গাদাস সেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রী-র স্বচিকাভরণ এক খড়কে দিলে মরামানুষ জ্যান্ত হয়ে উঠত। আজকাল স্বচিকাভরণ করাবে এমন মানুষ কই?'

'কেন, স্বচিকাভরণ কি হয় না?'

'দেখ হরবিলেস, সময়ে স্বচিকাভরণ পাননি বলে গঙ্গাদাস সেনের বাপ মরেছিল। গঙ্গাদাস কবরেজ জান বিখ্যাত লোক ছিলেন। যত বড় বড় বাড়ী তাঁর বাঁধা ছিল। বড় রাগী মানুষ ছিলেন। একবার বর্ধমানের মহারাজার শালা ওঁর কাছে যায়। তার মাথায় অসহ্য বেদনা। খালি নস্যি নেয়, এই এক অভ্যেস। তখন গঙ্গাদাস সেনকে ওরা বর্ধমান নিয়ে গেল। গঙ্গাদাস কবরেজ বললেন, ওকে চারটে জোয়ান লোক চেপে ধরুক। মহারাজা ওর মেজাজ গতিক জানতেন। শালাবাবুকে ত' চেপে ধরল সবাই। কবরেজ মশাই একটা সোনার ছুঁচ তাতিয়ে নিয়ে দিলেন শালাবাবুর নাকে ঢুকিয়ে। দুই নাকেই খোঁচা দিলেন। শালাবাবু ত' কাটাপাঁঠার মতো ছটফট করছে। তা বিশ্বেস করবে না, ওর নাক দিয়ে অঝোরে কালো দুর্গন্ধ পুরনো ঘিয়ের মতো কি বেরুতে লাগল। নস্যি মাথায় জমেছিল আর কি! তখন যন্ত্রণা হলেও শালাবাবু একেবারে আরোগ্য হয়ে গেল। মহারাজা কবরেজ মশায়কে অনেক খেলাৎ দিলেন।'

'এখন আর তেমন কবরেজ হয় না।'

'হয় না কেন? হয়। তা কবরেজ আছে সব বাংলাদেশে। তাদের দায় পড়েছে এই অজদেশে আসতে। গঙ্গাদাস কবরেজ যখন অনেক টাকা করেন, তখন তিনি স্বচিকাভরণ করেন। স্বচিকাভরণ করতে হলে পাকা একমণ ওজনের পুরুষ রুইমাছ চাই, একটা বুড়ো পুরুষ গোখরো সাপ চাই। মাছের ওজন একরতি বেশী বা কম হবে না। তারপর নির্দিষ্ট তিথি-নক্ষত্র দেখে সেই মাছের পিত্তির রস আর সাপের বিষ একত্র ক'রে সোনার পাত্তরে মরা আঁচে অষ্টপ্রহর জাল দিতে হয়। তাই করেছিলেন কবরেজমশায়।

ই খাঁটি স্বচিকাভরণ তাঁর সিন্দুকে থাকত সোনার কৌটোয়। মরণাপন্ন রুগীর র পেলে তিনি খড়কের আগায় স্বচিকাভরণ দিতেন। ও ত' যেমন তেমন নিস নয়। সুস্থ মানুষ নিলে ধড়ফড়িয়ে মরে যায়। তা যতদিন তাঁর তে আছেন ততদিন মানুষ পাবে, স্বচিকাভরণ পাবে। গঙ্গাদাস কবরেজ একটা সোজা মানুষ ছিলেন? ভদ্রাসনে তিন মহল বাড়ী তুললেন। ছাড়া তিন ছেলেকে তিনখানা বাড়ী করে দিয়েছেন। হাটখোলায় মস্ত বাড়ী রেছেন। রুপোর পাত মোড়ানো পালকী শোভাবাজারের রাজারা য়েছিল। তাতে চড়ে গঙ্গা নাইতে যেতেন। একশো দুই বছর বয়সে দেহ রাখলেন।'

ভবানীশঙ্কর অন্যদের সঙ্গে বসে বৃদ্ধের গল্প শুনছিলেন। ঈষৎ হেসে বললেন, 'নিজের নাতিকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু কবরেজ মশাই।'

'তা, নাতি হলে কি। কুলাঙ্গার যদি হয়, ত অমন নাতিকে তাড়াবে না?'

'নাতি যে আমার সঙ্গে পড়ত জ্যাঠামশায়। ছেলেটি ভাল।'

'ওতে ওকেই আমরা মন্দ ছেলে বলি। ঠাকুর্দা যার অতবড় কবরেজ সে কিনা কলেজে পড়ে ডাক্তার হতে গেল। বৌ-এর বাবা একঘরে হ'ল, বৌ-কে ত্যাগ ক'রে আর একটা বে' করতে বাবুর মান গেল।'

'মন্দ কাজটা কি করল?'

'এখন শুনি কোথায় চাকরি করছে, দাড়ির হাল হয়েছে।'

'না জ্যাঠামশাই। সে কাশীতে মাস্টারী করছে। ভালই আছে।'

'তবে যে শুনলাম ক্রীশ্চান হয়েছে?'

'শুনি বটে, তবে তার বাপ কাকা তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, মনের রাগে ক্রীশ্চান হলে তাকে দোষ দেওয়া যেত না। আপনারা বোঝেন না, কথায় কথায় এমন ভাবে বাধা পায়, কলঙ্ক দেওয়া হয় ব'লে কত ছেলে ক্রীশ্চান হচ্ছে, নইলে ব্রাহ্ম হচ্ছে।'

'তুমি ত' বলবেই বাপু। বামুন হয়ে পৈতে ছেড়েছ, আহ্নিক কর না।'

ব্যাপার ঘোরালো হয় দেখে ভবানীশঙ্কর তাড়াতাড়ি বললেন, 'জ্যাঠামশায় এখন, আপনারা দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন ব'লে আমি আজ রান্নাঘরের দিকেও যাচ্ছি না। আপনাদের সঙ্গেও বসব না, কথা দিচ্ছি। আপনি রাগ করবেন না।'

বৃদ্ধ বসলেন। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলানো প্রয়োজন মনে ক'রে ব্র শিকদার মশাই বললেন, 'ভবানীভায়া, তোমাকে ত' আমরা ছাড়তে চাই ন তোমাকেও আমরা আমাদের মধ্যে চাই। একটা বিয়ে ক'রে ফেল। ত আগে একটা প্রাশ্চিত্তির করে নাও, আমরা একদিন ভাল ক'রে লুচি মি খাই।'

রামলালের কাকা উৎসাহিত হলেন। বললেন, 'এলাহাবাদে আম শালার নাতনীটি বেশ বড়সড় হলো। তেরো পেরুল। বল ত' পত্র কা দেই একখানা।'

'বলেন কি জ্যাঠামশায়, এই বয়সে?'

'আরে এই বয়স কি একটা বয়স নাকি! তুমি না কুলীন সন্তান?'

হরবিলাস মুখুজ্জে বললেন, 'আজকালকার ছেলে তোমরা, বড় স্বার্থপ হে! আরে, তোমার বিয়ে হ'লে, ছেলে হ'লে তবে ত' পিতৃপুরুষ এ গণ্ডূষ জল পাবে!'

ভবানীশঙ্কর মৃদু হেসে বললে, 'আমার বৈমাত্রেয় ভাইরা রয়েছে দাদা

'তাদের সঙ্গে ত' তোমার যোগাযোগ নাই হে! পৈতৃক সম্পত্তিনা হারালে।' 'বিজয়শঙ্কর, শুনতে পাই বড় ভাল ছেলে হয়েছে। বাবা আ জ্যাঠামশায়ের নাম ও-ই রাখতে পারবে। ওর ছেলেমেয়ে অনেক সম্পত্তিতে ওদেরই দরকার।'

নন্দবাবু এতক্ষণে মুখ খুললেন। বললেন, 'দেখ ভাই, তোমার যদি বি হয়, পরিবার হয়, তাহ'লে বিদেশে বাঙালীর একটা ঘর বাড়ল। আমাদে বলভরসা হ'ল।'

'দাদা দু'বার সংসার করেছেন, আবার অন্যকে সেই সুখে টানছেন। কপালীবাবু ঘাম মুছতে মুছতে বললেন। নন্দবাবু মুখ বিকৃত করলেন, 'ও কথা আর বলো না রে ভাই! ঘরে নিত্যি কিচিমিচি, নিত্যি জিনিসপত্র বাড়ন্ত! এখন মা আছেন বলে ঠাণ্ডা আছে। নইলে এক এক সময়ে এমন আরম্ভ করে যে কাকচিল ভয়ে পালায়। ঘেন্নায় মনে হয় দেশান্তরী হই।'

ভবানীশঙ্কর বললেন, 'তা দাদা, অতবড় ছেলে, অমন মেয়ে থাকতে আপনি আর একবার সংসার না করলেই পারতেন!' নন্দবাবু একটু হেসে পানের খিলির টোপে জর্দা ঢাললেন। পানটি গালে দিয়ে বললেন, 'ভায়া, দুঃখও আছে, আবার সুখটি আছে। বড় বৌ দুধটি গরম করে দেয়, হাত পা

াবার জলটি গরম করে দেয়। মানকচুর মণ্ড ক'রে রুটিটি করে, বাতের থায় সেঁকতাপ দেয়। সেটুকু নইলে চলে না। আবার কনিষ্ঠা নথ নেড়ে ড়ে গল্প করেন, মল বাজিয়ে ঘুরে বেড়ান। ভায়া হে, দুই বিয়ে আমার তকালের লেপ, গরমে কচি আমের ঝোল। তুমি সন্নেসী মানুষ, তুমি এর বুঝবে? পট ক'রে যদি মরেও যাইরে ভাই, বৌদের জন্যে কোম্পানীর গজ রইল, দেশে ধান-জমি রইল। এ ত' আর বাপজ্যাঠার আমল ই যে, স্বামী মরলে চিতায় চড়াবে। তোমার বৌঠানরা সুখেই থাকবেন।'

সুখ কি কোম্পানীর কাগজে? নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে জ্ঞাতিদের তে নাস্তানাবুদ হওয়াতে! ভবানীশঙ্কর আর প্রশ্ন করলেন না। রামলাল টুকে বললেন, 'সেপাইগুলো বড় গরম হয়েছে। ওরা কথায় কথায় বলে, বু, আপনারা ত' সায়েবদের সঙ্গে একদলে!' হরবিলাস বললেন, 'পিঁপড়ের খা উঠেছে আর কি! গরম গরম কথা! আরে, সায়েবরা তোদের এক াসে ঠাণ্ডা করতে পারে!' রামলাল বললেন, 'এবার মগনলালদের াঁতে দোলে ত' কই নেমন্তন্ন পেলাম না।'

'এবার নাকি দোলে ওরা বড়বাঈজী এনেছিল!'

'ভবানীভায়ার বাড়ীতে ব'লে, নইলে এমন নিরিমিষ্যি নেমন্তন্ন হতো না ' বাঈজী আমরাও আনতুম!'

'হ্যাঁ, এবার একদিন তয়ফা-নাচ হোক।—মগনলাল যাকে এনেছিল মরা তাকেই আনব!'

'ওহে নন্দভায়া, সে লক্ষ্ণৌ-এর বাঈজী! তার তিন হাজার টাকা দামী।'

'া তিন হাজার দেওয়া যাবে! সবাই যদি মত করেন!'

ভবানীশঙ্কর গলাখাঁকারি দিলেন। রামলালের কাকা পাকশালার দিক কে ঘুরে এদিকে আসছেন। সবাই চুপ করলেন। তিনি বললেন, 'কপালী র তৈরী ছেলে হে! রাত দশটা বাজে, এর মধ্যে সব নামিয়ে দিল। াবড়িটা এলেই হয়!

'রাবড়ি এসে গেছে', ভবানীশঙ্কর বললেন, 'আমার মিশির নিয়ে এসেছে। রফের বারকোশে বসিয়ে ঠাণ্ডা করেছে, গোলাপজল দিয়েছে।'

একটু পরেই পাত পড়ল। সবাই উঠে গেলেন।

অনেক রাতে খাওয়া দাওয়া মিটল। সবাই যেতে যেতে একটা বাজল।

তারপর ভবানীশঙ্কর স্নান করলেন। স্নান ক'রে নিজের ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ল্যাম্পটি জ্বালালেন। ডায়েরী খুললেন। বৃহৎ মোটা খাতাটি, পাতায় পাতায় তাঁর অনেক একান্ত চিন্তার স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি লিখলেন, 'অনেকদিন পর তাহাকে দেখিলাম। তাহাকে দেখিয়াই আমার হৃদয় চঞ্চল হইল। দেখিলাম, তাহার চোখের নিচে কালি পড়িয়াছে। কিন্তু সেই রূপ তু ম্লান হয় নাই। একদিন যে রূপ দেখিয়া ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হইত, শিরা উপশিরা কোলাহল করিয়া উঠিত, সে রূপ তেমনই আছে। সে পরের। আমার তাহাতে কোন অধিকার নাই। তদুপরি সে কলঙ্কিনী, আপনাতে সে আপনি কলঙ্কলেপন করিয়াছে। সবই জানি, তবু সেই কলঙ্কিত-শশী দেখিয়া আকুল হই কেন? তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিয়া তাহাকে অনুক্ষণ ধ্যানের সঙ্গী করিয়াছি। এমন করিয়া আমি নিজেকে আহুতি দিতেছি কেন? ঈশ্বর আমার পথনির্দেশ করুন, আমাকে শক্তি দিন।' তিনি কলম থামালেন।

তিনি শূন্যদৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। বাইরের অন্ধকারকে তাঁর দুর্ভেদ্য, ঘোর তমসাবলুপ্ত মনে হ'ল। অন্ধকার। এই অন্ধকারের কিরূপ আছে? তাঁর কালীর ধ্যান মনে পড়লো। একসময়ে খুব ভাল লাগত। সব কথাগুলি মনেও পড়ে না।

'আমার হৃদয় নিরন্তর এর চেয়ে অনেক গভীর অনেক ভয়ংকর অন্ধকারে আচ্ছাদিত থাকে।' তিনি ধীরে ধীরে মনে মনে কথাগুলি বললেন।

তারপর আবার চাইলেন। হ্যাঁ। অন্ধকারেরও রূপ আছে, ভাষা আছে। ঐ অন্ধকার একজনের হৃদয়ের বেদনার মতো। বিশাল, চরাচর ব্যাপ্ত সেই বেদনা।

ভবানীশঙ্কর নিজের মনের চিন্তার দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন এই বিশাল, বিপুল, অনন্ত অন্ধকারকে তিনি আয়ত্ত করতে পারছেন না ওই অ-সীমকে তিনি স-সীম করতে চাইছেন। একটি মেয়ের হৃদয়-বেদনার সঙ্গে তুলনা করতে চাইছেন।

তিনি তবে মূর্খ এবং জীবনযুদ্ধে পরাজিত। কেননা প্রকৃতিকে তাঁর আর বিশাল মনে হয় না। একটি নারীকে তার চেয়ে বড় মনে হয় যেদিকে তাকান, তাকে দেখতে পান, শুধু তাকেই দেখেন। ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, প্রসন্নআকাশ, সবই যেন তার মতো, তার মতো।

—আমি কি মূর্খ ! ভবানীশঙ্কর ভাবলেন।

—আমি কি মূর্খ ? ভবানীশঙ্কর ধীরে, অস্ফুটে বললেন।

ষোল

জলসা থেকে ফিরে চম্পা তার ঘরে বসেছিল।

সে ভাবছিল। সম্পূরণ তার সামনে বসেছিল। একমনে টাকা গুনছিল। রূপোর এবং সোনার টাকা। এসব টাকা সম্পূরণ কোথা থেকে এনেছে তা চম্পা জানে না। টাকাগুলো থলিতে ভরছিল সম্পূরণ। ছোট, অথচ তীক্ষ্ণ একটা ধাতব শব্দ উঠছিল টাকায় টাকায় লেগে। সম্পূরণকে দেখে চম্পার মনে হচ্ছিল কোন অজানা অচেনা লোক !

আজ সন্ধ্যায় জলসার পর ইভান্স চম্পার সঙ্গে আলাপ করেছে। সে কি বলেছে, চম্পা তার উত্তরে কি বলেছে, সম্পূরণ তার প্রতিটি কথা জেনে নিয়েছে।

—'সম্পূরণ, তুমি খুশী হয়েছ ?' চম্পা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল। সম্পূরণ কিছুক্ষণ জবাব দিল না। তারপর বলল, 'হুঁ, খুশী হয়েছি।'

চম্পা আরো কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, 'সম্পূরণ তুমি কে ?'

'কি বললি ?'

'তুমি কে ?'

'তার মানে ?'

'তুমি কে ? তোমাকে কেন সবাই এত ভয় করে ? কেন টাকা দেয় ? কেন তুমি, তুমি আমাকে নিয়ে এলে ? তুমি কে ?'

'চম্পা, তোর ঘুম পায়নি ?'

'না। তুমি আমার ঘুম নষ্ট করেছ।' চম্পা খুব কঠোর স্বরে বলল। সে আরো বলল, 'আমি ভাবছিলাম আর ভাবছিলাম। ভেবে দেখলাম তোমাকে আমি ভয় করি না।'

'বেশ ত !'

'অন্যেরা ভয় করে কেন ?'

'তাদের শুধোও।'

'তাদের আমি চিনি না। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব মানুষটা বোকা। ওকে, ওকে কি তুমি খুন করতে চাও? নইলে ওর সঙ্গে কেন আমাকে...'

'চম্পা, ওকে খুন করব কেন?'

'জানি না। তুমি ত' মানুষ খুন কর, কর না?'

'খুন করি কি? যে আমার কাজে অসুবিধে ঘটায়, তাকে সরিয়ে দিই।'

'আমাকেও সরিয়ে দেবে?'

'তুই আমার কোন অসুবিধে ঘটাবি না।'

'কি ক'রে জানলে?'

'তোর কপালে লেখা আছে। তোকে আমি চিনেছি।'

'এ কথা কি সত্যি সম্পূরণ, যে কপাল দেখে তুমি লেখা পডতে পার?'

'পারি।'

'তুমি কি বলতে পার, আমার কি হবে, চন্দনের কি হবে? আমরা কি কোনদিন পরস্পরকে পাব?'

'ও সব আমি পড়তে শিখিনি চম্পা। আমি শুধু মৃত্যুর কথা পড়তে পারি, দুঃখের কথা ব্যথার কথা পড়তে পারি।'

'ও!'

'চম্পা, আমি এক সময়ে একজন সাধুর সঙ্গ পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে নিয়ে জঙ্গলে ঘুরতেন, শ্মশানে ঘুরতেন। তাঁর সঙ্গে থাকতে থাকতে আমি কপালের লক্ষণ পডতে শিখলাম। আমি যমরাজকে দেখেছি, জানিস।'

'কি রকম দেখতে?'

'কালো রং, কালো মহিষের পিঠে চড়ে তিনি বসে আছেন। তাঁর হাতের তালুতে দেখলাম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব মানুষ অসহায় হয়ে আছে। একটা মানুষ জন্মালে তিনি বিদ্যুতের মতো চিকচিক করে হাসেন। তিনি জানেন, যে জন্মাল, সে তাঁর দাস হল। তাঁর কাছে তাকে যেতেই হবে। রাজা হও বা ফকির হও, তাঁর কাছে যেতেই হবে।'

'তা ত' সবাই জানে।'

'তখন আমি ঠিক করলাম যে ক'দিন বাঁচব, কাজের মতো কাজ করব। আমার সাধুজী-ও বললেন, আমি শিবজীমহারাজ। একজন্মে ম্লেচ্ছদের

ঙ্গে যুদ্ধ করেছি ধর্মরাজ আনব বলে। এ জন্মেও আমাকে তাই করতে হবে। এই কথা বলে সাধুজী দেহ রাখলেন। আমার চোখের সামনে তাঁর শরীর জ্বলে উঠল। জ্বলতে জ্বলতে তিনি ওপরে চলে গেলেন। আমি বললাম, আমি যমরাজকে দেখেছি। এখন আমাকে একশো আটটি মানুষ বলি দিতে হবে, তাঁর পূজারী হব আমি। সাধু মহারাজ বললেন, 'তুই যা! সংসারে যা। তুই দেখবি তোর দিন আসবে!'

সম্পূরণ তার রক্তাভ দুই চোখ চম্পার দিকে ফেরাল। একটু হেসে বলল, 'জানিস আমি কত জন, কত ইংরেজ, কত মুসলমান, কত হিন্দুর কপালে যমরাজার ছাপ দেখছি আজকাল। আমার দিন এসে গিয়েছে। এবার অনেক রক্তপাত হবে।'

'তাতে কি হবে?'

'অনেক ম্লেচ্ছ মেরে আমি সিদ্ধপুরুষ হয়ে যাব। আমি রক্তপাত করে মাটিকে পবিত্র করে দেব।'

'সম্পূরণ, তুমি উন্মাদ।'

'অনেক কাণ্ড হবে চম্পা। আমি জানি আমার দিন এসে গেছে।'

সম্পূরণ অল্প অল্প দুলতে লাগল।

সম্পূরণ চলে যাবার পর চম্পা অনেকক্ষণ জেগে রইল।

সম্পূরণ উন্মাদ। এই রকম উন্মাদ আরো আছে। রক্তপাত, মৃত্যু, ...। চম্পার মনে হল সে বিরাট একটা জালে জড়িয়ে পড়েছে। নিজেকে যতই ছাড়াতে যাবে, ততই সে জড়িয়ে পড়বে। তার চেয়ে গা ঢেলে দেওয়াই ভাল।

বিছানায় শুয়ে সে জানালার দিকে চেয়ে রইল। আরো পরে অনেক রাতে তার দরজাটা খুলে গেল। চন্দন ঢুকল। বলল, 'সারারাত ওরা চর্চা করবে। চলে এলাম।'

পেছন পেছন সম্পূরণও এসেছিল। চম্পা তাকে বের ক'রে দিল। বলল, 'যাও।'

চম্পা দরজা বন্ধ করে দিল। বলল, 'ভালই হ'ল আমি আজ একলা থাকতে পারছিলাম না।'

চন্দন অবাক হয়ে গেল। চম্পা তার কাছে এসে বসল। বলল, 'আমাকে আদর কর, খুব আদর কর চন্দন।'

চম্পা, তোমার কি হয়েছে?

'কিছু হয়নি। খুব আদর কর চন্দন, আমি তোমায় হুকুম করছি। আমাকে তুমি ধর। শক্ত ক'রে ধর।'

'চম্পা!'

'তোমরা দু'জন যা বলছ আমি তাই করছি। তোমরা আমার কথা শুনবে না? তাই আমি ওকে বলেছি বেরিয়ে যাও। তাই তোমায় বলছি—আদর কর।'

চন্দনের কাঁধে মাথা রেখে চম্পা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, 'বা! আমার কথা শুনছ না যে? তুমি বুঝি আমায় কিছু দেবে না? আমাকে দিয়ে শুধু শুধু কাজ করিয়ে নেবে?'

চন্দনের মনে হল, অনেকদিন পরে আজ চম্পা সুরজের সেই ছোট মেয়ে হয়ে গেছে, যে মেয়ে আদর পায় না, বন্ধু পায় না, খেলনা পায় না—তবু সে চায়, শুধু চায়।

সে চম্পাকে আদর করে করে শান্ত করল। ভোররাতের দিকে চম্পা ঘুমোল। ঘুমের মধ্যে তার ঠোঁটটা একটু ফাঁক হয়ে রইল আর একটু একটু কোঁপাতে থাকল সে। চন্দনও ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল সুরজ এসেছে। তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে বলছে, তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে বলেছিলে! সে যেমন হ্যাঁ চাচা বলতে যাবে অমনি তার ঘুম ভেঙে গেল।

দেখতে পেল ভোর হয়ে গেছে।

ব্রিজদুলারী মাটিতে বসে কাঁদতে লাগল। ব্রাইট বিছানায় বসে মৃদুমৃদু হাসতে হাসতে তার দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'উঠে এস।'

ব্রিজদুলারী চোখ মুছল। উঠে দাঁড়াল। ব্রাইট বলল, 'দেখি, চন্দ্রহারটা দেখি।'

ব্রিজদুলারী কাছে এল। ছোট্ট একটা নিশ্বাস পড়ল তার। সপ্তাহে দু'দিন, তিনদিন তাকে এমনি করে সাজতে হয়। কপালে, হাতে, কোমরে গলায়, কানে গয়না পরতে হয়। ব্রাইটকে বাধা দেওয়া চলে না। ব্রাইট তাহ'লে চাবুক মেরে সিধে করে দেয় তাকে।

নতুন চন্দ্রহারটা গড়িয়ে আনবার পর থেকেই ব্রিজদুলারী ভয়ে ভয়ে ছিল। ব্রাইটকে হাসতে দেখলে সে ভয় পায়।

ব্রাইট তাকে কাছে টানল। বাতিটা নেভাল। তারপর এক চুমুক টেনে বোতলটা দূরে ফেলল। তার জামাটা প্রায় ছিঁড়ে ফেলে বলল, 'শালী এত খাস তবু গায়ে মাংস লাগে না কেন?'

ব্রিজদুলারী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'না। আর না।'

'কি বলছিস?' ব্রাইট ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে।

'সাহেব, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি···'

ব্রাইট ব্রিজদুলারীকে কথাটা শেষ করতে দিল না।

কিছুক্ষণ ঘনঘন ফোঁপানি, ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস এবং ব্রিজদুলারীর কান্না শোনা গেল।

ব্রাইট ঘুমোচ্ছে। ব্রিজদুলারী আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে রইল। তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। এখন শুকিয়ে গেছে।

ব্রিজদুলারী উঠল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কুলুঙ্গীর আয়নার পেছন থেকে একটা কৌটো বের করল।

কৌটোটা হাতের মুঠোয় ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল। অন্ধকারে, সন্তর্পণে, তার হৃদয়ে চিন্তা প্রবেশ করল। দুটি পুরুষের চিন্তা। তার জীবনে দুই অক্ষরেখায় দু'জন পুরুষের অস্তিত্ব। সে বিষুবরেখার মতো পুড়তে পুড়তে, দগ্ধ হতে হতে তাদের মাঝখান দিয়ে চলেছে। এমনি করেই তাকে চলতে হবে।

'এমনি করেই তোমাকে চলতে হবে, যতদিন না তুমি নিজেকে এই পঙ্ক থেকে টেনে তুলতে পারছ।'

'খুব চালাক তুই, শয়তানী! তোর মতো যুবতী মেয়েদের জব্দ করার মন্ত্র আমি জানি।'

'তুমি নিজেকে টেনে তোল। তুমি ভয়কে জয় কর।'

'ওরে বাঁদী, তোর দেশের মেয়েরা জানোয়ারের মতো বেঁচে থাকে। তোর বেলা কি শাস্ত্র উল্টে যাবে?'

'যদি না পার, যদি না পার ব্রিজদুলারী, যদি তোমার চোখে বিশ্বসংসারও অন্ধকার হয়ে যায়···'

'কাঁদ তুই, কাঁদ। আঃ মেয়েমানুষের চোখের জল দেখলে আমার আনন্দ হয়।'

'আমি কি করব?' ব্রিজদুলারী প্রথম পুরুষকে জিজ্ঞাসা করল।

'বিশ্বসংসার তোমার চোখে অন্ধকার হয়ে গেলেও তুমি আত্মহত্যা করবে না।'

'আত্মহত্যা করব না?' ব্রিজদুলারী অস্ফুটে অন্ধকারকে জিজ্ঞাসা করল।

'না, আত্মহত্যা করবে না।'

'না, আত্মহত্যা করবে না।'

'না, আত্মহত্যা করবে না।'

ব্রিজদুলারী সভয়ে শুনতে লাগল অন্ধকার তাকে বলছে এই কথা। সে শুনতে পেল ঘরের দেওয়াল, জানলা, ঘড়ি, আলমারী, এই সব নির্জীব জড়বস্তুরা হঠাৎ কথা বলবার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে। তারা বলছে, 'না, না, না।'

ব্রিজদুলারী মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলল, 'না'।

সে কৌটোটা রাখল। দরজা খুলল। হলঘর পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ধীরে সিঁড়ি ধরে নামল। শুকনো পাতা মাড়িয়ে, কাঁকর মাড়িয়ে বাগানের বুকে হেঁটে এল। আস্তে মাটিতে বসে পড়ল। মাটি এবং শুকনো পাতা, এবং জলহীন শুকনো ফোয়ারার পাথর সব কিছুর ওপর দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে সে জড়িয়ে ধরল। প্রথমে তার শরীরটা জ্বালা করছিল, কাঁপছিল। তারপর যেন শরীরটা ঠাণ্ডা এবং স্থির হল। সে ফিসফিস করে বলল, 'আমি মরতে গিয়েছিলাম। আমি মরতে গিয়েছিলাম।'

তারপর তার শরীরটা একটা দুর্নিরোধ্য, অদ্ভুত প্রেত হাসির দমকে দুলে উঠল। সহসা, এই রাতে ব্রিজদুলারী তার জীবনের এক বিরাট কৌতুক দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়েছে সে কি নির্বোধ!

'আমি মরে আছি, এর নামই মৃত্যু। তবু আমি বিষ খেতে গিয়েছিলাম।' সে হাসতে লাগল।

নির্বোধ! নির্বোধ আমি। আমি কি বোকা! কি বোকা আমি। মরে গেছি, তবু আমি আবার মরতে চাইছিলাম! মরা লোক কি আবার মরতে পারে? হাসতে হাসতে সে মাটিতে মুখটা ঘষতে লাগল। তারপর

তার চীৎকার করতে ইচ্ছা হল। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল, 'এই মৃত্যুর পরও আমি যদি বিষের মৃত্যু চাই, তাতে কার কি?'

একটা চীৎকারে আকাশকে, পৃথিবীকে ফাটিয়ে দেওয়া যায় না।

ব্রিজদুলারী নিজের গলা চেপে ধরতে গিয়ে একটা কাঠের টুকরো কামড়ে ধরল। কাঠের ঘষা লেগে তার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল, তার চোখ দিয়ে পড়তে লাগল জল। সেই অশ্রু ধর্ষিত, অপমানিত, এক কৃষ্ণ মহাদেশের হৃদয়ের রক্ত। তেমনিই লবণাক্ত এবং উত্তপ্ত।

সতেরো

সেই রাতে ব্যারাকের গারদখানায় নান্নু মুখিয়া নামে একটি সহিস জেগে বসেছিল। কাল তার শাস্তি হবে। কোর্টমার্শালের নির্দেশে নান্নু মুখিয়া বিশ ঘা বেত খাবে। নান্নু ঘুমোতে পারছিল না। মাঝে মাঝে নিশ্বাস ফেলছিল আর 'হায় রাম! হায় রাম!' বলছিল। তার হাতের তালু-পায়ের চেটো এবং কপাল ঘামছিল। ঘাম মুছছিল, তবু চটচটে ঘামে তার হাত, পা, মুখ ভিজে উঠছিল। সে ভাবতে ও বুঝতে চেষ্টা করছিল, কি করেছে। কোন্ দোষে সে অপরাধী সাব্যস্ত হল।

এবার রিসালায় ঘোড়া কেনবার একটা ব্যস্ততা দেখা যায়। রিসালায় ঘোড়া কিনবার সময় অশ্বারোহী সৈন্যদের বাড়ী থেকে টাকা আনতে হয়।

এবার স্থির হয়, সওয়াররা টাকা আনবে, ঘোড়া দেবে রিসালা। সেকেণ্ড রিসালার অ্যাডজুটেন্ট-ই ঘোড়া কিনে থাকেন। কম্যাণ্ডাণ্ট বা সেকেণ্ড কম্যাণ্ডাণ্ট সে বিষয়ে মাথা ঘামান না। এবার এ্যাডজুটেন্ট ব্যারেট এণ্টেরিক ফিভারে ভুগছেন এবং হাঁসপাতালে আছেন। তাই সেকেণ্ড কম্যাণ্ডার ব্রাইটের উপর দায়িত্ব এসে পড়ে। ভারতীয় রিসালাদার মেজর লাজপৎ সিংহের সহযোগিতা চেয়েছিল ব্রাইট। তিনি সে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন। অন্যদের বললেন, 'ত্রিশটা ঘোড়া কেনা হবে। ন'হাজার টাকার ব্যাপার। ব্রাইট সাহেব আছে, ও গোলমাল একটা হবেই। আমি ওর মধ্যে যাব না।'

ব্রাইট খুশী হল। আর টাকা পয়সার বিষয়ে তার নীতি যে খুব শ্লথ সে কথা স্বীকার করতে সে লজ্জা পায় না। রিসালার আমানত ফাণ্ড-এর টাকা নিয়ে সে দু'বার মুশকিলে পড়ে। একবার তার কোর্টমার্শাল হতে পারত।

শেষ অবধি সে বেঁচে যায়। আমানত ফাণ্ড-এ প্রত্যেক সওয়ার, এমন কি রিসালাদার মেজর পর্যন্ত দেড় মাসের মাইনে জমা রাখেন। এ আইন বাধ্যতা-মূলক। সেই টাকা রিসালা সুদে খাটায়। প্রয়োজন হলে রিসালভুক্ত লোকেরা সেই ফাণ্ড থেকে টাকা ধার পায়। এক এক সময়ে কোন কোন রিসালার আমানত ফাণ্ড-এর মূলধন সত্তর হাজার টাকা অবধি জমে যায়।

অন্য সময় হলে সওয়াররা নিজেরাই ঘোড়া কিনবার টাকা দিত। তারা রিসালাভুক্ত হওয়া গৌরবের মনে করত। 'নিকলসন, লরেন্স, মীড সাহেবের ক্যাভেলরিতে আমি ছিলাম', এ কথা বলতে অনেকে গর্ব অনুভব করেছে। এখন, ১৮৫৭-র প্রারম্ভে, রিসালা বা ইনফ্যানট্রি-তে ভর্তি হবার জন্য কারু মধ্যে আগ্রহ দেখা গেল না। নতুন রেক্রুটদের টাকা আনবার জন্য বলা হল। তার সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, ঘোড়া কিনবার টাকা আপাতত আমানত ফাণ্ড থেকেই দেওয়া হবে। পরে, সওয়াররা টাকা আনলে তা জমা ক'রে দেওয়া যাবে।

কানপুরে গত ত্রিশ বছর ধরে মির্জা মাহ্মুদ ও সিরাজী বাইজু ঘোড়া সরবরাহ করছে ক্যাভেলরিতে। মির্জা মাহ্মুদ দিল্লীতে থাকে। তার মস্ত বড় আস্তাবল আছে। ভাল ঘোড়া বিক্রি হবে খবর পেলে সে তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়। ঘোড়া পালন করা বিষয়ে তার অগাধ অভিজ্ঞতা। সে সৎ ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। অসৎ ভাবে পয়সা করাকে ঘৃণা করে। ঘোড়ার দাম বেশী নেয়। 'মির্জা মাহমুদের ঘোড়া' এ কথা জানলে কেউই বেশী টাকা দেওয়াকে ক্ষতি মনে করে না।

সিরাজী নেহাতই জুয়াড়ী ব্যবসাদার।

সিরাজীর বাবা আলতাফ। হুমায়ুন বাদশার সময় থেকে বাদশার মোহর নিয়ে ব্যবসা করেছে আলতাফের পূর্বপুরুষ।

জুয়া খেলে খেলে জুয়ার নেশা সিরাজীর রক্তে ঢুকেছিল। বাবার মৃত্যুর পর ঘোড়ার ব্যবসা নিয়েও সে জুয়া খেলতে লাগল। বর্তমানে সে তার পরিবারের সঞ্চিত সোনা ও রুপোর বাসন, গহনা, একে একে বিক্রি করছিল।

এবার সে ব্রাইটের বাংলোয় এল। মির্জা মাহ্মুদের এলিচি খবরটা দেরি ক'রে পায়।

সিরাজী এবং ব্রাইটের মধ্যে কথা হয়, কোম্পানী যদিও দু'শো আশি টাব

দিয়ে জিনপোষ সমেত ঘোড়া কেনে, এবার ব্রাইট তাকে ঘোড়াপিছু তিনশো কুড়ি টাকা দেবে। সিরাজী তিনশো টাকা দাম নেবে। ঘোড়া পিছু কুড়ি টাকা সিরাজী লাভ করবে। ব্রাইট পাবে ঘোড়াপিছু কুড়ি টাকা। ব্রাইট একটি লোককে পাঠাবে, সে সিরাজীর কাছ থেকে ছ'শো টাকা আনবে।

সিরাজী বলল, 'আপনি ছ'শো টাকা কেটে রেখে আমাকে টাকা দিচ্ছেন না কেন?' ব্রাইট বলল, 'তা হয় না। আমি কাগজে কলমে সই ক'রে গোলমাল বাধাব না। তোমাকে ন' হাজার ছ'শো দেওয়া হবে। তুমি সই দিয়ে তা' নিয়ে যাবে। আমাকে তুমি পরে দেবে টাকা। এখন বড় কড়াকড়ি। নজর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আমি সামনাসামনি টাকার লেনদেনে যেতে চাই না।'

টাকা আনতে কে যাবে? কাকে বিশ্বাস করতে পারে ব্রাইট? এমন কে আছে যাকে কেউ সন্দেহ করবে না? যার অস্তিত্ব সম্পর্কেই কারু খেয়াল থাকে না।

সকলের হাসিঠাট্টার পাত্র, করুণার পাত্র, মূর্খ নান্নু মুখিয়ার দিকে চেয়ে ব্রাইট বুঝল এ-ই সেই মানুষ।

ব্রাইট তাকে দুটো টাকা দেয়। সে সিরাজীর কাছে যায়। সিরাজী ইতিমধ্যে হঠাৎ মত বদলে ফেলেছে। হাতে টাকা পাবার পর ব্রাইটকে ছ'শো টাকা দিতে সে চাইল না। তোড়াবন্দী তিনশো টাকা পাঠাল সে। নান্নুকে দিল পাঁচটা টাকা। ব্রাইট রাগে আগুন হয়ে গেল। সে কিল খেয়ে কিল হজম করতে বাধ্য হল। আর কিছু করবার ছিল না তার।

নান্নু কিন্তু খবরটা চেপে রাখতে পারল না। ছোটবেলা জ্বর হয়ে হয়ে তার মাথাটা ভোঁতা হয়ে যায়। সবাই তাকে বোকা বলে। সে ব্রাইটের খিদমতগার মাত্র। তবু তাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেয় ব্রাইট। উঠানের ঘাস চাঁছিয়ে নেয়। গরমের দিনে কুয়ো থেকে ঘড়া ঘড়া জল টানায়। তাকে লাথি মারে। মারধোর করে। সবাই বলে, 'বোকা তুই। তুই হতভাগা একটা।'

এবার সে হেসে হেসে সকলকে বলতে লাগল, 'আমাকে সিরাজী সাহেব পাঁচটা টাকা দিয়েছে। আমার সাহেব দিয়েছে দু'টাকা। আমি যদি বোকা হব, সাতটা টাকা রোজগার করলাম কি করে?' তার কথা শুনে সবাই হাসল।

সে তখন সগৌরবে সাতটা টাকা দেখিয়ে দিল। এতদিন ধরে মাসে দেড়টাকা মাইনে পেয়ে যাকে খুশী থাকতে হয়েছে তার পক্ষে সাতটা টাকার মালিকানা ঘোষণা না করাই আশ্চর্য হত।

তাকে রিসালাদার মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রে ব্যাটা, তুই ত শুনছি সাতটাকা পেয়েছিস, তোর সাহেব কত পেল!'

নান্নু বলে, 'জানি না মেজর সাহেব। সিরাজী সাহেব আমাকে তোড়া দিল। আমি হুজুরকে দিলাম।'

'তুই সিরাজীর ওখানে গেলি, তা কেউ দেখেনি?'

'না। সাহেব আমায় শিখিয়ে দিয়েছিল। আমি ঘাসকাটা কাস্তে শাণ দিতে শহরে যাই। আমার চাচেরা ভাই সিরাজী সাহেবের আস্তাবলে সহিস। তার সঙ্গে দুটো কথা কই। তারপর টাকা নিয়ে আসি।' কথাটা ছড়াতে লাগল।

সিরাজী কারু ধার ধারে না। দায়িত্বহীন ভাবে এলোমেলো কথা বলে তার অভ্যেস আছে। সে নিজেই বলে বেড়াতে লাগল, 'সাহেবদের রিয়াসত গোটাবার সময় এসেছে। আজ তারা ঘোড়ার টাকা থেকেও নিচ্ছে। কাল শুনবে ঘোড়ার দানাপানি থেকে খরচা বাঁচাচ্ছে।'

ব্যাঙ্কার চৈৎরাম জৈৎরাম-রা তিনপুরুষ ধরে রেজিমেন্টকে টাকা ধার দিচ্ছেন। সুদ-তেজারতীর মস্ত কারবার তাঁদের। তাঁরা-ও কথাটা ভারতীয় অফিসারদের শোনালেন। ভারতীয় অফিসাররা তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণে এসে থাকেন। চৈৎরাম বললেন, 'কাজটা ভাল হয়নি। রিসালার মুখ হাসলো এই ব্যাপারে।'

আস্তে আস্তে কথাটা ওপরে পৌঁছলো। হুইলার বিপন্ন বোধ করলেন। ব্রাইটকে শাস্তি দিতে পারলে তাঁর বিবেক প্রসন্ন হত। কোম্পানীর সম্মানও থাকতো তাতে। সবাই দেখত কোম্পানী সরকার সাহেবদের দোষ ত্রুটিকেও ক্ষমা করে না। কিন্তু এওআর্ট, উইলিয়ামস প্রমুখ প্রবীণ অফিসাররা তাঁকে বললেন, 'না, এখন নয়।' এখন সৈন্যদের মধ্যে রিসালার মধ্যে প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব। ভারতীয় অফিসারদের মধ্যেও মনের ভাব গোপন করে চলবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে।'

হুইলার বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ। তা কি আমিই জানি না? আমার মনে হয় ওদের সঙ্গে কথা বলি। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু

তখনই মনে হয়, না। কখন অজান্তে কোথায় খোঁচা লাগবে। তার থেকে হঠাৎ কি ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। সত্যি বলতে কি, আমি বুঝতেও পারি না, অজানিত একটা বিপদের আশঙ্কা, বিপদের পূর্বাভাস, এ কি আমার মনগড়া ! না এর কোন অস্তিত্ব আছে।'

আলোচনা করে স্থির হল এখন ব্রাইটকে খোলাখুলিভাবে জেরা করা বা শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। তা হ'লে এই কথা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে। লোকের মনে অদ্ভুত সব ধারণা গজিয়ে উঠবে। তারা মনে করতে পারে এই সেনাবাহিনীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। তারা মনে করতে পারে, যাদের হাতে শাসকের রাজদণ্ড, তারাই যদি উৎকোচলোভী হয়, তাহ'লে কারু ওপরই ভরসা রাখা চলে না।

'ব্রাইট একটি প্লেগ', এওআর্ট বললেন, 'ব্রাইট ছাড়া আরো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, মুলেটো, হাফকাস্ট ত আছে। তারা ত' এ রকম নয়। ওর আবার অনুগত একটি পাঠান সওয়ার দল আছে। ব্রাইট অফ ব্রাইট'স হর্স-কে চটিয়ে রাখলে তারা বদমায়েসী করতে পারে।'

ডুইলার বললেন, 'দেখ, অশান্তির ভয়ে, অপ্রিয় হবার ভয়ে এমন ভাবে জোড়াতালি দিয়ে চলা-তে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমাকে এখন তাই করতে হচ্ছে।' ব্রাইটকে কিছু বলা হল না।

কিন্তু তাকে ভাবেগতিকে বুঝতে দেওয়া হল, তাকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলা হচ্ছে। তার সঙ্গে বসে কেউ মদ্যপান করতে চাইল না। তার সঙ্গ এড়িয়ে চলতে লাগল। অন্য সময় হলে ব্রাইটকে কোন ছুতোয় অপমান করে কেউ হয়তো আর কিছু না হোক, ঘুসোঘুসিতে অবতীর্ণ হতেন। কিন্তু না। এখন সে সময় নয়।

ব্রাইট কিন্তু নান্নুর কথা ভুলল না। সে-ই যে তাকে ফাঁসিয়েছে এ কথা সে ভুলতে পারল না। সিরাজীও তার সঙ্গে পরিহাস করেছে, অপমান করেছে তাকে। কিন্তু সিরাজীর ক্ষতি করবার ক্ষমতা নেই তার।

নতুন ঘোড়াগুলি তখনও সওয়ারদের দেওয়া হয়নি। তখনই, সেই সময়েই নান্নু যখন উপরি একটি টাকার লোভে ঘোড়াগুলিকে খাবার দেওয়ার ভার নিয়েছে, চারটে ঘোড়া অসুস্থ হল। গুলী করে মেরে ফেলতে হল তাদের। ঘোড়ার খাবারের সঙ্গে কাঁচা ধুতরোপাতা পাওয়া গেল।

কোর্টমার্শাল। নান্নুর বিশ ঘা বেত।

ভবানীশঙ্করের দিনলিপি 'আমাকে লাজপৎ সিং সঙ্কোচে প্রশ্ন করিয়াছেন, ব্রাইটের বেলায় সে নির্দোষ সাব্যস্ত হইল, আর এই হতভাগ্য সহিস দোষী সাব্যস্ত হইল, এ কেমন কাজীর বিচার! প্রশ্নটি আমাকে চিন্তাকুল করিয়াছে। তিনি আমাকে আরো বলিলেন, 'ডাক্তার বাবু, আপনি বোধহয় ইহাতে দূষণীয় কিছু দেখিবেন না।' আমি বলিলাম, 'কেন?' তিনি ঈষৎ হাস্যে বলিলেন, 'বাবু, আমরা কি জানি না, আপনারা সাহেবদের ভাবে ভাবিত, তাঁহাদের মতে-ই আপনাদের মত!' আমি বলিলাম, 'অন্যদের কথা জানি না। কিন্তু আমি সাধ্যমতো নিজের বিবেক ও ধর্মের অনুশাসনে চলি। আমার স্বাধীন চিন্তাকে শৃঙ্খলিত হইতে দেই না। রিসালদার মেজর সাহেব, তৎসত্ত্বেও আমি বেতনভোগী মাত্র। আমি নান্নুর এই শাস্তিকে অন্যায় মনে করিতে পারি। কিন্তু নিবারণ করিতে পারি কি? কই, আপনি রিসালার প্রধান। দয়াবান ও বিবেচক বলিয়া আপনার খ্যাতি সর্বজনে করিয়া থাকে। যদি মনে করেন নান্নু নির্দোষী, তাহা হইলে তাহাকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইলেন না কেন?' আমার প্রশ্ন শুনিয়া লাজপৎ সিংহের শুভ্র মুখমণ্ডল আরক্ত হইল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'ডাক্তার বাবু, সর্বজন সমক্ষে উহার বেত্রাঘাত হউক। তাহা দেখিয়া অন্যদের মনে ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে। এখনো যে সকল মূর্খ ভাবে সাহেবরা ন্যায়ধর্মের প্রতিপালক, তাহাদের ভ্রম ঘুচিবে।' লাজপৎ সিং কর্মান্তরে প্রস্থান করিলেন। আমি চিন্তাকুল হইলাম। বস্তুত কিয়দ্দিন হইল রেজিমেন্টে উল্টা বাতাস বহিতেছে। সিপাহী ও রিসালার মধ্যে ক্ষোভের প্রকাশ দেখা যাইতেছে। রেজিমেন্ট হইতে বাহিরে পত্র চালাচালি চলিতেছে এমন শুনা যায়। হুইলার সাহেব ও অন্য সাহেবদের মনে যেন সংশয় দেখা দিয়াছে। তাঁহাদের কিছু বলিতে গেলে তাঁহারা আর প্রীতিভরে শুনেন না। অথচ রিসালার কমাণ্ডারমেজর সাহেব পূর্বে আমার কত কথাই না শুনিতেন। এখন তিনি বলেন, 'চৌধুরী, তুমি বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত। তুমি এই সকল উড়ো খবরে কান দিও না।' ব্রাইটের ব্যাপারে হুইলার সাহেবকে সময়োচিত কঠোরতা অবলম্বন করিতে দেখিলাম না। এমত-ও শুনিয়াছি, দেশীয় সিপাহী রিসালার কাছে সাহেবরা হেয় প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া তাহাকে সমুচিত সাবধান করা হইল না। এইভাবে জোড়াতালি দিয়া চলিলে কি অশান্তি এড়ান যাইবে? ভারতীয়দের মনে ক্ষোভ ও

অশান্তির সত্যই কোন কারণ আছে কিনা তাহার তদন্তেই বা সাহেবদের এরূপ আশঙ্কা কেন? আশঙ্কা করিয়া বিপদের সম্ভাবনা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিলেই কি বিপদ দূরীভূত হইবে? স্বজাতীয়দের চটাইব না, ভারতীয়দের ক্রোধ উৎপাদন করিব না, সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া চলিব, ইহা কি বাস্তবে সম্ভব? জেনারেল হুইলার বৃদ্ধ এবং প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি অভিজ্ঞ এবং দূরদর্শীও বটেন। কিন্তু এখন যেন তিনি সিক্ত পেয়ালা চাপা দিয়া ঘরের আগুন নিভাইতে চাহিতেছেন। সিক্ত পেয়ালা প্রধূমিত অগ্নি নিভাইতে পারে না। মাটির বাঁধে বন্যাবেগ নিবারণ করিতে পারে না, তাহা তিনি বুঝিতেছেন না কেন? সওয়াররা এখন আমাকে অবধি পূর্বের ন্যায় বিশ্বাস করে না। কথায় কথায় বলে, 'বাবু' বাঙালীরা সাহেবদের রীতি-নীতি আচার সবই গ্রহণ করিয়াছে। কোন অফিসার বলিযা বসেন, 'বাবু, কোম্পানীর রাজ্যেই যে সকল সুশাসন তাহা মনে করিবেন না। আমাদের প্রাচীন হিন্দুরাজাদের আমলে বা মোগল বাদশার রাজত্বে কি সুশাসন ছিল না। বরং তখন অপরাধীর দণ্ডবিধান সম্যক কঠোর রূপে হইত।' আমি চিন্তা করিলাম, এখন সিপাহী ও রিসালালোক নিয়মিত বেতন পাইয়া থাকে। শাসনব্যবস্থায় অনেক শৃঙ্খলা আসিয়াছে অস্বীকার করিতে পারি না। তৎসত্ত্বেও ইহাদের মনে যে অসন্তোষের বীজ উপ্ত হইয়াছে তাহাকেও উপেক্ষা করিবার নহে। নতুবা ইহারা সেই অতীতের শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করিবে কেন? ব্যভিচারিণী স্ত্রী-র নাসিকা কর্তন, মিথ্যাবাদী ব্যক্তির জিহ্বা সমূলে উৎপাটন, চৌর্যাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্তপদ কর্তন, সেই রাজত্ব কে চায়? বিশেষ, বর্তমানে যে সকল হিন্দু ও মুসলমান নৃপতির স্বতন্ত্র রাজ্য রহিয়াছে তাহাদের ইতিহাস কি ভয়ানক। সিপাহী ও কর্মচারিগণের বেতন ব্যবস্থা নাই। তাহারা সর্বদা লুণ্ঠনদ্বারা কোষবৃদ্ধির কার্যে তৎপর। প্রজাবর্গের সুখশান্তি নাই। ধনসম্পত্তি লইয়াও স্বস্তি নাই। সদাই যায় যায়, ঐ নিল, এই ভাব! নৃপতি কিছুই বোঝেন না, কিছুই শুনেন না। বিলাসব্যসন ও সুরাতে তাঁহার সমধিক আসক্তি। বস্তুত তাঁহার মধ্যে তমোগুণ উত্তম রূপেই বর্তমান। ভোগেই জীবন। ভোগেই মৃত্যু ত্বরান্বিত হইয়া থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা বা প্রজার হিতকল্পে নৃপতিদের তৎপর হইতে কই, আমি তো শুনি নাই। তাঁহারা রেসিডেন্ট অফিসারদের কাছে দরবার করণে ও কোম্পানীর ডিরেক্টর মহোদয়ের নিকট ঘনঘন আর্জি প্রেরণে সদাই নিরত।

আমার মনে হয় এই সকল কথাবার্তা সাহেবদের জানা উচিত। যাহাতে তাঁহারা বিবেচনা সহ অশান্তির অঙ্কুর উৎপাটনে যত্নপরায়ণ হয়েন। কিন্তু কাহাকে বলিব? সকলের মধ্যেই আড আড়, ছাড ছাড় ভাব।

এতখানি লিখে ভবানীশঙ্কর থামেন। তারপর একটি পাতা উল্টে লেখেন, 'কল্য নান্নু মুখিয়ার বেত্রাঘাত। এই ঘটনা কাহার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে দেখিতে উৎসাহী থাকিব।'

ইদানীং ভবানীশঙ্কর বড বেশী চিন্তা করছিলেন।

নান্নুর বেত্রাঘাত দেখতে যতজন সমবেত হয়েছিল তাদের দেখে তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। তারা ক্ষুব্ধ, ক্রোধের চেহারা তাদের মুখে স্পষ্ট। কেন তারা এসে দাঁড়াল?

কেন তাঁর সঙ্গে চন্দনও এসে দাঁড়াল? চন্দনের উপস্থিতি ত' বাধ্যতামূলক নয়।

তাঁর নিজের কষ্ট হচ্ছিল।

তিনি বুঝতে পারছিলেন, তাঁর পেটের ভেতরে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে, কপালেব শিরটা কন্‌কন্, শিরশির করছে। নিজেকে এই দৃশ্য দেখবাব জন্যে প্রস্তুত করলেন তিনি।

নান্নুকে বাইরে আনা হল। সকালের আলোয় তাকে খুব নির্বোধ, ভয়ার্ত দেখাচ্ছিল। সে এদিকে ওদিকে চাইছিল আর মাঝে মাঝে বলছিল, 'হায় রাম, হায় রাম!' তার চোখ দিয়ে জল পডছিল। তাকে চাবুক মারে শোভারাম। শোভারাম বলিষ্ঠ। অন্য অনেকের চেয়ে বলশালী ব'লে তাব নাম আছে।

চামডায় মোড়া বেতের চাবুকটা উঠছিল, বাতাসে শিস কেটে নামছিল, নান্নুর পিঠে পডছিল।

প্রথমবার চাবুক পড়তে নান্নু চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর সে আর থামে না। 'হায় রি-ই-ই-ই-ই-ই'—তার চীৎকারটা কাঁপতে কাঁপতে চলতেই থাকে। কেউ কেউ বলছিল নান্নু বাড়াবাড়ি করছে। জোয়ান মানুষ, ছোলাদানার বস্তা ব'য়ে ব'য়ে তার পিঠ শক্ত হয়ে যাওয়া উচিত। ওর যত না লাগছে, তার চেয়ে ও ভয় পেয়েছে বেশী।

তারপর দেখা যায় ওর পিঠ ফেটে পুঁজ পড়ছে। রক্তর বদলে পুঁজ

পড়তে দেখে ভবানীশঙ্কর চেঁচিয়ে ওঠেন—থামাও! শোভারাম তাঁর কথা শুনছে না দেখে তিনি চাবুকটা কেড়ে নেন। ব্রাইট চেঁচিয়ে ওঠে, 'ডক্টর!' সে তাঁর হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নেয়। ভবানী বলেন, 'না! ও অজ্ঞান হয়ে গেছে!'

'আর চার ঘা চাবুক খেলেই জ্ঞান ফিরবে!'

'ও নো! আই কান্ট্ এ্যালাউ ইট। নো। হি মাস্ট হ্যাভ বার্স্ট সামথিং ইন্সাইড।'

'হোআট ক্যান হি হ্যাভ বার্স্ট? হি কান্ট্ বি ক্যারিয়িং দি লিভার অ্যাণ্ড দি স্প্লীন অন হিজ ব্যাক!'

'বাট ইট ইজ সামথিং আই সে!' তখনো ভবানী বুঝতে পারেননি। পরে নায়ককে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর বোঝা গেল। ইংরেজ ডাক্তারের কাছে শুনে নিয়ে ভবানী অপারেশন করলেন। ঠিক এ ধরনের টিউমার তিনি দেখেননি। শল্যবিদ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতাও সামান্যই। তাঁর মনে আশঙ্কা হয় এর চেয়ে গুরুতর কিছু হবে কি না।

ব্রাইট তাঁর ওপর খুব অসন্তুষ্ট হয়। বাপ তুলে একটি গালাগালি দিয়ে বলে, 'আমি ওকে শিক্ষা দেব।'

সে চটে গিয়ে হিন্দীতে গালাগালি করতে থাকে। ব্রাইটের হিন্দী, পরীক্ষা দেবার জন্যে শিক্ষকের কাছে শেখা নয়। সে শৈশব থেকে আরদালিদের এবং তারপর সহিসদের কাছে ইতর লোকের অভব্য হিন্দী শিখেছিল। ভাল হিন্দী সে চমৎকার বলে। কিন্তু রাগলেই তার মুখ থেকে যে হিন্দী বেরোয় তার প্রতিটি কথার সঙ্গে একটি গালাগালি মিশ্রিত।

চন্দন-ও খুব চিন্তিত হয়ে রইল। আজকের ঘটনা তার মনকে কেন জানি গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। মনে পড়েছে এই সাহেবটি-ই একদিন তার পিতামহ চন্দনের জীবনে দুর্যোগ টেনে নামিয়েছিল। তার আরো টুকরো টুকরো কথা মনে পড়েছে। সে হঠাৎ ভবানীকে বলে বসেছে, 'ডাক্তার সাহেব, হলদোয়ানীতে দাদার কাছে যখন ছিলাম, নৈনী থেকে একসাহেব আর তাঁর মেম শিকার করতে আসেন। সাহেবটি মেমটিকে বন্দুকের নিশানা ঠিক করে দিচ্ছিলেন। বিকেল থেকে চেষ্টা ক'রে শেষে মেমসাহেব দুটো পাখী ফেলেন। পাখীগুলো জলে পড়ে। আমি সঙ্গে ছিলাম। একটা ছোট ছেলেও ছিল। ছেলেটাকে মেম সাহেব বলেন বকসিস দেব।

একটা সিকি দেব। ছেলেটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেকদূর সাঁতরে হাঁসদুটো নিয়ে আসে। তার কষ্ট হয়েছিল ডাক্তারবাবু। পাথরের ঘষায় তার কাঁধ ছিঁড়ে গিয়েছিল। শেষে মেমসাহেব তাকে সিকিটা দিলেন। তিনি খুব হাসছিলেন। হাসতে হাসতে সিকিটা তিনি দূরে ছুঁড়ে দেন। ছেলেটা খোঁজে, অনেক খোঁজে। কিন্তু সিকিটা সে পায়নি।'

ভবানী আশ্চর্য হয়েছেন। ভেবেছেন, এখানে এই অপ্রাসঙ্গিক কথাটা বলবার কি কোনও মানে আছে?

চন্দনের-ও মনে হয়েছে, সে যেন বোকামি করে ফেলেছে। সেদিন চন্দন বিকেলে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসেছে। নৌকার মাঝিদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে তার মনে হয়েছে, আজ তার কেন সেই কথাটা মনে পড়ছে? বারবার, ফিরে ফিরে? সে বুঝতে পারেনি।

সে চুপ করে বসে থেকেছে। নৌকার মাঝিরা কি বলছে তাই শুনেছে। আস্তে আস্তে মন্দিরে ঘণ্টা বেজেছে, সতীমন্দিরে পিদীম দিয়েছে ব্রাহ্মণ বালকটি, আকাশে তারা ফুটেছে একটা দুটো। দেখে তার মন যেন এক শান্ত গা এলিয়ে দেওয়া বিষণ্ণতায় ভরে গিয়েছে। সে ঘাটের রাণার ওপর শুয়ে পড়েছে! চুপ করে শুয়ে আকাশ দেখেছে আর নিজের চিন্তার ভারে অবসন্ন হয়েছে।

আঠারো

ক্রমবর্দ্ধমান অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা-কে আর চেপে রাখা যাচ্ছিল না। এমন কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছিল তিন হাজার সওয়ার, সিপাহী ও গোলন্দাজদের ওপরে মাত্র কয়েকজন অফিসার ইংরেজ। তাদের সংখ্যা পুরো একশো-ও নয়। ভারতীয়রা যেন নতুন এক আগ্রহ নিয়ে, সতর্ক হয়ে হিসেব করছিল আর অবাক হচ্ছিল। ভারতবর্ষের সর্বত্র এত এত ভারতীয় সিপাহী সওয়ার। আর শ্বেতাঙ্গ মাত্র ক'হাজার।

নানারকম কথা, হাতে হাতে চিঠি বিলি এ-সব চলছিল। সম্পূরণের মতো ধর্মোন্মাদ, যারা মনে করে তারা ঈশ্বর-প্রেরিত, তাদের সংখ্যাও বাড়ছিল বই কি! রাজা, জমিদার, তালুকদার, গদীচ্যুত ভূম্যধিকারীরা ভাবছিলেন এর পরে দিল্লীর বৃদ্ধ বাদশাহ তক্তে বসবেন। তাঁরা স্ব-স্থানে সগৌরবে রাজত্ব করবেন।

যারা জমি হারিয়েছে, সেইসব চাষী ভাবছিল তাদের জমি তারা ফিরে পাবে। অযোধ্যার লোকরা ভাবছিল নবাবকে কলকাতা থেকে টেনে এনে আর একবার গদীতে বসালে তারা চাকরি পাবে, জমি পাবে, সব পাবে।

রেজিমেন্টে যাঁরা ওপরে আছেন তাঁরা ভাবছিলেন, এরপর এদের ধ্বংস করতে পারলে আমরা স্বাধীন হব। যারা নিচে আছে, সেই সব সিপাহী কি ভাবছিল তা-ই জানা যায় না। তাদের ক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তারা সাত টাকা মাইনেয় ঢোকে, চল্লিশ বছর বাদে তাদের মাইনে হয় ন' টাকা। এই টাকা দিয়ে খাদ্য ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে মাস গেলে সে কখনো এক টাকা, কখনো এক আনা পায়, কখনো কিছুই পায় না। সিপাহী সুবাদার সহজে হয় না। উপরন্তু তারা অনেক অবিচার অনেক অপমান নিয়ত সহ্য করে। রিসালার সওয়ার প্রথমে সাতাশ টাকা মাইনেয় ঢোকে, অন্তিমে তাদের মাইনে হয় ত্রিশ টাকা। কখনো তারা ন' দশ টাকার বেশী পায় না। সওয়ার থেকে রিসালাদার মেজর হওয়া তাদের কাছে আশাতীত এক সম্ভাবনা। অথচ, সিপাহী যদিও জানে সে সুবাদার হবে না তবু সে সেই লক্ষ্যের দিকে তাকিয়েই ড্রিল, প্যারেড এবং কুচ করতে থাকে। সওয়ারও রিসালদার মেজরের তিনশো টাকা মাইনের পদের দিকে তাকিয়ে ঘোড়া ছোটাতেই থাকে।

এইসব জমিদার, তালুকদার, স্বার্থসন্ধী, নিঃস্বার্থ যোদ্ধা, সিপাহী সওয়ার ব্যতীতও সম্প্রদায়ের মতো একদল ধর্মোন্মাদ এসে জুটেছিল। তাদের ধারণা হল ভারত থেকে ইংরাজ বিতাড়নের মহৎ কাজটি সাধনের ভার ঈশ্বর তাদেরই দিয়েছেন। তাদের কোন স্বার্থ নেই। তারা জমি, টাকা বা ক্ষমতা চাইল না। তারা গাঁজা খেয়ে রক্তচক্ষু করে, ভাবোন্মাদে বক্তৃতা দিয়ে চলল। মানুষকে উৎসাহ দিতে লাগল। সুদূর গ্রাম যেখানে পল্লীবাসী এসব কথা কোনদিনও চিন্তা করেনি, সেখানেও হাটে বাজারে এরা হানা দিল।

কানপুরের অবস্থাকে বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত করতে, এই সব ধর্মোন্মাদ লোকরা কথায় কথায় বিঠুরের গদীচ্যুত মহারাজের দৃষ্টান্ত দেখাতে লাগল। বিঠুরের মহারাজের সৈন্যদল এবং কানপুরের রেজিমেন্টের সৈন্যদল দু'দলের মধ্যে পত্র ও দূত বিনিময়ের অন্ত রইল না।

সম্ভবত বিঠুরের পেশবা মহারাজ জানলেনও না। যাদের উপর তাঁর নির্ভর, তারা ইতিমধ্যেই সব স্থির করে ফেলেছে। তাঁকেই তারা নেতা বানাবে।

মজা হচ্ছে, প্রত্যেকে নিজের নিজের কথা ভাবল, কেউ অপরের কথা ভাবেনি। বড় অফিসাররা সিপাহীর কথা ভাবেন নি। কোন তালুকদার ভূমিচ্যুত প্রজার কথা ভেবে উদ্দীপিত হন নি। লক্ষ্য এক, ইংরেজ বিতাড়ন. কিন্তু একতা নেই।

মেজর জেনারেল হিউ হুইলার অশান্তির আভাসটুকু আঁচ করতে পেরেছিলেন মাত্র। জতুগৃহ নির্মাণের কাজ যে সমাপ্ত, এখন নির্দেশের অপেক্ষা করা হচ্ছে মাত্র তা তিনি বোঝেন নি।

অনেকে তাঁকে অনেক কথা বলেছেন। বিঠুরের পেশবাকে যে বিশ্বাস করা উচিত নয়, তা বলেছেন।

হুইলার বুঝতে পারেন নি কেমন করে তিনি পেশবাকে অবিশ্বাস করবেন।

স্থূলদেহ, বিষয়লোভী, প্রমোদপ্রিয় মানুষটি বরাবর তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারই করেছেন। তাঁর বাবার বৃত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। সদরে অনেক চিঠি পাঠিয়েও বাবার শীলমোহর নিজের নামে ব্যবহার করবার অধিকার পান নি। তবু তিনি কখনো ইংরাজদের সঙ্গে অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন কি? হুইলারের ত মনে পড়ে না। তিনি চিন্তাকুল হলেন।

মনে হল কোথায় যেন কি ঘটে যাচ্ছে, তিনি ধরতে পারছেন না। কোথায় যেন আগুনের উত্তাপ টের পাচ্ছেন, কিন্তু এতটুকু ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর দুঃখ হল হয় ত' তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। হয় ত' তরুণ অথবা যোগ্যতর কোন ব্যক্তির হাতে আজ এই গুরুদায়িত্ব থাকা উচিত ছিল।

আবার মনে হল, না, এ চিন্তা দুর্বলের চিন্তা।

এই সময় সেকেণ্ড ক্যাভালরি-র ভারতীয় ডাক্তার ভবানীশঙ্কর স্থির করলেন তিনি ছুটি নিয়ে কাশী যাবেন।

কেন যেন তাঁর মধ্যে একটা অস্থিরতা এসেছে। একটা বিষণ্ণ চিন্তা
ার মনের উপর গুরুভার হয়ে চেপে থাকে। তিনি সে চিন্তা থেকে মুক্ত
তে পারেন না, স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না।

তিনি রিসালা ও অন্যত্র জনপ্রিয় মানুষ।

ওরা তাঁকে ভালবাসে, তাঁকে বিশ্বাস করে। তিনি অসুখে বিসুখে
দের সেবা করেন, তাঁর কর্তব্যের অতিরিক্ত-ই করেন। প্রয়োজনে এদের
কা ধার দেন। সবাই জানে তিনি সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী। তাঁর
প্রয়োজন বড় কম। মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে বই আনান। বাংলা
গজ আনান অনেক মাশুল দিয়ে। এ ছাড়া তাঁর অন্য শখ নেই।
দিক একহারা মানুষটি। দুই চোখের দৃষ্টি নিরাসক্ত এবং গভীর।
হারে বা ব্যসনে তাঁর রুচি নেই। তাঁকে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে
কমই দেখা যায়। পৈতা আছে বটে, কিন্তু নিত্য সন্ধ্যা আহ্নিক তিনি
রেন না। মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করেন বটে, সে গ্রীষ্মকালে। রাতে
ন করতে যান নদীতে।

সাহেবদের সঙ্গে তাঁর গতায়াত নেই। প্রবাসী বাঙালীদের যে সমাজটি
ড উঠেছে, সেখানে কালীপূজা বা দুর্গাপূজা ব্যতীত অন্য সময়ে তিনি
ন না।

বাঙালীরা বলেন, ভবানীর সংসার করা প্রয়োজন। পদস্থ ভারতীয়
ফিসাররা বলেন, ডাক্তারবাবুর মাথায় পোকা আছে। সিপাহী ও
ওবরা তাঁকে ভালবাসে। বিশ্বাসও করে। তাদের সেই প্রীতি ও
বাসকে ভবানী অনুভব করতে পারেন।

এবার তাঁর মনে হচ্ছে, সেই প্রীতি, সেই বিশ্বাস যেন তিনি হারিয়েছেন।
তিনি অশান্ত বোধ করলেন।

কাশীতে তাঁর এক জ্ঞাতি দাদা থাকেন। সেই সদানন্দ স্নেহময়
ানুষটিকে ভবানী ভালবাসেন। তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ বোধ করেন। এবার
ার মনে হল তিনি যেন ক্লান্ত হয়েছেন। ইচ্ছা হল কিছুদিন কাশীতে গিয়ে
থাকবেন। একটি সুখী ও তৃপ্ত পরিবারের কোমল স্নেহচ্ছায়ায় কিছুদিন
বিশ্রাম নেবেন।

তিনি যাবেন শুনে চন্দন তাঁর সঙ্গে যেতে চাইল। সেখানে নাকি তার
প্রয়োজন আছে।

তিনি বিস্মিত হলেন, কিছু বললেন না। কিছুদিন ধরে তার মধ্যে তিনি অস্থিরতা লক্ষ্য করেছেন। দেখেছেন রাতের পর রাত সে বাইরে কাদের সঙ্গে কাটায়। অনেক রাতে তার ঘরে বাতি জ্বলতে দেখে তিনি কৌতূহলী হয়েছেন। দেখেছেন মোমবাতি জ্বেলে সে পড়ছে, নয়তো লিখছে। চন্দন হিন্দী পড়তে জানে বটে, কিন্তু সে যে পাঠে গভীর অনুরাগী তা ভবানীর কোনদিন মনে হয়নি। তিনি কিছু বলেননি। কৌতূহল প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ।

তিনি স্থির করলেন নৌকায় যাবেন। যাবার আয়োজন হল। তবে যাত্রা করবার আগে তিনি একজনের সঙ্গে দেখা করা স্থির করলেন।

তাকে ভবানী সাবধান করবেন। সে জানে না, সে অপরাধী নয়, তবু তাকে ঘিরে সিপাহী ও সওয়ারদের মনে কি ক্রোধ, কি ঘৃণা জমে উঠেছে। মনে হলো, যদিও তার ওপর তার কোন অধিকারই নেই, তবু তাকে সাবধান করা আশু কর্তব্য।

অতএব, অনেক দ্বিধার পর তিনি চন্দনের সাহায্য নিলেন। চম্পার বাড়ী ছাড়া তার সঙ্গে দেখা করবার আর নিরাপদ স্থান নেই।

চম্পার বাড়ীতে, বাইরের ঘরে ল্যাম্প জ্বলছিল। দরজার দিকে চেয়ে একটি মেয়ে দাড়িয়েছিল।

ঘোমটা নেই মাথায়। গলায় হাতে গহনা নেই। ল্যাম্পের আলো জ্বলছে। সেই আলো মুখে পড়েছে তার। মুখের সাদা ফ্যাকাসে রং হলদেটে দেখাচ্ছে। বড় বড় দুটি কালো চোখ প্রত্যাশায় অস্থির, অধীর!

তার সামনে যখন দাঁড়ালেন, ভবানীশঙ্করের নিজেকে বড়ই ক্লান্ত বোধ হল।

তিনি যেন একটা সমুদ্রের শুকনো সুবিস্তীর্ণ খাতের ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছেন। যেন সেই শুষ্ক, ঊষর মাটি দিয়ে চলতে তাঁর কষ্ট হয়েছে। সে সমুদ্র যেন কার অভিশাপে মরুভূমি হয়েছিল। কে যেন বলেছিল, 'তবে শুষ্ক হও, তবে বুকে দগ্ধতার জ্বালা বহন কর।'

সে সমুদ্র তাঁরই হৃদয়। নিজের হৃদয়কে অতিক্রম করে তবে তাঁকে আসতে হয়েছে।

মেয়েটি তাকাল। সহসা, সহসা ভবানী অস্থির হলেন, তাঁর রক্ত চঞ্চল হল। জল আসছে সে সমুদ্রে। ভরে উঠছে। ভরতে ভরতে, পূর্ণ হতে

ত, নিজের পূর্ণতাকে ধারণ করতে না পেরে, এক অশান্ত তরঙ্গে স্ফীত য় উঠছে। তাঁর হৃৎপিণ্ডে সেই তরঙ্গের প্রথম আঘাত লাগল ধ্বক করে।

তিনি সে আঘাতের শব্দ শুনতে পেলেন।

তারপর, প্রায় স্বরহীন ভাঙা গলায় তিনি বললেন, 'ব্রিজদুলারী ভালো াছ?'

ব্রিজদুলারী নীরব।

ভবানীশঙ্কর কথা খুঁজে পেলেন না। তিনি দেখতে লাগলেন, ব্রিজদুলারীর লায়, হাতে, কানে কোন গহনা নেই। তার দুই চোখের নিচে কালি। ক্তহীন হাতে, কপালে, গলায়, নীল শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়।

তিনি আবার বহু চেষ্টায় গলা স্বাভাবিক করে বললেন, 'এত রোগা য় গেলে কেন? কেন শরীরটাকে এমন ক'রে ভাঙছ?'

ব্রিজদুলারী ঈষৎ হাসল। সেই করুণ বিষণ্ণ হাসিতে প্রশ্নের জবাব হল।

ভবানীর মনে হয় তিনি যদি কথা বলেন আর ব্রিজদুলারী যদি তার বাব না দিয়ে এমন করে হাসে, তাহলে তিনি আর বেশীক্ষণ এখানে াড়াতে পারবেন না। ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছে, পা কাঁপছে তাঁর।

নিজেকে পাগল করলেন।

অন্য দিকে চেয়ে বললেন, 'কয়েকটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তুমি, তুমি কি বসবে না?'

নিজে চেয়ারে বসলেন। ব্রিজদুলারী মাটিতে বসে। 'তোমার গহনা াড়াবার জন্যেই না কি এবার ব্রাইটের টাকার দরকার হয়েছিল?'

ব্রিজদুলারী মাথা নেড়ে জানায়, না।

'তোমার ওপর সিপাহীরা, বিশেষ করে সওয়ারেরা রেগে আছে। মানুষ খন রেগে যায়, রাগ তাদের অন্ধ করে। আর কিছু না হোক, তারা তোমাকে গুণ্ডা লাগিয়ে খুন করাতে পারে আমি এ কথা শুনেছি।'

'বলুন।'

'তোমার বাবা বা ভাইয়ের কাছে তুমি যেতে পার না? তোমার কিছুদিন এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার।'

'আমার কেউ নেই।'

'কেউ নেই?'

ব্রিজদুলারী চুপ করে রইল। মুখ নিচু করে নিজেকে যেন শাসনে আনল। তারপর মুখ তুলল।

বলল, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'কাশী।'

'ও।'

আবার দু'জনে চুপ করলেন। দু'জনে শুনতে লাগলেন ঘড়িতে টিকটিক করে শব্দ হচ্ছে। সময়টা সরে সরে যাচ্ছে।

'আপনি বলুন আমি কি করব।'

'আমি কি বলব?' ভবানীর কণ্ঠ বেদনায় হতাশ।

ব্রিজদুলারী দুঃসাহসী হল। সহসা এই দূরত্বের বেড়াটা ভেঙে ফেলে দিয়ে বলল, 'একদিন তুমি আমাকে ডেকেছিলে। একদিন বলেছিলে আমার সব বিপদে পাশে থাকবে, কাছে থাকবে। মনে পড়ে।'

মনে পড়ে। না মনে পড়ে না। মনে পড়ে। মন অবাধ্য, মন দুর্বিনীত। মনে পড়ে, তবু আমি সে কথা ভাবতে চাই না। কেননা সে অতীতকে আবার বাঁচিয়ে তুলে কোন লাভ নেই।

'সেদিন আমি ভয় পেয়েছিলাম ডাক্তার সাহেব। আমার সাহস হয়নি।'

হ্যাঁ। তুমি ভয় পেয়েছিলে। তুমি ভুল করেছিলে। সে ভুলের দাম তুমি দিচ্ছ, আর আমি দিচ্ছি। তুমি পরের। তবু তোমার চিন্তা আমাকে গ্রাস করেছে, আমাকে বৃদ্ধ করেছে। পৃথিবীর সকল সুখ সকল বাসনা থেকে আমার মনকে ছিঁড়ে উপড়ে তুলে নিয়ে এক নিরালম্ব মহাশূন্যে ফেলে দিয়েছে। আর কোথাও মনকে প্রোথিত করতে পারি না আমি।

'একদিন তুমি আমাকে কত কথা বলতে ডাক্তার সাহেব—রেওয়ার কথা মনে পড়ে?'

'না।' ভবানীর কণ্ঠ ক্রোধে রূঢ় শোনাল।

'আমার মনে পড়ে। আমি মরতে গিয়েছিলাম। তুমি বললে আত্মহত্যা মহাপাপ। বললে, নিজেকে এমন করে নষ্ট করতে নেই।'

'আজ সে কথা কেন?' ভবানীর গলায় নিদারুণ ক্ষোভ ও বেদনা। তিনি বলতে লাগলেন—

'সেদিন যদি তোমার সাহস হতো, যদি তুমি ভয় না পেতে, এতদিনে কোথায় কত সুন্দর জীবনে পৌঁছে যেতে পারতে তুমি। তোমার সাহস

হল না। বেশ যে জীবন যাপন করছ, তাকেই স্বীকার কর। দু'নৌকায় পা রেখে চলা যায় না ব্রিজদুলারী, তাতে কষ্ট পেতে হয়।'

'আমি যে আর পারি না। তোমার দোষ দিই না। কোন দোষ করনি তুমি, তুমি ত মহৎ। তুমি ত আমাকে বাঁচাতেই চেয়েছিলে!'

'না।' ভবানী প্রায় চীৎকার করে উঠলেন! তিনি বললেন, 'আমি মহৎ নই। আমি অক্ষম। আমি পথভ্রষ্ট। তোমার কথা আমার চিন্তায় আনা উচিত নয়, আমি তোমাকে চিন্তা করি। তোমাকে সাহায্য করবার ক্ষমতা আমার নেই, তোমার জন্য তবু কাতর হই। এমনি করে আমি ক্রমশই পথ হারাচ্ছি, বিভ্রান্ত হচ্ছি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

'আমি কি করব?'

'জানি না। বাঁচতে পারলে বাঁচ, নইলে ভাল করে মর। তবে একটা কথা বলে যাই, তোমাকে এ-ভাবে দেখতে আমার ঘেন্না করে, এর চেয়ে তুমি মরলে আমি স্বস্তি পেতাম।'

ব্রিজদুলারী তাঁর দিকে চেয়ে রইল। ভবানীশঙ্কর বেরিয়ে এলেন।

তিনি পথ চলতে লাগলেন।

তিনি অনুভব করলেন তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মনে হ'ল হৃদয় খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। তিনি নিজেকে শত শত ধিক্কার দিলেন।

বাড়ীতে ফিরে ভবানীশঙ্কর সেদিন তাঁর দিনলিপিতে একটি অক্ষরও যোগ করতে পারলেন না। পাতায় আজকের তারিখটা থাক, আর শূন্য, নিরুত্তর সাদা থাক কাগজটা।

তিনি ধীরে সযত্নে খাতার প্রথম পাতাটা খুললেন। এই খাতাটির পাতায় পাতায় তাঁর জীবনের কাহিনী একদিন লিখতেন। জিজ্ঞাসা-জটিল সেই জীবনের গ্রন্থি তিনি মোচন করতে চেয়েছিলেন। আজ সেই কথা স্মরণ করে তাঁর হাসি পেল।

কিছুই নিজের হাতে থাকে না। এমন কি তিনি নিজেও নিজের নন, ভাগ্যের। আঁধার রাতে নদীর বুকে ভাসমান পিদীমের মত। অপার অতল রহস্যকে আলোকিত করবেন কি, কোনমতে নিজের অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখতে পারলেই যথেষ্ট।

উনিশ

দীর্ঘদিন আগে হুগলীর অন্তর্গত সুজাখাল গ্রামে তাঁর জন্ম। ভবানীশঙ্কর এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান। তাঁর বাবা নৈকষ্য কুলীন।

ভবানীশঙ্করের সেই সংসারের অনেক কথা মনে পড়ে। তাঁদের বাড়ীতে বারোমাসে অনেক পূজা, অনেক পার্বণ হত। কালীপূজার কথাটা তাঁর বেশ মনে পড়ে। কালীপূজার আগের দিন তিনি অন্য ছোটছেলেদের সঙ্গে মিলে চোদ্দশাক তুলতে যেতেন। গ্রামের উপান্তে বাগদী বুড়ীর বাড়ীর পাশের খালে শুশুনি শাক হতো। শাক নিয়ে যখন তাঁরা ফিরতেন, তাঁদের বিধবা পিসীঠাকুমা বলতেন, 'ওরে, ভাসানে জলে শাক ধুয়ে নিয়ে আয়।' নদীর 'ভাসানে' জলে শাক না ধুলে তাঁর পছন্দ হ'ত না। এই বৃদ্ধা ছিলেন ভবানীর বাবার পিসীমা। তাঁর স্বামীপুত্র সবাই গত হলে তিনি ভাইপোর বাড়ী এসে ওঠেন। ভবানী শুনেছেন তিনি গ্রামের শ্মশানে তিন হাত জমি কিনে রেখেছিলেন। নিজের দাহের খরচা তিনি একটি কৌটোয় পুরে রাখতেন। একদিন নাকি মস্ত বড়ঘরের বৌ ছিলেন। নিজের শ্বশুরকুলের সম্মান রাখবার জন্য এই সব ব্যবস্থা ছিল। এই বৃদ্ধাকে তাঁরা 'পিসীঠাকুমা' বলতেন। ইনি এই বৃহৎ পরিবারটির অন্তঃপুরের হাল ধরে বসে থাকতেন। ভূতচতুর্দশীর দিন বেলা না পড়তেই ছোট মেয়ে ছোট বৌ-দের পিদীম গড়তে সলতে পাকাতে বসাতেন। চোদ্দটি পিদীম অস্থানে কুস্থানে দেবার ভার পড়তো ছোট ছেলেদের উপর। অন্ধকারে খিড়কীর ছাইগাদার উপর পিদীম বসিয়ে তাঁরা ছুটে চলে আসতেন। ঐ ছাই গাদার উপর সন্ধে হলেই নাকি বুড়ী ঝি মতি এসে বসত। ঐখানে সে ভূত হয়েছিল। সে নাকি বলত, 'কত্তাবাবু, আমারে গঙ্গা দিলে না? আমার ছেলেদের জমি দিলে না?' ভবানী পরে শোনেন, তাঁর জ্যাঠামশাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মতিকে গঙ্গাতীরে দাহ করবেন, তার ছেলেকে জমি দেবেন। মতি জরে ভুগে ঘরে মরে পড়েছিল। তাকে কেউ গঙ্গা দেয়নি। তার মৃতদেহ তিন পো' দোষ পেয়েছিল।

কালীপূজার দিন সন্ধেবেলা গোবরের নুড়ি রেখে তার উপর পিদীম বসাতেন ভবানীরা। বৃহৎ বাড়ীর প্রাচীরে ছাতে ও দেউড়ীতে পিদীম, উঠোনে চেরাবাঁশের মঞ্চ বেঁধে তাতে আলোর মালা পরাতে কত না আনন্দ!

পিদীম জ্বেলে দিয়েই বাইরে চণ্ডীমণ্ডপে ছুটতেন। কালীর গলায় মোম ফুলের মালা ঝুলত। কলকাতা থেকে ভবানীর বাবা কাগজের ফানুস কিনে এনেছিলেন! মস্ত মস্ত ফানুষ চণ্ডীঘরের আড়ায় টাঙানো হতো। সেই ফানুসের ভেতর আলো জ্বলতো। পাতলা কাগজের ঘেরের চারপাশে ধীরে ধীরে একটি কাগজের চক্র ঘুরছে। তাতে হাতী, ঘোড়া, মানুষের কাগজ-পুতুল, ফানুসের কাগজে তার সঞ্চরমান ছায়া।

অনেক রাতে ঢাকে কাঠি পড়ে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে সে বাজনা শুনে ভবানী মার বুকে মুখ লুকোতেন, 'আমার শরীর ভারি অস্থির করছে, বলি দেখতে যাব না।'

কিন্তু জ্যাঠামশায় বড় কঠোর। বাড়ীর সব ছেলেরা সামনে দাঁড়াবে, চিকের আড়ালে বউ মেয়েরা। বলি দেখতেই হবে। মোষের গলায় ঘি দিয়ে ডলছে কারা যেন। একপাশে ব'সে রতনকামার। গাঁজায় টকটকে চোখ, হাতে পেল্লায় খাঁড়া, গলায় 'মা, মা, মা!'

গভীর রাত। ভাঙা ঘুমের নেশায় মাথাটা ঝিমঝিম। বুকের মধ্যে ধড়ফড়। বলি দেখবার ভয়। আবার রতন কামারের দিকে না চেয়েও উপায় নেই। 'মা, মা, মা!' সে যেন ভ্রূণী শক্তি দ্বারা অধিকৃত। আর চোখ চলে যায় ঐ মণ্ডপের দিকে। ঐ ওপাশে কালীকীর্তনের আসর। প্রৌঢ় পার্বতীচরণ চোখবুজে হাঁ ক'রে গাইছেন 'শ্যাম রণে দ্রুতগতি চলে, রিপু দলবলে গজ গরাসে।' কি বিশাল কালীমূর্তি। নিরাবরণ, মাথার ডাকের মুকুট কত উঁচু। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রে ভবানীর কাকা ডাকছেন 'মাগো, মা।'

মা, সকলের মা। ওদিকে সারিসারি আবদ্ধ ছাগশিশু। ঢাকীদের উদ্দাম নৃত্য, লুচির ওপর ধুনোর গুঁড়ো পড়ে ঝপ্ ঝপ্ শব্দ হয়। শাদা ধোঁকা চোখে মুখে এসে লাগে।

একদা নাকি সুজাখাঁদের এ-বাড়ীতে মোষ বলি হ'ত না। এঁরা ছ' আনি, বড় তরফ দশ আনি। বড় তরফ মোষ বলি দিত। একবার বলির মোষ হাড়িকাঠ তুলে নিয়ে পালায়। ভয়ার্ত ক্রুদ্ধ পশু ভয়ঙ্কর আর্তনাদে বাতাস ফাটাতে ফাটাতে হাওড়ের দিকে চলে যায়।

সে রাতেই প্রায়শ্চিত্ত ও মানসপূজা হয়। কিন্তু এবার বলি আটকে যায়। এককোপে কাটা গেল না। দু'তিনকোপে কাটা হ'ল। এরপর

নানা ভাবে ও-বাড়ীতে দোষ অর্শাল। আস্তে আস্তে বলি গেল উঠে
এ-বাড়ীতে সুখসমৃদ্ধি বাড়তে থাকল। নূতন ক'রে কালীপূজা প্রঃ
করলেন ভবানীর পিতামহ। শেষ অবধি এ-বাড়ীর কালীপূজার খ্যাতি
আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ভবানী দেখেছেন গ্রামে যার যা মানসিক আ
সব এ-সময়ে ভারে ভারে আসে। সোনার নথ, নতুন কাপড়, জো
জোড়া কালো পাঁঠা।

ভবানীর বাবা কলকাতায় যা দেখে আসতেন তাই এখানে করা হ'ত
কলকাতার কারিগর এসে একবার বাজি তৈরী করে। মাটিতে গর্ত খুঁ
বড় বড় বোম্ ফাটান হয়। বাজি পোড়াবার সময়ে বাঁশ পুঁতে নারকে
দড়ি বেঁধে সকলকে সরিয়ে দেওয়া হ'ত বেড়ার ওপাশে। একা বাজি
অদ্ভুতকর্মা দৈত্যের মত বেড়ার ভেতরে দাঁড়িয়ে বাজি পোড়াল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন পা টাটন করত, তখনই হঠাৎ ঢাকঢোল কাঁসর
ঘণ্টা বেজে উঠত ঐক-অট্টরোল। ধূপের ধোঁয়ায় সব অন্ধকার, মন্ত্র
মন্ত্রোচ্চার, কীর্তনধ্বনি 'কে রে ঘোর বরণী, করাল বদনী, নিশীথ শ্মশা
খল খল হাসে', জোড়হাতে চক্ষু আকাশপানে তুলে ভক্তিভরে চি
জ্যাঠামশায়।

এরই মধ্যে সকলের মাথার উপর একবার রতন কামারের খাঁড়া
ঝল্‌সে উঠত।

পরদিন পিসীঠাকুমা গরদের থান পরে সকলকে লুচি পায়েস বিলোতেন।
কালীপূজার ভোজ পূজার পরদিন। বলির ছাগমাংস রাঁধতেন ভবানীর
জ্যাঠাইমা, মা এবং অন্যান্য বধূরা। নাকে মুখে কাপড় বেঁধে নতুন আটচালা
ঘরে রান্না করতেন।

বেলা দু'প্রহরে নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করতেন। রাত এগারটা অবধি
চলত খাওয়া দাওয়া। লুচি, চিনি, রসকরা, ক্ষীর।

ছোটবেলার অনেক কথা ভবানীর মনে পড়ে।

'নবান্ন'-র দিন সকাল বেলা খোঁড়া তিলে বা ত্রিলোচনঠাকুর এসে বলত
'প্রসাদ পাব গো পিসীমা।' তিলে এককালে ভবানীদের ঠাকুরঘরে কাজ
করেছে। বয়স হওয়াতে সে আর কাজ করত না। লেখাপড়া জানত না।
জ্বর হয়ে তার চেহারাটা দড়ির মতো শুকিয়ে গিয়েছিল। লোকের বাড়ীতে
বাড়ীতেই তার বারোমাসের খাওয়াটা চলতো। বিশেষ বিশেষ দিনে

পিসীঠাকুমা তিলেকে সরষের তেল, নতুন গামছা, নতুন কাপড ও ক্বচিৎ একটি রুপোর দু' আনী দিতেন। তিলে ভবানীর শৈশবের স্মৃতিতে এক প্রধান পুরুষ।

নবান্ন-র দিন সে সকালেই মাথায় গামছা বেঁধে কলার 'পেটকো' কেটে খণ্ড খণ্ড করতো। সেগুলি ধুয়ে দাওয়ায় তুলে দিত দাসী। বৌ-রা বঁটি পেতে বসে আখ, নারকেল, শশা, শাঁকালু কুটতেন। বড পেতলের থালায় কাঁচাগোল্লা, গুডের মণ্ডা, বাতাসা, চিনির ছাঁচ রাখা হত। পরে পুরুত-ঠাকুর এলে পুজো হতো। পিসীঠাকুমা তখন বুড়ো হয়েছেন। বড় পাথরের দশসেরী বাটি তিনি তুলতে পারতেন না। তাঁর সামনে বাটি রাখা হত। সেই বাটিতে নতুন গাইয়ের দুধ, নতুন খেজুরে গুড, ভেজা আতপ চাল, মিষ্টান্ন, ফলমূল সব মেখে তিনি কলার 'পেটকো' ক'রে হাতে হাতে তুলে দিতেন। বাড়ীর রাখাল, মাহিন্দার, দাসদাসী সবাইকে দেওয়া হত। ভেজাচুল মাথার উপর চুড়ো ক'রে তুলে, ভবানীর মা, জ্যেঠিমা, হেমপিসীমা সবাই রান্নাঘরে ঢুকতেন। দেশের বাড়ীতে ভোজের দিনে ঘি-ভাত, পাঁচরকম ভাজা, পাঁচরকম মাছ, পাঁচ তরকারি, দু'রকম ডাল, গুড-অম্বল, পায়েস এইসব রান্না হতো।

শ্রীপঞ্চমীতে তিলে ভবানীদের শাপের কলম কেটে দিত। পুজোর ফুল পেড়ে দিত। আবার কার্ত্তিক পুজোয়, শ্রীপঞ্চমীতে গ্রামের বাজারের সং বেরুলে দেখাতে নিয়ে যেত।

একবার তিনি শুনেছিলেন তাঁর জ্যেঠামশায়কে নাকি দশ-আনিরা সং বের করে ব্যঙ্গ করেছে। জমিদারী সেরেস্তায় বসে সুদের হিসেব করছেন তিনি, এই মূর্তি করেছে। পরে জেনেছিলেন তাঁদের বৈভবের অনেকটাই জ্যেঠামশায়ের অর্জিত। তেজারতীর কারবার ছিল তাঁর। তেজারতী কারবার করাতে তাঁর নিন্দে হয়েছিল। তবে তাঁর পয়সা ছিল। সবই মানিয়ে যায়।

মাকে ভবানীর খুব ভাল মনে পড়ে না। তার কোন কোন স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। মা আর হেমপিসীমার খুব ভাব ছিল। মাঝে মাঝে দুপুরে তাঁরা খিডকীর পুকুরঘাটে গিয়ে বসতেন। বাইরের পুকুরঘাট ছিল বাঁধানো। খিড়কীর পুকুরে মেয়েরা নাইতেন। খেজুর গাছের গুঁড়ি ফেলে পঁইঠে দেওয়া ছিল। ওপাশে দাসীরা বাসন মাজতো। পঁইঠের নিচে

হাঁড়ি, পেতলের বোকনো, পেতলের কড়া ডোবানো থাকত। ভবানীর মনে পড়ে সেই বাসনের মধ্যে ছোট ছোট মাছ খেলা করতো।

'খিড়কীর পুকুরঘাটে বসে হেমপিসীমা মা-কে গায়ে খোল মাখিয়ে দিতেন। হাতের জশম, গলার মুড়কিমালা তেঁতুল দিয়ে মেজে নিতেন। ভবানীর মা-র কানে চার পাঁচটা মাকড়ি ছিল। ভবানীর মা-কে হেম পিসীমা বলতেন, 'বৌঠান, একটা গান বল না!'

গান গাওয়া, তাতে বৌ মানুষ, বড় লজ্জার কথা ছিল। তবু এদিকে ওদিকে চেয়ে ভবানীর মা গাইতেন—

"ও ঠাকুরঝি!

অনেক সাধে নাকে মতির নোলক পরিছি।

সাধ গিয়েছে দেখব মু'খান, কেমন সেজিছি।

ও মা দেখতে গিয়ে লাজে মুখে ঘোমটা টেনেছি, ও ঠাকুরঝি।"

তাঁরা দু'জন জলে হাত দিয়ে ঢেউ দিতেন। ভবানীর মা নীল শাড়ি পরতেন। তাঁতি-বৌ কাপড় আনত। যে নাপতিনী আলতা পরাতে আসত সে পরে ভবানীকে বলেছিল তাঁর মা-র মত সুন্দর পায়ের গড়ন নাকি সে দেখেনি। সে বলত, "আলতা দিলে পা দু'টি যেন হেসে উঠতো।'

হেসে উঠত! এই কথাটি মনে পড়ে। ফর্সা পা, নীলাম্বরী শাড়ির পাড় দিয়ে ঢাকা তাও যেন মনে পড়ে। আর মনে পড়ে মাথার তেলের গন্ধ, মা-র বুকের নরম ও স্নিগ্ধ সুবাস, চাঁদতারা মাকড়ির কোলের লাল পাথরটির দোলন।

ভবানীর বছর সাতেক বয়সে তাঁর মা মারা যান।

তখন মাঘ মাস। ভবানীর একটি ভাই হয়েছিল। উঠোনের একপাশে খেজুর পাতা দিয়ে কাঁচা আঁতুড়ঘর বাঁধা হয়। রাতে দাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মালসায় আগুন ছিল না। ঠাণ্ডা লেগে প্রসূতি ও শিশু দুজনেই মারা যান।

ভবানীর মনে পড়ে তখন হেমপিসীমাও নেই। ক'দিন তাঁকে পিসী-ঠাকুমা আগলে আগলে রাখেন। কোমরে একটা লোহার চাবি বেঁধে দেন। রাতে কাছে নিয়ে শোন। পরে দাসীদিদি বলেছিল, 'তোর মা দোষ পেয়েছে। তোকে এখন ডাকবে, বারবার ডাকবে। তুই যেন ভরদুপুরে, রাতে, বা অবেলা কুবেলায় কারুর ডাকে হঠাৎ সাড়া দিসনে। সাড়া দিলেই তোকে বাঁশ গাছে নিয়ে তুলবে।'

বাঁশ গাছ সম্পর্কে এমনিতেই ভয় ছিল। দাসীদিদি বলে তার মা নাকি দোল পেয়ে বাঁশ হয়ে এড়োপথে পড়ে থাকেন। হঠাৎ কখনো ভবানী যদি পা দেন তো সোজা হয়ে তাঁকে ঠেলে বাঁশ ঝাড়ে তুলে ঘাড় মটকাবেন। শুনে ভবানী ভয় পেয়েছিলেন, বিস্মিত-ও হয়েছিলেন।

তাঁর মা, যিনি ধীরে কথা কইতেন, যাঁর মুখ ঘোমটার আড়ালে থাকতো, মৃত্যুর পরে কি তাঁর এমন পরিবর্তন হতে পারে? মা, প্রেতপ্রায়শ্চিত্ত হয়নি বলেই কি প্রেতিনী হয়ে কেঁদে বেড়াতে পারেন? সম্ভবতঃ এই প্রথম ভবানীর মনে জিজ্ঞাসার উদয় হয়। এবং তিনি যে নিঃসঙ্গ, পৃথিবীতে সকলের মধ্যেই যে নিঃসঙ্গ, একাকী আর একসত্তা থাকে, তা যেন তিনি তখনই বোঝেন! সেই বৃহৎ সংসার তাঁকে ঘিরে নিজের কর্মচক্র পথে আবর্তিত হতো। তিনি স্পষ্ট অনুভব করতেন তিনি নিঃসঙ্গ, তিনি একাকী।

এই সময়ে তাঁর বিমাতা আসেন।

ভবানী জেনে আশ্চর্য হন, তাঁর বাবার আরো কয়টি বিয়ে আছে। তাঁর এই বিমাতাটি দুটি ছেলে নিয়ে পিত্রালয়ে থাকতেন। ভবানীর বাবা নাকি মাঝে মাঝে যেতেন সেখানে। এই বিমাতা তাঁর মা-র আপন খুড়তুতো বোন জেনে তিনি আরো আশ্চর্য হন। জগৎসংসার সম্পর্কে তাঁর বিস্ময় ক্রমেই বাড়ছিল। ক্রমেই তিনি পরিচিত জগৎকেই আর চিনতে পারছিলেন না। প্রত্যহের চেনা জানার মধ্যে থেকে এই সব অপরিচয়ের বিস্ময় ক্রমেই তাঁকে মুখ ভেঙাচ্ছিল।

বিমাতা তাঁকে আপন করে নিতে পারেননি। তাঁর মা-র সঙ্গে তিনি যে খাটে শুতেন, তার থেকে এইসময় ভবানীকে নির্বাসিত করা হয়।

তাঁর বিমাতার কোলে আরো দু'টি সন্তান আসে। ভবানী জানতেন না সংসারে স্নেহ-মমতাও আদায় ক'রে চেয়ে নিতে হয়। তিনি দেখতেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের নিয়ে তাঁর পিতা তাঁর বিমাতা কেমন ব্যস্ত হয়ে থাকেন। ভবানী সেই জগতের বাইরে বাইরে ম্লানমুখে ঘুরে বেড়াতেন। কেউ তাঁকে বলত না 'এইখানে আয়, তোর গা মুছিয়ে দিই, তোকে খাইয়ে দিই। তুই রোদে যাবি, আয় ভিজে গামছা পাট করে মাথায় দিই। তুই না খেয়ে ঘুমোস, আয় সন্ধে না হতে তোকে খাইয়ে দিই।'

তাঁকে কেউ কিছু বলত না। মা থাকতে তিনি যেন কোন একজনের ছিলেন। তারপর যেন তিনি সকলের হয়ে যান। সকলের সঙ্গে নাইতেন,

খেতেন, পণ্ডিতের কাছে পড়তেন। সকলের সঙ্গে তাঁর কাপড় আসতো, চাদর আসতো। মাঝে মাঝে, যখন কেউ থাকত না তিনি একা একা ঘুরতেন। মাঠে, ঘাটে, হাটতলায়! ভরদ্বপুরে ধানবিছানো উঠোনে। ঢেঁকিশালে ঢেঁকির পাড় পড়তো, ঘুঘু ডাকত গাছে। ভবানীর মনে যেন কোথায়, কোন দূর থেকে কার গাওয়া গানের সুর ভেসে আসতো 'ও ঠাকুর ঝি!'

এই দুইয়ের সঙ্গে সেই গানের সুরের মিল ছিল। বাঁশগাছের ঝিরিঝিরি শব্দের সঙ্গে যেন কার হারিয়ে যাওয়া হাসি, স্নেহমাখা চাহনি আর আলতা-পরা পায়ের কথা মনে পড়ে যেত।

ভবানী লেখাপড়ায় মন দিলেন। তাঁদের বাড়ী খুব গোঁড়া। কিন্তু গ্রামের কোন কোন পরিবার থেকে ছেলেরা কলকাতায় গিয়ে ইংরেজী পড়ছিল, বাইরে চাকরি নিচ্ছিল। ভবানীর বৈমাত্রেয় ভাইদের পড়াশোনায় দিকে মন ছিল না। নবীনচন্দ্র মুখোটি নামে একজন ভদ্রলোক মাঝে মাঝে 'সমাচার দর্পণ' এবং 'সংবাদ-প্রভাকর' কাগজে সুজাখাল ও আশপাশের গ্রামের চমকপ্রদ সংবাদ লিখে পাঠাতেন। শ্রীদাম পরামাণিক জাতব্যবসা ছেড়ে তিসির ব্যবসায়ে অনেক টাকা করে। সে বহুটাকা খরচ করে কালীপূজা করেছিল। আর একবার বর্ষার সময়ে একজন মুসলমান এসে জাত ভাঁড়িয়ে একটি মেয়েকে এক বিয়েপাগলা বামুনের কাছে বেচে যায় এককুড়ি টাকায়। নবীন মুখোটি এই সব সংবাদ পাঠাতেন। তিনি খোনা ছিলেন এবং লিচু খেতে ভালবাসতেন। তিনিই ভবানীকে আগ্রহ ক'রে বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসী শেখান। তিনি ভবানীকে কলকাতায় গিয়ে ইংরেজী পড়বার জন্য জোর করতে থাকেন। ভবানীর বয়স তখন আঠারো। একদিন তিনি জানতে পারেন কুলীন ব্রাহ্মণের নিয়ম অনুযায়ী তাঁকেও বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তখন ভবানী তাঁর জ্যাঠামশায়ের কথার উপর কথা বলেন। প্রতিবাদ জানান এবং জেদ করে কলকাতা চলে আসেন।

একটি নতুন জীবনে প্রবেশ করলেন তিনি! নতুন জীবনে দীক্ষা।

ভবানী হিন্দু কলেজ-এর স্কুলে ভর্তি হন। অনেক বয়স হয়েছিল বলে তাঁর লজ্জা করত। তিনি এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতেন, 'বিদ্যাশিক্ষার কোন বয়স নেই। আমি লজ্জা পাব না।'

সেই সময় সম্ভবতঃ জ্যাঠামশায়ের নিষেধে, বাবা টাকা পাঠাতে পারেননি কিছুদিন। পড়া ছাড়তে হয় ভবানীকে। তিনি তাঁর এক বন্ধুর চেষ্টায় শোভাবাজারের রাজবাড়ীর সেরেস্তায় কাজ নেন। তিনি কাজ নেওয়াতে তাঁদের বাড়ীর সবাই খুব অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি দু'বছর চাকরি করেন। পনরো টাকা মাইনের থেকে নিজের খরচ চালাতেন এবং জমাতেন। সে সময়টা তিনি গোলদীঘির কাছে একটি ঘর নেন। তাঁর আর তিনটি বন্ধু বাসাটি নিয়েছিলেন। তাঁরা একসঙ্গেই খাওয়া দাওয়া করতেন। তারপর অবশ্য তাঁর বাবা অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে আবার টাকা পাঠান এবং ভবানীকে কাজ নিতে মানা করে চিঠি লেখেন। ভবানী বুঝতে পারছিলেন বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাবা দুবল হয়ে পড়ছেন। সম্ভবত তাঁর বিমাতা স্বামার উপর প্রভাব বিস্তার করছিলেন।

পাশ করে যখন বেরুলেন তিনি তখন তাঁর বয়স হয়ে গেছে। চব্বিশ বছর বয়স অনেক বয়স। তাঁর বয়সের অন্যান্য ছেলেরা তখন চাকরি, বিয়ে, ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারে জড়িয়ে পড়েছেন।

তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করতেন এবং ক্রমেই বাইরের জগতে, চিন্তার জগতে সঙ্গ খুঁজতেন।

এই সময়ে, তাঁর মনে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা জাগে।

যে বয়সে মানুষের মন নিজেকে বাইরে মেলতে চায়, পৃথিবী থেকে রূপ ও রস আহরণ করতে চায়, সেই বয়সে ভবানী কেমন করে জিজ্ঞাসার বর্তিকা হাতে এক বিরাট, অনন্ত অন্ধকারের গুহায় প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হলেন? ঈশ্বর কি, সে প্রশ্নের কি কোন শেষ উত্তর আছে? ভবানী এই সময়ে দিনলিপিতে লেখেন, 'না। উত্তর নাই। প্রাচীন মিশরীয়গণ গোথকে পূজা করিত। বেদস্রষ্টা আর্যগণ ভাবিতেন আদিত্যবর্ণ দেব সকলই ঈশ্বর। এ প্রশ্নের উত্তর নাই। যীশু উত্তর নহেন। বুদ্ধ, জরাথুস্ট্র, অথবা কনফুসিয়স কেহই উত্তর নহেন। তাঁহারা অবিরত সন্ধান। উত্তর যদি মিলিত, তাহা হইলে গ্রাম্য নারী প্রস্তরখণ্ডে জল ঢালিয়া এবং ক্যাথলিক পুরুষগণ সন্তদের পূজা করিয়া একই তৃপ্তি পাইতেন না। মনে হইতেছে উত্তরের চেয়ে প্রশ্ন-ই শ্রদ্ধা করিবার। কেন না প্রশ্ন যতদিন জাগরূক থাকে ততদিনই মানবের মন নূতন নূতন পথ সন্ধানের চেষ্টায় ধাবিত হয় ও ঘর্ষণ দ্বারা নিজেকে তীক্ষ্ণ করে। উত্তর মিলিলে মন সেই

উত্তরকে পরম ও চরম জানিয়া নিষ্ক্রিয়, বলহীন, বীর্যহীন তৃপ্তির অবসাদে আচ্ছন্ন হয়।'

একদিকে বাঙালী যুবক বাইনাচ, পাখীর লড়াই, মদ্যপান ও অন্যান্য ব্যসনে গা ভাসাত, অপরদিকে অন্য বাঙালী যুবকরা গভীর ও জটিল জীবন জিজ্ঞাসায় ক্ষত-বিক্ষত হত, এরই নাম বাংলার উনবিংশ শতক।

ভবানী দিনলিপিতে যাই লিখুন, তিনি আত্মজিজ্ঞাসা, জীবনজিজ্ঞাসায় অস্থির হচ্ছিলেন।

জেসুয়িইট ফাদারদের উদার মানবপ্রেমের ধর্ম তাঁকে সর্বপ্রথম ঈশ্বর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। যীশুর মানবতা ও করুণা তাঁকে অভিভূত করে।

এর উৎস একটি ছবি।

একজন স্নেহশীল ফাদার-এর ঘরে তিনি ছবিটি দেখেন। জুনিয়ার রোমান প্রোকিউরেটর পন্টিয়াস পাইলেটের আদেশে যীশু স্বীয় ক্রুশটি বহন ক'রে বধ্যভূমিতে চলেছেন। একটি বিখ্যাত ছবির প্রতিলিপি। যীশুর বেদনার্ত চোখদুটি স্বর্গের দিকে স্থাপিত।

ছবিটি তাঁর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

অবশ্য শুধু ছবিটি নয়, ফাদার-এর সঙ্গে তিনি আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রশ্ন, অবিরত প্রশ্ন।

প্রশ্ন করতে করতে তর্ক উঠত, তর্ক করতে শুরু করলে কে যেন ভেতর থেকে তাঁর মুখে কথাগুলি জুগিয়ে দিত। যীশুখ্রীষ্ট যে ধর্মের প্রবক্তা, সে ধর্মকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু খ্রীশ্চানদের এ গোঁড়ামি তাঁর কাছে আশ্চর্য লাগে।

'গোঁড়ামি?'

'নিজের ধর্মকে সব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করা গোঁড়ামি।'

'সকল ধর্মেই এ বিশ্বাস প্রতিপালিত হয়।'

'না, ফাদার, না।'

ভবানী আর সব জায়গায় মুখচোরা হয়ে থাকতেন বটে, এখানে এসে তাঁর সব সঙ্কোচ অন্তর্হিত হত। তিনি শুধুই জানতে চাইতেন। পৃথিবীতে অনাদ্যন্ত কাল থেকে এত দেশে এত ধর্ম আছে, এটি না হয় অপেক্ষাকৃত নবীন, অধিকাংশ শ্বেতজাতি না হয় এটিকে আলিঙ্গন করেছে, তা ব'লেই অপরাপর ধর্মসমূহ এর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল?

ফাদার তাঁর সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন না। মুখে অল্প অল্প হাসতেন, মনে মনে বিরক্ত হতেন কি না, কে বলবে।

এই সময়েই ভবানী মাঝে মাঝে পথে পথে হাঁটতে বেরোতেন। ফাদার-এর কাছথেকে বেরিয়ে মনটি বহুক্ষণ চঞ্চল ও আপনাতে আপনি ডুবে থাকত। পথ চলতে চলতে খেয়াল থাকত না কোথায় চলেছেন।

একদিন তেমনি ভাবের ঘোরে ভাসতে ভাসতে চলেছেন। মেডিকেল কলেজ ও কলুটোলা ছাড়িয়ে কতদূর চলে গেছেন খেয়াল নেই। দূর থেকে কানে গানের সুর আসছিল। সমবেত কণ্ঠে কীর্তন। অবশেষে মোড় ফিরতে তিনি একটি চলমান জনতার মধ্যে ঢুকে পড়লেন ও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন।

ওঁ হরি, ওঁ হরি, ওঁ হরি! গম্ভীর ও পবিত্র নামোচ্চার দু'পাশে দুলে দুলে সবাই গাইছে, তিনিও দুলতে থাকলেন।

দুলছেন আর চলছেন, চলার গতি আপনা আপনিই মধুর, সুশৃঙ্খল একদল জনতার সঙ্গে চললে যেমন হয়। নগ্নগাত্র, উদ্বাহু গায়কদল, নানান চন্দন ফুলের ছিটে, খই ও কড়ি পড়ছে দু'পাশে। অতিবৃদ্ধ একটি মানুষ খাটুলীতে শয়ান। ভবানী দেখতে পেলেন মুখে মৃত্যুর বিকার নেই, চন্দন ও তুলসীর গন্ধে ভুর ভুর, দুটি একটি সাদা চুল বাতাসে ফুরফুর ক'রে উড়ছে, নইলে মনে করা চলত ঐ বাদামী ও কুঞ্চিত শরীরটি রক্তমাংসের নয়, বহুব্যবহৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত কোনও বৃহৎ চন্দন কাঠ দিয়ে নির্মিত মনুষ্যমূর্তি।

ভবানীর হৃদয় উদ্বেল হতে থাকল। চলার গতিতে ছন্দ, খই ও কড়ি দুলেদুলে ছেটাচ্ছে যে তার হাতের ভঙ্গিতে ছন্দ, ওঁ হরি মন্ত্রের উচ্চারণ ছন্দে বাঁধা।

সবকিছু ছন্দ। এই মলিন পথঘাট, অপরিচ্ছন্ন নগরী, সারিসারি ঘরবাড়ী, খোলারঘর, কীর্তনীয়াদের গায়ের স্বেদ গন্ধ কিছু না, সত্যি না। আসলে সবকিছুর ভেতরেই কোন নিয়ামক ছন্দ কাজ করে চলেছে।

শবযাত্রীদের পেছন পেছন ভবানী গেলেন এবং নিমতলার শ্মশান-ঘাটে এসে বসলেন। সমস্ত রাত বসে থাকলেন। একটি বৃদ্ধাকে অন্তর্জলী করাতে আনা হয়েছিল। তাকে ভাল ক'রে দেখলেন। শ্মশান, শবযাত্রী, প্রজ্বলন্ত চিতা, শোকার্ত বিলাপ, সব কিছুই তাঁর চোখে নূতন বোধ হয়। তাঁর মনে

হয় সব তুচ্ছাতিতুচ্ছের মধ্যে এক গভীর প্রবহমান অসম্ভবকে তিনি আবিষ্কার করতে পারছেন।

সকাল অবধি তিনি বসে থাকলেন। ভোরবেলা দু' একজন কুলবধূ এলেন। রোজ প্রভাতে এসে তাঁরা সৌভাগ্যবতী সধবা আয়তির শবদেহ খোঁজেন, এবং পেলে মৃতের পায়ে জল ফুল ও আলতায় পূজা দিয়ে পুণ্য অর্জন করেন।

তাঁরা এই তরুণ যুবককে দেখে বিস্মিত হলেন। গঙ্গাস্নান করে ভবানী বাসায় ফিরলেন। পথের জঞ্জাল, উড়িয়া জলবাহক, মুসলমান ভিস্তি, ক্রন্দনরত শিশু, সব কিছুই তাঁর চোখে তখনো নূতন এবং ওঁ হরি মন্ত্রের সুরে বাঁধা।

তিনি লিখলেন, 'এতদিন আমার মন বাহিরে বাহিরে ভাসমান ছিল। সে এবার ভিতরে প্রবেশের পথ খুঁজিতেছে।'

থাকে না, ওসব অনুভূতি টেঁকে না। দু'দিনের মধ্যেই তাঁর মন থেকে সেদিনের অভিজ্ঞতার সবটুকু স্বর্গীয় সৌরভ অন্তর্হিত হল এবং তাঁর হৃদয়ে রেখে গেল আবেগ, অস্থিরতা, সংশয়। বিশ্বাসে কি শান্তি, ওঁ হরি মন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণে কি সুখ, তা কে যেন পরমকৌতুকে তাঁর কাছে একবার প্রকাশ ক'রে আবার লুকিয়ে নিল।

মনের আবেগে অধীর ভবানী উপনিষদ, বেদ পড়লেন। গীতা মুখস্থ করলেন। বেন্থাম ও মিল পড়লেন। রামমোহন রায়ের নিরীশ্বরবাদ-ও পাঠ করলেন। তাঁর মন ক্রমেই বাইরের তুচ্ছকে ছেড়ে প্রেয়-র সন্ধানে ভিতরে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ঢুকতে লাগল। ভবানী আনন্দ পেলেন, যন্ত্রণাও পেলেন।

আনন্দ কম, যন্ত্রণা বেশী। তার কারণ তাঁর মধ্যে যতটুকু দেশের, আবহমান কালের, চিরচরিতের দ্বারা অধিকৃত, সেটুকু দিয়ে তিনি বিনাপ্রশ্নে এক একটি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে বেশীটাই ছিল যুগের, তাঁর যুগের এবং ভবিষ্যতের। তাই বিশ্বাস অন্তর্হিত হত নিমেষে, সংশয় ও প্রশ্ন এসে মনকে অধিকার করত। তাঁর মতিগতি দেখে বন্ধুবান্ধবেরা উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন, জ্ঞাতি কাকা মামারা সুজাপুরে খবর পৌঁছাচ্ছিলেন; এত কথা ভবানী জানতেন না। একদিন বৃহৎ সাদা ছাতা বগলে নিয়ে নবীন মুখোটি এসে উপস্থিত। ভবানীর বাল্যস্মৃতিতে নবীন মুখোটি একজন কেষ্ট-বিষ্টু। বড় বড় চিঠি ফেঁদে সতী

হওনে বিধবার আপত্তি, রথের চাকায় পিষ্ট হইয়া বালকের প্রাণত্যাগ, বিবাহলোভী ব্রাহ্মণের সঙ্গে মোছলমান কন্যার প্রতারণা (স্নান করিবার কালে সে যেমন 'গোছল' কহিল অমনি সকলে বুঝিল এক কুড়ি টাকা লইয়া ছদ্মবেশী ঘটক ব্রাহ্মণের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। গ্রামের লোকে কত না রঙ্গ করিয়া তাহাকে সমাজে পতিত করিল আর কন্যা কহে কি আমারে ফুফার ঘরে পেঠিয়ে দাও তোমাদের রসুয়ের গন্ধে আমার কলিজা হেঁচড পেঁচড় কর্য্যে) এ সব সমাচার তিনিই 'সমাচার দর্পণ' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় পাঠাতেন। তাঁর নাম কলিকাতার কাগজে বেরোয় এবং তাঁর ঘরে কেরোসিনের সেজবাতি জ্বলে এ-সব কারণে গ্রাম্য বালকদের মধ্যে নবীন মুখোটির প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ভবানীকে লেখাপড়াতে দীক্ষা তিনিই দেন।

এখন বৃদ্ধ এসে সানুনাসিক স্বরে ভবানীর কাছে খেদোক্তি করতে থাকেন। গলার স্বর বরাবরই খোনা, লিচুকে 'নিচু' বলেন এবং মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে 'রাধের সখী নলিতা নলিতকণ্ঠে গাহ গো' গেয়ে তিনি ভবানীকে আনন্দ দিয়েছেন।

প্রচুর চন্দ্রবিন্দুর হট্টগোল থেকে যা উদ্ধার করা গেল তার সার কথা হচ্ছে ভবানী ক্রীশ্চানদের সঙ্গে মেশেন, সম্ভবতঃ ক্রীশ্চান হবেন শুনে জ্যাঠামহাশয় ক্ষেপে গিয়ে নবীন মুখোটিকে দিনরাত লাগাচ্ছেন। বলেছেন ঐ মুখোটিই আমাদের ছেলেটার কানে বিষ মন্তর দিলে। চৌধুরী বাড়ীর সেরা ছেলেটা পাষণ্ড হয়ে গেল। সে ছেলে যদি ক্রীশ্চান হয় তবে মুখোটিকে আমি জব্দ করব।

ভবানী প্রথমটা কৌতুক অনুভব করেন ও সুজাখালে যান। গিয়ে দেখেন সবাই তাঁকে খুব সন্দেহের চোখে দেখছে। জ্যাঠামশায় জিজ্ঞাসা করেন তিনি ক্রীশ্চান হয়েছেন কিনা। হ'লে পরে যেন জানান। কেননা তার আগেই ভবানীকে যাতে ত্যাজ্যপুত্র করা হয় সেটি দেখবেন তিনি। ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ বলেন, 'তুই কুলাঙ্গার। একটা নিমগাছের ডাল আমের কলমের সঙ্গে জুড়ে দিলে গাছের সবগুলো ফলই তেতো হয়। গোড়া ধরে উপড়ে ফেলাই ভাল।'

ফিরে আসেন ভবানী। মন আহত, আচ্ছন্ন। অথচ অভিমানে ধর্মান্তরী হবেন সে পাত্র তিনি নন। ঠিক এই সময়েই তিনি ব্রাহ্ম হবার কথা চিন্তা করেন।

নানা কারণে বারবার মনে হচ্ছিল বড় গোঁড়া, অন্ধ এবং অনুদার হিন্দু সমাজ। একটু পরিচ্ছন্ন ভাবে বাঁচতে গেলে ধর্মান্তরী না হয়ে উপায় নেই।

দেশে আর যাননি। বাবা টাকা পাঠান, কচিৎ লুকিয়ে চিঠি লেখেন। ভবানী জানেন আঠারো না। পেরুতেই বৈমাত্রেয় ভাই বিজয়শংকরের দু'টি বিয়ে হয়ে গেল।

জেনে আরো খারাপ লাগে তাঁর। কোনমতে পাঠকাল সাঙ্গ হলে আর এতটুকু সম্পর্ক রাখবেন না স্থির করেন।

অবশেষে ব্রাহ্ম হবার সব যখন ঠিকঠাক, 'এই সময়ে, জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তাঁহাকে দেখিলাম। প্রথম দর্শনকেই সংশয়াকুল হৃদয় তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইল। মনে হইল প্রজ্বলিত অগ্নি বেষ্টনার মধ্যে মহাতেজা তপস্বী বসিয়া আছেন।'

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে ভবানীর একটি বন্ধু তাঁকে নিয়ে যান। বিদ্যাসাগরকে দেখে ভবানী আর একটা প্রচণ্ড ঘা খেলেন। তিনি হিন্দু সমাজের সবই জীর্ণ ও গলিত জ্ঞানে ধর্ম বর্জনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। বিদ্যাসাগরকে দেখে তাঁর নিজেকে ছোট মনে হল। মনে হল চারিদিকে তাঁর মতো গুল্ম এবং তৃণ। বিদ্যাসাগর যেন মহীরুহের মতো প্রবল ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকাতে গেলে মাথা নিচু করতে হয়।

তিনি দেখলেন, এই মানুষটি ধর্মকে ত্যাগ করে নয়, ধর্মের মধ্যে থেকে, ধর্মের মধ্যে বাস করে সংস্কারের কাছে সমাজকে মুক্তি দিতে চাইছেন।

ভবানীর বন্ধুটি বলেছিলেন, 'আমার এই বন্ধুটি ব্রাহ্ম হতে চান। ঘরে ল্যাম্প জ্বলছিল। হাতিচেয়ারে পিঠ ঋজু করে বিদ্যাসাগর বসেছিলেন। তিনি বল্লেন, 'হ্যাঁ। হিন্দুসমাজের ভাল ভাল ছেলেরা আজকাল ব্রাহ্ম হতে চাইছে বটে।' একটু হেসে আবার স্বগত চিন্তার মতো বলেছিলেন, 'অনেকে একে ফ্যাশন বলতে চান। তাঁরা যুগের সত্যকে স্বীকার করেন না। এক সময়ে বিশপ কলেজের ছেলেরা যখন ক্রীশ্চান হতো, তাঁরা তাকেও ফ্যাশন বলতেন। না। ফ্যাশন নয়। এত সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে আমি এত বড় সত্যকে অস্বীকার রাখতে পারি না।'

তারপর তিনি যে কথা বলেছিলেন, তা আগে ভবানীর কানে খানিকটা

অপ্রাসঙ্গিক ঠেকে। তিনি বলেন, এই সেদিনও লাহাবাবুরা হাজার টাকা ব্যয় করে ঢাকার কারিগর আনিয়ে আতসবাজী পোড়ালেন। ভাল, ভাল। একচক্ষু হরিণের মতো চোখ বন্ধ করে থাকবার এই ত' সময়।'

ভবানীশঙ্কর যখন বিদ্যাসাগরের কাছে যান, তার মাস ছয়েক বাদেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। পরে ভবানী জেনে অবাক হয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর চেয়ে মাত্র-ই চার বছরের বড। এইজন্য অবাক হয়েছিলেন, যে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাপ্তমনস্কতা, উন্নত ভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা, সব দেখে সকল সময়ই তাঁকে অন্যদের চেয়ে অনেক ওপরে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে হতো। ভবানীর সেদিন নিজেকে বড় অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, ঐ মানুষটি জীবনের প্রত্যেকটা দিন বাঁচার মতো করে বাঁচছেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে প্রথমে 'আপনি' বলেন, পরে 'তুমি' বলেছিলেন। ভবানীর মনে হয়েছিল 'তুমি' বলে বিদ্যাসাগর তাঁকে কিছুটা কাছে আসতে দিলেন।

ভবানীর বন্ধুটি ঈশ্বরচন্দ্রকে 'জ্যাঠামশায়' সম্বোধন করতেন। সম্ভবতঃ কোন আত্মীয়তা-ও ছিল। তারই সঙ্গে যাওয়া আসা করতে করতে ভবানী নিজেই উপস্থিত হতে শুরু করলেন। বিদ্যাসাগর কর্মব্যস্ত মানুষ। যে দায়িত্ব বহন করে তার ওপর-ই দায়িত্ব আসে। বিদ্যাসাগর তখন এক সঙ্গে বহু দায়িত্ব বহনের চেষ্টায় ব্যস্ত। প্রত্যেকদিন তিনি আলাপ করতে পারতেন না। তাঁর সময় হতো না। অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তায় যখন যা বলতেন ভবানী মন দিয়ে শুনতেন।

একদিন বিদ্যাসাগর সক্ষোভে বলেছিলেন, 'আমাদের শিক্ষিত ছেলেরা যদি দশটি মানুষের নিরক্ষরতা দূর করবার সংকল্প গ্রহণ করতো, তাহ'লেও অনেক উপকার হতো দেশের।'

একটু চুপ করে থেকে আবার তিনি বলেন, 'হয়তো হবে, হয়তো হবে। একদিন যুবকরা সচেতন হবে। কিন্তু সে আমি দেখব না।' ভবানীকে তিনি একদিন বলেন, 'তুমিই ব্রহ্মবাদী হতে চেয়েছিলে, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যা।'

'এই কথাটা নিয়ে আমি চিন্তা করি। দেখ, হিন্দু সমাজের ভাল ভাল ছেলেরা যদি ধর্মান্তর গ্রহণের পথে মুক্তি খোঁজে, তাতে একের মুক্তি ঘটবে। বহুর কি হবে? ব্যক্তি মুক্তি পাবে, সমাজের কি হবে? বলতে বলতে

তিনি শান্ত হয়ে পড়েন। তিনি উঠে দাঁড়ান। পায়চারি করতে করতে স্বগত চিন্তার মতো বলেন, 'সংস্কার, অশিক্ষা, অধর্ম আজ সমাজকে কর্কট-ব্যাধির মতো আক্রমণ করেছে। কিন্তু কোনমতে নিজেকে নিয়ে সরে গেলেই কি চলবে? তাতে কি বিবেকী মানুষ শান্তি পেতে পারে? না। আমার মন এতে সায় দেয় না। আমি বলি এ এক ধরনের কাপুরুষতা।'

আবার বলেন, 'একটি কথা ভেবে দেখো। অভ্যাস ও আচার একে জরাগ্রস্ত ক'রেছে, নইলে এর মত উদার ধর্ম এক অর্থে পৃথিবীতে কোথাও নেই। তুমি সন্ধ্যা কর বা না, কর, আচার নিয়ম পালন কর বা না কর, ধর্ম তোমার কদাপি ত্যাগ করো না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তুমি হিন্দু, মৃত্যুর পর তুমি তোমার প্রাপ্য লোকে গমন কর।'

কথাটি ভবনীর মনে কঠিন শেলের মতো বেঁধে। তিনি অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিলেন। একটি আলোর শলাকা তাঁর বিবেককে বিদ্ধ করে। অতএব ধর্মত্যাগ করবার সংকল্প ত্যাগ করলেন তিনি। পরে অনেক পরে বুঝেছিলেন ঈশ্বরের বিরাট ও বৃহৎ রূপ, যা মূর্তির অতীত, যা ধ্যানের বস্তু, তাকে উপলব্ধি করবার জন্য ধর্মত্যাগ করবার প্রয়োজন হয় না। যার মনে সে আকুতি আছে, সে যে-কোন ধর্মের শাসনে থেকেও তা উপলব্ধি করতে পারে।

এফ-এ পাশ করে তিনি ডাক্তারী পড়তে চাইলেন।

বৃত্তিটিকে মহান বোধ হয়েছিল। রোগীকে সেবা করতে পারবেন, আর্তকে দিতে পারবেন আরাম। মিশনের ডাক্তার ও ধর্মযাজকদের দৃষ্টান্ত তাঁকে অনুপ্রাণিত করে।

ইতিমধ্যে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ভবানী প্রথমে দেশীয় হাঁসপাতালে চাকরি নিয়ে গয়া চলে যান।

গরমকালে গয়াতে কলেরার মড়ক লেগেছিল। ভবানীশঙ্কর তখন দেখেছেন জলাভাবে, অচিকিৎসায় মৃত্যু সে কি ভয়াবহ। সর্বত্র বলেছেন, 'জল ফুটিয়ে খাও। রোগীর জামা-কাপড় পানীয় জলের পুকুরে কেচ না।' কিন্তু তখন দেখেছেন এই অনুন্নত দেশে পানীয় জলের ইঁদারা নেই। পুকুর নেই, নদী নেই, দেখে তিনি কষ্ট পেয়েছেন। ডাক্তার হলেই যে মানুষকে ত্রাণ করাতে পারবেন এ অহমিকা দূর হয়েছে তাঁর। না। দেশে পানীয় জল চাই, আহার চাই, মানুষের মতো বাঁচবার ন্যূনতম সঙ্গতি চাই।

এরপরে তিনি সেনাবিভাগে চাকরি নেন। আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, কাশী যেখানেই গেছেন, সেখানে চাকুরীজীবী বাঙালী সমাজ ছিল। তাদের সঙ্গে মিলে আনন্দ পেতেন না ভবানী। নিজের রুচিবোধ আর মানসিক সংগঠন তাঁকে নিঃসঙ্গ করেছে।

নিজের বৃত্তিকে শ্রদ্ধা করেই তিনি তৃপ্ত হতে চান। কিন্তু সেখানেও সুবিপুল আশাভঙ্গ ঘটে।

তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখেন হেয়ার, প্রিন্সেপ, ডিরোজিও এইসব উদার-চরিত্র জ্ঞানব্রতী ইংরেজদের এদের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন না। মিশনারী ফাদারদের মতো মানুষকে ভালবাসবার ব্রতে ব্রতী ইংরেজদেরও দেখতে পাচ্ছেন না কোথাও।

এখানে, এই ফৌজীজীবনে সাদা ও কালো দুই চামড়ার মধ্যে এক সুস্পষ্ট বর্ণ-বিদ্বেষের গণ্ডী বর্তমান। এখানে তাঁর পরিচয় তিনি নেটিভ ডাক্তার। তাই তাঁর হাঁসপাতাল তাঁবু অপরিসর। ওষুধপত্র কম, অভিযোগ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ উদাসীন।

তিনি দুঃখিত হলেন। কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা, তাঁকে যে পরিশীলিত ভদ্রতা শিখিয়েছে, তা তাঁকে সমালোচনা বিমুখ করেছে। অত্যাচার ও বৈষম্য দেখে তিনি কষ্ট পেলেন। কিন্তু এই অত্যাচার ও বৈষম্যের সূচন ইংরেজদের যে শাসকসুলভ মনোবৃত্তি কাজ করছে তাকে তিনি দেখতে পেলেন না।

তিনি শুধু বোধ করলেন তাঁর মনের ভারসাম্য বিচলিত হয়েছে। তিনি ভারসাম্য খুঁজে পাবার জন্য পুনর্বার মুখ ফেরালেন এবার প্রকৃতির দিকে। তাঁর মনে হল মানুষের রাজ্যে বৈষম্য আছে, হিংসা আছে। প্রকৃতির রাজ্যে সবই উদার, সবই মহিমাময়।

ভবানীশংকর ওআর্ডস্‌ওয়ার্থ ও রুশো পড়েছিলেন। কার্লাইল ও ভোলতেয়ার পড়েননি। বোঝেননি তিনি তাঁর যুগের মানুষ নন। তিনি আগামী যুগের শিক্ষিত, উদার মধ্যবিত্ত যুবকদের পূর্বসূরী।

সেই সময়ে জীবনে এল এক অন্য অভিজ্ঞতা। তখন তিনি রেওয়াতে ব্রাইটের ক্যাভেলরির সঙ্গে আছেন। ব্রাইট ও ব্রিজদুলারীর সম্পর্কের কথা জানতেন। ব্রিজদুলারী সম্পর্কে তিনি এতটুকু স্বগতচিন্তাও অপব্যয় করেন নি। তিনি ভাবতেন, নেহাতই স্বর্ণলোভী নীতিহীন একটি স্থূল স্বভাবের স্ত্রীলোক ব্রিজদুলারী। ব্রিজদুলারীকে হিন্দী ও উর্দু শেখাবার জন্য ব্রাইট

তাঁকে অনুরোধ করে। সে বলে, 'একজন পণ্ডিতের কাছে ও পড়ছিল। পণ্ডিতটি বৃদ্ধ হয়েছেন। আসতে পারেন না।'

ভবানীশঙ্কর প্রথমে রাজী হননি। তারপর ব্রাইট তাঁকে বারবার বলে। তিনি শেষ অবধি বলেন, 'সামান্য চিঠিপত্র লেখবার বা পড়বার মতো হিন্দী উনি ত যার কাছে হোক শিখতে পারেন।' ব্রাইট শ্লেষ ক'রে বলেছিল, 'সে-সব ও ভালই জানে। তাতে ওর মন উঠছে না। ও আরো পড়তে চায়। ওদের গ্রাম যে পণ্ডিতদের গ্রাম।' তিনি শুনেছিলেন কয়েকজন কনৌজী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এখনো ঐ গ্রামে বাস করেন। সম্ভবতঃ তাঁদের প্রভাবেই গ্রামটিতে একটি বিদ্যাচর্চার পরিবেশ আছে। ও বিধবা হবার সময়ে নেহাত শিশু ছিল ব'লে ওর বাবা ওকে একজন বৃদ্ধ পণ্ডিতের কাছে যেতে দিতেন। মিশ্রজী ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। ওর বাবা বলেছিলেন, 'লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়; তা ও ত বিধবা-ই। শিখতে চায় শিখুক না। তবে বেউ যেন জানতে না পারে।'

ভবানী শেষ অবধি রাজী হন।

সকালে তাঁর সময় হত না। তিনি বিকেলে আসতেন। ব্রিজদুলারী চুপ ক'রে বসে থাকত। ঘরের মাঝে মেঝেতে গালচের উপর একখানা নিচু জলচৌকি। দোয়াত এবং কলম। বালি কাগজের খাতা। তুলসীদাসের রামায়ণ, মীরা, কবীর, সুরদাস এঁদের দোঁহা সংগ্রহ, ভাগবদ্‌গীতা, বেতাল পঞ্চবিংশতি, পঞ্চতন্ত্র এই বইগুলি দেওয়াল আলমারীতে রাখা। লক্ষ্ণৌ এবং হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি উর্দু বই-ও তাঁর চোখে পড়ে। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলেন তিনি শিশুপাঠ্য একটি ইংরেজী ঈশপের গল্প সঞ্চয় দেখে।

'সাহেব একসময়ে ইংরেজী শেখাতে চেয়েছিলেন। তারপর ওঁর সময় হলো না।'

ব্রিজদুলারী বলেছিল, 'ইংরেজীতে না কি অনেক বই আছে। ওখানে কি সবাই বই পড়ে? এত বই লেখে কে? সবাই যদি বই লেখে তবে পড়ে কারা? ওদের দেশে এত বইয়ের দরকারই বা কি? ইংরেজী শিখলে চাকরি পাওয়া যায় বলে শোনা গেছে। কিন্তু ওদের দেশে সবাই ত'

ইংরেজী জানে। চাকরি করতে ত' ওরা ভারতবর্ষে এসেছে। এ দেশে এসে ওদের আবার হিন্দী উর্দু শিখতে হচ্ছে, তাহ'লে এত বই পড়ে কে? ওরাই বা লেখে কেন?'

বিজজুলাবী এইসব প্রশ্ন করত।

তার কৌতূহল দেখে ভবানী একটু আশ্চর্য হন। তিনি বলেছিলেন, ইংরেজরা পৃথিবীর অনেক দেশেই এমনি ক'রে রাজত্ব স্থাপন করেছে। পৃথিবী সম্পর্কে তিনি তার অজ্ঞতা দূর করেছিলেন। সংস্কৃত মহাভারত পড়াতে গিয়ে তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলেন সে সংস্কৃত বোঝে। তার পুঁথিগত বিদ্যা সামান্য কয়েকটি বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিখবার ও জানবার একটি সহজ আগ্রহ আছে। তিনি সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন যেদিন সে বলেছিল শ্রীচৈতন্যের পর বাংলাদেশে যে সব সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার দু'একটি তিনি আনিয়ে দিতে পারেন কিনা।

তিনি বলেন, কর্ণপূর রচিত 'আনন্দ বৃন্দাবন' ব্যতীত অন্য বইয়ের খবর তিনি রাখেন না। সেটি এবং জয়দেবের বই তিনি আনিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন।

তাঁর মনে কৌতূহল হয়। ওকে তিনি নেহাত গ্রাম্য এবং সাধারণ ভেবেছিলেন। এই সুদূর প্রবাসে এসে ওর মতো একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হবে তা ভাবেননি।

পরে বিজজুলাবী তাঁকে নিজের জীবনের অনেক কথাই বলেছিল। সে ব্রাহ্মণের মেয়ে। তার পিতা যদিও দরিদ্র, তবু তাদের ছোট গ্রামটিতে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তার মাতামহ বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করবার পর তার মা ও সে কয়েকবছর মাতামহ-র কাছেই ছিলেন। সে বলে, 'আমার দাদুর বাড়িতে বিষ্ণু মন্দির ছিল। দাদু পুঁথি লিখতেন। কাশীতে যে পণ্ডিত সমাজ আছে তিনি তারই মধ্যে একজন। শুনেছি যৌবনে একবার নদীয়ার রাজবাড়ীতে তাঁকে ডাকা হয়েছিল। তিনি সেখানে একবছর থাকেন। সেখানে টোল খুলে বসবার জন্য মহারাজ তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ওখানকার ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রা তাঁর অন্য রকম বোধ হয়েছিল। তিনি চলে আসেন। আমাকে বলেছিলেন, কলকাতায় তখন গেলে তাঁর পক্ষে সুবিধে হতো। সাহেবরা নাকি সংস্কৃত পণ্ডিতদের সমাদর করতেন। কিন্তু নবদ্বীপের এক বৃদ্ধ পণ্ডিত

উদয়রাম ভট্টশালী তাঁকে বলেন, কলকাতায় গেলে আচারবিচার রাখা মুশকিল। তা:ছাড়া সেখানকার জলে গায়ে 'লোনা' লাগে। স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

'তিনি বলতেন চলে এসে ভুল করেছি। বাংলার অনেক পণ্ডিতই ত' সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁরা কেউ কেউ মাছ খেতেন বটে। কিন্তু কতজন ত' কী গোঁড়া আচারনিষ্ঠ ছিলেন! আমার কেমন বুঝতে ভুল হল। মনে হল আচার রাখতে পারব না। গেলে ভালই করতাম। রাজারা আজকাল সংস্কৃত চর্চায় সাহায্য করেন না। সাহেবরাই ত' রাজা। ওরা সংস্কৃতকে খুব বড চোখে দেখে। পণ্ডিতদের ওরা সম্মান করত। কারুকে কারুকে বাড়ীতে এনে নিজেরা সংস্কৃত শিখত।'

বাংলাদেশে ব্রাহ্মণরা কেন অন্যরকম, এ প্রশ্নের জবাবে ভবানী বলেছিলেন, বাংলা দেশে হাজার বছর ধরে অনেক জাত এসেছে। অনেক জাতের রক্ত এসে মিশেছে। তারই ফলে সে দেশের মানুষের মধ্যে অনেক জাতের অনেক নিয়ম রক্তে ঢুকে গিয়েছে। যেমন আপনাদের দেশে সব সমাজের মধ্যেই মুসলমানদের অনেক আচার নিয়ম অজানতে ঢুকে গেছে। কেননা উত্তর ভারত দীর্ঘদিন মোগল অধিকারে থেকেছে।'

পরিচয় কিছুটা পুরনো হবার পর ভবানী বুঝেছিলেন—সংযম, শুচিতা, ভগবানে ভক্তি, জ্ঞানচর্চার প্রতি শ্রদ্ধা এগুলি ওর রক্তে লালিত হয়েছে। কিন্তু ওর মতো মেয়ে কেমন ক'রে এ পরিবেশে এল তাই বোঝেননি। শুনেছিলেন ব্রাইট ওর ওপর বড অত্যাচার করে। শুনে তিনি ব্যথিত হতেন। কিছু জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ হতো. মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতেন ওর চোখের নিচে গভীর কালি। চোখে বেদনার ছায়া। মুখ নিচু করে ও খাতায় লিখত। সেদিন দু'জনে একটি কথাও কইতেন না।

ও মাঝেমাঝেই উপবাস করতো।

পূজা ব্রত, উপবাস এ সব লেগেই থাকত। একবার ও সসঙ্কোচে বলে, 'আমার ব্রতে আপনি কি ব্রাহ্মণ হবেন?'

'না।' ভবানী অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁর জবাবটা একটু রূঢ় হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'আমি ব্রাহ্মণের আচার পালন করি না।'

'কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ ত?'

'ব্রাহ্মণ বংশে আমার জন্ম ঠিকই। কিন্তু তার দ্বারাই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না।'

'কেন ?'

'ব্রাহ্মণ' কথাটিকে এক অর্থে খুব বড করে দেখা যায়। যে বিদ্যা দেয়, চর্চা করে, সে-ই ব্রাহ্মণ। এই ব্যাখ্যাটি আমার ভাল লাগে। তাতে অনেককেই ব্রাহ্মণ বলা চলে। আবার যে অর্থে আপনি 'ব্রাহ্মণ' কথাটি বলছেন তার মানে খুব সংকীর্ণ।'

'কিন্তু আপনি ত' বিদ্যা দান করেন।'

'আপনি ত' সে কথা মানেন না। যে-কোন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হলেই আপনার চলবে।'

'আমি যা বুঝি সেটা কি ভুল ?'

'না না। আপনি যা বোঝেন তাই সকলে মানে। আমার ব্যাখ্যা কে স্বীকার করছে ?' ভবানী হেসে বলেন।

ও হাসে না। গম্ভীর হয়ে চিন্তা করে। তারপর বলে, 'হয়তো আপনার কথা-ও ঠিক।'

'দেখুন.' ভবানী গম্ভীর স্বরে বলেন, 'আপনি যা বিশ্বাস করেন, সেই মতই কাজ করবেন। আমি বললাম বলে, বা অন্য কেও বললো বলে তার মতো ভাববেন কেন ?'

'আমি ? আমার বিশ্বাস ?'

'হ্যাঁ। প্রত্যেকটি মানুষই নিজের মত ভাববে, চিন্তা করবে এ-ই উচিত।'

তখন সে নিরুত্তর থাকে। পরে একদিন সে আবার কথাটি তোলে। বলে, 'আপনি বলেন কয়েকজন সাহেব-ও বাংলাদেশে লেখাপড়া শেখাবার জন্য কতই চেষ্টা করেছে। তাদের-ও কি আপনি ব্রাহ্মণ বলবেন ?'

ভবানী বলেন, 'হ্যাঁ। বলব। আমি বিশ্বাস করি যিনি জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করেন, যাঁর আদর্শ মহান, চরিত্র শ্রদ্ধার যোগ্য, তাঁকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলে মনে করা উচিত।'

'তবে 'ব্রাহ্মণ' বলছেন কেন ? বলুন তাকেই শ্রদ্ধা করা উচিত।'

কথাটি ভবানীর আশ্চর্য লাগে এবং তাঁকে আঘাত করে। তিনি অনেকক্ষণ আনতমুখে চুপ ক'রে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তোলেন। এর আগে কখনোই তিনি তার দিকে এমন ক'রে চান নি। তাঁর দৃষ্টি থাকতো নিচে। অথবা জানলার দিকে। তাঁর মুখে বিচিত্র একটি

হাসি সামান্য ফুটে ওঠে। বলেন, 'হ্যাঁ। আপনি ধরে ফেলেছেন। আমার বলা উচিত ছিল তিনিই শ্রদ্ধেয়, কেন না তিনি বিদ্যা দান করেন। তা না বলে আমি 'ব্রাহ্মণ' 'ব্রাহ্মণ' বলছিলাম। সম্ভবতঃ আমার জানাও ছিল না যে আমার মনে ঐ ব্রাহ্মণ যে শ্রেষ্ঠ সেই বিশ্বাসটি লুকিয়ে আছে।'

ও সম্ভবতঃ ওঁর সব কথা বোঝেনি। ভবানী আবার নিজের মনেই বলে চলেন, 'হ্যাঁ। আপনি যা বললেন আমি হয়তো তাই-ই বলতে চাইছিলাম। কিন্তু ভুল হচ্ছিল।'

তাঁর ছাত্রীর সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা বাড়ে। তিনি একদিন ব্রাইটকে বলেন, 'ওঁর বেশ মেধা আছে। উনি চেষ্টা করলে, ভাল পণ্ডিতের কাছে পড়লে অনেক শিখতে পারবেন। এমন কি ইংরেজী শেখাও ওর পক্ষে কঠিন হবে না।'

ব্রাইট বলে, 'আর ইংরেজী শিখে কাজ নেই।' সে আরো দুটি একটি মন্তব্য করে এবং বলে, 'তুমিও এক আজব মানুষ, ডাক্তার! আমি অন্য ডাক্তারদের-ও দেখেছি, তারা দিনরাত বই পড়ে না। তুমি কি ডাক্তারি বই পড়? পড়ে কি করবে? এর চেয়ে ভাল কাজ ত আর পাবে না।

সে মাঝে মাঝে ভবানীকে বলেছে, 'চল না, শিকার টিকার করবে?'

তারপর বলেছে, 'না! তুমি বড়ই অদ্ভুত লোক। তোমার এ সব ভাল লাগে না?'

হঠাৎ, কখনো সে টাকা ধার চেয়েছে তাঁর কাছে। কখনো শিকার থেকে ফিরে হরিণ বা পাখির মাংস পাঠিয়ে দিয়েছে।

মাঝে মাঝে ভবানী দেখেছেন সে তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। কি যেন বুঝতে চেষ্টা করছে ব্রাইট।

ভবানী কিছুই বোঝেন নি।

সেবার গরমের সময়ে 'লু' লেগে তাঁর জ্বর হয়। দিন তিনেক বেশ অসুস্থ হন। ইনফ্যান্ট্রির হিসাবরক্ষক শুকদেব মুন্সী তাঁকে দেখতে আসতেন। একদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ ব্রিজদুলারীর আয়া তাঁকে দেখতে আসে। সে কিছু ফল, মিছরী ও মেওয়া এনেছিল। 'বিবিজী পাঠিয়ে দিলেন। আপনার খবর জেনে যেতে বললেন।' ভবানী বলেন, 'ভালই আছি। আর, ও সবের কোন দরকার ছিল না। বলো, ভাল হলে যাব।' সে চলে গেলে পরে শুকদেব কাছে এসে বসেন। ফতুয়ার গলার বোতামটা

আল্গা ক'রে দিয়ে অস্বস্তিব্যঞ্জক দু'চারটি শব্দ ক'রে বলেন, 'ডাক্তারবাবু! আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়। দেখুন, এসব ভাল নয়।'

'কি ভাল নয়, মুন্সীজী?'

'এই সাহেবের বিবিজীর আসা এখানে আসা।'

'কেন?'

'অনেক কথা উঠতে পারে। ঐ মেয়েটিত ভাল নয়?'

'কে? আয়া?'

'না। ঐ বিবিটি। আপনি ওকে পড়ান বলে সবাই কত কথা বলতে পারে। বলছে-ও। আপনি জানেন না।'

'আপনি তাঁর সম্বন্ধে ওভাবে কথা বলছেন কেন?'

'ওর গয়নার জন্যে সাহেব নানাভাবে টাকাপয়সা…কেন, আপনি জানেন না?'

'ভদ্র মহিলার সম্পর্কে আপনি ওসব কথা বলবেন না, মুন্সীজী।'

'আমি আপনাকে ভালবাসি তাই সাবধান করছি। সাহেবটি-ও ত গাঙ্গরোর বাচ্চা। আসা এসেছে জানলে আপনাকেই হয়ত…'

'এ সব কথা থাক।'

ভবদেব মুন্সী চুপ করেন। তিনি একটু পরে বলেন, 'আপনাকে আমরা বাই ভালবাসি।'

ভবানী প্রসঙ্গটা বদলাতে চান। তিনি বলেন, 'আপনার বাড়ীর চিঠি পেলেন?'

দুটো একটা কথা বলে মুন্সী বিদায় নেন। তখন ভবানী চিন্তা করেন। র মনে হয় আয়া আসাতে তিনি যেন খুশী হয়েছিলেন! কেন? তারপরই জেকে শাসন করেন। না, এসব কথা তাঁর ভাবা উচিত নয়।

সুস্থ হবার পর তিনি আবার গেলেন। এবার দু'জনেই যেন কিছুটা স্কাচ অনুভব করছেন। ব্রিজদুলারী বলল, 'আপনি 'লু' লাগালেন ন?'

'একটু অসাবধান হয়েছিলাম।'

তারপর ভবানী পাঠে মন দিলেন। লক্ষ্য করলেন, পড়বার সময়ে আয়াটি রর এককোণে বসে থাকে। আগে সে থাকত না।

ব্রাইট কি তাঁকে সন্দেহ করছে? এবার তিনি একদিন বলবেন যে

আর পড়াতে আসবেন না। ব্রাইট তাঁকে সন্দেহ করলে সে খুব অপমানের হবে। ব্রিজদুলারীর জীবনটা যে খুব সহজ নয়, তা ত' তিনি বোঝেন। সে সম্পর্ককে আর জটিল ক'রে লাভ কি?

তবু তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হল।

একদিন তিনি শুনলেন ব্রিজদুলারীকে ব্রাইট মেরেছে। ব্রিজদুলারীর ভাই এসেছিল। তার হাতে সে টাকা দেয়। তাই নিয়ে গোলমাল হয়। সন্ধ্যায় আয়া বলে, 'বিবিজী-র জ্বর হয়েছে। বিবিজী পড়বেন না।'

সেদিনই ভোররাতে তাঁকে ডাকতে আসে ব্রাইটের চাকর। ব্রিজদুলারীকে ব্রাইট মেরেছিল। সে সারাদিন কিছু খায়নি। ব্রাইট তাকে রাতে আবার গালাগালি করে। সম্ভবতঃ ব্রিজদুলারী কিছু প্রত্যুত্তর দেয়।

ব্রাইট তাকে ঘর থেকে বের করে দিতেই সে গিয়ে কুয়োতে ঝাঁপ দেয়। ভবানী ছুটে যান।

ব্রাইট বাইরে পায়চারি করছিল। ক্রোধে তার মুখ লাল। সে ভবানীকে বলে, 'কুত্তীটাকে বাঁচাও। তারপর ওকে বেত মেরে টিট করব।'

ভবানী জবাব দেন না। ব্রিজদুলারী মেঝেতে পড়ে আছে। সে অচৈতন্য। সর্বাঙ্গ ভেজা। গলায় এবং হাতে কালশিটে ও রক্তের চিহ্ন তিনি দেখতে পান। ব্রাইট বলে, 'কুয়োর পাড়ে ধাক্কা লেগেছে।'

'না। ওটা বেতের দাগ।'

ভবানী আয়ার সাহায্যে ওর মাথা নিচু ক'রে জল বের করেন। নাকে ফুঁ দেন। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর ব্রিজদুলারীর জ্ঞান ফেরে। অসহায় দৃষ্টিতে সে চারিদিকে তাকায়। তারপর বলে, 'আমাকে বাঁচালে কেন? আমি মরতে চাই, মরতে চাই।' সে কাঁদতে থাকে। তারপর বলে, 'ওকে সরে যেতে বল। ও আমাকে মারতে চেয়েছিল।' সে আবার কাঁদে।

অনেকের সামনে এই অভিযোগ শুনে ব্রাইট খুব অস্বস্তি বোধ করে। সে হঠাৎ গলাটা বদলে ফেলে। ভবানীকে বাইরে ডেকে বলে, 'ডকটর, ও ভাল আছে ত?'

'হ্যাঁ। তবে আপনাকে বেত মারবার জন্যে ক'দিন সবুর করতে হবে।'

'ডকটর, তুমি বোঝ না। ওসব রাগের কথা! শোন...'

'না। আমি শুনতে চাই না।'

'ডকটর, তুমি ভুলে যাচ্ছ...'

'না। আমি ভুলিনি যে আমি আপনার কর্মচারী।'

'তুমি জান আমি ইচ্ছে করলে…'

'হ্যাঁ। আমি চাই আপনি রিপোর্ট করুন। আমি চাকরি যাবার ভয় করি না। বরং হেডকোআর্টার্সে আপনার সম্পর্কে দু'চার কথা বলতে পেলে খুশী-ই হব।'

তিনি চলে আসেন।

ফিরে এসে নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে কপালে দু'চারবার জোরে করাঘাত করেন। তারপর অবসন্ন হ'য়ে বসে পড়েন। ভেজা চুল। সাদা কপাল। নীল ঠোঁট এবং অসহায়, একান্ত অসহায় একটি মুখ। অসহায় চাহনি। তিনি কি করতে পারেন? তাঁর কি কোন ক্ষমতা আছে? এই সেদিন অবধি ভেবেছেন আর যাবেন না। নিজেকে সরিয়ে নেবেন। কিন্তু কেমন ক'রে সরে যাবেন?

তিনি ভগবানকে ডাকলেন। আজ তিনি পরীক্ষায় পড়েছেন।

ব্রাইট কিছুই করল না।

সে নিজেই এল এবং ভবানীকে বলল, 'ও ত এখন সুস্থ আছে। তুমি যেও। পড়াশোনা নিয়ে থাকলে ওর মন ভাল থাকে।'

ভবানী বললেন, 'না। আমি যাব না। আমি আর পড়াতে পারব না।'

ব্রাইট শিস দিল, ঘাড় বাঁকাল, এবং চলে গেল। ভবানী গেলেন না। ব্রিজদুলারীর আয়া একদিন তাঁর কাছে পায়ের ব্যথা দেখাতে এল। সে নিজেই বলল, 'সাহেব এখন খুব ভালো হয়েছে। বিবিজীকে কিছু বলে না। ঘরের ঝগড়াও দুদিনেই মিটে যায়।'

তার কথা শুনে ভবানী আশ্বস্ত হতে চাইলেন। তিনি এখন যে-কোন খড়কুটোকে আঁকড়ে ধরতে রাজী। যদি এমন হয়, ও শুধু ওদের দাম্পত্য জীবনের ভুল বোঝাবুঝি, তা হ'লে তিনি খুব খুশী হবেন। খুব আশ্বস্ত হবেন। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন কই? সামান্য কারণে রাগ করে যে সব মেয়ে মরতে যায় ও কি সেই জাতের? তিনি এবার একটি প্রশ্ন করলেন। আয়াকে বললেন, 'বিবিজীর ভাই এসেছিল। ওরা ওঁকে নিয়ে যায় না কেন?' আয়াটি তামাকের মিশিতে কালো দাঁত বের ক'রে চতুর হাসল। বলল, 'বিবিজীকে ওরা বেচে দিয়েছে যে! সাহেব ভাইদের চাকরি

দিয়েছে। বাপকে টাকা দিয়েছে। এখন ঐ মেয়েকে ওরা ঘরে নেবে কেন? ওদের জাত ধর্ম নেই? এমনিতেই ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল একবার।'

ভবানী অনুভব করলেন তিনি অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছেন। ব্রিজদুলারীর সমস্যা তাঁকে নিয়তির মতো টানছে। তা'হলে এই হলো প্রকৃত সত্য। এখন আর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। বাপ ও ভাই ওকে ব্রাইটের হাতে তুলে দিয়ে চাকরি কিনেছে। ওদের ঘরে আর ওর জায়গা নেই। ব্রাইটের প্রতি কৃতজ্ঞতা-ই ওকে এই জীবনে বেঁধে রেখেছে। তবু ও সহ্য করতে পারে না। এবার মরতে চেয়েছিল। যদি এই জীবনের দুঃসহ গ্লানিই তার কারণ হয়ে থাকে, তবে সে গ্লানি ত ওর অপরিচিত নয়। তা সহ্য করেও ত ও বেঁচে ছিল। এবার মরতে গিয়েছিল কেন? তবে কি—তবে কি ভবানীরও সে সম্পর্কে কোন দায়িত্ব আছে? ভবানী ভাবতে লাগলেন। চিন্তা তাঁকে দগ্ধ করতে লাগল। তাঁর মনে হতে লাগল যদি আবার সে তাঁর সম্মুখীন হয়, তাহ'লে হয়তো অনেক কথা বলতে হবে, শুনতে হবে। আর তাকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।

তিনি সেই সম্ভাবনাকে ভয় পেতে লাগলেন। ব্রাইট ট্যুরে গেছে জানলে তাঁর ভয় হতো। যদি সে আসে! যদি ডেকে পাঠায়? এবার দেখা হলে ছোট ছোট কথা, ভালবাসা সৌন্দর্যের আলাপ এ সব আর সম্ভব হবে না। তবে কি করতে হবে? কি বলতে হবে? ভবানী শুধু তাই ভাবতে লাগলেন।

সন্ধ্যা হলেই ঐ বাড়ীর পথ তাঁকে টানে। কিন্তু ও পথ দিয়ে তিনি কখনো হাঁটেন না। শহরে সে মন্দিরে যায়। পথে আগে দেখা হতো। এখন তিনি আর শহরে যান না। তিনি সারাদিনমান কাজ করেন। সন্ধ্যা হলে ঘরে এসে বসেন। সেজবাতি জ্বলে। ভবানী কোন বইয়ের পাতা খোলেন। তারপর স্থির হয়ে চিন্তায় ডুবে যান।

একদিন তেমনই বসে আছেন। নীরব এবং চিন্তামগ্ন। তাঁর দরজায় শব্দ হলো। ব্রিজদুলারী এল। বলল, 'বাইরে আসুন।'

তাঁরা বেরুলেন। ছাউনার সীমানা পেরিয়ে, উঁচু-নিচু মাটির ওপর দিয়ে তাঁরা শালবনের কাছে এলেন। দু'জনেই বসলেন। কিছুক্ষণ সময় গেল। তারপর ভবানী মুখ তুললেন। বললেন, 'কথা বল। আমার যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি সহ্য করতে পারছি না।'

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। অনেক কথা তারা বলেছেন। ভবানী বলেছেন, [illegible]। বিশ্বসংসার তোমার চোখে যদি অন্ধকারও হয়ে যায় তুমি আত্মহত্যা করবে না।'

তারপর সে-সব কথাও শেষ হয়ে গেছে। অনেকটা সময় নীরবে কাটবার পর ভবানী বলেছেন, 'যে কথা বললাম, তুমি ভেবে দেখো। চিন্তা ক'রে তবে আমাকে জানিও।'

ঘরে ফিরে এসে তিনি ভেবেছেন। একদিন নয়, কয়েকদিন ধ'রে। [illegible] বলেছে 'তোমার সমাজ নেই? সংস্কার নেই?' 'সমাজ এবং সংস্কার আছে বৈ কি! কিন্তু একদিন কেউ না কেউ সমাজ ও সংস্কারকে [illegible]। দিতেই হয়। যখন স্থির করেছি এই আমার কর্তব্য, তখন আমাকে তা করতেই হবে।'

বিবর্ণ মুখে ত্রিগুণদুলারী চিন্তা করেছে। ভবানী বলেছেন, 'জীবনটা অনেক [illegible], আমরা এখানে থাকব না। অন্যদেশে যাব।'

'সাহেব টুর থেকে ফেরবার আগেই যাবে ত?'

'[illegible] তাই যেতে হবে। ভেবেছিলাম ওর সামনে যাব। আমি [illegible] ওর বাপভাই তোমার সাহায্য নিয়েছিল সেইজন্য তুমি [illegible] চিরজীবন কষ্ট দিতে পার না। তোমার সঙ্গে ওর বিয়েও [illegible] তোমার কাছে থাকবার ওর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এই [illegible] তোমার সমস্ত টাকা এবং গহনা। ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ভেবে দেখলাম তা হয় না। ও তাহ'লে হয়তো খুব নীচতা [illegible]।'

তারপর তিনি বলেছেন, 'মনস্থির করবার আগে অনেক ভেবেছি। এখন [illegible] আমার কোন সংশয় নেই।'

তারপর বলেছেন, 'তোমার কোন চিন্তা নেই ত? তুমি আমাকে বিশ্বাস [illegible]?'

'হ্যাঁ।' ব'লে ত্রিগুণদুলারী বলছে, 'জান, আমার কেমন স্বপ্নের মত লাগে! [illegible] আবার একটা অন্যজীবন যাপন করতে পারব! রাতদিন বুকের মধ্যে [illegible] না এ যেন বিশ্বাস হয় না।'

'সবাই যে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। তোমার বাপ ভাই···তারাও

অসহায়। তা ছাড়া আমার নিয়তিতে যা আছে তা যে আমাকে ভোগ করতেই হবে।'

'ও কথা আমি মানি না।'

তখনো ভবানী নিয়তির সর্বাধিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন না। মানুষ চেষ্টা করলে নিয়তির নির্দেশকে অতিক্রম করতে পারে এই তাঁর বিশ্বাস।

তবু তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হল।

নিয়তির কাছে। ভাগ্যের কাছে। যে নিয়তি মানুষকে পুতুলের মত নিয়ন্ত্রণ করে তার কাছে।

তাঁর দিক থেকে কোন ত্রুটি ছিল না। ডাক গাড়ী এবং পালকির ব্যবস্থা করেছিলেন। পদত্যাগ পত্র লিখেছিলেন। কাশীতে তাঁর এক দাদাকে লিখে টাকা আনিয়েছিলেন।

কিন্তু যাত্রার আগের দিন ব্রিজদুলারী ছিন্নমূল লতার মতো তাঁর পায়ে পড়ল। বলল, 'আমি পারব না। আমার ভয় করছে। আমি পারব না। এ আমার কি হল?' সে কাঁদতে লাগল। চুল ছিঁড়ে, মাটিতে মাথা ঠুকে, বিপর্যস্ত ও দিশেহারা হয়ে। সে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে ও আমাদের মেরে ফেলবে। আমার সাহস নেই। আমি ভীরু!'

ভবানী তাকে বোঝালেন। রূঢ় ভাষায় বললেন, ভাল ক'রে বললেন, বারবার বললেন।

তারপর পরাজিত এবং আহত ভবানীশঙ্কর রেওয়া ছেড়ে চলে গেলেন। ছুটির দরখাস্ত রেখে গেলেন। পদত্যাগপত্র ছিঁড়ে ফেললেন। চলে গেলেন রাতের অন্ধকারে।

তারপর থেকে হৃদয়ে শুধু-ই রক্ত পড়েছে। আজও সে ক্ষত শুকোয়নি। মানুষ যে নিজের চেষ্টায় কিছুই করতে পারে না, অনেক দাম দিয়ে ভবানী সেই কথা শিখেছেন।

ভবানী দিনলিপি বন্ধ করলেন।

রাত অনেক হয়েছে। তাঁর সমগ্র জীবনটি তিনি পরিক্রমা ক'রে এসেছেন। আজ তিনি বুঝতে পারছেন তিনি পূর্ণ করবার পূর্ণ হবার সৌভাগ্য নিয়ে এ পৃথিবীতে আসেননি। তাঁর ভাগ্য তাঁকে চিরতরে নিঃসঙ্গ করে পাঠিয়েছে।

কুড়ি

চৈৎরামদের একটি ছোট বাগানবাড়ী চম্পার জন্যে সম্পূরণ আগেই ভাড়া করেছিল। সম্প্রতি সেখানে কার্পেট, দেওয়ালগিরি, গদীআঁটা চেয়ার, দরজা ও জানালায় পর্দা, খসখস, আলবোলা, ফরাস ও তাকিয়া আনা হয়েছে। এখানে মাঝে মাঝে ইভান্‌স আসে।

ইভান্‌স সম্প্রতি গভীর প্রেমাসক্ত। চম্পার কাছে আসবার আগে সে মনে মনে ভাল ভাল কথা গুছিয়ে নেয়। কিন্তু চম্পাকে দেখলেই তার গলা ভারী হয়, নিশ্বাস ঘন হয়, কথা গোলমাল হয়ে যায়। চম্পা তাই দেখে হাসে। এত হাসে যে ইভান্‌সের মনে হয় তাকে নিয়ে চম্পা শুধু কৌতুক করে। ইভান্‌সের আরো মনে হয়, চম্পা যদি তাকে ভালবাসবে, তাহ'লে তার মধ্যে প্রণয়ের প্রগাঢ়তা দেখা যায় না কেন? তার অদর্শনে চম্পা আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করে না কেন? সে একবার সাতদিন আসতে পারে নি; সাতদিন পরে সে যখন এল, তখন কেমন করে অভিমান ভাঙাবে চম্পার, তার ছলছল চোখ কেমনে মুছিয়ে দেবে এই সব ভাবনায় ইভান্‌স খুব ব্যস্ত ছিল।

সে আশ্চর্য হয়ে দেখল চম্পা এতটুকু কাতর হয়নি বিরহে। বিছানায় শুয়ে চম্পা লম্বা লম্বা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলছিল না। চম্পা একটি দাসীর সঙ্গে হিসেব করছিল এবং খুব শানিত ভাষায় তাকে বলছিল—'ঘি-এর সের বারো আনা হয়েছে? আমাকে বোকা পেয়েছিস?'

'দর্জি কে হয় তোর?'

'কেউ হয় না চম্পাবাই।'

'নিশ্চয় তোর কেউ হয়। আমার মনে হচ্ছে ও তোর শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে আত্মীয়। নইলে আমার সোফা কৌচের ঢাকনী সেলাই দু'টাকা চায়? তোর সঙ্গে বখরা আছে বুঝি?'

দাসী বলছিল, 'চম্পাবাই, আমি নাকে কানে মলছি। এমন বেইজ্জত আমাকে কোর না। আমার শ্বশুরকুলে সাত গুষ্টিতে কেউ বেঁচে নেই। হায় রাম, হায় ভগবান!'

ইভান্‌সকে দেখে চম্পা দাসীকে আর এক ধমক দেয়। বলে, 'আতর তামাক দিয়ে যাবি। শরবতের কুঁজো রেখে যাবি। তারপর রাস্তায় গিয়ে

বসে থাকবি। যদি দেখি দরজার আড়ালে উঁকি মারছিস তোর নাক কেটে নেব।'

দাসী একহাত ঘোমটা টেনে পালিয়ে বেঁচেছিল।

এবার ইভান্‌সকে দেখে চম্পা খুব আদর যত্ন করলো। বলল, 'ঐ হতচ্ছাড়া পাইপটা ছাড়ো। আলবোলা খাওয়া অভ্যাস কর।'

তারপর চঞ্চল পায়ে ঘরময় একবার ঘুরে এসে বলল, 'কাল কোথা ছিলে?'

'চম্পা, তুমি আমার জন্যে দুঃখ করছিলে?'

'কাল আমি আমের আচার বানাচ্ছিলাম। আম, আম বোঝ?'

'হ্যাঁ। আম একটি সুস্বাদু ফল।'

'সে পাকলে পরে। কাঁচা আম দিয়ে আচার হয় জান? লঙ্কা আর মশলা দিয়ে।'

'ও, চিনি আর স্পাইস বড় খারাপ জিনিস।'

চম্পা গম্ভীর হয়ে বলে, 'তাহলে হল না সাহেব।'

'কি হল না?'

'এই আমার তোমার ইয়ে আর কি?' চম্পা হাত নেড়ে বুঝিয়ে দেয়।

'কেন, চম্পা কেন? আমি কি করেছি?'

'তুমি যে তোমার অভ্যাস, ভাললাগা মন্দলাগা পালটাতে পারছ না। আমি ঘি-এর মিষ্টি ভালবাসি, তুমি ভালবাস না।'

'ও গ্রীজি অ্যাফেয়ার।'

'আমি লঙ্কা ভালবাসি, আচার ভালবাসি।'

'অসম্ভব।'

'দোলের দিনে রং খেলতে ভালবাসি। ঢাকঢোলের বাজনা আমার ভাল লাগে। তোমার তাতে মাথা ধরে। আমার গান শুনতে তোমার ভাললাগে না।'

'তুমি ভেরি ব্যাড সিংগার, চম্পা।'

'ও!'

'কিন্তু গুড ডান্সার। তুমি জিপসীদের মতো তাম্বুরিণ হাতে নিয়ে নাচবে। মাথায় রুমাল বাঁধবে একটা।'

'বুঝলাম।'

কিছুক্ষণ চম্পা খুনসুটি করল। ইভান্সের গলায় নিজের চওড়া হারটা পরিয়ে দেখল। ইভান্সকে দিয়ে জোর করে আলবোলা আনাল। ইভান্স রোজই ভাবে এই সব হালকা হাসির আবরণ দিয়ে চম্পা মুহূর্তগুলোকে হালকা করে রাখে। তাকে ঘনিষ্ঠ হতে দেয় না। ভাবে সে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু চম্পার কাছে এসেই তার সব সঙ্কল্প ওজন হারাতে থাকে। সে মাঝে মাঝে পরামর্শ করেছে টমসন ও এভারের্ড-এর সঙ্গে। তারা বলেছে, ওহে মূর্খ! ওহে স্বত্রদলী! মেয়েটাকে দু'একটা উপহার টুপহার দাও। তারপর নিজের জোর খাটাও। দেখ, এরা ওসব নরম কথা মিষ্টি ব্যবহার বোঝে না। দু'এক ঘা মারতেও পার। ওরা কড়া ব্যবহারে সায়েস্তা থাকে। বুঝলে?'

উপহার এনেছিল একবার ইভান্স। একটি রূপোর আতরদান। চম্পা তাই দেখে গম্ভীর হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চিন্তা করে। তারপর বলে, 'দেখ, আমার জন্যে তুমি খরচ করে উপহার এন না, কেমন? আমার ত অনেক গহনা, অনেক কাপড় আছে!'

'হ্যাঁ চম্পা। আমি তোমাকে আর কি দিতে পারি। আমি সামান্য মাইনে পাই। আমি ইঞ্জিনীআর মাত্র। আমি ত জানি ভারতীয়দের বাড়ীতে ঘরে ঘরে-ই সোনা থাকে, মুক্তা থাকে, প্রবাল থাকে।'

'না সাহেব। সে কজনের? কিন্তু সে কথা থাক। তুমি টাকা জমাও।'

'টাকা জমাব তাই না চম্পা?'

হঠাৎ ইভান্সের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বলে, 'তাই ভাল চম্পা, তাই ভাল। আমি একটি বাড়ী নেব। সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব। সেজন্যে ত আমার অনেক টাকার দরকার হবে, তাই না?'

আজ চম্পা তাকে বলল, 'তুমি নাকি চলে যাবে?'

'নো মাই প্রিন্সেস, নো মাই প্রিটী?'

'সাহেব ইংরেজী ব'লো না।'

'আমি যাব না।'

'যাবে না?'

'না। মেজরের নিষেধ আছে।'

'কেন?'

চম্পা ইভান্সের পাশে এসে বসল। তার কাঁধে হাত রাখল। ইভান্স একটু মনে করতে চেষ্টা করল, 'তোমার গতিভঙ্গী গেজেল হরিণের মতো' এই কথাটি সে গুছিয়ে বলতে পারবে কি না! তারপর মনে হ'ল, না, বৃথা চেষ্টা। বলতে গেলে গোলমাল হবে। তখন চম্পা হাসবে। সে বলল, 'মেজরের ইচ্ছে হয়েছে মেম ও বাচ্ছাদের নিরাপদে রাখতে হবে। আমার ওপর হুকুম হয়েছে, স্বল্পসময়ে নিরাপদে থাকবার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।'

'তুমি কি গড় বানাবে?'

'না। আমি এক টাওআর বানাব। তার ওপরে তোমাকে কয়েদ করে রাখব। তুমি আমার জন্যে পথ চেয়ে থাকবে।'

'তারপর?'

'আমি যখন ঘোড়া চড়ে আসব, তুমি আমাকে মাথার চুল নামিয়ে দেবে। তুমি আমার র‍্যাপুনজেল।'

'বুঝলাম।'

'কিন্তু আমি শীঘ্রই এক কুঠি নেব। তোমাকে অনেক কালো কালো দাসী দেব। অনেক পান, তামাক, আতর, খাঁচায় বুলবুল, টিয়া, আম এবং লঙ্কা, যা যা ভালবাস তুমি সব দেব।'

'তুমি তোমার ভাষা আমায় ভাল ক'রে শেখাবে না?'

'না চম্পা। আমি তোমার ভাষা আরো ভাল ক'রে শিখব। তোমার নিজের ভাষায় তুমি কথা বললে শুনতে মিষ্টি লাগে।'

'কবে থেকে তুমি গড় বানাবে সাহেব? আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না?'

'ইউ ব্লাক আইড জিপসী, তোমার সঙ্গে দেখা না করে আমি কি থাকতে পারব?'

ঘরে ফিরে চম্পা সম্পূরণকে বলল, 'সাহেবরা তোমার মতো 'কালী 'কালী' করে না বুঢ়া, তারা কাজ করে। তারা দিল্লীর ইস্তাহার আর মীরাটের বাজার-গরম গল্প গুজবের কথা জানে না, মনে করো না। তারা সাবধান হতে চেষ্টা করছে। মেজর সাহেব ইভান্সকে গড় বানাতে বলেছে।'

সেই এনট্রেঞ্চমেন্ট, সেই ব্যারিকেড।

ইভান্‌স প্রমুখ তরুণদের ইচ্ছে ছিল, এনট্রেঞ্চমেণ্ট যদি করতেই হয়, তবে শক্ত ক'রে করা হোক।

হুইলার তখনো বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন, অধীনস্থ সেনাদল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। তিনি বললেন—

'গুপ্তচর আমাকে বলেছে এরা যদি বিদ্রোহ করে তবে দিল্লীর পথে রওনা হবে। কাণপুরের ক্রীশ্চানদের গায়ে হাত দেবে না। আমরা যদি শক্ত ব্যারাক গড়ি, সেখানে রসদ জমা করি, ম্যাগাজিন থেকে গোলাবারুদ আনি, এরা ধরে নেবে আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।'

'মেজর, যদি কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তবে কি এই এনট্রেঞ্চমেণ্টে কাজ হবে? সিপাহী লাইনের এত কাছেই বা কেন?'

'সিপাহী লাইনের কাছে আমাদের উপস্থিতি প্রয়োজন। অফিসাররা সেখানে রাতে ঘুমোবে।' এর চেয়ে তোড়জোড় করে বন্দোবস্ত করলে ওরা যদি উত্তেজিত হয়? আমাদের প্রোভোকেশনে ওরা যদি শহরের সিভিল খ্রীশ্চানদের আক্রমণ করে? তাদের বিপন্ন করা কি উচিত হবে? আমাদের এখানকার রেসিডেণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিলার্সডন বলেছেন, পেশোয়া নানাসাহেব আমাদের সাহায্য করবেন। তাঁকে ট্রেজারীর ভার দেওয়া যাবে।' অতএব তাঁর কথা মানতেই হ'ল।

ইভান্‌সের সব উৎসাহ মাঠে মারা গেল। ছটি একতলা ইটের ব্যারাক তৈরী হলো। গরমে চুনসুরকির আস্তর চটপট শুকোল। একটিতে টালি এবং অপরটিতে খড়ের ছাউনী লাগান হ'ল। দ্বিতীয় ব্যারাকটির সামনে খাতও খোঁড়া হ'ল। সেটি অগভীর। ব্যারাকছুটির উচ্চতাও হ'ল সামান্য।

যখন ব্যারাক তৈরী হচ্ছে, খাত খোঁড়া হচ্ছে, তখনই রেজিমেণ্টে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল।

'আমাদের উপর কি সাহেবরা বিশ্বাস রাখতে পারছেন না?'

'ব্যারাক তৈরী করবার কি দরকার ছিল?'

এইসব কথা মুখে মুখে ফিরতে লাগল। একটি বৃদ্ধ জমাদার, সে বিশ্বস্ত এবং প্রভুভক্ত, সে একদিন বলল, 'তোমাদের সব কথায় দরকার কি? এই ছেলেখেলার মতো ব্যারাক গড়ে তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে ওরা? ওরা অনেক বুদ্ধি রাখে। ওদের বিশ্বাস করতে পার না কেন?'

তাকে সবাই 'বুড়ো', 'অকেজো', 'খোসামুদে' বলল। হুইলার তখন অবস্থার হাতে নিশ্চল পুত্তলিকা।

তিনি দোষও দেখতে পান না। শুনেও শুনতে চান না। উটপাখীর মতো তিনি সমানে মাথা গুঁজছেন আর ভাবছেন, 'আমি যদি বিচলিত না হই তাহলে কোন বিপদ হবে না, হতে পারে না।'

এরপর ভবানীশঙ্কর রওনা হলেন। আসন্ন বিদায়ের প্রাক্কালে চন্দন এসে দাঁড়াল।

চন্দন অস্বস্তি এবং উত্তেজনায় ভুগছিল; তাকে খুব দায়িত্বপূর্ণ একটি গোপন কাজের ভার দেওয়া হয়েছে সেজন্য সে উত্তেজনা অনুভব করছিল। চম্পাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছি, এই উদ্বেগ তাকে পীড়িত করছিল। চম্পাকে সে বালকের মতো আঁকড়ে ধরল। বলল, 'তুই আমার কাছে কাছে থাক।'

চম্পা তার জামায় বোতাম বসিয়েছে। নতুন জামা, যোধপুরী এবং নাগরা করিয়েছে। অনেক টাকা দিয়ে সাহেবেরা যেমন ব্যবহার করে, তেমনি ক্যাম্বিশের বাক্স আনিয়েছে। পথে খরচের সুবিধে হবে বলে টাকা ভাঙিয়ে রেজকি করেছে।

.চন্দন যাবার সময়ে বালকের মতো ভেঙে পড়তে লাগল। বলল, 'তোকে কার কাছে রেখে যাচ্ছি?'

চম্পা ধরা গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরো এসো।'

'আমি ত ওখানে পৌঁছে দেব খবরগুলো। তারপরই আমার ছুটি।'

'ছুটি?'

চম্পা যেন বুঝতে পারল না। তারা দু'জন যে ঘটনাচক্রের জালে জড়িয়ে পড়েছে তার হাত থেকে কি ছুটি আছে? চম্পা বলল, 'হ্যাঁ। আমাকে ওরা কথা দিয়েছে, এরপরই ওরা তোকে আমাকে চলে যেতে দেবে।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ চম্পা! নইলে কি আমি যাই? তোকে ছেড়ে যাই?'

'এরপর তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাবে?'

আজকাল চম্পা তার কাছে এই কথা ক'টা বারবার শোনে। চন্দনকে রোজ এই রূপকথাটি বলতে হয়। চন্দন বলল, 'সেন্নার নদী পেরিয়ে

চবাপুর নামে একটি ছোট্ট গ্রাম আছে। কানপুর থেকে দক্ষিণে আকবরপুর য়ে হাজিপুরের সড়ক ধরে সেখানে যাওয়া যায়। আবার বিঠুর হয়ে ক্ষিণ পশ্চিম বরাবর পেশোয়াদের সড়ক, কাঁচা মাটির রাস্তা আর টি-বাঁধানো পথ দিয়েও যাওয়া যায় ডেরাপুর। আমরা সেই পথে যাব।'

'আকবরপুরে থামব আমরা ?'

'হাঁ। আকবরপুরে থামা যায়। বিষ্যুৎবার হলে সেখানকার হাট দেখা যায়। হাটের আড়তদারকে দু'আনা পয়সা দিলে সে থাকবার ঘর আর াসনপত্র দেয়। যারা কানপুর থেকে অনেক অনেকদিন বাদে সেখানে যায়, তারা আকবরপুরে রাত কাটিয়ে সকালবেলা গরুর গাডী ভাডা করতে পারে।'

'তুমি চিনির মঠের কথা বললে না ?'

চন্দনের গলা ব্যথা করে। সে অনেক চেষ্টা করে আবার সহজ গলায় বলে, 'আমরা চিনির মঠ কিনে নেব। আকবরপুরের পীরের দরগায়, যদিও পীরসাহেব মুসলমান, তবু আমরা আধপয়সার চিনির মঠ সেখানে দেব।'

'কেননা তিনি সকলকে সমান চোখে দেখতেন—'

'তারপর ?'

'তারপর গরুর গাডীটা যেমন গ্রামের কাছে যাবে, তেমনি দূর থেকে গৈবীনাথের মন্দিরের চূড়া দেখা যাবে। ত্রিশূল ঝকমক করবে। তারপর গ্রামের কাছে এসে বটগাছও দেখা যাবে।'

'কিষাণরা ?'

'আগে কিষাণরা দেখবে। তারা ছুটে গিয়ে খবর দেবে গ্রামে। আমি আগে আগে যাব।'

'কিন্তু আমি নামব না গাডী থেকে।'

'তুই নামবি না। তখন আমি মা বাবাকে বলব, চম্পাকে আমি অনেক খুঁজে এনেছি। তোমরা যদি তাকে আসতে দাও, তবে আমি তাকে আনব। নইলে আমরা দু'জনে আবার চলে যাব। তখন মা আসবে, বাবা আসবে। আরো কতজন আসবে, গ্রামের সবাই। মা এসে হাত ধরে তোকে নাবাবে। আমরা যেতে যেতে দেখতে পাব বটগাছের ডালে নতুন নতুন ঝুরি নেমেছে।'

'তুমি দেখতে পাবে, আমি পাব না।'

'না। চম্পা পাবে না। চম্পাকে তখন চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে চলতে হবে।'

চন্দন মুখ ফেরাল। তার বুকে কষ্ট হচ্ছিল, গলাব্যথা করছিল। চম্পা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বিড়বিড় ক'রে বলল, 'কানপুর থেকে দক্ষিণে আকবরপুর গ্রাম, সেখান থেকে যাওয়া যায়, নইলে বিধুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রথমে পেশোয়াদের সড়ক···চন্দন, তুমি ভেব না।'

'আচ্ছা চম্পা, ভাবব না!'

'আমি খুব ভাল থাকব!'

'জানি, চম্পা।'

'আর শোন, যদি তেমন গোলমালই হয়, তবু ভেব না। আমাকে কেউ, কেউ কিছু করবে না।'

'জানি।'

'তবে দেরি ক'রো না চন্দন। তোমার যে দেরি হয়ে যাবে?' চম্পা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সব গুছিয়ে নিয়ে চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল। টাকা-পয়সার থলি দিল। চন্দনের জুতোটা বারবার ঘসল।'

চন্দন বলল, 'চম্পা!'

'ম্?'

'এবার আসি!'

'এস। তাইত, সময় ত হয়ে গেল, তাই না?'

চম্পা কতকগুলো অসংলগ্ন কথা বলল। তারপর মুখ তুলল। হাসল। বলল, 'চন্দন, 'শুনেছি বিশ্বনাথের গলিতে অনেক কাঠের খেলনা পাওয়া যায়। এই এতটুকু হাতী, ঘোড়া, উট! শুনেছি ছোট ছোট কালপাথরের শিবমূর্তি পাওয়া যায়। তুমি আমার জন্তে এনো।'

'আনব।'

'যখন, যখন আমরা গ্রামে যাব, তখন সবাইকে কিছু কিছু চিহ্ন যে দিতে হবে?'

চন্দন মাথা নাড়ল। তারপর বেরিয়ে গেল।

তখন চম্পা ঘরের দরজা বন্ধ করল। আবার খুলল। একবার মনে হল বাইরের দরজা বন্ধ করি নি। আবার মনে হল, না, বন্ধ করেছি। চন্দনের পুরানো জামাটা দেখল দেওয়ালে ঝুলছে। সেটা তাড়াতাড়ি বাক্সে তুলল।

একবার মনে হল তার অনেক কাজ আছে, আবার মনে হল, না কোন কাজ নেই।

নিজেকে নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কোথায় যেন কি ভেঙে যাচ্ছে, কি শূন্য হয়ে যাচ্ছে, কি হাহাকার করছে, চম্পা বুঝতে পারল না।

তার হঠাৎ মনে হ'ল কাঁদতে পারলে সে স্বস্তি পাবে। তার চোখে জল এল না।

'চন্দন!' অস্ফুটে বলে সে মাটিতে বসে পড়ল। বহু, বহু সময় ধরে সে বসে রইল।

চন্দন গেছে দু'ঘণ্টাও হয়নি, তাতেই তার এ রকম লাগছে? আরো অনেক ঘণ্টা, অনেক প্রহর, অনেক সময় সে কাটাবে কি করে?

একুশ

১৮৫৭ সালের মার্চের শেষে ও এপ্রিলের গোড়ায় উত্তরভারতের প্রকৃতিতে বসন্তের সমারোহ লাগল। কানপুরের আশেপাশে আমগাছে ছোট ছোট আমে ভরে গেল। দু'একদিন অন্তর অন্তর ক'পসলা বৃষ্টি হলো। তাতে বাতাসটা ঠাণ্ডা রইল।

ক'দিন পরে, বা অদূর ভবিষ্যতে কিছু ঘটতে পারে কি না, সে বিষয়ে শ্বেতাঙ্গ সমাজ যেন জোর ক'রেই একেবারে উদাসীন ছিলেন।

মহিলারা বন্ধঘরে বেসন মেখে, দাসীদের সাহায্যে বেসন ঘসে তুলে, তারপর ল্যাভেণ্ডার বা গোলাপ-গন্ধী জলে স্নান করছিলেন। ফ্যান্সী ফেআর বা চ্যারিটি বলের কথা আলোচনা করছিলেন। অবিবাহিত যুবকদের খুঁজে খুঁজে নিজেদের অবিবাহিতা আপনজনদের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা ভাবছিলেন। তা ছাড়া সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

'আমার জনের দাঁত উঠবে। সব সময় আঙুল মুখে দেয়। কিছুতেই অভ্যাসটা ছাড়াতে পারছি না।'

'মিসেস ম্যাকগিলক্রাইস্ট, আঙুলে একটু কুইনিন পাউডার দাও। একেবারে সেরে যাবে অভ্যেস, জানলে?'

'আয়াটা বলছিল মাইনে বাড়াতে। পাঁচটাকা দিচ্ছি, পানতামাক দিই, তা ছাড়া আমার কাছেই খায়। কি করব জানি না।'

'শুনেছ, আর্মেনিয়ানটার দোকানে নতুন নতুন কাঁচের বাসন এসেছে?'

'বাজারে যেন আগুন লেগেছে। ভাল মুরগীর জোড়া আটআনা হলো।'

'দাম বাড়বে, বাড়বে। সাবান ত' এখনি পাওয়া যাচ্ছে না।'

'শোন, আমি তোমায় পাঠিয়ে দেব। পিআর্স গ্লিসারিন একটা কেস, নতুনই আছে আমার।'

সাহেবরা অন্য কথা আলোচনা করছিলেন।

পোলো গ্রাউণ্ড তৈরী হবার কথা, একটি টুর্ণামেণ্টের কথা। গভর্ণর জেনারেল এবং কাউন্সিলের কথা। সুন্দরী মিসেস ব্লুমকিস্তের সঙ্গে শেরিডানের বিয়ের কথা। কেউ কেউ তার মধ্যেই বলছিলেন, 'শুনেছ হে উনাও-তে আবার একটা ফকির ধরা পড়েছে। সে না কি গাঁয়ে গাঁয়ে চাপাটি বিলি করছিল।'

একজন প্রৌঢ় অফিসার ভারমুথ্-এর গেলাসটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বলছিলেন,

'আমি যখন ভূপালে ছিলাম, তখন দেখেছি রংরেজীরা চাপাটি ভেঙে বিলি করে। ওটা ওদের একটা প্রাচীন কুসংস্কার।' আর একজন হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'সত্যি বলছি! কাশীপুরের রাজা আবার বিয়ে করছেন। এটি তাঁর এগারো নম্বর স্ত্রী হবে।'

'তুমি ত, কাশীপুরে ছিলে হে!'

'হ্যাঁ। কিন্তু রাণীদের দেখেছি মনে ক'রো না! মাঝে মাঝে পালপার্বণে সারি সারি বন্ধ পালকী বেরুত। মস্ত একটা পুকুরে পালকীসুদ্ধ ডুবিয়ে আনা হতো। এমন পর্দাপ্রথা।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। কাশীপুরের রাজাটি কিন্তু বুদ্ধিমান। খুব ভোগী-ও নন। তবে বিয়েটা ত আর এড়াতে পারেন না উনি। ওঁর তিলক হবার আগেই বিভিন্ন রাজপরিবার থেকে নারকেল পাঠান হয়। ওঁর বাবা যে-গুলো গ্রহণ করেন, সে সব রাজ্যের মেয়েদের ত বিয়ে করতে হবে-ই ওঁকে। এই-ই প্রথা। যখন নারকেল পাঠান হয় এই মেয়েটির বয়স একবছর ছিল। এখন এর বয়স বারো। মহারাজের বয়স সাতচল্লিশ। তবু এ বিয়ে হবে।'

'ওহে ইঞ্জিনীআর, ভাল ক'রে শোন! শুনে রাখ! রহস্যময় ভারত বলতে যে মূর্চ্ছা যাও, প্রথাগুলো কি রকম শুনছ?'

'ওর কানে কি আর যাবে; সম্প্রতি ও যে রকম অগাধ জলে পড়েছে!'

'শোন, নতুন ককটেলটা বানানো যাক! বেয়ারা! ভারমুথ, সিনাযোন, াণ্ডি, অরেঞ্জ স্কোয়াস, বরফ! হ্যাঁ। এক ট্রে বরফ! জলদি! তোমার রেসিপিটা মনে আছে?'

এবার বসন্তে কুমায়ুনের সেই সাফাখানার আশেপাশে বনভূমি অতি পরূপ হয়ে উঠলো! নদীর জলে বরফ গলেছে। তাতে মহাশোল মাছের াক দেখা গেল। কুল এবং জামজাতীয় একরকম ফল তখনো গাছে য়েছে। মৌশুমী পাখীরা চলে যাবার আগে ফলের লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে চড় করলো। হরিণের দল যেন আরো বড় হয়েছে। চন্দন সব দেখে নে খুশী হ'ল। একদিন একটা কাশ্মারি লাল হরিণও চোখে পড়ল ার।

নদীতে ছোট জাল বা ছিপ ফেললেই মাছ উঠছে। প্রচুর হরিণ, অনেক াখী। এমন কি একচোখ-কানা সেই শয়তান বাঘটাকেও দেখা যাচ্ছে াশে পাশে। চন্দন খুব খুশী হয়ে বুড়ো ম্যাকমোহনকে পাপামো-এর কানায় একটা চিঠি লিখল। লিখল এখন সময় হয়েছে। বুঢ়াসাহেব যদি াসেন, অতি সুখে, অতি আরামে ক'টা দিন ঘুরে যেতে পারেন। ইতিমধ্যে খানে কতকগুলো আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। চন্দন জঙ্গলের গভীরে একটা ত দাঁতাল হাতীর শবদেহ দেখেছে। তার দাঁত দুটো কাটিয়েছে। এই াতের ত অনেক দাম! চন্দন কি এই দাঁত জোড়া হলদোয়ানির ধনী ্যবসায়ী থাপাজীর কাছে বেচতে পারে, না এটা কোম্পানীর সম্পত্তি? ানো একটা খবর; যে বুড়ো সাধুবাবা তিনযুগ ধরে কল্লান্ত তপস্যা ক'রে ...দ বসেছিলেন, যিনি একবার নিদারুণ গ্রীষ্মের সময়ে পাথরে লাথি মেরে লের ঝর্ণা বইয়ে গ্রামবাসীদের বাঁচান, তিনি দেহ রেখেছেন। তাঁর দেহকে বল কাঠের চিতায় জ্বালান হয়েছে এবং ছাই যখন নদীর জলে ফেলা য়, তখন দূরে সাতটি পাহাড়ের গায়ে আলো জলে উঠেছিল। সবাই লছে সাধুজী বড মহাপুরুষ ছিলেন। যাঁদের আত্মা খুব বড়, তাঁরা স্বর্গে াবার সময়ে ঐ সব পাহাড়ের গায়ে আলো জ্বলে।

চন্দন চিঠি শেষ ক'রে আবার লিখল হাতীর দাঁতের কথাটি যেন তাকে ানান হয়। তার খুব সখ হয়েছে একটি দো'নলা বন্দুক কেনে। থাপাজী াকে বন্দুক ও কার্ট্রিজ এনে দিতে পারেন।

সেই চিঠি হাতে করে, এলাহাবাদের সন্নিকটে পাপামৌ-এর বাংলোয় বুড়ো ম্যাকমোহন আনমনা হয়ে গেলেন।

অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। চমন হয়তো ভাবছে ম্যাকমোহন সেই রকমই আছেন। শিকারপ্রিয়, উৎসাহী এবং কর্মঠ। সে ত জানে না ভরতপুর, বর্মা, রোহ্‌টক ও পিণ্ডারী যুদ্ধের প্রাচীন নেতা ম্যাকমোহন কত বদলে গেছেন। এখন আর তাঁর সে উৎসাহ নেই। এখন আর তাঁর শিকার করতে ইচ্ছে করে না। এই ত, তাঁর বাংলার পেছনের আমগাছে গোখরো সাপটা ক'দিন ধরে উঠছে আর পাখীর ডিম খাচ্ছে। তাঁর একবারও বন্দুক তুলে ওকে মারতে ইচ্ছে হয়নি।

এখন তিনি সকালবেলা বাগানে গিয়ে দাঁড়ান। শীতকালে যে গাঢ়নীল মৌচুষি পাখী দুটো তাঁর কাঞ্চনগাছে বাসা বেঁধেছিল, তাদের চলে যাবার সময় হয়েছে। এবার তারা অনেকদূরে উত্তরে চলে যাবে। ম্যাকমোহন রোজ তাদের জন্যে রুটির টুকরো আনেন। মস্ত বড় একটা সিমেণ্টের চাতাল আছে। তার ওপর তিনি বাদাম, মুড়ি, রুটি, কিস্কুট, ছোলা ছড়িয়ে দেন। ছাতুর মণ্ড দেন। মৌচুষি, সাহেববুলবুলি, তিতির, হরিপাল, ব্লু-জে, দোয়েল ও লাল পাখা হীরামণ কাড়াকাড়ি ক'রে ক'রে খায়। ছাতারে পাখী দুটো খালি ঝগড়া করে। তারা সবচেয়ে বেশী খেতে চায়, সকলকে সরিয়ে দিতে চায়। ম্যাকমোহন একটুও নড়েন না। মাঝে মাঝে নীলপাখা মৌচুষি পাখী তাঁর কাঁধেও এসে বসে। শার্টের ওপর খচমচ শব্দ করে। মাঝে মাঝে কাঠবিড়ালী এগিয়ে এসে তাঁর হাত থেকে খৈ খায়। ওরা শুধু জমায়, শুধু সঞ্চয় করে। কাঠবিড়ালীর গর্তে উঁকি দিয়ে ম্যাকমোহন দেখেছেন মার্বেলের টুকরো, ক্ষয়ে যাওয়া পেনসিল, গালার টুকরো, ছোট মোমবাতি, ভাঙা চিরুনী এমনি অনেক জিনিস ওখানে জমা হয়ে আছে। টুকটুকে লালচোখ একজোড়া বেজী আছে তাঁর প্যাকিংবাক্সের মধ্যে। তারা ঢোকে আর বেরোয়! একটা মস্ত বড় দাঁড়াল সাপ মাঝে মাঝে বাগানে ঢোকে। বেজীদম্পতির ছুটোছুটি দেখেই ম্যাকমোহন বুঝতে পারেন দাঁড়ালটি এসেছে। ম্যাকমোহন সামনের দিকে চেয়ে রইলেন।

মৌসুমী ফুলের চারা দেরিতে লাগিয়েছিলেন। তাই এখনো অ্যাসটার-সিআম-এর লাল ও হলুদ ফুলে আলো করে আছে। ডালিয়ার পাপড়িতে

ী-পিঁপড়ে জমা হয়েছে। বারোমেসে লতানে গোলাপটায় ফুল ফুটছে র। বোগোনভিলিয়া-র লাল ও কমলা রঙের ফুলের পাপড়ি বাতাসে উড়ে বড়াচ্ছে।

আম গাছে মুকুলের গন্ধ। কৃষ্ণচূড়া ও শিমুলের রঙে যেন আগুন জ্বলে।

মালীর বৌ শুকনো কাঠকুঠো তুলে ঝুড়িতে ভরছে। ওর ছেলেদুটো খেলা করছে। ছোট মেয়েটা গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মালী-বৌ বলল, 'লেখবার চৌকি এখানে এনে দিই?'

'না।' তিনি একটু হাসলেন। মালী-বৌ বলল, 'আজ কি রাঁধতে বলব?'

'কি এনেছে?'

'ভাল মাছ পেয়েছি।'

'মাছ বানাতে বল।'

মালী-বৌ চলে গেল। ম্যাকমোহনের সংসারটুকু ওরা দু'জন, স্বামী-স্ত্রী নায। ম্যাকমোহন ওদের থাকবার ঘর দিয়েছেন। এই বাগানের ওপাশে কসব্জীর ক্ষেত আছে। ওরা তরকারী খায় এবং বিক্রি করে। ম্যাকমোহন ছাড়া দশটি করে টাকা দেন।

ওদের ছেলেদের ক্রিমি, কানব্যথা, সর্দি, এসবের চিকিৎসা ক'রে কমোহনের আশেপাশের বসতিতে ভাল ডাক্তার বলে নাম হয়েছে। ওরা কেলে আসে। বসে বসে কথা বলে। দোল ও রাসলীলায় তাঁকে ডাকে। সবের পরদিন দেখা যায় বারান্দায় অনেকগুলি পিতলের সরা, এবং তাতে টা ও গুড়ের লাড়ু, চিনি, কলা ইত্যাদি সাজান। ম্যাকমোহনকে মাঝে ঝে দুধও দিয়ে যায় ওরা।

আমার তীর্থযাত্রা সার্থক। ম্যাকমোহন মনে মনে ভাবেন। সারাজীবন র তিনি এদের মধ্যেই থাকলেন, এদেরই ভালবাসলেন। আজ খছেন এরাও তাঁকে স্বীকার ক'রেছে। তাঁকে ওদের কাছে আসতে যেছে।

ম্যাকমোহন বর্তমানে 'ভারতে পঞ্চাশ বছর' বা 'Fifty Years in India' মে একটি বই নিয়ে ব্যস্ত। পঞ্চাশ বছর এ দেশে কাটিয়েছেন তিনি। যে ন এসেছিলেন সেদিন লণ্ডনে তাঁকে বলে দেওয়া হয়, 'যে দেশে যাচ্ছ, সে শ অনুন্নত এবং বর্বর। তুমি সেখানে সভ্যতা বিতরণ করতে যাচ্ছ।' কিন্তু দেশে এসে এদের সঙ্গে মিলে তাঁর সে-সব ধারণা কোথায় চলে গেল।

তিনি ত মিশনারী নন। তিনি ত যোদ্ধা। তবু তিনি ক্রমে ক্রমে এ দেশটাকে ভালবেসে ফেললেন।

এখন তিনি সকালবেলা বাগানে চৌকি নিয়ে বসেন। বসে আস্তে আস্তে লেখেন। প্রথমে মনে হয়েছিল তাঁর কি-ই বা বলবার থাকবে, কতবড়ই বা হবে বই। এখন দেখছেন, অনেক অনেক কথা বলবার আছে। এদেশের উৎসব, পূজা, পালপার্বণ, সমাজ, ব্যবহার, রীতি নীতি। তাঁর ফৌজীজীবনের স্মৃতি। এ দেশের পাখী ও পশু, গাছপালা নদনদী সম্পর্কে স্মৃতি। ম্যাকমোহনের আজকাল মনে হয় তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি। বোধহয় পিলগ্রিমেজে এসেছিলেন। মন্দির দেখেননি বা তীর্থসলিলে স্নান করেন নি। কিন্তু এ দেশের মানুষকে দেখেছেন, আর সেই দেখাই তাঁর দেবতাকে দেখা।

তিনি চন্মনকে কি লিখবেন? অনেক ভেবে লিখলেন, 'চন্মন, হাতীর দাঁতের অনেক দাম। ও জঙ্গল রামপুরের রাজার সম্পত্তি। বর্তমান রাজা আমার চেনা। তাঁর উকীলকে আমি চিঠি দিচ্ছি। তাঁর উকীল সাহেব মাঝে মাঝে হলদোয়ানিতে যান বলে শুনেছি। তুমি সেখানেই দাঁতটি দিও। উনি তোমাকে টাকা বা বন্দুক যা হয় দেবেন। চন্মন, তুমি যেতে লিখেছ, কিন্তু এখন ত আমি যেতে পারব না। পরে যাব। সাধুজীর কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে তিনি পুণ্যাত্মা। তাঁর সম্পর্কে আর কিছু শুনলে আমায় জানিও।'

বাইরের দিকে চেয়ে তাঁর মনে হল, রেভিনিউ কালেক্টার ফেআর সেদিন বলছিলেন শীঘ্রই একটা গোলমাল বাধবার সম্ভাবনা আছে। তাঁর কেন যেন মনে হল, সে আশঙ্কা মিথ্যা। আজকাল নতুন অফিসাররা ভারতীয়দের মোটেই বোঝেন না এবং অবিশ্বাস করেন।

ইভান্স চম্পাকে বলল, 'সত্যি! মেজর সাহেব হুকুম দিয়েছেন ক্যাণ্টনমেণ্টের বাইরে কোন অফিসার থাকতে পারবে না। সিভিল ইওরোপীআন ও অন্যান্য ক্রীশ্চানরাও দরকার হলে ক্যাণ্টনমেণ্টে থাকবেন।'

'কেন?'

হঠাৎ ইভান্সের মনে হল হুইলারের আদেশের কথাটা তার মুখ থেকে বেরুন উচিত হয়নি। সে ভুলটা ঢাকতে গিয়ে আর কতকগুলো এলোমেলো কথা বলল।

চম্পা বলল, 'তবু সব সাহেবরা ত যাচ্ছে না। সিভিল লাইন্‌স-এর সাহেবরা ত আছেই এখনো!'

'সব সাহেব একসঙ্গে গেলে হিন্দুস্থানীরা সন্দেহ করবে না?' ইভান্‌স আর একটা বেফাস কথা বলল।

চম্পা বলল, 'তুমি কি ভয় পেয়েছ?'

'ন। আমরা ভয় পাই না।'

'ও!'

চম্পা সেদিন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না।

সেদিন, রাত দুটোর পর চম্পাকে সম্পূরণ পালকীতে তুলল। বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস তা জানতে চাস না।'

চম্পা শুধু বলল, 'বুঢা, তোর যদি ছুরিটুরি বসাবার মতলব থাকে ত বল্! ঘরে গিয়ে বিষ খেয়ে শুয়ে থাকি!'

'চম্পা, ঠাট্টা করিস না!'

'কে ঠাট্টা করছে সম্পূরণ? তোমার কৃতিত্ব ত' এখনো কিছু দেখিনি! শুনেছি তোমার হাতে ছোরাটা ভাল খেলে!'

তারপর পালকীটি যখন শেঠ মগনলালের বাড়ীতে ঢুকল, চম্পা বিস্মিত না হয়ে পারল না। মগনলাল ধনী ব্যবসায়ী। শুধু তাই নয়, ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর প্রচুর খাতির আছে। তাঁর বড় বড় চাল ও আটার আড়ত এবং অন্যান্য ব্যবসা আছে! রেজিমেণ্টের আটা, চাল, ঘি ইত্যাদি সরবরাহ করবার লাইসেন্স আছে তাঁর। বাড়ীতে দোল ও অন্যান্য উৎসবে সাহেবদের নিমন্ত্রণ হয়। মিলিটারী ও সিভিল দুই দলের শ্বেতাঙ্গরাই তাঁকে বন্ধু বলে জানেন। মগনলালের বাড়ীটি বৃহৎ। তিন মহলা বাড়ী। বাইরের বৈঠকখানা মহলে চম্পা কয়েকবার নাচ দেখিয়ে গেছে এবং প্রত্যেকবারই পাঁচশো' এক টাকার তোড়া পেয়েছে। মগনলাল গৌরবর্ণ ও স্থূলকায়, তাঁর পায়ে গোদ আছে। মানুষটি রুক্ষভাষী, দাম্ভিক প্রকৃতির।

তাঁর বাড়ীর ভেতরের ঘরে যাঁরা বসেছিলেন, সকলকে চম্পা চেনে না। তবে চৈৎরাম, জৈৎরাম দু'ভাইকে দেখল। বিঠুরের একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকে দেখল।

সে একপাশে বসল। কিছুক্ষণ বাদে চৈৎরাম বললেন,

'আজিমুল্লা সাহেব, দিল্লীতে মোগল বাদশাহ বলুন, বা এখানে পেশোয়ার হিন্দুরাজ্য হোক, আমরা দুটাতেই খুসী, ম্লেচ্ছদের চেয়ে তা অনেক ভাল হবে।'

এখন চম্পা একপাশে, আলাদা ভাবে বসা, শ্যামবর্ণ সুপুরুষ মানুষটিকে চিনল। আজিমুল্লা কোন কথা বললেন না।

জৈৎরাম বললেন, 'খাজাঞ্চিখানার টাকা এরা সরিয়ে নেবে। আমরা বাজার থেকে সোনা তুলে নিচ্ছি।'

'কোথায় সরাবে টাকা ?'

চম্পাকে সম্পূরণ ইসারা করল। চম্পা বলল, 'খাজাঞ্চিখানার টাকা সম্ভবত পেশোয়ার হাতে দেওয়া হবে। তাঁকে সাহেবেরা বিশ্বাস করেন, অন্ততঃ সাহেবেরা সব খবর রাখেন। সিভিল লাইনের সাহেবরাও ক্যাণ্টনমেণ্টে যাবেন। একসঙ্গে সবাই গেলে সন্দেহ হবে ব'লে যাচ্ছেন না।'

তারপর আরো দু'জন এলেন। তাঁদের চম্পা চেনে। মনে হলো তাঁরা ভারতীয় অফিসার হবেন। রিসালা না সওয়ার, কোন দলের অফিসার তা সে চিনল না।

অনেক কথা হ'ল। যানবাহনের অবস্থা কেমন! নৌকো চলবার মতো জল গঙ্গায় আর বেশীদিন নেই। নৌকো সরিয়ে ফেলতে হবে দরকার হলে। ডাকগাড়ী, এক্কা, টাঙ্গা এবং পালকীরও হিসাব নেওয়া দরকার।

মগনলাল বললেন, 'আমি মনে করি ঐ ট্রেজারীতেই টাকা জমা করা যাবে। কাশী থেকে খবর এলে বুঝতে পারব, কলকাতার ব্যবসায়ীটি আগেকার কথামতো তিন হাজার বন্দুক এবং টোটা দিতে পারবে কিনা! পারবে বলেই মনে হয়। কেননা তার স্ত্রী-পরিবার এখানে। তাদের আটক করতে পারি আমরা সে ভয় তার থাকবে।'

চম্পাকে চৈৎরাম বললেন, 'পরে তোমাকে আমরা পুরস্কার দিতে পারব। অনেক টাকা।'

চম্পা বলল, 'আমি টাকা চাই না।'

সবাই চলে গেলে পরে মগনলালের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। এতক্ষণ কথাটি মনের মধ্যে বিঁধছিল। তিনি তাঁর ভাইপোকে ডাকলেন।

বললেন, 'শোন গুদামের যে সব পচা আটা বিশ বস্তা ফেলে দাও। বাকি ...শ বস্তা পচা আটা নব্বুই বস্তা ভাল আটার সঙ্গে মেশাও। ক্যাণ্টনমেণ্টের ...নিয়াকে সেই মিশাল আটা দেবে।'

'কিন্তু, সে আটা যে বড় গন্ধ…'

'গন্ধ!' মগনলাল এক ধমক মারলেন। বললেন, 'সিপাহীরা সোনারুপো ...য় কি না, তাই আটায় গন্ধ লাগবে!'

আটার ব্যবস্থা করে মগনলাল মেঝেতে ছড়ি ঠুকলেন। একটি চাকর ...কে তাঁর গোদ পা-টি টিপতে লাগল। আর একজন একটা তোলা উনোন ...রে আনল। তাতে আকন্দপাতা, গোবর এবং লবণের কাথ ফুটছে। ... মনম তাঁর পায়ে লেপে সে পট্টি বাঁধতে লাগল। মগনলাল কড়িকাঠের ...কে চেয়ে তন্ময় হলেন। তাঁর পায়ে বেশ আরাম হচ্ছে। পায়ের গোদ, ...-পা না কি সারে না। হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো চীনেমাটির বয়ামে ... ...োঁক ভিজোনো আছে। কাল পায়ে জোঁক লাগাবেন। বাতের ... ...নে নিলে ব্যথাটা আরাম হবে।

...শ বস্তা আটার ব্যবস্থা হল।

এবং কয়েকদিনের মধ্যেই কানপুরের বাজারে সেই পচা আটা ...রো গুজবের জন্ম দিল।

রেজিমেণ্টের বানিয়া মারফৎ বাজার চৌধুরী যখন সেই আটা কিনে নিল, ...দিনে সেই পচা, কালচে, ঈষৎ ভাপসা গন্ধ আটার কেন্নোর মত সুড়সুড়ে ...বং বিশ্রী অসংখ্য গুজব সৃজন করবার ক্ষমতা হয়েছে।

—'সাহেবরা আটাতে জানোয়ারের হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়েছে।'

—এনফিল্ড প্রিচেট রাইফেলের টোটাতে তাহ'লে সত্যিই জানোয়ারের ...র্বি ছিল?'

—'ছিল হে ছিল! নইলে সেই টোটা বাজার থেকে তুলে নিল ওরা, ...সাহেবকে ইস্তাহার পাঠিয়ে জানাতে হল যে টোটায় চর্বি নেই। কেন বুঝতে পারছ না!'

—'বুঝেছি। দোষ ঢাকবার জন্যে ওদের এত চেষ্টা।'

'হায় রাম! টোটা দিয়ে হল না, ত' আটা খাইয়ে জাত মারবি?'

'আটাতে জল দিয়েই আমি বুঝেছি এর মধ্যে কোন গোলমাল আছে!'

সবাই একে একে সে সব কথা শুনল।

মগনলাল ছু'পায়ে জোঁক লাগিয়ে খুব গম্ভীরভাবে সব শুনেটুনে একটি রাজপুত অফিসারকে বললেন, 'কি আর বলব বলুন, যে রক্ষক, সে-ই ভক্ষক।'

বাইশ

কানপুর থেকে যখন বেরোন ভবানী, তখন তাঁর মনটা বড় অশান্ত ছিল। এলাহাবাদ থেকে নৌকো নিয়ে কাশী চললেন তিনি। গঙ্গার ছু'পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁর মন একটি নিরাসক্ত প্রশান্তিতে ভ'রে উঠল। যেদিন বাংলাদেশ ছেড়ে গয়াতে গিয়েছিলেন, সেদিন বাংলাদেশের জন্যে বড় মন কেমন করত। মনে হতো সেই শ্যামল, সেই কোমল যেন আর কোথাও নেই। তারপর ধীরে ধীরে বিহার ও উত্তরভারতের প্রকৃতির ধূলিসাজ, বৈরাগী বসন তাঁর ভাল লেগে গেল।

এখন গঙ্গার ছু'পাশে ক্ষেতে-ক্ষেতে চৈতালী ফসল। কলাই, লঙ্কা, যব এবং অড়হর। মাঝিরা সারাদিনমান দাঁড় টানে। নৌকোর গায়ে, যেখানে দাঁড়টি বাঁধা, সেখানে একঘেয়ে, একটানা ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ হয়। সেই শব্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আকাশে চিল ডাকে। দূরে—অনেক দূরে চাষীরা কুয়ো থেকে, পানচাক্কিতে জল তোলে, তার শব্দ শোনা যায়। এই সব ক্যাঁ কোঁ, একটানা একঘেয়ে শব্দের মধ্যে এক করুণ ঔদাস্য, কি বিশ্রান্তি, কি চিরন্তনতা আছে। মাঝে মাঝে, কচিৎ, ডাকহরকরা ঝুমঝুম করে বর্শার আগে ঘুঙুর বেঁধে ডাক নিয়ে চলে যায়। ডাকগাড়ীতে ডাক পৌঁছে দিলেই তার ছুটি। সন্ধ্যা নামে। দিগন্ত লীন, প্রান্তরব্যাপী বিষণ্ণ, বৃহৎ ও উদাস সন্ধ্যা। কখনো গরুর গাড়ী চ'ড়ে ছোট বউ শ্বশুরবাড়ী যায়। নৌকোর দিকে, যাত্রীদের দিকে সে অবাক হয়ে তাকায়। নৌকোয় মাঝিরা উনোন ধরিয়ে ডাল ভাত রান্না করে। তারা যে-সব গল্প করে শুনে ভবানীর যেন কেমন লাগে।

অনেক খবর শোনা যায়। ছেদীরামের চাচী এতদিনে মারা গেল। মারা যাবার আগে সে পেয়ারা খেতে চেয়েছিল। রামভরোসে-র গাইটা তা হ'লে পরমী কিনল। পরমীর অনেক টাকা হয়েছে। সে রোজ মিছরী দিয়ে জল খায়। এবার প্রথম মাঝিটির গাছে খুব আমের গুটি এসেছে। আম হবে কি না কে জানে। যে গরম পড়ছে। গরমে না কি প্রথম মাঝির

আমাদের গাঁয়ে কাক আর বাদুড় চক্কর খেয়ে পড়ে মরে যাচ্ছে। বৃষ্টি না হলে আমের বোঁটা শক্ত হবে না বলে মুশকিল। ঐ গাছটি জমা দিয়ে টাকা নিয়ে তবে সে মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়ী থেকে আনবে বলে স্থির করেছে।

কি সরল, কি নিরীহ আর স্বল্পে তুষ্ট এ সব মানুষ। এদের জীবনের সুখ দুঃখ বলতে গেলে ভাগ্যের হাতে সমর্পিত। এ সনে গাছে আম হয়েছে। যদি জল হয় তবে আম গাছে থাকবে। যদি আম থাকে, তবে পাইকার গাছ জমা নেবে। দেড় বা দু' টাকা দেবে, এবং তা হ'লেই মেয়েটিকে এনে ও সুখী হতে পারবে।

ওদের সুখ। মেয়েটিকে হয়তো একটু দই, একটু আচার এনে খাওয়াবে। মেয়েটি ঘোমটা ফেলে ক'দিন ল্যাংটো ভাইটাকে কোলে নিয়ে এ-বাড়ী ও-বাড়ী বেড়াবে। তারপর শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় হলে বাবা একটা শাড়ী কিনে দিবে। বলবে, 'গওনার সময়ে রুপোর চুড়ি দেব বলেছিলাম মা, এখনো দিতে পারিনি। তোর শাশুড়ীকে বলিস আষাঢ় শ্রাবণে নদীতে জল বাড়বে। নৌকো চালিয়ে আমি টাকা আনব। তোকে চুড়ি দেবই দেব।'

ভবানী ভাবেন, ইণ্ডিয়ার ভাল করবার জন্যে ওরা রেলপথ বসাচ্ছে। ডাকঘর বসাচ্ছে, আদালত বসাচ্ছে। ইণ্ডিয়া বড় প্রাচীন, বড় স্থবির। এ দেশে ওরা গতি আনতে চায়। কোন্ ভারতবর্ষের কথা ওরা ভাবে? আসল ভারতবর্ষ ত' এদের নিয়ে। বড় বড় শহরের সঙ্গে এদের কোন যোগাযোগই নেই। এদের জীবনে গতি নেই, বেগ নেই, বড় বড় চিন্তা নেই। এরা সারা দিনমান খেটে দিনান্তে একটু ভগবানের গান করতে পেলেই খুশী। দু'বেলা নয়, এক বেলা পেট ভরে খেতে পেলেই এদের সব স্বপ্ন সার্থক। দিল্লী থেকে কবে সিংহাসন চলে গেল কলকাতা, তৈমুর বংশীয়দের শ্লথ হাতের রাজদণ্ড কবে বিদেশীরা নিয়ে নিল, এরা সে সব কথা ভাবে না, জানে না।

দূরে শিবালয়ে ঘণ্টা বাজে। আরতির বাজনা শোনা যায়। কোথাও বা শ্মশানে ধিকিধিকি চিতা জ্বলে। অনেক রাতে শ্মশানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মাঝিরা বলে, 'রামনাম করুন হুজুর!'

ওরা বলে ঐ সব শ্মশানে নাকি অনেক রাতে মুখে আগুন নিয়ে

প্রেতিনীরা ছোটাছুটি করে। তারা কাঁদে আর বলে, 'জলে মরেছি, স্বামী পাইনি। জলে মরেছি, স্বামী পাইনি!'

চন্দন স্থির হয়ে দেখে।

সে গম্ভীর, অন্যমনস্ক। ভবানী দেখেছেন সে কথাবার্তা বলতে চায় না। কিছুতেই না।

ভবানীর হেম পিসিমার কথা মনে পড়ে। হেমশশী তাঁর জ্ঞাতি পিসীমা। তাঁর মা-র সখী এবং সহচরী।

সেবার সতীদাহ বন্ধ হবার কথা শোনা যাচ্ছে। সে ১৮২৮ সাল। অবশ্য সেবার নয়! তার এক বছর বাদে বন্ধ হলো সতীদাহ। সে সময়ে তাঁদের গ্রাম, আর কাছাকাছি গরিফা, হালিশহরে না কি বড্ড সতীদাহ হতো। তাঁর জ্যাঠামশাইকে একজন কলকাতা থেকে 'সমাচার দর্পণ' এনে প'ড়ে শোনায়। তাতে সে কথার উল্লেখ ছিল। জ্যাঠামশায় রেগে বলতেন, 'কলকাতার কাগজ-ছাপা-বাবুরা দেশধর্ম উচ্ছয়ে দিচ্ছেন। কে খবর পাঠালে? আমাদের নবীনচন্দ্র বুঝি?'

ভবানীর তখন চার বছর বয়েস। পিসীমার আঠারো হবে। কুলীনের মেয়ে, কুলীনের বৌ। ফুলে মেল, নৈকষ্যকুলীন বাঁড়ুজ্জে মহাশয় একটি চাকর ও একটি নাপিত নিয়ে মাঘ ফাল্গুন মাসে বিয়ে করতে বেরুতেন। নাপিতটি একদিনের পথ এগিয়ে গিয়ে সম্বন্ধ ঠিক করতো। বাঁড়ুজ্জে মহাশয় হাটের চালাঘরে বিশ্রাম করতেন এবং নতুন হাঁড়িতে মুগের ডালভাতে সেদ্ধ ক'রে কলাপাতায় ঢেলে খেতেন। খবর পেলে গিয়ে পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে বিয়ে করতেন। তিনি সবশুদ্ধ উনিশটি বিয়ে করেন। হেমশশী বোধ হয় একাদশতমা কিংবা দ্বাদশতমা হবেন। একশো একাশী সিক্কা টাকা, চার জোড়া ধুতি চাদর, আংটি এবং সোনার পৈতের বিনিময়ে তিনি হেমকে বিয়ে করেন। ভবানীর জ্যাঠামশাই তাঁকে জমি দিয়ে স্বগ্রামে বসত করাতে চেয়েছিলেন। তিনি রাজী হননি। বিয়ের পরে তিনি হেমের কাছে একবারও আসেননি। হেমও কিছু মনে করেননি। তিনি জানতেন কুলীনের মেয়ের এই হয়। সকলের বিয়েও হয় না। আর বিয়ের কথা বলতে মনে পড়তো একটা জাম রঙের নতুন চেলীর গন্ধ, আর একজনের খাওয়া এঁটো নতুন কাঁসার থালায় ভাত মাছ খাওয়ার অস্বস্তিকর স্মৃতি।

হেমশশীর দেহটা বেড়েছিল, কিন্তু তাঁকে ঘিরে একটি বালিকার শুচিতা

বিরাজ করত। বাড়ীতেও বোধ হয় সবাই ভুলে গিয়েছিল তাঁর বয়স হচ্ছে। সবাই তাঁকে ছোট মেয়েদের সমান ক'রেই দেখত। বিবাহিতা মেয়ে হিসেবে সধবার মাঙ্গলিক কিছু কিছু করতেন তিনি। বিয়ের বরণডালার জন্যে আতপ চাল বেঁটে তাকে রাঙিয়ে 'শ্রী' গড়তেন। বিয়ের কনের চুল বেঁধে দিতেন। তিনি অনেক গুছির বিনুনী বেঁধে খোঁপা করতে জানতেন।

কালীসরের নৈকষ্য কুলীন বাঁড়ুজ্জেমশাই ১৮২৮ সালে দেহ রাখেন। দুখন হাটুরে সংবাদ নিয়ে আসে 'কর্তাবাবু গো, হেমদিদিরে দে' হাঁড়ি ফ্যালান, ঘাটে নে' যান। কালীসরের জামাইদাদা দেহ রেখেছে।'

তখন জ্যাঠামশাই খবর নেন, কালীসরে ধুমধাম ক'রে তিনজন পত্নীসহ চিতায় উঠছেন বাঁড়ুজ্জেমশাই। তিনি স্থির করেন মহাধুমধামে হেমশশীকে 'সতী' করাবেন। একনিমেষে সামান্য হেমশশী অসামান্য হলেন।

ঢাকীরা ঢাকে ঘা দিচ্ছে, লোক ছুটে ছুটে আসছে। বাড়ীর দাসীরা হলুদ বাটছে। মেয়েরা তেল হলুদ আনছেন। জরের ছেলেটি রোগা মেয়েটি সবাইকে টেনে টেনে আনছেন।

অন্ধ উন্মত্ততার সে কি ভয়ঙ্কর নেশা ধরানো চেহারা! ভেতরের দালান ধূপধুনোয় অন্ধকার। হেমশশীর যে শরীরটা এতদিন কেউ দেখেনি, সেই শরীরটার আর আব্রু রইল না। নতুন কাপড় যেমন তেমন ক'রে জড়ানো। যে পারছে মাথায় থাবড়ে থাবড়ে সিঁদুর দিচ্ছে। লালটকটকে সিঁদুর পরাচ্ছে। মানতার পাতা ভিজিয়ে আলতাগোলা জল পায়ে ঢেলে দিচ্ছে সবাই। হেমশশীর দুই চোখ অপ্রকৃতিস্থ। মাঝে মাঝে তিনি কি বলতে চাইছেন, উঠতে চাইছেন পিঁড়ি থেকে। কে এসে হাতে আমের ডাল বেঁধে দিল। কারা যেন তাঁর পায়ে মাথা ঠুকছে, ছেলের মাথা তাঁর শরীরে ছুঁইয়ে নিচ্ছে।

জ্যাঠামশাই বাইরে বসে লিখছেন, পুরুতঠাকুর চ্যাঁচাচ্ছেন 'ঘৃত তিন টাকা, ওড়ন পাড়ন বস্ত্র এক টাকা, সতীবস্ত্র আড়াই টাকা, কাঠ, পুরোহিত, চাল, সুপারি, মিষ্টান্ন...'

জ্যাঠামশাই হাঁকছেন 'বাড়ী থেকে ঘি, মিষ্টান্ন, চাল, হলুদ, নারকেল, সুপারি, ফুল, কর্পূর চন্দন যাবে। ওরে, পরামানিককে খবর দে! বাজারে মথুর সা-র আড়তে যা কেউ, পাঁচটা টাকা আধলা ক'রে আন, দান হবে। দান হবে, ওরে হাড়ি কাওরাদের খবর দে! নাপিতকে বলিস রাঙাকড় আনতে। অমনি চারজোড়া তেলধুতি আনিস, ঢাকীরা পাবে।'

ভবানীর মনে পড়ে জ্যাঠামশাই হেমশশীকে পালকীতে তুলছেন, বলছেন, 'তোর নামে মঠ দেব, মঠ দেব আমি। পঞ্চাশটাকা খরচ করে মঠ দেব, ওরে জামাইয়ের চাদরটা এনে দে না কেউ, ওর যে চাদর কোলে রাখতে হয়।'

ভয়ঙ্কর স্মৃতি। অদ্ভুত সন্ধ্যা।

সে সন্ধ্যায় বাড়ীতে লোকজন থাকে না। সবাই শ্মশান ঘাটে যায়। সে সন্ধ্যায় একটি সাতবছরের ছেলে খালি মা-কে খোঁজে। দেখে মা উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে। সাড়া দিচ্ছেন না। বারান্দাময় শুধু সিঁদুর, আলতা, কড়ি, চাল, খই ছড়াছড়ি, ছড়াছড়ি।

পরে, অনেকপরে ভবানী জেনেছিলেন। থানা থেকে কর্মচারীটি এসেছিলেন। এসে জ্যাঠামশাইকে সনাতন ধর্মরক্ষায় এমন সচেষ্ট জেনে ভূয়সী সাধুবাদ ক'রে যান। তিনি রিপোর্ট দেন হাসতে হাসতে সানন্দে হেমশশী, স্বামীর চাদর কোলে, ঊনবিংশ বর্ষীয়া বিধবা···ইত্যাদি।

ভবানীর এখন মনে হয়, হেমশশী কেমন ক'রে যেন জীবনের বঞ্চনাটুকু, তাঁকে নিয়ে ভাগ্যের পরম পরিহাসটুকু ব্রিজদুলারীর মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন। হেমশশী, তাঁর মা, এঁদের জীবনের দুঃখ তিনি জেনেছিলেন বলেই যেন আর একজনকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি কি ভেবেছিলেন, তাকে জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলে তাঁর মন শান্তি পাবে? কেউ কি কাউকে মুক্তি দিতে পারে? বিদ্যাসাগর বলতেন, 'যে যার নিজের ভেতর থেকে যদি জড়তার বন্ধন কাটাবার প্রেরণা আহরণ না করে, অপরে তাকে সাহায্য করতে পারে না।'

সত্যিই তাই। যে মুক্ত হতে চায় না তাকে কে মুক্তি দিতে পারে? সে আবার বন্ধনে, দাসত্বে, বন্দিত্বে ফিরে যাবে।

তারপর কাশী কাছে এল। অর্ধচন্দ্রাকৃতি সেই গঙ্গা দেখে চোখ যেন ধন্য হয়। এক অঞ্জলি জল তুলে মাথায় দিলেন ভবানী। চন্দন দেখতে লাগল ওপারে ধূ ধূ বালুচর, এপারে মন্দির, ঘাট, প্রাসাদের পর প্রাসাদ। সে শুনতে লাগল মাঝিরা বলছে, 'ঐ হরিশঘাট। হরিশচন্দ্রের সোনাদানা নিয়ে কালুডোম কি ধনী-ই হলো! ঐ কেদারঘাট। এ-ই চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট আর ঐ যে পেশোয়া প্রাসাদ!

দশাশ্বমেধ ঘাটে কত বড় বড় ছাতা। ঘাটের দু'পাশে জলের নীচে যে ।ব শিবমন্দির জলে ঢাকা ছিল, এখন সেগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। গঙ্গা ।তদিন মহাদেবকে গেরুয়া মাটিতে সাজিয়ে ছিলেন। এখন ঘাটপূজারী ছাই নৌকো নিয়ে সেখানে ফুল বেলপাতা আর কোষা ভরা জল ছিটিয়ে দিতে দিতে চলেছে।

ঘাটপাণ্ডারা ছাতার নিচে বসে আছেন। স্নানার্থীরা একটি আধলা, ।ড়ি বা তামার পয়সা সামনে রেখে তাঁর কাছ থেকে তেল নিচ্ছেন। কেউ । জলে নামতে নামতে চেঁচিয়ে গঙ্গাস্তোত্র আওড়াচ্ছেন। একজন প্রৌঢ় ।র সঙ্গীকে বলছেন, 'ওহে, বেগুন এখন ওঠে না। তুমি দুটোমাস থেকে যাও, মহাশয়কে আম পাঠাতে পারব।'

ভবানী অনেকদিন বাদে অনেক বাঙ্গালীর কথাবার্তা একসঙ্গে শুনছেন। ।ক বিধবা অপরকে বলছেন, 'মটর ডাল চড়ালে'

'চড়ালুম।'

'তাতে নুন লঙ্কা দিলে'

'দিলুম'

'তারপর ডালটি বেশ সেদ্ধ হলো, অথচ ফাটফাট হলো না, তখন ।ন, চেরা লঙ্কা গুটিকত দিয়ে ঘি ছড়িয়ে নাবিয়ে নিলে, বেশ নেড়ে নিও, নেড়ে নিও।'

গলার স্বরটি এমন শোনাল, বিধবাটি যেন নেড়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। তারপর তিনি বুকের কাপড়ের মধ্যে হাত রেখে দ্রুত মাটির শিব ।ড়তে গড়তে বললেন, "তোমার বৌ যদি বলে, মা ঘি কেন, বলো ঘি ।ড়া ডাল আমরা খাই না। কথায় বলে, 'ঘৃত ছাড়া ডাল, আর ।াঁছাড়া গাল।'

নিমেষে হাতের কৌশলে শিব গড়ে পূজো ক'রে তিনি শিবসহ ডুব ।লেন। ডুব দিয়ে মাথা তুলেই তিনি রোষ কষায়িত গলায় একটি বৌকে ।ললেন, 'হ্যাঁগা, চুল ঝাড়ছ কেন গা? চুলের জল দিচ্ছ কেন?'

মহিলাকে দেখে ভবানীর কৌতুক বোধ হ'ল।

ভবানী ও চন্দন দশাশ্বমেধ ঘাটের পাশে ঢালু মাটিতে নৌকা বাঁধলেন। ।খনি ঘাটের সকলে নদীর দিকে চেয়ে নমস্কার করতে লাগল। তাঁরা দেখলেন গঙ্গার ঐ প্রান্ত দিয়ে এক বিশালকায় পুরুষ ভেসে চলেছেন।

সকলে বলতে লাগল, নমস্কার করুন, নমস্কার করুন। উনি তৈলঙ্গস্বামী, সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বরের অবতার।

ভবানীর দাদা হরিলাল বাবু এসেছিলেন। তিনি সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁদের নিয়ে চললেন। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই তাঁর বাড়ী। তিনি আবগারী বিভাগের কেরাণী। তামাক ব্যবসায়ীদের কল্যাণে উপার্জন ভালই হয়। মানুষটি হাসিখুসী। সংসারে ডুবে থাকতে ভালবাসেন। ভবানীর মনে পড়ল তাঁর বৌঠান যখন বলেন, 'ওগো পাঁচসের গুড় এনো', তখন তাঁর দাদা বলেন, 'আঃ, জ্বালালে দেখছি তোমরা। বলি একবারে বলতে কি হয়।' কিন্তু একবারে সব জিনিস আনতে তিনি ভালবাসেন না। বারবার যাওয়া-আসা করতে চান। দোকানদার, হাটুরে, সকলের সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি ভবানীকে বললেন:

'দুটো ঘর সাফ করিয়ে রেখেছি। তা, হাবিলদারজীর অসুবিধে হবে না।'

চন্দন হেসে বলল, 'আমি হাবিলদার নই।'

'আহা হতে কতক্ষণ, হতে কতক্ষণ' বলে তিনি চন্দনের সঙ্গে গল্প শুরু করলেন, এবং পাঁচমিনিট পরেই বলতে লাগলেন চন্দনের কপালে তিনি আশ্চর্য সব শুভলক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন। এ ছেলের খুব উন্নতি হবে।

হাত মুখ ধোয়ার পর তিনি প্রচুর জলখাবার সামনে রেখে বলতে লাগলেন, 'ওটুকু খাও ভাই। ওযে পানফলের জিলিপি, হ্যাঁ গো, তোমরা যাকে সিঙাড়া বল। লুচি ক'খানা খাও। আমার গিন্নীর নিজে হাতে করা ক্ষীরটুকু!' চন্দন স্বল্প পরিচয়েই মানুষটিকে চিনে ফেলল।

জলপানের পর চন্দন বিদায় নিল। বলল, 'ডাক্তার সাহেব, আমি চলি। আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাব।'

ভবানী বাড়ীর ভেতরে গেলেন।

হরিলালের স্ত্রী, তাঁর এই বৌঠানটি শ্যামবর্ণ, দোহারা। তাঁর কানে চারটি ক'রে মাকড়ি, গলায় সোনার বিছে, হাতে জশম ও চুড়ি, নাকে ফুল। গুল ও মিশি দেবার অভ্যাসে দাঁত কালো, তবু হাসিটি মিষ্টি। চারটি ছেলে-মেয়ে হয়ে তিনি গিন্নী হয়েছেন, এবং এখন ভবানীর সঙ্গে কথা কন। এখানে শাশুড়ী ননদ নেই। আগে ভবানীর সঙ্গে পারতপক্ষে কথা কইতেন না।

ভবানী স্নান করে এলে পরে তিনি জলখাবারের থালা সাজিয়ে দিয়ে নিজে সামনে বসলেন। পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'কতদিন সন্নিসী হয়ে থাকবেন? এবার সংসার করুন।'

'এই বয়সে বৌঠান?'

'হ্যাঁ, কুলীন বামুনের ঘরে তেত্রিশ বছর কি একটা বয়স? এই চাটুজ্জেদের ঘরেই ভাল মেয়ে আছে, বলেন ত' সম্বন্ধ করি।'

একটু হেসে ভবানী বললেন, 'অন্য কথা বলুন। অন্দরে অনেক কথাবার্তা শুনছি। কোন কাজকর্ম আছে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

ঘাড়টি কাত করে বৌঠান একটু হাসলেন। বললেন, 'কালীপুজো আছে না এবার? এ বছর উনি চারবার পুজো করবেন যে! পরশু ভাল দিন। তাই মেয়েরা এসেছেন।'

হঠাৎ গলাটা একটু নামিয়ে তিনি বললেন, 'একটা কথা কইব ঠাকুরপো?'

ভবানী মুখ তুললেন। বৌঠান গলা নামিয়ে বললেন, 'আমার ভাইটি এসেছে। নারাণ। আপনার দাদা ত গা করেন না, দেবেন ওকে একটা কাজে ঢুকিয়ে?'

'দেখব। এখন ত' ক'দিন আছি।'

ভবানী ঘরে গিয়ে বসলেন। বৌঠান তাঁকে মশলা দিলেন। ভবানী বললেন, 'দাদা গেলেন কোথায়? আপিস?'

'না। কাজে আজ দেরি ক'রে বেরুবেন। আপনার জন্যে মাছ আনতে গেছেন। জানেন ত মানুষটিকে। বাজারে সবাইকে বুঝি বলে এসেছেন রকমরকম মাছ আনতে।'

'না, না, এ ভারি অন্যায়'—ভবানী বিব্রত হলেন। বৌঠান হেসে বললেন, 'কতদিন পরে, তা একটু খাওয়াতে মাখাতে সখ হয় না? আর ঘরে বৌ না থাকলে হয় ঠাকুরপো? কে খাওয়ায়, কে শরীর দেখে বলুন?'

তিনি কর্মান্তরে গেলেন।

ভবানী শুনতে লাগলেন বৌঠান ছোট ছেলেটিকে বললেন, 'দেব বাবা, মুড়কি দেব বই কি? আগে বামুনদি'কে একটু বলে দিই। বামুনদিদি যে ঘর থেকে নাড়ু আনবে, মোয়া আনবে। পুজো হবে যে ধন!'

ভবানীর শুনতে ভাল লাগল। শুনতে অনভ্যস্ত, তবু এসব কথা

ভালো লাগে। একটু পরেই তাঁর দাদা শোরগোল তুলে প্রবেশ করলেন, 'চিতল এনেছি, বাটা এনেছি, রুই মাছটা চারসের হবে। সরপুঁটি বেশী পেলাম না।'

তারপর পিরাণ খুলে পাখার বাতাস খেতে খেতে ঢুকলেন। ভবানী হাসিমুখে চাইলেন। হরিলাল বলতে শুরু করলেন, 'দেখরে ভাই, সংসারী মানুষের সুখ দেখ। সংসার বড় বন্ধন রে ভাই, বড় বন্ধন!' তাঁর নানাবিধ জ্বালা সম্পর্কে সব তথ্য জানালেন হরিলাল, একটি ইংরেজি চিঠি গুছিয়ে লিখে দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। বৌ বিষয়ে বললেন, 'মেয়েছেলে কিছুই বোঝে না, খালি হৈ-চৈ ক'রে খরচ করে।' এবং তারপরই 'চল বাপ, কাকার জন্য রাবড়ী নিয়ে আসি' বলে তৈলাক্ত পিরাণটি পরে ছেলেকে কাঁধে নিয়ে বেরুলেন।

খাওয়াদাওয়া মিটতে মিটতে তিনটে বাজল। বামুনমেয়ের সঙ্গে বসে বৌঠান অনেক রান্না করেছেন। তিনি মাথার দোহাই দিতে লাগলেন, 'ঠাকুরপো মোচাঘণ্টটুকু খান। মাছভাজা ত মোটে চারখানা। না না, চিতল মাছের ঝাল কালিয়া খেতেই হবে। বাটা মাছের ঝোল তবে ভাল হয়নি? মৌরী বেটে না দিলে হয় না। সরপুঁটি ত তেলঝাল ঠাকুরপো। বেশ তবে রুইমাছের পোলোয়া খান। কেন ভাল হয়নি? মাছের পোলোয়া নতুন শিখেছি যে।'

এ ধরনের আদরযত্নে অনভ্যস্ত ভবানীশঙ্কর কোনমতে খেয়ে উঠলেন। তারপর তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে বিশ্রাম করতে গেলেন। অন্তঃপুরে কোলাহল এবং কথাবার্তা তাঁর কানে আসছে। হুমরো, আগ বাঢো, পিছ সামাল, হুমরো—করতে করতে পালকী আসছে। মেয়েরা আসছেন। কারুকে বৌঠান বলছেন, 'হ্যাঁ ভাই ডালিমফুল, এমন বেলা গড়িয়ে আসতে হয়?' কেউ বা বলছেন, 'কি করি বউ। কর্তাটি ভাত খেয়েই ইসবগুলের শরবত খান জানত? বৌদের কাজ যে পছন্দ হয় না ভাই!' মেয়েরা পান সুপারি খাচ্ছেন। কেউ কাঠের আঁচে ডাল ভাজছেন। বৌ-রা আলতাপরা পা ঢেকে বসে সুপুরি কুচোচ্ছেন। বিখ্যাত সারদামিত্তির অন্নদামিত্তিরের মা এসেছেন। তিনি পিঁড়েতে বসে পান খাচ্ছেন আর অভ্যাসবশতঃ উপদেশ দিচ্ছেন।

তাঁর ছেলেরা কেউকেটা মানুষ।

সেইদিনই সরকারকে জমি দিয়েছেন সরকারী রাস্তার জন্য। বাঙালীদের নে এনে কমিসারিয়েটে চাকরি দেন তাঁরা। দু'জনের তিনটি ক'রে ছ'টি হিণী। মা-কে বড ভক্তি করেন। নিত্য সোনার বাটিতে মা বাবার াদোদক খান আর বলেন, 'আমাদের সব কিছুর মূলে এঁরা দু'জন। 'রাই আমাদের বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা।'

মিত্রগৃহিণী মানুষটি কালোকোলো। পাকাচুলে সিঁদুর পরেন। ঢাকাই ফরাসডাঙ্গা ভিন্ন সূতীর শাড়ী পরেন না। চাদরটি দাসী হাতে য়ে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে আলতা, পায়ের আঙুলে রূপোর চুটকি। তে গোখরা চুড়ি, বাউটি, অনন্ত। গলায় মেমচেন ও মুড়কিমালা। নে চারটি ক'রে মাকড়ি এবং সেই সঙ্গে টানা দেওয়া হীরের নথ নাকে। নুষটি দাম্ভিক।

তবে পরোপকারী এবং মিশুকে। পূজা-পার্বণ, বিয়ে, অন্নপ্রাশন, তে ইত্যাদির আচারনিয়ম তিনি জানেন। কাশীতে কারু বাড়ীতে াজকর্ম হলে গিয়ে সব করে-কর্মিয়ে দেন। গুরুমন্ত্র নিয়েছেন বলে রু বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করেন না। জল ও পান নেন মাত্র। এখন তিনি রিলালের স্ত্রীকে ডাকলেন। বললেন, 'সর্বজয়া চতুর্কালী পূজা বড সোজা া নয়। একটু ত্রুটি হলে দোষ অর্সাবে। তোমাদের পুরুতঠাকুর জানেন না। এ পূজায় সর্বৌষধি ষডঙ্গ ধূপ, ষোড়শাঙ্গ ধূপ দুই-ই চাই। শ কান্দী আচার্যানী-র কাছে সব লেখা আছে। তিনি লিখতে জানেন, র খাতাটি চেয়ে নিয়ে হরিলালকে দিও। ওগো মেয়ে, ধূপ, গুগ্‌গুল, লাক, তেজপাতা, বালা, শ্বেতচন্দন, অগুরু, কুড, গুড, ধুনো, মুথা, রতকী, লাক্ষা, জটামাংসী, শৈলেয় আর নখী—এই ষোলটি ষোড়শাঙ্গ প চাই। রক্তপদ্ম, রক্তজবা, কৃষ্ণ অপরাজিতা, রক্তকরবী আর দ্রোণফুল এই পাঁচটি ফুল চাই।'

'দিদি আপনার মতো জ্ঞান আর কার আছে?'

'ওগো, জামাই যখন কালেক্টরীতে নাজির হলেন, আমার ছেলেরা দৈবী লীপূজা করেন। শাশুড়ী তারাপীঠ থেকে পুরোহিত আনান। লকেতার স্যাকরারা আসল নবরত্ন আনে। মুর্শিদাবাদ থেকে খাগড়ার সন আসে। আমাদের ভদ্রাসন রামকেষ্টপুর থেকে পূজার ফর্দ আসে।

ষোলটি বলি পড়ে, জানলে? আজকাল আর কেউ তেমন নিষ্ঠায় কাজকর্ম করে না গো!'

তাঁর পালকী এল।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দেখ সর্বজয়া বউ, আমি শুধু পূজা দেখে চলে যাব। আমার মেয়ে, ভাগ্নে, বৌ তারা বসে খাবে। মন্ত্র নেবার পর থেকে বাইরে খেতে পারি না মা।'

'সকাল সকাল আসবেন ত?'

'এই দেখ। এ আমার পাগল মেয়ে। হ্যাঁ মা, কর্তা আর ছেলেদের ত' জান না। বউরা এসেছেন, তবু রোজ আমার হাতের দুটি একটি তরকারী নৈলে ছেলেরা আহার করেন না। ওগো সংসারের ভারটি বড় জেয়াদা; আত্মীয় পরিজনে বাড়ীর মানুষ এবেলা একশো, ওবেলা একশো জন আহার করেন। দাসীরা ছেলে দেখে, বৌমা-রা পাকশালে থাকেন। বামুনদিদি দু'জন শুধু ভাত ডাল নামান গো! আমাকে সংসারের সকল দায় বইতে হয়। আমি সারাদিন না-ই থাকলাম, আমার আচার্যানীকে পাঠিয়ে দেব। মুক্তোঠাকরুন সবই জানেন। তোমরা ত একালের 'কেশো' বামুনদের মতো নও, তোমাদের নিয়মনিষ্ঠা আছে, পূজা ভালই হবে।'

তিনি চলে গেলেন।

তখন মেয়েরা সহজ হলেন। একজন গিন্নী ফাঁদি নথ নেড়ে বললেন 'ঠাণ্ডা হলো বাপু। টাকার গরমে গরম যেন বেড়ে গিয়েছিল।'

একটি বছর চোদ্দর মেয়ে, তার কপালে সিঁদুর, কোলে ছেলে। অতএব সে বড়দের সঙ্গে সব কথা বলবার অধিকার পেয়েছে, এই ভাব দেখিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কি কালো, কি কালো! টাকায় কি করে, ঘরে যে কালোজিরের ক্ষেত গা!'

আরেকজন বললেন, 'ওগো, টাকার জৈল্লা বড় জেল্লা! কুচ্ছিতরে সুন্দর করে!'

আর একজন বললেন, 'ওগো, আমার ছেলেরাও পালপার্বণে পঞ্চাশটি বামুনকে রুপোর বাসনে খাওয়ায়, আমরা গরম দেখাতে জানিনি বাবু!'

হরিলালের স্ত্রী সকলকেই মিষ্টিকথায় তুষ্ট করতে লাগলেন।

ভবানীর কানে কথাগুলি গেল, এবং তার আমোদ বোধ হল। বৌঠানের নাম কি সর্বজয়া? না ত! তাঁর মনে পড়ল বৌঠানের নাম সর্ব-

ন্দরী। বোধ হয় মিত্রগৃহিণীর শ্বশুরবাড়ীর কোন গুরুজনের নাম সুন্দর বা ন্দেরলাল কিছু একটা হবে। তাই মিত্রগৃহিণী নামটিকে ভেঙে চুরে বদলে নিয়েছেন।

বেনারস সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের বড় ভয়। রাজা এবং বাদশা, যাঁদের গদাচ্যুত করা হয়েছে, তাঁদের কতজনের আত্মীয়-স্বজন কাশীধামে বসবাস করছেন, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

দিল্লীর বাদশাহের দূরসম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন, পেশোয়ার ভাই চিমনাজী ঘরের লোকজন—এঁদের কথা ভাবছিলেন ক্যানিং। চৈৎসিংকে হেস্টিংস অপমান করেন। চৈৎসিং কবে মরে গেছেন, কিন্তু তাঁর বংশের কেউ কেউ আছেন।

ক্যানিংয়ের মনে হয়েছিল ঐ সব মানুষ কটি যেন এক-একটি বিপদজনক বারুদের বস্তা। যে-কোন সময়ে জ্বলে উঠলেই হল।

নিজের আশঙ্কা প্রকাশ করতে পারছিলেন না বটে, কিন্তু ক্যানিং মনে মনে ভূত দেখছিলেন। হ্যাঁ। কাউন্সিলের মিটিং বসছিল। ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে বাজনা বাজছিল। স্ট্যাণ্ড ধ'রে বড় ল্যাণ্ডো চ'ড়ে বেড়ানো হচ্ছিল। মস্ত টেবিলে রূপোর বাসনে অনেক কোর্সে ডিনার খাওয়া হচ্ছিল। টানা পাখা চলছিল, স্নানের পর মাথায় গোলাপজল দেওয়া চলছিল। বাইরে যা যা দরকার সবই করছিলেন ক্যানিং, কিন্তু মনে মনে ভূত দেখছিলেন। এমনকি টেরিটি বাজারে একজন ফল ব্যবসায়ী মুসলমান বাজি ও পটকা পুড়িয়ে, আলো সাজিয়ে ছেলের বিয়ের শোভাযাত্রা করেছেন শুনেই তাঁর মাথা গরম হয়। বাজি, পটকা, দুমদাম শব্দ, অনেক জন একসঙ্গে জমায়েৎ, বহরমপুর, বারাকপুর এবং হাজার হাজার উড়ো গুজব এই সব কিছু একসঙ্গে তাঁর মনে পড়ে।

তাঁকে অনেক ভাবনা ভাবতে হচ্ছিল। বেনারস, হ্যাঁ, বেনারস হিন্দুদের ধর্মস্থান, মুসলমানদের প্রিয় শহর, ভারতের প্রাচীনতম নগরী সম্পর্কে তাঁর মন খুব সতর্ক ছিল। তবে শুধু খবরাখবর নিয়ে এবং বেনারসের ইংরেজ সিভিল ও মিলিটারী অফিসারদের ওপর নির্ভর করেই নিশ্চিন্ত থাকতে হচ্ছিল তাঁকে।

জজ সাহেব গাবিন্স, কালেক্টর লিণ্ড্, কমিশনার টাকার এঁরা যোগ্য এবং অভিজ্ঞ।

37th বেঙ্গল নেটিভ ইন্‌ফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট-এর ভারপ্রাপ্ত অফিসার ব্রিগেডিআর পন্‌সন্‌বি দুঃসাহসী ও নির্ভীক। তবে কূটনীতি বোঝেন না। একটু মোটাবুদ্ধির মানুষ।

তিনি কিছুই বোঝেন নি। কিছুই ধরতে পারেন নি। এমনকি তাঁর সুবাদার নিহাল সিংকেও না। তাঁকে বিশ্বাস করতেন পন্‌সন্‌বি। অনেক কথা বলতেন।

চন্দন, কালভৈরবের মন্দিরের কাছে একটি বাড়ীতে উঠল। বাড়ীটি একজন ধনীব্যবসায়ীর। শেঠ বাঁকেলাল বারাণসী শাড়ী এবং উৎকৃষ্ট মলিদার ব্যবসা করেন। তাঁর অধীনে, তাঁর ব্যবসায়ে বহু হিন্দু মুসলিম কারিগর ও শিল্পী খাটে। পাইকার ও মহাজনেরা তাঁর আড়ত থেকে শাড়ী নিয়ে যায় ভারতের সর্বত্র। বাঁকেলাল অগাধ অর্থের মালিক। কাশীতে তাঁর অনেক বাড়ী আছে। কলকাতার সঙ্গে কারবার হয়ে থাকে। বাংলাদেশে তাঁর কাপড় খুব ধনীরা কিনে থাকেন। সাহেবদের মেমরা বর্তমানে বেনারসী শাড়ীর থান কিনে পোশাক বানাচ্ছেন।

বাঁকেলালের একটি বাড়ীতে অন্নছত্র আছে। নিত্য সেখানে দু'বেলা পাঁচশো' লোক ভাত, ডাল, রুটি, চ্যাড়স ও বেগুনের তরকারী, টকদই, ভেলিগুড় ভোজন ক'রে থাকে। বাড়ীটি পাথরের। মাঝে উঠোন। চারপাশ ঘিরে দালান ও চারতলা বাড়ী উঠেছে। কয়েকজন চাকর দু'বেলা একতলাটি ধোয়, তাই সর্বদা ভেজা, স্যাঁতসেঁতে, রান্নার গন্ধ এবং গুমোট একসঙ্গে অনুভব করা যায়। একতলায় খাওয়া হয়। দোতলায় চাকর ঠাকুরেরা থাকে। তিনতলার ঘরে ঘরে অতিথিদের থাকবার ব্যবস্থা আছে। যে কোন অতিথি সাতরাত্রি বাস করতে পারে। যাদের বেশীদিন থাকবার প্রয়োজন হয়, তারা বাঁকেলালের গদী থেকে মুহুরী মশায়ের হুকুম-নামা এনে নেয়। চারতলায় বারটি ঘর এবং বাকিটা ছাদ। এ ছাড়া একটি মস্ত ঘরও আছে। সে ঘরে দড়ির খাটিয়া, কম্বল, বাসনপত্র ইত্যাদি থাকে। অতিথি সজ্জনের প্রয়োজনে বের করা হয়। চন্দন চারতলার একটি ঘরে স্থান পেল।

বাঁকেলালের গদীতে সকলেই আসা-যাওয়া করতে পারেন। অনেক গণ্যমান্য লোক, যথা বাঁকেলালের খুড়তুতো ভাই গুলাবলাল, মহম্মদ জুনা

আলি, মাখনরাম, সুবেদার নিহাল সিং সকলে সেখানেই একত্র হলেন। জুনা আলি দিল্লীর বাদশাহদের আত্মীয়। তিনি প্রৌঢ়। ক্রোধপরায়ণ এবং আত্মসম্মানী লোক। তাঁর অর্থবল নেই। সামান্য এবং নগণ্য জমিদারীর আয় থেকে তাঁর চলে। কঠোর ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা এইসব কয়েকটি গুণের জন্য তিনি হিন্দু-মুসলিম সকলেরই শ্রদ্ধা পান। মুসলিমরা তাঁকে খুব মানে। ছোটখাটো ঝগড়াবিবাদ থেকে শুরু ক'রে বড় বড় সমস্যাও তাঁরই কাছে নিয়ে যায়। বলে, 'আলিসাহেব আমাদের সরল হিন্দীতে আইন বুঝিয়ে দিতে পারেন। আমরা লেখাপড়া জানি না। ফারসী ভাষায় লেখা আইন আমরা বুঝি না। আলি সাহেবের বিচার আমরা মানি।' সম্ভবত সেই কারণেই বাঁকেলালের গদীতে জুনা আলিকে ডাকা হয়েছে।

গুলাবলাল একজন মাঝারি ব্যবসায়ী। তিনিও বারাণসী কাপড়ের ব্যবসা করেন। তিনি শৌখীন, মধ্যবয়স্ক লোক। তাঁর রঙ অত্যন্ত ফর্সা, প্রায় লালচে। কাশীতে তিনি সুপুরুষ ব'লে গণ্য। পাকানো গোঁফ, মাথায় টুপি, পাতলা পাঞ্জাবি ও ততোধিক পাতলা ধুতি পরণে। চোখে সুর্মা, হাতে এবং রুপোর ছড়িতে বেলফুলের মালা জড়ানো।

মাখনরাম-এর পিতামহ চৈৎসিং-এর কর্মচারী ছিলেন। তিনি হেস্টিংস-এর সেনাদলের হাতে নিহত হন। মাখনরাম বর্তমানে নদীর ওপারে রামনগর রাজবাড়ীতে বাস করেন। কাশীতে কেদারঘাটের বাজারটি তাঁর। তিনি ভাল তোলা পেয়ে থাকেন। তাঁর পরিবার চিরদিনই ইংরেজবিদ্বেষী।

সুবাদার নিহাল সিং রাজপুত।

তিনি বড় ঘরের ছেলে। সাহেবদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে তিনি রেশমের পর্দা খাটিয়ে কুঠি সাজান। দশটি ঘোড়া রাখেন। তাঁর মাইনের টাকাটিতে শুধু চাকরবাকরের খরচ চলে এ রকম শোনা যায়।

চন্দন তাঁকেই তার কাগজ-পত্র দেয়। তাই-ই দেবার কথা ছিল। তাঁরা তাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। তারপর নিহাল সিং বলতে থাকেন, 'বেনারসে অনেক খবর এসে থাকে। তবু 37th রেজিমেণ্ট সহজে বিদ্রোহ করবে না। তারা কানপুরে এই আটার খবরটি শুনলে কিছু উত্তেজিত হতে পারে।'

চন্দন তাঁদের কথা শোনে।

অনেক কথা আলোচনা হয়। বাঁকেলাল বলেন, 'এখন ইংরেজরা চলে

যাবে এবং দিল্লীতে বাদশাহ বসবেন। রাজারা বাদশাহের মোহর নিয়ে স্ব স্ব স্থানে শাসন করবেন এ ভগবানেরই নির্দেশ।'

অনেকের অনেক কথা শুনে চন্দন বলে, 'আমার ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন, আমি দু'একটা কথা বলি। দেখুন, সিপাহীরা কে রাজা কে বাদশা হবে সে কথা ভাবছে না। তারা সামান্য বাট্টা পায়। হাতে টাকা পায় না। জমিজমা খালাস করতে পারে না। যুদ্ধের সময়ে তারাই মরে। তাদের জাতধর্ম বিসর্জন দিয়ে সব জায়গায় যেতে হয়। এখন এদিকে রেল চলছে, কাল ওদিকে চলবে। জিনিসপত্র এদেশ থেকে ওদেশে চলে যাবে, আর দাম বাড়বে। সিপাহীদের এর পরে কি হবে? তারা কি জমি পাবে, ভাতা পাবে, সুবিচার পাবে?'

এ প্রশ্ন নিয়ে কেউই ভাবেন নি। অতএব সদুত্তর পেল না চন্দন। শুধু গুলাবলাল ও জুনা আলি বললেন, 'সবাই কাজ পাবে।'

চন্দন আবার বলল, 'হুজুর, তারা নয় জমি পেল। কিন্তু চাষী মহাজনের হাতে মরে, তালুকদারের হাতে মরে। তার কি সুবিচার হবে?'

মাখনরাম আস্তে আস্তে বললেন, 'হ্যাঁ। এটা ভাববার কথা। তবে কি জান, আমাদের দেশ একে গরীব। তাতে ওরা আমাদের দেশ লুটে সব জাহাজে বোঝাই করে পাঠিয়ে দেয় ওদের দেশে। আমরা ওদের দেশেই ওদের পাঠিয়ে দেব। আমাদের সুবিধেমতো কানুন বানিয়ে নেব, জমির ভাগ-বাঁটোয়ারা করব।'

তখন চন্দন বলল, 'এবার আমি কি কানপুরে চলে যেতে পারি?'

বাঁকেলালের বৃহৎ, সিংহসদৃশ মাথাটি নড়ল। তিনি বললেন, 'না।'

চন্দন শুনল একটি আর্মেনী ব্যবসায়ী ভাল ভাল বিলাতি বন্দুক ও টোটা আনছে। চৈৎরাম, মগনলাল এঁরাও টাকা দিয়েছেন। চন্দনকে লোক, যানবাহন ও অর্থ দেওয়া হবে। বড় বড় নৌকায় খড় চাপা দিয়ে বন্দুক নিয়ে যাবে সে। নিহাল সিং বললেন, 'আমাদের গাদা বন্দুক, মাস্কেট বন্দুক অকেজো। ভাল বন্দুক ও গুলী পেলে আমরা ভাল যুদ্ধ করতে পারি।'

চন্দন বুঝল, তাকে ক'দিন থাকতে হবে। ইচ্ছে করলেই সে যেতে পারবে না।

তেইশ

মীরাট কানপুরের প্রতিবেশী।

অথচ মীরাটে যখন সিপাহীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ছাউনী জালিয়ে দিল, তখনও হুইলার উটপাখীর মতো বালিতে মুখ গুঁজছেন আর গুঁজছেন।

নদীতে যত নৌকো ছিল তাদের গাঁতিদারদের সঙ্গে সম্পূরণ প্রমুখ ক'জন যারা রাজ্য চায়নি, তালুক চায়নি, শুধু যুদ্ধ করতে চেয়েছে, তারা কথাবার্তা কইল। নৌকোগুলো তারা ফুরন করল। তাদের না জানিয়ে একটি নৌকোও যেন ঘাট না ছাড়ে।

সিপাহীরা বুঝতে পারছিল তাদের আর বিশ্বাস করছেন না সাহেবরা। তারা রেগে আগুন হচ্ছিল।

এই সময়ে হুইলারকে সাহায্য করতে লক্ষ্ণৌ থেকে 'আউধ ইর্‌রেগুলার ক্যাভেল্‌রি'-র দু'শো চল্লিশ জন অশ্বারোহী এবং পঞ্চান্নজন ইংরেজ অফিসার কানপুরে এলেন। কানপুর মীরাটের বড্ড কাছে। কানপুরকে আপাততঃ পাহারা দেওয়া যাক্। লক্ষ্ণৌ ত দূরে। লক্ষ্ণৌ-এ যদি কোন বিপদ হয়-ই তখন না-হয় কানপুর থেকে লোক যাবে সেখানেও।

সিপাহীরা বলে, 'কেন? বাইরে থেকে সওয়ার আর অফিসার এল কেন? আমাদের ওপর কি বিশ্বাস থাকছে না?' হুইলারকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল।

'কেমন? এখনত সিপাহীরা গরম হচ্ছে? আপনি শক্ত ব্যারিকেড বা শেলটার তুলতে দেননি, ওদের মিছিমিছি উত্তেজিত করবেন না বলে।'

'আমি ওদের প্রোভোক করতে চাইনি', হুইলার নিজেই নিজেকে বলল।...

'তবু ওরা প্রোভোক্‌ড হয়েছে। হবেই। ওরা যে উত্তেজিত হবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। ওরা যে-কোন ছুতো পেলেই উত্তেজিত হতে চায়। তাই আটার ব্যাপারে ওরা সন্দিগ্ধ হল। তাই লক্ষ্ণৌ থেকে ফৌজ আসতেই ওরা রেগে উঠল। এখনো, এখনো কি আমরা সুদৃঢ় একটি ব্যারাক গাঁথতে পারি না?'

না। হুইলার বুঝলেন, বড় দেরিতে বুঝলেন, ভারতীয়দের অন্তরে তিনি পৌঁছতে পারেন নি। তা বোধহয় হয় না। ভারতীয় মেয়েকে বিয়ে

করলেও না, বহুবছর ধ'রে এদের সঙ্গে মিশলেও না। দেরি হয়ে গিয়েছে তাঁর। তিনি সব সুযোগই হারিয়েছেন।

পুরনো দিনের সঙ্গীসাথীদের মধ্যে আজকাল তাঁর ম্যাকমোহনকে মনে পড়ে। বারবার। ম্যাকমোহনকে সবাই বলতো শরীরটি সাহেবের, মনটি ভারতীয়। এখন তিনি তাঁকে ঈর্ষা করলেন। ম্যাকমোহন অনেক ওপরে ওঠেননি। তাই বোধহয় তিনি চিরদিনই ওদের কাছে রয়ে গেলেন। হুইলার এবং ওদের মাঝখানে অনেক প্রোমোশান এবং উচ্চপদটি বাধা হয়ে রইল।

এখন তিনি যে সব কথা বলতে লাগলেন তা যেন নিজের কাছে নিজেই কৈফিয়ত দেবার মত, জবাবদিহি করার মত।

লক্ষ্ণৌ থেকে সাহায্য পেয়েছি। দরকার হলে কলকাতা থেকেও সাহায্য পাব। নানা ধুন্ধুপন্থ সাহায্য করবেন, ট্রেজারীর ভার নেবেন। সিভিলিয়ান ইংরেজরা যদি অ-নিরাপদ বোধ করেন, তাঁরা এসে ব্যারাকে থাকুন।

বিকেলেই কানপুরে সিভিল লাইন্‌স খালি করে ইংরেজরা ব্যারাকে চলে এল।

তারপর হুইলার দেখতে লাগলেন, কেমন করে তিনি অবস্থা এবং পরিপার্শ্বিকতার দাস হয়ে গেলেন। কেমন করে একজন অফিসার মদ খেয়ে রাতে সেকেণ্ড ক্যাভেলরির সওয়ারদের গুলি করে বসল।

ক্রোধে ও দুঃখে সিপাহী সওয়াররা প্রশ্ন করতে লাগল। আর ওদিকে লক্ষ্ণৌ থেকে ভীষণ খবর এল। আউধ ক্যাভেলরির অফিসাররা সওয়ারদের নিয়ে লক্ষ্ণৌ চলে গেলেন।

খবর উড়তে লাগল হাওয়ার আগে। হুইলার যখন 'সিক্রেট সার্কুলার', 'গোপন সংবাদ' পেয়েছেন, তার আগেই তাঁর রেজিমেন্ট এবং কানপুর শহর জানে সাহেবরা লক্ষ্ণৌ, মীরাট সর্বত্র বিপন্ন।

অতএব প্রতিশ্রুতি মতো হুইলারকে লক্ষ্ণৌ-এ সাহায্য পাঠাতে হল। কাদের পাঠাবেন তিনি? সব শ্বেতাঙ্গরাই হাতে বন্দুক চায়। তারা যুদ্ধ করতে চায়।

অত্যুৎসাহী ইভান্‌স এবং সকলের অপ্রিয় ব্রাইট, ব্রাইটের অনুগত পঞ্চাশটি পাঠান সওয়ার নিয়ে রওনা হল। তারপর দিল্লী বেহাত হল।

লক্ষ্ণৌ, মীরাট এবং দিল্লী। হুইলার যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন

দেওয়ালে টাঙানো ম্যাপের এক একটা জায়গা থেকে লালরঙ মুছে যাচ্ছে। দক্ষিণে ঝাঁন্সী এবং নওগাঁ-তে ইংরেজরা নিহত, পলাতক।

'Desperate time needs desperate action' হুইলার নিজেকে কশাঘাত করতে লাগলেন। ট্রেজারী থেকে একলক্ষ টাকা আনা হোক। রসদ আনো। বিস্কিট, ময়দা, ঘি, লবণ, চিনি, চা, চাল, আলু, মদ, ব্রাণ্ডি, পোর্ট, মোমবাতি এবং কেরোসিন। ব্যারাকে রাখ।

আঃ, সেই ব্যারাক! ইঁটের গাঁথনি আরো উঁচু হতে পারত। পাঁচিল মজবুত হতে পারত। হালকা কামানগুলি টেনে আনা যেত। তাছাড়া কার্টিজ, বন্দুক, তরোয়াল, বেয়নেট। সবাই বন্দুক চায়, অস্ত্র চায়।

পেশোয়া তিনশো মারাঠা সৈন্য পাঠালেন। তারা পথেই ছড়িয়ে পড়ল। মীরাট ও লক্ষ্ণৌ-এর দলছাড়া, ছত্রভঙ্গ সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিল। তারা কানপুরের আশেপাশেই ক্যাম্প করল।

জং-ধরা লোহার দরজা খুলল।

জমিদার, তালুকদার, ঠাকুরসাহেব, ছোট ছোট রাজা, নবাব, সকলের বাড়ীর চোরকুঠুরীর দরজা খুলে পুরোন দিনের ভারী ভারী গাদাবন্দুক, বর্শা, তরোয়াল বেরুল। শানওয়ালারা শান দিতে লাগল তরোয়ালে। বৃদ্ধেরা ঝুলেপড়া লোল ভ্রূ ও চামড়া তুলে বেঁধে ফেললেন পাগড়ীতে। কল্যাণপুর, নারায়ণপুরের পথ ধ'রে কানপুরের কাছে এলেন। হ্যাঁ। অনেক যোদ্ধা জমল। সকলেই জীবনদানে স্থির সংকল্প। নেতা নেই। নেতা চাই।

তখনো কয়টি রেজিমেণ্ট বিশ্বস্ত।

তারা সাহেবদের পাহারা দেয়। তারা বিদ্রোহের কথা শুনলে কানে আঙুল দেয়। তারা বলে, 'সাহেব, ভয় পেও না, ভয় পেও না।'

৫ই জুন রাতে, 53rd. রেজিমেণ্ট যখন রান্নার জন্যে উনোন ধরিয়েছে, কাঁচাকাঠ ফটফট করে ফাটছে, তখন ইংরেজরা তাদেরই গুলী করে বসলেন।

তারা রাউণ্ডের পর রাউণ্ড গুলী ছুঁড়ে চলল। তারা থামচে না, থামতে পারল না।

অসম্ভব ভয় এবং উত্তেজনা কেমন ক'রে স্নায়ুমণ্ডলীকে বিধ্বস্ত করে তা ইংরেজরা ভাল করেই দেখাল।

তখন কানপুর শহর থেকে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী ও কোম্পানীর পতাকা ছিঁড়ে

ফেলা হোল। 53rd. রেজিমেণ্ট ও অন্যান্য বিশ্বস্ত সেনাদল অগত্যা জোয়ারে গা ভাসাল। হিন্দু সিপাহী সওয়ার 'হরহর মহাদেব' বলে লাল পতাকা তুললো। মারাঠা সৈন্যেরা আনলো 'ভগবা ঝাণ্ডা'। আর মুসলমানেরা বাদশাহের পতাকা নিয়ে 'দীন দীন' শব্দে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

হুইলার দেখলেন এবার ভাগ্যের ভরা সম্পূর্ণ হল। ডুবলেই হয়। শহরে ফৌজ বাড়ছে, টাকা চাই। ইংরেজদের কুঠি লুঠ হল। ব্রাইটের বাড়িটি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। 'শালীকে মাথানেড়া করে শহর থেকে তাড়াব। ওর গয়নাগুলো নেব।'—এই ব'লে তারা ব্রিজদুলারীকে খুঁজতে লাগল।

রাতে শহরে আগুন জ্বলে রোশনাই হল।

রোশনাই হবারই কথা। ইংরেজদের ঘরদোর জ্বলছে। আসবাবপত্র জ্বলছে। গ্রীষ্মে নীরস, শুষ্ক গাছগুলো জ্বলছে। বাঁশ ফাটছে, কাঠ ফাটছে। অনেকে মদ খেয়ে চেঁচাচ্ছে। অনেকে সমবেত জোয়ানদের আর্মারি লুঠ করা বন্দুক ও তরোয়াল বিতরণ করছে। ব্যবসায়ী দোকানীরা পালাতে চেষ্টা করছে। সর্বত্র কলরব, হট্টগোল। শহরটি বলতে গেলে শাস্ত্রী দিয়ে ঘেরা। বেরোতে গেলেই আজ চেনালোকের সাহায্য চাই।

যে রাতে বিদ্রোহ হল, সে রাতে ব্রিজদুলারীকে যারা খুঁজেছিল তাদের মধ্যে সম্পূরণও একজন।

রাত তিনটায় বাড়ী ফিরে সে দেখল চম্পা আর ব্রিজদুলারী মুখোমুখি বসে আছে। ব্রিজদুলারীর সামনে একরাশ গয়না, সোনার মোহর, রূপোর টাকা, রূপোর আতরদান, গোলাপপাশ, সোনার নস্যিদান, সোনার রেকাবী গেলাস জড়ো করা।

সম্পূরণ অল্প অল্প টলছিল। কালীর কাছে বসে সে অনেকক্ষণ দেবীকে ডেকেছে এবং কারণ পান করেছে। দুটী ইংরেজ চর্মব্যবসায়ী ঘোড়া ছুটিয়ে ব্যারাকে পালাচ্ছিল, তাদের একজনকে হত্যা করেছে। একদল লোক মদ খেয়ে হল্লা করছিল, তাদের তরোয়াল তুলে তাড়া করেছে! বলেছে, 'সামনে যুদ্ধ, এখন মাতলামো করছ?' তারপর সে বাড়ী ফিরেছে।

ব্রিজদুলারীকে দেখে সে অল্প অল্প দুলতে লাগল। তারপর বলল, 'চম্পা ওকে বের ক'রে দে, ওকে সবাই খুঁজছে।'

চম্পা বলল, 'নিজে বের করে নিয়ে যাও।'

'আমি মেয়েদের গা ছুঁই না।'

'কেন ?'

'না।'

চম্পা তার দিকে তাকাল। তারপর গম্ভীর, অপরিচিত কণ্ঠে বলল, 'সম্পূরণ, আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব।'

সম্পূরণ তাকাল। সে মদ খেয়েছে। সে আজ নিজের মধ্যে নেই। সে অন্য কারো দ্বারা চালিত হচ্ছে, এবং সে সম্মোহিতের মতো তার অন্তরের সেই দ্বিতীয় জনের আজ্ঞা পালন করছে।

তার মনে হল চম্পাই সেই দ্বিতীয় জন। ঘোরা, রক্তাম্বরা, বিদ্যুৎনিভ কান্তি; সে বিডবিড করে বলল।

'সম্পূরণ, ব্রিজদুলারী ব্রাইটের সব সঞ্চিত ধন এনে দিয়েছে।' সম্পূরণ নিরুত্তর।

'সম্পূরণ, তুমি ওকে নিজে শহরের বাইরে দিয়ে আসবে। ও তোমাকে বিশ্বাস করে এখানে এসেছে। তোমার আশ্রয় নিয়েছে।' সম্পূরণ কথা বলল না।

'ও চলে যেতে চায়।'

'না। ও এখানে থাকুক। শহরের—বাইরে—বড—ভয়।' সম্পূরণ থেমে থেমে বলল।

ব্রিজদুলারী উঠে দাঁড়াল। সে পরিষ্কার এবং দ্বিধামুক্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার সঙ্গে পিস্তল আছে।'

'কিন্তু, তুমি, কেন, যাবে ?' সম্পূরণ আবার বলল।

'ওকে যেতে দাও। রাত ফর্সা হচ্ছে।'

'আমাকে যেতে দাও। রাত ফর্সা হচ্ছে।'

সম্পূরণ কপালটা মুছে, ঠোঁট কামড়ে গলা পরিষ্কার করল। বলল, 'বেশ। আজ এখানে থাক। কাল রাতে আমি তোমাকে নিজে শহরের বাইরে পৌঁছে দেব। আজ আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। চম্পা তোমায় লুকিয়ে রাখবে।'

পরদিন সম্পূরণ এবং চম্পা দু'জনে ব্রিজদুলারীকে শহরের বাইরে, দূরে, অন্ধকার এবং নিরুদ্দেশে পৌঁছে দিয়ে এল।

চব্বিশ

মীরাট, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ এবং অন্যান্য জায়গা যখন একে একে ইংরেজরা হারাল, তখনও কাশীতে কোন গোলমাল হয় নি। তবু কাশী সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হলেন।

বেনারসের একদিকে পাটনা, অন্যদিকে এলাহাবাদ। বেশীদিন নয়, মাত্র গত বছরই বাংলা ও বিহারে সাঁওতাল অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে। সে বিদ্রোহ কঠোরতার সঙ্গে দমিত হয়। সম্ভবত কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন সাঁওতালদের মধ্যে এখনও অসন্তোষ প্রধূমিত হচ্ছে। এখনই যদি তাঁদের শক্তি ও ক্ষমতার একটি 'দৃষ্টান্ত স্থাপনা' করা যায়, তাহ'লে এই আগুন আর ছড়িয়ে পড়তে পারবে না। তাঁরা ভাবছিলেন জমিদার ও তালুকদাররা ভূ-স্বত্ব হারিয়ে বিক্ষুব্ধ। সিপাহীরা বিদ্রোহী। সকলে যদি মিলিত হয় তা হ'লে আর এই উপনিবেশকে হাতে রাখা যাবে না। উত্তর থেকে মধ্য ভারত, পূর্ব ও পশ্চিম, এবং বাম-দক্ষিণেও এই বিপদ ছড়িয়ে পড়বে। ডাক, তার ও টেলিগ্রাফের সাহায্য না নিয়েও এরা খবর চালাচালিতে কত পটু তা ত' দেখাই যাচ্ছে।

তাই ক্যাপটেন নীলকে কলকাতায় আনা হল। মাদ্রাজ থেকে নীল কলকাতা এলেন। হাওড়া স্টেশনে এসে রেল বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গীন উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে তাঁর জরুরী ট্রেনটি পাশ করালেন। স্টেশনের সমস্ত কর্মসূচী উলটে পালটে গেল এবং নীলের ফৌজ বোঝাই একটি স্পেশাল ট্রেন বেনারস রওনা হল। নীল বেনারসে পৌঁছলেন ৩রা জুন।

পৌঁছিয়ে-ই নীল ওদিকে নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি-কে নিরস্ত্র করবার সংকল্প ঘোষণা করলেন।

নীল বেনারসে টাকার, লিণ্ড, গাবিন্‌স—এই সব অফিসারদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করলেন এবং প্রকাশ্য ময়দানে ইনফ্যান্ট্রির সিপাহীদের উর্দি ও অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করবার আদেশ দিলেন। তবু তারা আপত্তি করে নি।

37th. নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির ছয়টি কম্পানীর তিন হাজার আটশো চল্লিশ জন সিপাহী এবং জমাদার, সুবেদার, সকলেই উর্দি সমর্পণ করল এবং অপমানিত মুখে মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল।

বাকি দু'টি কম্পানী তখনো আসছে। কিন্তু তখনই ইংরেজ অশ্বারোহীরা এগিয়ে এসে তাদের ঘেরে।

তখন তাদের মধ্যে হল্লা পড়ে যায়।

তারা বলে, 'হায় আল্লা, হায় বিশ্বনাথ! এদিকে বন্দুক কেড়ে নিচ্ছ, আর ওদিক থেকে বন্দুক তুলে ক্রমেই এগিয়ে আসছ। কেন? পাঞ্জাবের খবর ত' আমরা জানি। সিপাহী ও সওয়ারদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছ, উর্দি কেড়ে নিয়েছ, তাদের চাকরি, জমিজমা সব কেড়ে নিয়েছ, তবু তাদের পেছন পেছন ধাওয়া ক'রে মেরেছ। তোমরা কি আমাদের তাই করতে চাও? উর্দি আর বন্দুক নামিয়ে দিয়েছি, এখন যে শিশুর মতো অসহায় লাগছে। কবে এসেছিলাম, ফৌজে নাম লিখিয়েছিলাম, তখন ত' আমাদের হাতেই ঐ উর্দি ঐ বন্দুক তুলে দিলে! আঃ, ঘাড়ের কাছে, কানের কাছে আগুনের ছুঁচ ফুটছে অপমানে!'

বাকি দুটি কম্পানীর মধ্যে ইতস্তত দেখে-ই নীল আদেশ দেন আর বন্দুক চালনা শুরু হয়। অবশিষ্ট কম্পানীর সিপাহীরা বন্দুক ছুঁড়ে আত্মরক্ষা করতে চায়। যারা নিরস্ত্র তারা কেউ বা পালাতে চায়, কেউ বা বন্দুক তুলে নিতে চায়। শিখ ও ইরেগুলার সৈন্যদল প্যারেড করতে এসেছিল, তারাও গুলী খায়। তারাও পালটা বন্দুক ছোঁড়ে। নীলের সৈন্যদল একটি নিরস্ত্র জনতার ওপর তাদের নতুন এনফিল্ড প্রিটেষ্ট রাইফেল এর সব গুলী ফুরিয়ে ফেলে।

কমিশনার টাকার এবং অন্যরা নীলকে দোষারোপ করলেন। তারপর নীল মনে করলেন তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত এক শক্তি। এবার তিনি যথেচ্ছাচার করতে পারেন। তখন যে তাঁর লক্ষ্ণৌ এবং কানপুরে যাওয়া কর্তব্য তা ভুলে গিয়ে তিনি বেনারস শহর ক্যান্টনমেন্ট এবং আশপাশের গ্রামের ওপর অত্যাচারের রাশ খুলে দিলেন।

ক্যান্টনমেন্টের দু'পাশের পথে গাছে গাছে ফাঁসীমঞ্চ তৈরী হল। আশপাশের গ্রাম থেকে নিরীহ মানুষ তাড়িয়ে এনে ঝোলানো হতে লাগল।

শহরের অলিতে গলিতে আর দেবস্থানের মর্যাদা মানা হল না। দোকানপাট লুঠ হল। শবদেহ পচে দুর্গন্ধ হল।

সঙ্কীর্ণ গলিতে গলিতে যুদ্ধ হতে লাগল। কিন্তু মুখোমুখি যুদ্ধ করবার চেয়ে নির্বিচার নরহত্যা অনেক পছন্দ করলেন নীল।

নিরীহ ও নিরস্ত্র গ্রামবাসীকে ধ'রে এনে ফাঁসী দেওয়া এবং মাঝে-সাঝে

মানুষকে কামানের মুখে বেঁধে হুম করে উড়িয়ে দেওয়ার যে দৃষ্টান্ত দেখালেন নীল, তা অন্যরা পরে অনুসরণ করলেন। তবে নীল সবার উপরে টেক্কা দিলেন শিশুহত্যা করে। সাত আট দশ বছরের বালকদের ধরে এনে গাছের ডালে দু'জনকে পেঁচিয়ে ফাঁসী দিলেন। তাদের দেখতে হল বাংলা '৪' সংখ্যার মতো। ডিজাইনটি ভারী পছন্দ হল নীলের। অতঃপর ছোটছেলে খুঁজে এনে তাদের শরীর দুমড়ে ঐ ভাবে ফাঁসী দেওয়া চলতে লাগল।

ইতিহাসের ঘটনা সব চমৎকার বক্রপথে ঘোরে। বেনারসে নীল নতুন ক'রে নাদির শা'র ইতিহাস রচনা করছেন এবং এই খবর কানপুরে গিয়ে পৌঁছল। তারপর সেখানেও আর হিসেব ঠিক রাখা গেল না। সতীচৌড়া ঘাটে ইংরেজদের নৌকোয় তুলতে গিয়ে গুলী ক'রে মারল ভারতীয়রা। তারা বেনারসের খবর পেয়েছে। পাঞ্জাবের খবর পেয়েছে। তারপর তারাও ন্যায় অন্যায়ের হিসেব শিকেয় তুলে রাখল। অনেকে মরলেন, অনেকে পরে 'বিবিঘর'-এ মরবেন বলে ফিরে এলেন। যাঁরা মরলেন তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে হুইলার, তাঁর ভারতীয় স্ত্রী এবং মেয়েও মরলেন।

হুইলার এই ক'দিনে যেন বিভ্রান্ত এবং নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ সর্বদাই তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি ব্যর্থ, নিদারুণভাবে ব্যর্থ। যারা মরছে তাদের মৃত্যুর জন্যে তিনি নিজেকে দাযী না করে পারেননি। মৃত্যু যখন এল, যখন তাঁরই অধীনস্থ কারু তরোয়াল তাঁর সাদা মাথায় আঘাত করলো, তিনি নীরবে মরলেন। অফিসার হয়েও তিনি অদূরদর্শিতা দেখিয়েছেন। তার ফলেই এই অগৌরবের মৃত্যুই এল। তিনি ভাগ্যকে দোষী করতে পারলেন না।

নীল তখনও জানেন না পরে তাঁর স্বদেশীয়রা সবাই, এমন কি ক্যানিং-ও তাঁকে ছি ছি করবেন, এবং 'অবিবেচক, অদূরদর্শী' বলবেন।

তাঁর খুব আনন্দ হল। তিনি সেই একই ইতিহাস রচনা করতে করতে এলাহাবাদে চললেন।

বেনারসের সিপাহী ও সওয়াররাও এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়লো। গুলাবলাল ও বাঁকেলালের টাকায় কেনা সেই বন্দুক নিয়ে আর বেনারস থেকে বেরুতে পারল না চন্দন। সে বন্দুক সবাই হাতে হাতে নিয়ে গেল। আগে যেদিকে ইংরেজ ফৌজ যাচ্ছে সেদিকে তারা যেতে চায় না। এদিকে

ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামে যখন ইংরেজ ফৌজ হানা দেয় তখন তারা পালটা লড়াই করে। ওদিকে বিহারে যখন খবর পৌঁছল, তখন বিহারের মানুষ শুধু ক্যান্টনমেন্টের ইংরেজ মেরেই ক্ষান্ত হল না। তারা ইংরেজদের কারখানা, অফিস, গুদাম সব ধ্বংস করতে লাগল।

নীল মনের আনন্দে এলাহাবাদের দিকে চললেন। 'যারা কিছুই করেনি, অত্যাচারের ভয়াবহতায় তাদের মনে জন্মের মতো ভয় ঢুকিয়ে দেব' এই হল তাঁর নীতি।

সেই সময়ে ভবানীশঙ্কর ও চন্দনের দেখা হয়। চন্দন যে সাহস ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে তা তিনি ভাবেন নি।

ভবানীশঙ্কর কিছুদিন ধ'রে অসম্ভব কষ্ট পেয়েছেন।

নীলের অর্থহীন আচরণ এবং তার পরবর্তী অত্যাচার তাঁর মনকে নিদারুণ আঘাত করে। তাঁর দাদা এবং অন্যরা অন্যান্য জায়গায় আত্মীয়-স্বজনের কি দুর্দশা হলো তাই জানতে ব্যগ্র ছিলেন। ভবানীশঙ্কর তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কার ভাগ নিতে পারেননি।

তার একবার মনে হচ্ছিল তাঁর অনেক কিছু করবার আছে, আবার বোধ হচ্ছিল, না, কিছুই করবার নেই তাঁর। কিছুই তিনি করতে পারেন না। তাঁর আহার ও নিদ্রা ছিল না। তিনি শহরের পথে না বেরিয়েও পারছিলেন না। আবার সেই পাশব উন্মত্ততা দেখে কশাহত হয়ে ফিরে আসছিলেন।

চন্দন তাঁর সঙ্গে বেশী কথা বলেনি। সে শুধু বলল, 'আপনার সঙ্গে যদি চম্পার দেখা হয়, তাকে বলবেন সে যেন চলে যায়। সে যেন নিজেকে বাঁচায়।'

ভবানী তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি এখন কি করবে?'

চন্দন বলে, 'আপনার পথ আলাদা, আমার পথ আলাদা। তবে আপনাকে আমি চিনতে ভুল করেছিলাম। ভেবেছিলাম আপনার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে।'

তার কথার রূঢ়তায় ভবানী আহত হন। চন্দন আরো বলে, 'দেখুন, আগে, কিছুদিন আগেও আমি ভেবে পাইনি কেন এরা ইংরেজদের তাড়াবে, কেমন ক'রে তাড়াবে। এখন, এই অত্যাচার দেখে দেখে আমার মনে কোন সংশয় নেই। আমি যেন দেখতে পেলাম, আপনি যে সব কথা বলতেন তার কোন দাম রইল না। আপনি বলতেন, শিক্ষা সবচেয়ে বড় কথা।

ওদের কাছ থেকে ভাল ভাল জিনিস নেব আমরা, নিজেদের ভাল করব। ডাক্তারবাবু, ওরা ছোট ছোট ছেলেদের মা-র কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ফাঁসি দিল। ওরা গ্রাম জ্বালাচ্ছে আর গ্রামের মানুষদের তাড়িয়ে নিয়ে সেই আগুনের মধ্যে ফেলছে। ওরা যাদের মারছে তারা কি দোষ করেছে? কেন ওরা বেনারসের সিপাহীদের ওপর গুলী চালাল? ডাক্তারবাবু, আমার আগে প্রাণের মায়া ছিল। আমি আমার বাপ-মা'র এক ছেলে। আমি তাদের মনে বড় দুঃখ দিয়ে চলে আসি। আসবার দিন আমার মা কত কেঁদেছিল, আমি ফিরে চাইনি। এখন আর আমার কোন মায়া নেই।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বিষণ্ণ হেসে চন্দন বলল, 'আগে মরতে ভয় পেতাম। এখন যেন সে ভয় চলে গেছে।'

ভবানী বললেন, 'চন্দন ভারতীয়দের মধ্যে কোন নেতা নেই। তোমরা যুদ্ধ করবে, সাহস দেখাবে কিন্তু নেতা না থাকলে, যুদ্ধকে না চালাতে পারলে বার বার যে মার খাবে '

'জানি।'

চন্দন একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল। গঙ্গার দিকে চেয়ে বলল, 'যারা বড় বড় কথা বলেছিল তাদের ত দেখছি না! যাদের কথা ভাবিনি তারাই দেখছি এগিয়ে এসেছে।'

দু'জনেই চুপ করলেন। তারপর চন্দন বলল, 'একটাই পথ খোলা আছে।'

'কি পথ চন্দন?'

'আমি ত মরতে পারব। মরবার আগে যদি পারি ওদের যতজনকে পারব মারব। মরতে আমি পারব ডাক্তারবাবু, আমি মরতে পারব, আপনি মরতে পারবেন, ঐ একটা পথই আছে। বাঁচতে পারব না। বাঁচতে চেষ্টা করব কেন তাই ভাবছি, ডাক্তারবাবু, আমার ভেতর থেকে কি যেন বদলে গেছে, বুঝতে পার না।'

তারপর আর একটু পরে স্বগত উক্তির মতো বলল, 'শুধু চম্পা!'

'চম্পা?'

'হ্যাঁ। ওর কোন দোষ নেই। সম্পূরণ ওকে পুতুলের মতো ব্যবহার করেছে। ওকে কি ওরা মারবে? ইংরেজরা?'

ভবানী জবাব দিতে পারলেন না। চন্দনকে তিনি এতদিনে বুঝতে

পারছেন। যে-সব ব্যবহার, যে-সব কথা বুঝতেন না, সব যেন স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে।

'সেই কবে থেকে বোধহয় যখনকার কথা মনে নেই তখন থেকে ও আমায় বিশ্বাস করে আসছে। আমি ওর বিশ্বাসের দাম দিতে পারলাম না।'

কিছুক্ষণ বিরতি।

'শহরটার চেহারা দেখছেন ডাক্তারবাবু? ঘাটে ঘাটে মানুষ নেই। ঘরে ঘরে আলো নেই। নদীতে নৌকা দেখি না। যারা ফাঁসীতে মরেছে তাদের দেহগুলো এনে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে যাচ্ছে, ঐ দেখুন! আঃ ডাক্তারবাবু, কি আশ্চর্য, কি অদ্ভুত রাত। ছেলে মরেছে, মা কাঁদছে না, স্বামী মরেছে, স্ত্রী কাঁদছে না।'

ভবানী কথা বললেন না।

একটু পরে চন্দন বলল, 'ডাক্তারবাবু, ওরা বলছিল আপনার কাছে এলে আপনি আমাকে ধরিয়ে দেবেন। আপনি কি আমাকে ধরিয়ে দেবেন?'

ভবানী তার দিকে তাকালেন। তারপর গম্ভীর, সংযত কণ্ঠে বললেন, 'না।'

'ওরা বলছিল আপনি নীল সাহেবের সঙ্গে যাবেন। আপনি কি যাবেন?'

'না।'

'আপনি কি করবেন?'

'চন্দন, আমাকে প্রশ্ন ক'রো না।'

দু'জনেই চুপ করে রইলেন। ভবানী তারপর বললেন, 'চন্দন, যদি যেতে হয়, তুমি দেরি ক'রো না। ওরা তোমাকে সন্দেহ করবে সেটা স্বাভাবিক। ওরা বাড়ীতে বাড়ীতে হানা দিয়ে খোঁজ করবে। কমিশন বসবে, বিচার হবে···বিচার হবে?' তিনি যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন।

দু'জনেই চুপ করে রইলেন। অন্ধকার গঙ্গার বুক দিয়ে হরিশঘাটের দিক থেকে একটা নৌকো, দুটো নৌকো নদী পেরিয়ে রামনগরের দিকে চলে যাচ্ছে।

'ওরা পালাচ্ছে।' চন্দন আস্তে বলল।

আবার দু'জনে চুপ। তারপর ছোট একটি নিশ্বাস ফেলল চন্দন। বলল, 'ডাক্তারবাবু, ওরা সব পারে। পাঞ্জাবে ওরা কি করেছে জানেন?'

'চন্দন, অত্যাচারের কথা তুমি আর ব'লো না।'

'আর ত বলিনি? কোথায় বলেছি? শুনলাম ওরা একজন সওয়ারকে প্রথমে পা ধরে চিরে ফেলতে চেষ্টা করে। তারপর পা ধরে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায় আর মুখে বেয়নেট দিয়ে খোঁচাতে থাকে। তার ওপর, তাকে একবারে না মেরে…'

খবর বলতে বলতে চন্দন যেন নিজেকে আর সামলে রাখতে পারে না। সে বলে, 'তারা ওকে সেই অবস্থায় কাঠের ওপর চাপিয়ে কাঠে আগুন দেয়। সে আগুন থেকে নেমে এসেছিল ডাক্তারবাবু, সে অফিসারদের কাছে বলেছিল, 'আমার মাথা কেটে ফেল, নয় গুলী কর!' তারা হাসতে হাসতে তাকে আবার আগুনে চড়ায় ডাক্তারবাবু; বেয়নেট দিয়ে চেপে থাকে।' চন্দন দু'ধাপ সিঁড়ি নেমে যায়। চন্দন তাঁর দিকে ফেরে। বলে, 'খবরটা শুনে আমি হড়হড় করে বমি করেছিলাম। ডাক্তারবাবু, ওরা মানুষ নয়। ওদের মারলে কোন দোষ নেই।' তারপর অন্ধকার থেকে ছোট একটা নৌকো এসে লাগে। ঘাটের শেকলে দাঁড়টা বাধায়। সেই নৌকায় চড়ে চন্দন। ভবানী দেখেন সে-ও একটা দাঁড় তুলে নিল এবং বাইতে লাগল। তারা উত্তরের দিকে যাচ্ছে। স্রোতের উলটো দিকে। তারা ঘাটেব কিনার ঘেঁষে যাচ্ছে। মাঝনদীতে স্রোত বেশী। ঘাটের কিনারে স্রোত নেই।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন অপেক্ষা করলেন ভবানীশঙ্কর। তারপর তাঁর দাদাকে জানালেন না, কারুকে কিছু বললেন না। তিনি পথচারী লোকের মতো সামান্য পোশাক পরলেন, সামান্য টাকা নিলেন। তাঁর ডায়েরীটি তিনি বুকের ভেতরের কাপড়ে রাখলেন, মাথায় পাগড়ী বাঁধলেন। তারপর যে পথে নীল গেছেন, সেই পথেই রওনা হ'লেন। কখনো তিনি নীলের ফৌজের রসদবাহী চৌধুরীদের সঙ্গ পেলেন, কখনো কারুকেই পেলেন না। দু'পাশের গাছে মৃতদেহ। দু'পাশের গ্রাম জ্বলে গেছে।

মাঝে মাঝে দু'একজন ভীত, ত্রস্ত গ্রামবাসীকে দেখলেন। ইংরেজরা দু'দিনের পথ এগিয়ে গেছে জেনে তারা তাদের আত্মীয় বন্ধুদের মৃতদেহ খুঁজতে এসেছে। একজায়গায় দেখলেন, একজন অশীতিপর বৃদ্ধ এবং একটি মেয়ে গাছ থেকে দড়ি কেটে একটি মৃতদেহ নামাতে চেষ্টা করছে। তিনি তাদের সাহায্যে করলেন। একলাই দেহটিকে বয়ে নিয়ে গেলেন। বৃদ্ধটি তাঁকে পথ দেখিয়ে একটি গ্রামের সামনে নিয়ে গেল। গ্রামটি দগ্ধ এবং

রিত্যক্ত। সেখানে সে যেন কি খুঁজতে লাগল। বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে 'চিয়ে একজায়গায় আগুন পাওয়া গেল। বুড়োটি নিজের মনেই বলল, তুঁষের আগুন অনেকদিন থাকে।'

ভবানী তাদের দেখছিলেন। তারা কথা বলছিল না, শোক প্রকাশ রছিল না। তারা স্তব্ধ হয়েছিল। বৃদ্ধটি ছেলেটির মুখে একটা খড়ের নুড়ি ালিয়ে নিয়ে ধরে। তারপর ভবানীর সাহায্যে তার পা ধ'রে তাকে সেই ্ষ বা খড, বা ধানের ভুষির ধিকিধিকি আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়। াংস পোড়া দুর্গন্ধ উঠতে থাকে। মেয়েটি তারপর বৃদ্ধের দিকে হাত বাড়িয়ে রে। বৃদ্ধটি কোন কথা না বলে তার হাতের চুড়ি খুলে সেই আগুনে দিয়ে দয়। মেয়েটি তারপর এদিক ওদিক চেয়ে একটা নালা থেকে আঁজলা সেঁচে সেঁচে এক আঁজলা কাদাগোলা জল আনে। ছেলেটির দেহের ওপর ছিটিয়ে দেয়। তারপর ভবানীকে কোন কথা না ব'লে তারা দু'জন ওঠে এবং দ্রুতপদে চলে যেতে থাকে। তখন বিকেল। ভবানী দেখেন তারা চলে যাচ্ছে। ভেতর পানে মাঠের দিকে, ক্ষেতের দিকে চলে যাচ্ছে।

তারপর সন্ধ্যা হয়। মানুষের কথা নেই, পাখীর ডাক নেই, ধুলো, ছাই, মাংসপোড়া বিশ্রী গন্ধ, এক অদ্ভুত সন্ধ্যা।

এরপর ভবানী দিনে না চ'লে রাতে চলতে থাকলেন। পথে যেখানেই দেখলেন মৃতদেহ নামিয়ে নিয়ে কেউ দাহ-র চেষ্টা করছে, সেখানেই তিনি দাঁড়ালেন। তিনি তাদের মিনতি ক'রে বললেন, 'আমাকে সাহায্য করতে দাও। আমি ব্রাহ্মণ।' কোন যুবক, বৃদ্ধ বা বালকের উলঙ্গ মৃতদেহকে নামিয়ে গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে তার মুখে জ্বলন্ত কাঠ কয়লা বা কাঠ গুঁজে দিয়ে, কখনো বা দেহটি চিতায় স্থাপনা করে, কখনো বা মৃতকে গ্রামের দগ্ধাবশেষের মধ্যে রেখে দিয়ে তিনি অদ্ভুত শান্তি পেলেন।

কখনো তিনি খাবার পেলেন, কখনো পেলেন না।

পথ চলতে চলতে তাঁর পায়ে ফোস্কা পড়েছিল। তাই তাড়াতাড়ি চলতে পারতেন না। তখন তিনি পাকা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামলেন এবং সরকারী ফৌজের পথ ত্যাগ ক'রে গ্রাম দিয়ে, ক্ষেত দিয়ে চলতে লাগলেন।

তখন মাঝে মাঝে ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়া ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা হলো।

একাই দুটি মৃতদেহ নামিয়ে তাদের মুখে আগুন দিয়ে তিনি কোলের কাছে হাত জড়ো ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর চোখ আপনা থেকেই বুজে এসেছিল। যখন চোখ খুললেন তখন দেখলেন বিস্মিত নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে সাত আট জন। তাদের পোশাক ছিন্নবিচ্ছিন্ন। তাদের চোখে মুখে ধুলো। তাদের কারো হাতে বন্দুক, কারো হাতে বা তরবারি। একজন বৃদ্ধ তাঁকে বলল, 'আপনি কে?' তিনি জবাব দিলেন না।

'আপনি কি এ. . র আত্মীয়?'

তিনি ঘাড় নাড়লেন। একজন বলল, 'আপনি জানেন সাধুজী, এখানে কোন জলাশয় আছে কি না?'

তিনি বলতে চাইলেন—আমি সাধু নই। কিন্তু তা তিনি বললেন না। বললেন, 'আছে। আধমাইল দূরে। দক্ষিণে।'

সেই বৃদ্ধটি তার সঙ্গীদের বলল, 'তবে কি আমরা তাকে জলাশয়ের কাছেই রেখে এসেছি?'

'কাকে?'

'আমাদের একজনকে। তার গুলী লেগেছে।'

ভবানী তাদের সঙ্গে চললেন। আহত লোকটি বছর পঁচিশের একজন যুবক। তার লম্বা চওড়া শরীর দেখে ভবানী বললেন, 'রিসালার লোক।'

'হ্যাঁ। রিসালার লোক। আপনি কেমন করে বুঝলেন?'

কিছু না বলে ভবানী নিচু হলেন। ছেলেটি চিৎ হয়ে পড়ে ছিল, এবং একটা শুকনো ডালো চকমকি ঠুকে আগুন জেলে তার আলোতে ভবানী দেখলেন, তার গলার পাশে কণ্ঠার হাড়ে গুলী বিঁধেছে। ঘা-টি দগদগে এবং সাদা হয়ে উঠেছে। তিনি একটি ছুরি চাইলেন। ছুরি দিয়ে গুলীটি বের করলেন। ছেলেটি মুখ কুঁচকোল কিন্তু চীৎকার করল না। তিনি বারুদ চাইলেন। বারুদ থুথু দিয়ে ভিজিয়ে সেই ক্ষতের পুঁজ মুছে নিলেন। বললেন, 'ওপাশে, ওই দশ হাত দূরে নিম গাছ আছে। একটা ডাল পাতা সমেত ভেঙে আন।' নিমের পাতা জলে ধুয়ে, চিবিয়ে নরম ক'রে তিনি ক্ষতের মধ্যে গুঁজে দিলেন। নিজের পাগড়ীটি ছিঁড়ে ক্ষতটি বাঁধলেন। তারপর, ছেলেটি বললো 'চিনেছি। আপনি ডাক্তার সাহেব।'

'হ্যাঁ।' ভবানী অপরাধীর মতো চাইলেন। তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন।

ছেলেটি বলল, 'আপনি এখানে কেমন ক'রে এলেন?' সে কথার জবাব না দিয়ে ভবানী তাকে বললেন, 'তুমি কানপুরে ছিলে? তাই আমায় চেন?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার সাহেব।'

'তুমি জান ব্রাইটসাহেবের বিবি বেঁচে আছে কি না?'

'জানি না। তার কোন খোঁজ মেলে নি।'

'কানপুরের খবর কি?'

'তাও জানি না। পেশোয়ার সব ফৌজ যমুনার দক্ষিণে কাল্পীতে গেছে। আরো দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ডে আমাদের রাজ হয়েছে।'

'তোমরা সেখানে গেলে না কেন?'

'আমাদের দেশ চুণারের কাছে। আমরা দেশে যাচ্ছি।'

'কিন্তু তোমরা পথেই যে ধরা পড়বে!'

তারা জবাব দিল না। একটু পরে বৃদ্ধটি বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি সাধু অথবা সন্ত্। শবদাহ ক'রে পুণ্য করছেন।'

তারা সে রাত সেখানেই রইল। তারা স্নান করল এবং ভবানীও স্নান করলেন। তাঁরা সকলেই দীঘিটির বাঁধানো রাণায় শুলেন। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সকালে যখন ঘুম ভাঙল, হঠাৎ একটা দুর্গন্ধ তাঁর নাকে লাগে। চেয়ে দেখলেন একটি শকুনি তাঁর মাথার কাছে বসে তাঁকে দেখছে। তিনি উঠে বসলেন। শকুনিটি দু'পা সরে গেল। তিনি চেয়ে দেখলেন দূরে এবং কাছে, গাছের ডালে ডালে শকুনি বসে আছে। তিনি বুঝলেন ক্রমে ইংরেজদের কাছে আসছেন তিনি। মৃতদেহ গড়াগড়ি যাচ্ছে এবং ঝুলছে। শকুনিগুলি যথেচ্ছ শবমাংস ভোজন ক'রে দুঃসাহসী হয়েছে।

তাঁর মনে হলো, তাঁর শরীরে এত শক্তি নেই যে শকুনির পাল আক্রমণ করলে তাদের ঠেকাতে পারেন। তিনি দেখলেন, কালকের ভাঙা ডালটি একপাশে পড়ে আছে। তিনি ডালটি তুলে নিলেন। নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

দুপুর নাগাদ তিনি কয়েকটি বলদ গাড়ীর দেখা পেলেন। তারা রসদ ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে সশস্ত্র শান্ত্রীদের পাহারায় এলাহাবাদ চলেছে। ভবানী যখন তাদের সাহায্য চাইলেন তারা প্রথমটা প্রত্যাখ্যান করে। তারপর তাঁর কাছে টাকা চায়, অবশ্য গোপনে। ভবানী তাদের নিজ পরিচয় দেন এবং

প্রথমটা তারা তাঁকে বিশ্বাস করেনি। তিনি কোমরে জড়িয়ে সন্ন্যাসীদের মতো ধুতি পরেছিলেন। মাথায় পাগড়ী ছিল। কয়েক দিনের অযত্নে দাড়ি গজিয়েছিল। তাঁর দীর্ঘ সবল দেহ, এবং রোদে পোড়া গৌরবর্ণ দেখে তারা সন্ন্যাসী বা সাধু ভেবেছিল। সন্ন্যাসী বা সাধু সম্পর্কে এখন সবাই সাবধান। তারা খবর চালাচালি করে ভারতীয়দের সাহায্য করেছে। তাদের কথায় মনে পড়লো ভবানীর, তাঁর সঙ্গে টাকা আছে। এ ক'দিন টাকার দরকার হয়নি। তিনি শেষ অবধি নিজের পরিচয় দিয়ে তাদের বিশ্বাস করিয়ে এবং টাকা দেখিয়ে গাড়ী চড়তে পেলেন। এলাহাবাদে পৌঁছে তিনি নেমে গেলেন। এলাহাবাদে পৌঁছলেন যে উপায়ে, কানপুরে পৌঁছবার জন্যে তেমনিই উপায় সন্ধান করতে থাকলেন। তাঁর মনের ভেতরকার মনটা তাগিদ মারছিল। তিনি ভাবছিলেন, 'বোঝা যাচ্ছে মানুষ সবচেয়ে নিজেকেই ভালবাসে, আমিও, স্বীকার করতে লজ্জা পাই, ব্যতিক্রম নই। শুধু নিজের কথাই ভেবেছি, অথচ একবার ভেবে দেখিনি ব্রিজদুলারীকে যদি ওরা হাতের মধ্যে পায় তবে ছেড়ে দেবে না। তার পাশেই আগে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত ছিল।

যদি ধরা পড়ি তবে কি আমাকেও ওরা, ইংরেজরা বিশ্বাসঘাতক বলবে? ধরা পড়ব কি? কে জানে! কিছুই বুঝি না, চিন্তার শক্তি আচ্ছন্ন, কেন বা এমন ক'রে শবদাহ করতাম, তবে কি এদের উপরই আমার সহানুভূতি বেশী? তা যদি হ'ত তবে ত' যুদ্ধই করতাম।

আসলে এসব যুদ্ধবিগ্রহ একটি চূড়ান্ত প্রমত্ততা, ইংরেজদের দৃষ্টি অন্ধ, ওরা মানুষ-টানুষ বুঝছে না, সাম্রাজ্য হাতছাড়া হবার ভয়ে লড়ছে। এদের হয়তো লড়বার পেছনে হাজারটা ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে কিন্তু এই কি তার পরিণতি? ঐক্য নেই, পরিকল্পনা নেই, শৃঙ্খলা নেই, সেজন্যেই ত এখন দলে দলে মরছে। আবার ওদিকে শুনতে পেলাম দিল্লীতে কয়েকটি ইংরেজ ও আইরিশ এদের পক্ষে দেখা দিয়েছে।

আর ভাবতে পারি না। আমার কর্তব্য কি কে বলে দেবে? তাকে যদি বাঁচাতে না পারি তবে মরব, চন্দন ত' মরতেই বলেছিল। সত্যি মরতে কেমন ক'রে হয় তা এরা দেখিয়ে দিল, শুধু ছোট স্বার্থ থাকলে কোন জাত এমন ক'রে মরতে পারে? ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। ইংরেজদের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে যে উদার জাতকে দেখতে শিখেছিলাম সে দেখাই

দেখাই সব নয়। ওরা আমাদের শ্রদ্ধা করেনি। আমরা ওদের কাছে সাবজেক্ট নেশান মাত্র।

পঁচিশ

সম্পূরণ এবং তার কতিপয় সহযোগী চম্পার বাড়ীতে একটা ঘাঁটি বানিয়েছিল। প্রথম কিছুদিন যুদ্ধ ও বিদ্রোহের ব্যাপারে বাতাস খুব সরগরম ছিল।

পেশোয়ার সৈন্যদল ক্রমেই ভারী হয়। কয়েকটি যুদ্ধের পর তাঁতিয়াটোপী, পেশোয়া'র ভাইপো, এঁরা কালপীতে একটা মস্ত ঘাঁটি বানান। কালপী যমুনার দক্ষিণে।

পেশোয়া'র সৈন্যদলে সম্পূরণ কোন কাজ পায়নি। বন্দী ইংরেজদের হত্যা দেখে সে কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। সতীচৌড়া ঘাটে ইংরেজদের হত্যার পর চম্পা তাকে খুব নির্মম ভাষায় বলে, 'তোমাকে না ভগবান আশ্চর্য শক্তি দিয়েছিল? খুব শক্তির পরিচয় দিলে যা হোক!'

পরে বলেছিল, 'বিবিঘরে ওদের জীইয়ে রেখেছ কেন? পরে মারবে বলে?'

খুব ক্ষোভের সঙ্গে সে বলেছিল, 'এত লোক তোমাদের, এতজন যোদ্ধা, এত অস্ত্রশস্ত্র, এত টাকা, কেন তোমরা যুদ্ধ করছ না! এখানে একটু, ওখানে একটু যুদ্ধ করলে কি তোমরা শেষ অবধি জিতবে? আগে মনে হয়েছিল তোমরা কি জানি কি করবে! এখন দেখছি তোমরা সবাই মরবে। তবে কেন আমাকে এর মধ্যে জড়ালে? ওকে কেন যেতে দিলে?'

সম্পূরণ তাকে বলে, 'তুই ডেরাপুরে যাবি চম্পা? তোকে পাঠিয়ে দেব?'

'না।'

'কেন?'

'আমার ভাবনা তুমি ভেব না সম্পূরণ।'

তারপর হ্যাভলকের ও নীলের দু'দিক থেকে কানপুরে এগিয়ে আসবার সংবাদ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে-ই বিবিঘরের অবশিষ্ট বন্দীদের হত্যা করা হয়।

তারপর শোনা গেল, হ্যাভলক এবং নীল এবার কানপুরকে রক্তে

নাওয়াবেন। আরো শোনা গেল উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবে উজনালাতে, কুপায় পাঁচশত মানুষকে নৌকো ডুবিয়ে, গুলী ক'রে, ফাঁসি দিয়ে এবং কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে মেরেছে। একই কুয়োতে মরা ও জ্যান্ত মানুষকে একসঙ্গে ডুবিয়েছে। সগর্বে জানিয়েছে, 'There is a well at Cawnpore but there is also one at Ujnalla !'

এবার মানুষ কানপুর ছাড়তে শুরু করল। অনেকে গেল কালপীতে। তাদের সংখ্যাই বেশী। অনেকে পালাল দূরে দূরে, জঙ্গল বা পাহাড়ের পথ ধরলো।

গরুর গাডী, উটের গাডী অবিরাম চলতে লাগল।

তারপর একে একে, দলেদলে, এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ ও অন্যান্য জায়গা থেকে ভারতীয় সৈন্যেরা আসতে থাকে। তারা বিভ্রান্ত হয়ে, দল না পেয়ে, নেতা না পেয়ে ফিরছে। তারা কানপুরে পেশোয়ার সৈন্যদলে যোগ দিতে চায়।

পেশোয়া নেই, সৈন্যদলও নেই। তখন তারা কালপীর দিকে গেল। মধ্যভারতে ইংরেজের নামগন্ধ নেই। সেখানে তারা হয় তো বা নিরাপদ।

তারা অনেকরকম খবর আনল। ভারতের বাইরে যেসব জায়গায় ইংরেজের রাজত্ব আছে, সেই চীন, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য থেকে না কি জাহাজ জাহাজ গোরাসৈন্য শুধু আসছে আর আসছে। বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজের বন্দরে ভীড়।

তারা ইংরেজদের অত্যাচারের ভয়ঙ্কর সব ইতিবৃত্ত বয়ে আনল।

তখন বিরাট একটা আতঙ্কের দৈত্যকে কে যেন কানপুরে ছেড়ে দিল। শহরে, বাজারে, গলিতে, রাজপথে, ধনীর প্রাসাদে এবং দরিদ্রের কুটিরে সেই দৈত্যের দেহের ছায়া পড়তে লাগল। সে আতঙ্কের চেহারা এত বড়, যে তার কূল কিনারা পাওয়া যায় না।

সকলে সকলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'এখন কি করব? কোথায় যাব?'

এই সংকটের সময়ে মগনলাল, চৈৎরাম, জৈৎরাম প্রমুখ মহারথীদের দেখা গেল না। তাঁরাও পালিয়েছেন। যাবার আগে চৈৎরাম তাঁর দু'শো বলদ-গাড়ী, হাজার খানেক ডুলি, পালকী, নালকি, ডাণ্ডি এ সব ফেলে রেখে গেলেন। তিনি নাকি বলে গেছেন, 'যে যে পারে এগুলি নিয়ে পালাক তারা!'

আগন্তুক সিপাহী সওয়াররা বলতে লাগল, 'যারা যুদ্ধ করেনি, ইংরেজ মারেনি, ইংরেজের কুঠি লুঠ করেনি, তাদেরও নিস্তার নেই। কেউ বাঁচবে না, বালক, বৃদ্ধ, শিশু! যদি বাঁচতে চাও, পালাও।'

'যদি বাঁচতে চাও পালাও! যদি বাঁচতে চাও, পালাও!'

এ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

এই সময়ে সম্পূরণের মাথায় আবার ভূত চাপল। কিছুদিন আগে সে নেহাত চুপচাপ হ'য়ে যায়। এখন আবার বলতে থাকে সে সর্বশক্তিমান। ভগবানের কাছ থেকে দৈবী প্রেরণা পেয়েছে তাকে ম্লেচ্ছ নিধন করতে হবে। সে-ই শিবাজী মহারাজ। ম্লেচ্ছ নিধন কল্পে এ যুগে জন্মেছে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। সেইজন্যে ঘুষ নেবে না; টাকা, নারী বা সুরার প্রলোভনে টলবে না।

এখন সবাই তাকে চেঁকে ধরল। কেউ কেউ ক্ষোভে মরিয়া হয়ে বলল 'কি সম্পূরণ! এখন সে সব কথা কোথায় গেল? ক'দিন হল আমরা ইংরেজ তাড়িয়েছিলাম? এত তাড়াতাড়ি কেন আমাদের সব চেষ্টা নষ্ট হয়ে গেল?'

'এখন আমরা কি করব? এখন আমরা কি করব?' বারবার এই প্রশ্নের জবাব দিতে হল সম্পূরণকে।

তারপর সে চম্পার কাছে এসে একদিন বসল। চম্পা দেখল সে প্রচুর ভাঙ খেয়েছে। তার ঘেন্না হল।

সম্পূরণ চম্পাকে বলল, 'চম্পা, আমি খুব ভুল করেছি। আমার কোন ক্ষমতা নেই রে! আমার ভগবান আমাকে ছেড়ে গেছে। মাথা কুটে মরি তবু কোন আদেশ পাই না।'

চম্পা কিছুক্ষণ তার প্রলাপ সহ্য করল।

তারপর অসহ্য বোধ হওয়াতে সে চেঁচিয়ে বলল, 'আর বসে থেক না। যুদ্ধই যদি করতে চাও, চলে যাও। মরতে যদি হয় এমন ভাবে মরো যে সে কথা মনে ক'রে আমি আর অন্যরা যেন তোমায় ঘেন্না না করি।

সম্পূরণ তার পায়ের কাছে ব'সে হাঁটুতে মুখ গুঁজল। চম্পা বলল, সর'।

'কোথায় যাবি তুই?'

'আমি চকের বাজারে যাব।'

'আমি কি করব?'

চম্পা কোন জবাব দিল না।

সম্পূরণ চলে গেল। কিন্তু যাবার আগে সে কয়েক দিন আরো পাগলামি করল। তার এবং চম্পার সঞ্চিত টাকা নিয়ে যে সব নিঃসম্বল দরিদ্র অধিবাসীরা পালাচ্ছিল তাদের মধ্যে বেটে ছিল। বাজার এবং গলিতে, রাজপথে এবং বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে ঢোলে ঘা মেরে বলতে লাগল, 'ইংরেজরা আসছে। যারা বাঁচতে চাও তারা পালাও!'

চম্পার আরো জ্বালা হল। কেউ শুনবার নেই, শূন্য নগরীতে সম্পূরণের ঢোলের আওয়াজ হাজার গুণ হয়ে গুম্ গুম্ ক'রে বাজে। সম্পূরণ খায় না, স্নান করে না। চম্পা তাকে ডেকে নিয়ে আসে। তাকে খাওয়ায়।

তারপর একদিন সম্পূরণ কোথায় যেন চলে গেল।

অকালে মেঘ দেখা দিল। ঠাণ্ডা বাতাস বইল। বিষ্টির দিন এল। চম্পা সারাদিন বাজার তলায় ঘোরে। সব্জীমণ্ডীতে বসে থাকে। চন্দন আসবে কিনা তার খবর নেয়। কতজনের সঙ্গে দেখা হয় তার। যাকেই দেখে তাকে আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'চন্দনকে দেখেছ? চন্দনকে কি তোমরা চেন? ডেরাপুরে বাড়ী, কানপুরে থাকতো। কাশী গিয়েছিল। লম্বা শ্যামবর্ণ চেহারা। কপালে একটা কাটা দাগ আছে। বাঁ ভুরুর ওপরে।' কেউ বলে, 'জানি জানি। সে বিহারে পালিয়েছে। সেখান থেকে নেপাল যাবে।'

চম্পা বলে, 'তবে সে অন্য কোন চন্দন হবে!'

কেউ বলে, 'একজন চন্দনকে জানি আমাদের দলে ছিল। ফর্সা রঙ, গোঁফ আছে।'

'সে নয়, সে নয়।'

তারপর একদিন একজন প্রৌঢ় পাঠান এল। চম্পা তাকে কুয়ো থেকে জল তুলে দিল। হালুইকরের দোকানে ঝাঁপ খোলা ছিল। কয়েকটা বেসমের লাড্ডুতে মাছি ভন ভন করছে। তাই চেঁছে চেঁছে লোকটি খেল।

কুয়োর জলে হাত মুখ ধুয়ে সে যখন এল, তখন চম্পা তাকে চিনতে

ারল। বলল, 'তুমি সেই দফাদার না? আমার কাছে টাকা ধার নিতে সেছিলে চন্দনের সঙ্গে?'

লোকটি কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'চম্পাবাঈ!'

'হ্যাঁ। তুমি, তুমি কি চন্দনকে দেখেছ?' চম্পা প্রায় কেঁদে ফেলল।

লোকটি পাগড়ী নেড়ে নেড়ে বাতাস খেল। তারপর বলল, হ্যাঁ দেখেছি। স কানপুরে আসছে।'

'কোথায় দেখেছ? কবে দেখেছ? আমি এগিয়ে গেলে কি তার দেখা পাব?'

'চম্পাবাঈ, সে একলা নয়! তার সঙ্গে লোক আছে। তারা মাঠ দিয়ে ক্ষেত দিয়ে, রাতে রাতে লুকিয়ে আসছে। দিনমানে চলতে পারে না, তাই দেরি হয়। তুমি এগিয়ে কোথায় যাবে?' তারপর স্বগতোক্তি করল, 'ওদের শেয়ালে খাবে, শকুনে খাবে। কাণপুরে এলে মরবে, তবু আসছে শালারা!'

'তুমি কেন এলে?'

আমি তাড়া খেয়ে এসেছি।'

যাবার সময়ে সে হাসল। নিরানন্দ এবং ভীষণ হাসি। বলল, 'অবশ্য এলেও মরবে, না এলেও মরবে। মৃত্যুকে কেউ এড়াতে পারবে না। আমিও না।'

সে চলে গেল। তার লোহার নাল-পরা বুট পাথর বাঁধানো রাস্তায় ভীষণ শব্দ তোলে।

চম্পা তার ঘরে ফিরে আসে। সম্পূরণ নেই, ঘরটা শূন্য। দরজা জানলা খোলাই থাকে, চম্পা বন্ধ করে না। সর্বত্র ধুলো। লক্ষ্মীছাড়া বাতাস ঘরের ভেতর শুকনো পাতা ওড়াচ্ছে। ধুলো সরিয়ে চম্পা আয়নায় মুখ দেখল। নিজেকে চিনতে পারল না।

ছাব্বিশ

এলাহাবাদে এসে নীলের ফৌজ গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে ফোর্টটি দখল করে। মৌলবী লিয়াকৎ আলী স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন।

নীল এলেন। তাঁর পেছনে পেছনে শকুন ও চিল উড়ে এল। গোরা ফৌজ এবং শিখ সৈন্যরা গ্রামের পর গ্রামে ঢুকে নির্বিচার নরহত্যা শুরু করলো।

এলাহাবাদে চকের বুকে এক সুবৃহৎ বটগাছে ঝুলতে লাগল মৃতদেহ। দুরন্ত গরম।

নীল তাঁবু ছেড়ে বেরোন না। বাইরে থেকে শান্ত্রী বা কোন অফিসার বলেন, 'ত্রিশ! পঞ্চাশ! পঁচিশ!'

নীল তাঁবুর ভেতর থেকে চেঁচান, 'লট্‌কাও! হ্যাং দেম্!'

'এরা লড়তে চেষ্টা করছে। শেকল সুদ্ধ হাত তুলে শান্ত্রীদের মারছে।'

'ব্লো দেম্! কামানের মুখে উড়িয়ে দাও।'

কামানের ভেতর বারুদ ঠাসা হয়। বন্দীদের পিছমোড়া করে বাঁধা হয়।

'এক!'

বন্দীদের মুখ নীল হয়। মুখ দিয়ে ফেনা গড়ায়।

'দুই!'

তারা চোখ ভাটার মতো ঘোরায়। তারা বিড়বিড় করে ভগবানকে ডাকে। অফিসাররা হাসেন। উরুতে চাপড় মেরে হাসেন এবং বলেন, 'দেখ দেখ ঐ শালা পেচ্ছাব করে ফেলেছে।' তারপর কামান দাগার হুকুম দেন। বিকট আর্তনাদ ওঠে। টুকরো টুকরো মাংসপিণ্ড ছিটকে পড়ে তাজা গরম রক্তমাখা একটা ছিন্ন মস্তক চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে আসে। তখন দ্বিতীয় দলকে টেনে আনা হয়।

অফিসারা চ্যাঁচান এবং হাসেন। কোন কোন বন্দী সে অবস্থাতেও শিখ সৈন্যদের বলে, 'শালা আমাদের মেরে মজা দেখছিস? যা, সাহেবদের বিষ্ঠা চেটে খা! সাহেবেরা তোদের সাতজন্মের বাপ। তাই আম্বালা, উজনালা, শিয়ালকোট, ঝিলমে তোদের কুত্তার মতো মেরেছে।'

শিখ সৈন্যরা বলে, 'আরে বুড়ো, খুব থুথু ছেটা, তোর মড়ার উপর থুথু পড়বে।'

সন্ধ্যাবেলা তাঁবুতে বসে সেইসব ইংরেজ অফিসাররা বড় বড় কলম নিয়ে কলকাতা বা ইংলণ্ডে চিঠি লেখেন, 'আমাদের শিখগুলো ভারী ফূর্তিবাজ, জানলে মা? গ্রামে গ্রামে নিগারগুলোকে মেরে মজা করে আবার আমাদের কাছে এসে জমিয়ে গল্প করে।'

'এমিলিয়া, প্রাণের এম, এমি, এমা, আমার সাধের বুলবুলি! তোমার ডেভিড এখন ভীষণ, ভী···ষণ ব্যস্ত। নেটিভ বদমাশগুলো মাঝে মাঝে

যে রকম কান্নাকাটি করে দেখলে পরে ওদের উপর ঘেন্নাই হবে। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে জ্বলছে, বাঁশ ফাটছে, নেটিভ মেয়েগুলো কাঁদছে, সে এক মজার দৃশ্য! এমিলি, তুমি আমার জন্যে ভেব না। আমি এই ক'দিনে প্রায় সত্তর জন নেটিভকে নিজে মেরেছি। সম্মানের পদক বা অন্য কোন চিহ্ন নিশ্চয়ই পাব।'

'বাবা, আপনার চিঠি পেয়েছি। হ্যাঁ, আপনি যা লিখেছেন তা আমি মনে রাখি এবং বিশ্বাস করি। আপনি লিখেছেন, "মনে রেখো বার্টি, তোমাদের এই যুদ্ধ ইতিহাসে কীর্তিত হবে। ঐ অসভ্য মহাউপনিবেশে তোমরা ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করছ। ভয় পেওনা, যুদ্ধ কর। যদি যুদ্ধে তোমার মৃত্যুও হয়, তাহ'লে আমিই সর্বাগ্রে গৌরবান্বিত বোধ করব।" চিঠিটি আমি যাদেরই শুনিয়েছি তারাই আমার পিতৃভাগ্যকে অভিনন্দন জানিয়েছে। না। কানপুরের 'রক্তপায়ী দানব, সেই ব্লাড ফীন্ড' নানা সাহেবকে আমরা ধরতে পারিনি। তবে চিন্তা করবার কারণ নেই। আপনি নিশ্চয় জানবেন প্রত্যেকটি ইংরেজ তার দেহে শেষ শোণিতবিন্দু থাকা পর্যন্ত কানপুরের বীভৎস নারকী লীলার প্রতিশোধ নেবে। একটি ইংরেজের জন্যে পাঁচশো নিগারের মাথা নেওয়া হবে। আপনাকে লিখতে লজ্জা করছে, আমাদের মধ্যে কয়েকজন দুধখেকো মেনিমুখো বুড়ো জঙ্গী আছেন। তাঁরা মনে করছেন আমাদের এই সব কাজ ক্রীশ্চিয়ানদের যোগ্য নয়। আমরা না কি ক্রীশ্চিয়ানিটি এবং ক্রাইস্ট-এর বিরুদ্ধে অপরাধ করছি।'

এই সব তরুণ অফিসাররা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিভূ মনে করলেন। প্রত্যেকেই যেন কোম্পানীর উপনিবেশের এক একটি স্তম্ভ বিশেষ। তাঁদের কৃতিত্বের উপরই যেন সাম্রাজ্যের বনিয়াদ তৈরী হবে।

আবার কতিপয় মুষ্টিমেয় ইংরেজ, যাঁরা ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের আত্মীয়তা পাতিয়েছেন, তাঁরা অনুভব করলেন তাঁরা অকেজো হয়ে গেছেন। তাঁরা কিছুতেই এই নিধন যজ্ঞে সায় দিতে পারছেন না।

ম্যাকমোহনকে দেখে দেখে সবাই টিটকিরী দিল। বলল, 'বুড়ো অকেজো! ওর পাদ্রী হওয়া উচিত, নইলে বনে যাওয়া উচিত!'

সত্তর বছর বয়সে ম্যাকমোহন উপলব্ধি করলেন তাঁর পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তিনি কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছেন না। 'ফিফটি ইআর্স ইন ইণ্ডিয়া'র অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি, মৌসুমী পাখীদের গতিবিধি, অ্যাকাশিয়া গাছে ফুল ফোটবার সমারোহ, ছোট ছোট কালো কালো ছেলেমেয়ের কান ও দাঁতের ব্যথা সারানো. এই ছিল তাঁর জীবন।

সে জীবনটাকে ফেলে আসতে হয়েছে।

ম্যাকমোহনকে একজন বলেছেন, 'you have to unlearn yourself' কিন্তু চাইলেই কি যা শিখেছেন সব ভুলে তিনি নতুন করে নতুন রীতি শিখতে পারেন? সব কি ভোলা যায়? কেমন করে তিনি ভুলবেন মালীর ছেলেটাকে তিনি রোজ বলেন, তবু ও দাঁত দিয়ে নখ কাটে। তিনি তার নখ কেটে দেন যখন, যখন তার কানে তুলো দিয়ে পরিষ্কার করে দেন, সে তাঁর দিকে গম্ভীর ভাবে চেয়ে থাকে। ওর চোখটা বড় কালো, বড় গভীর। একদিন সে ওকে মস্ত একটা প্রজাপতি এনে দিয়েছিল। বলেছিল, 'তিত্‌লী, সাহেব তিত্‌লী! ধরো ধরো, পিন ফুটিয়ে গেঁথে রাখ। তুমি জ্যান্ত তিত্‌লীতে পিন ফোটাও না, দেখ এটা মরা!'

ছেলেটা সুযোগ পেলেই তাঁর ছিপটা চুরি করে পালায়। কেমন করে সে সব কথা ভুলবেন?

বুড়ো ম্যাকমোহন।

অল্পবয়সেই চুলগুলো পেকেছিল। যে কটা কাঁচা ছিল, একমাত্র বোন যখন ব্রাইটের বাবাকে, সেই কলঙ্কিতজন্ম মানুষটাকে বিয়ে করল, তার ভাবনা ভাবতে ভাবতে তাঁর বাকি চুলগুলো পাকে। তাঁকে সবাই বলতো বুড়ো ম্যাকমোহন। সামনে নয় আড়ালে বলতো।

অনেক কথা মনে পড়ে।

তাঁর খুব বাত ছিল। তাঁকে খুব কষ্ট দিত বংশানুক্রমিক ব্যাধিটি। যে বছর নেপালের যুদ্ধ হয়, তরাই-এর জঙ্গলে ঘোর বর্ষা নামে। একদিন, তাঁরা যখন ঘনজঙ্গলে রাত পোহাচ্ছেন, বাতের ব্যথা ত বটেই, সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও হয়। চমন তাঁকে জোর করে খাটিয়ায় ধরে রাখে এবং পায়ে জোঁক লাগিয়ে দেয়। সবুজ জোঁকগুলো দেখে তাঁর ঘেন্না করছিল। তিনি রেগে চমনকে বলেছিলেন, 'হারামজাদা, আমি তোমার গলায় জোঁক পেঁচিয়ে দেব।'

কিন্তু জোঁকগুলো যেমন রক্ত খেয়ে মোটা হয়ে হয়ে পড়ে গেল, তাঁর ব্যথাও কমে যায়। পরে চন্মনের কথা মতো গাওয়া ঘি-এ রসুন ভেজে খেয়ে তিনি উপকার পেয়েছিলেন। সে সব কথা কি ভোলা যায়?

তাঁদের অনেক ঝামেলা সইতে হতো, অনেক কষ্ট করতে হতো। তখন যে কত যুদ্ধই করতে হয়েছে, কি সব পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। খাবার নেই, পচা সবুজ জল। জল ফুটিয়ে খেতে হয়। বুনো হাতী এসে তাঁদের মালবাহী হাতীদের ক্ষ্যাপায়। আর কি অজস্র সাপ!

সে ভাবারের জঙ্গলের কথা। বোধহয় ১৮৩২ সাল হবে। না তেত্রিশ? মনে পড়ে না। সেবার তাঁকে সাপে কামড়েছিলো।

তিনি সাহেব, বিধর্মী। তিনি ম্লেচ্ছ। তবু তাঁর পা চুষে মহাবৎ বিষ বের করে নেয়। রাতে তাঁর ঘুম পাচ্ছিল। ঘুমোলে সাহেব মরে যাবেন বলে মহাবৎ আর তেজপাল তাঁর বগলের নীচে ধরে শুধু হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তবু ঘুম আসে। তখন মহাবৎ তাঁকে কাঁচা বাঁশের ছপটি দিয়ে মারে। মেরে মেরে জাগিয়ে রাখে। সকালে চোদ্দমাইল দূরে প্রধান ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

ডাক্তার লোহা পুড়িয়ে ক্ষতস্থানটা শোধন করেন আর পটাশ পারমাঙ্গানেট দিয়ে বেঁধে দেন। পরে তাঁর কাছে এসে মহাবৎ বোকা বোকা মুখে বলেছিল, 'খুব দোষ হয়েছে আমার। হুজুরের গায়ে হাত তুলেছি।'

কাঁচা গাছের ডালের ডুলিতে বয়ে নিয়ে যেতে যেতে ওরা নাকি তিরিশ বার ডুলি নামিয়ে তাঁকে দেখেছিল তিনি ঘুমোচ্ছেন কি না!

আবার চন্মনের কথা মনে পড়ে। চন্মন সতেজে বলেছিল, 'ঝড় উঠলে গাছ ভাঙে সে সব কথা ঝুট হুজুর। হনুমানজীর বাবা পবন দেব ছেলেকে দেখতে আসেন, তাঁর তেজে ঝড় ওঠে। তাঁর তেজে গাছ ভাঙে।'

ম্যাকমোহনের মনে হয় ওদের অন্তরে পৌঁছবার জন্যে তাঁকে কত বছর ধরে পথ চলতে হয়েছে।

'ঐ দেশ বর্বর ও অনুন্নত। ঐ দেশকে সভ্য করতে হবে।' এই সব নির্দেশ ভুলতে তাঁর বেশী দিন লাগেনি। তিনি এদের ভালবেসেছেন, এদের ভালবাসা পেয়েছেন।

তিনি ধর্মযাজক নন, সমাজসেবী নন, শিক্ষাব্রতী নন। তিনি অতি সামান্য একটি মানুষ। ১৮০৭ সালে তিনি বোম্বাই-এ এসে নেমেছিলেন।

তারপর থেকে তাঁকে শুধু পথ চলতে হয়েছে, শুধুই পথ চলতে হয়েছে। আফগানে যেতে হয়েছে, পাঞ্জাব এবং নেপাল, কুমায়ুন এবং বুন্দেলখণ্ড, কত পথই যে তিনি হেঁটেছেন। সেই সময় এদের সঙ্গে মিশতে মিশতে ভালবাসতে বাসতে একদিন তিনি ভারতবর্ষকেই অধিকার করে ফেললেন। তাঁর পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতায় লিখলেন, 'আমি ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছি। মানুষকে ভালবাসা, পরধর্মসহিষ্ণুতা, ক্ষমা, সহনশীলতা, নম্রতা, কঠোর শ্রম করবার অভ্যাস, নির্লোভিতা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ও নারীদের শ্রদ্ধা করা, এ যদি কোন জাতির সভ্যতা বিচারের মাপকাঠি হয়, তা হ'লে আমি বলব অন্তরের দিক থেকে এরা অতি উন্নত, অতি সভ্য।'

তিনি আরো লেখেন, 'খ্রীষ্ট যখন তাঁর ক্রুশ কাঁধে নেন, তখন তিনি যে কয়টি পদক্ষেপে বধ্যভূমিতে গিয়েছিলেন, সেই অন্তিম পদক্ষেপ কয়টিই তাঁকে চিরদিনের মতো মানুষের অন্তরে পৌঁছে দিয়ে গেছে। আমি এদের ভালবেসেছি। আমি বিশ্বাস করি এই ভালবাসা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমার শ্বেত ত্বক্ নিয়ে আমি এদের অন্তরে প্রবেশের অধিকার পেতাম না। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পর মনে হয় এদের ভালবাসতে হবে। এদের ভালবাসা করজোড়ে চাইতে হবে। তাহ'লে ওরা আমাদের কাছে আসবে, আমরাও ওদের কাছে যেতে পারব। অন্য কোন পন্থা নেই, অন্য কোন উপায় নেই।'

তবু ম্যাকমোহনকে যুদ্ধে নামতে হল।

'আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম না। আমি সৈনিক। আজ্ঞা বহন করা আমার ধর্ম। কিন্তু আজ আমাকে যে ভূমিকায় নামতে হয়েছে, তার গুরুভার আমি বহন করতে পারছি না। জহ্লাদ ও হত্যাকারী। শেষ বয়সে এই পরিচয় কি আমার সব পরিচয় মুছে দেবে?'

আজ যদি সেই সব মানুষ থাকত? সেই সব বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক— সিপাহী ও সওয়ার? তাদের যদি অমনি ক'রে কামানের মুখে বাঁধা হত?

ম্যাকমোহন তাঁর পলিতকেশ মাথা নাড়েন। কপালে হাত চালান। তিনি যে বিশ্বাস হারিয়েছেন। আজ তিনি যখন চকের পথে, কোতোয়ালীতে, দারাপুরের রাস্তায়, পাপামৌয়ের অতি পরিচিত অতি প্রিয় পথে ঘোড়া নিয়ে চলেন, তাঁকে দেখে মেয়েরা, বৃদ্ধারা, শিশুরা সভয়ে সরে যায়। তাঁর নামতে এবং নতজানু হতে ইচ্ছে করে।

তিনি নামেন না, নতজানু হন না। মাথা সোজা রেখে চলেন তিনি, ওদের চোখে আতঙ্ক দেখতে দেখতে। ওরা সরে যাচ্ছে। অনেক দূরে।

তিনি ফিরে আসেন। ভোজন ও পানরত আত্মতৃপ্ত, কঠোর কর্মী ইংরেজদের দেখেন। কথা কন না। তিনি বুঝতে পেরেছেন আজ থেকে এই মহাদেশের ওপর ইংরেজরা তাদের সকল অধিকার হারাল। অত্যাচারে ও ঘৃণার প্রাচীর দিয়ে দুই জাতিকে দু'দিকে রাখা হলো। হ্যাঁ। অত্যাচারে ওরা হয়তো আজ নিষ্পিষ্ট হবে। কিন্তু আর ওরা কাছে আসবে না। ওরা ইংরেজদের শুধু ঘৃণা করবে, ইংরেজরা ওদের শুধু ঘৃণা করবে। এরা এবং ওরা দু'পক্ষ-ই দু'পক্ষকে অবিশ্বাস করবে। যেখানে বিশ্বাস থাকবে না, সেই বিশ্বাসহীন নৈরাজ্যে কতদিন এক সঙ্গে থাকতে পারা যাবে?

একা ম্যাকমোহন এ সব কথা ভাবেন।

এর পর থেকে একটি মালীর ছেলে এসে তাঁর হাঁটুতে হাত রাখতে চাইবে না. চম্মন এসে তাঁকে নিঃসঙ্কোচে ঘি ও বেসমের লাড্ড হাতে তুলে দেবে না।

'সে ভীষণ ক্ষতি! অপূরণীয় ক্ষতি! দিল্লী এবং সমস্ত রাজাবাদশার ট্রেজারী লুঠ ক'রে সমস্ত ভারতের ওপর লেভি বসিয়ে, কোটি কোটি টাকা যদি দাও তা হ'লেও ইংরেজের সে ক্ষতি পূরণ হবে না।' তিনি চেঁচিয়ে বলেন। শূন্য তাঁবু। তাঁর কথা কেউ শোনে না।

তিনি চুপ ক'রে যান। চম্মনের হাত ধরে আর জঙ্গলের সুঁড়িপথ পেরোন যাবে না, বৃদ্ধা মতির মা-কে পেটব্যথায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে হাত ধরে বাংলোর সিঁড়ি ক'টা সযত্নে আর নামিয়ে দেওয়া যাবে না, এ ক্ষতি যে কত বড় ক্ষতি, তাঁর নয়, ভারতবাসী ইংরেজের নয়, সমস্ত ইংরাজ জাতের পক্ষে এ ক্ষতি যে কত বড় তা বোঝবার মতো আর একটি ইংরেজও আশেপাশে নেই।

'না। ভাবতে ভাবতে আমি পাগল হয়ে যাব। আমি ভাবব না। আজ, ১৮৫৭ তে আমাদের মতো ইংরেজদের আর দরকার নেই। আমরা এম্পায়ার গড়ে দিয়েছি। আমাদের নিরানব্বুই জন হয় তো অত্যাচার করেছে, আমার মতো একজন হয় তো ভালবেসেছে। কিন্তু সেই একজনই বাকি নিরানব্বুই জনের চেয়ে এই এম্পায়ার গড়তে সাহায্য করেছে বেশী। আজ আর

আমার, এবং আমাদের আর প্রয়োজন নেই। এখন থেকে ঐ নীল, ঐ কুপার, ঐ নিকলসন এবং এই ব্রাইট—এদেরই দরকার।'

ব্রাইটকে এতদিন কতকগুলো বিরুদ্ধশক্তি হাত পা বেঁধে রেখেছিল। ব্রাইট নিজেকে বিকশিত করতে পারছিল না। এবার, এই ১৮৫৭-তে সে নিজের বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পেল।

এতকাল তার অনেক বাধা ছিল। এখন আর কোন বাধা নেই।

তার বাবার শরীরে নেটিভ রক্ত ছিল বলে তাকে সবাই হীন চোখে দেখতো, তা সে ভোলেনি।

এখন সে এই নেটিভদের সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক অস্বীকার করবার এক চূড়ান্ত সুযোগ পেয়েছে।

হত্যা, নির্বিচার নরহত্যায় যে এত আনন্দ পাওয়া যায়। এতরকম অবরুদ্ধ কামনাবাসনাকে মুক্তি দেওয়া যায় তা সে জানত না। ব্রাইট এবং তার অনুগত সওয়াররা বর্তমানে 'সারপ্রাইজ অ্যাটাক'-টা পছন্দ করছে।

আগে-আগে খবর সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। তারপর হঠাৎ গিয়ে পড়তে হয়। পুরুষ ও বালকদের হত্যা করো। বালকদের বিশ্বাস ক'রো না। ওরা এক একটি গোখরো সাপের বাচ্চা। মেয়েরা কাঁদছে? চুল ছিঁড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। দিক। তাদের গায়ে হাত দিও না। মেয়েদের অসম্মান করতে নেই।

লুঠ করবার-ও নিয়ম আছে। রুপোর টাকা, রুপোর জিনিস তার সওয়াররা নেবে। সে শুধু সোনার মোহর, সোনার জিনিস নেবে।

এক একটি 'সারপ্রাইজ অ্যাটাক'-এর পর ব্রাইট যখন ফিরে আসে তাকে তরুণ অ্যাপোলোর মতো দেখায়। নীল চোখ, সোনালী চুল, অতি সুশ্রী মুখে সোনালী কুঞ্চিত দাড়ি। তাকে দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে একঘণ্টা আগে বন্দীদের মারতে মারতে কুৎসিততম ভাষায় গাল পাড়ছিল এবং যে ঠাট্টা করছিল তা রেজিমেন্টের বেশ্যাদের-ও লজ্জা দেয়।

যার যার সঙ্গে পুরনো হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দেবার আছে, এই সময়ে ব্রাইট তাদের খুঁজছে। আগে আগে কোন কোন রেজিমেন্টে সে টাকাপয়সা নিয়ে ফেঁসেছে, সে সব কথা যারা জানে তাদের এই সুযোগে যত সরিয়ে

দেওয়া যায় ততই ভাল। সে সব লোক মরে গেলে আর তাকে কেউ বিপদে বা লজ্জায় ফেলতে পারবে না।

আসলে এটা হ'ল বীরত্ব দেখাবার, সম্মান অর্জন করবার সময়। অনেক সময়ে ভেবেছে এই সময়ে সেই হতভাগা, বুড়ো গাধা চম্মনকে পেলে ভাল হতো। লোকটা পি-হাবিলদার থাকবার সময়ে ব্রাইটকে যে বিপদে পড়তে হয় তা সে ভোলেনি। তাকে অপদস্থ ও লজ্জিত হতে হয়। ম্যাকমোহন সেই থেকেই তাকে বিষ নজরে দেখলেন। তাঁর সঙ্গে ব্রাইটের মন-কষাকষি হয়ে গেল এবং হুম ক'রে ম্যাকমোহন তাঁর উইল পালটে বসলেন।

এখন চম্মনকে পেলে বেশ হতো।

কানপুরে সে যা জমিয়েছিল, সে-সব নাকি লুঠ হয়েছে। শুনেছে ব্রিজদুলারী নাকি গয়নাপত্র নিয়ে পালিয়েছে। শুনে খুশী হয়েছে। হাজার হোক, নেটিভ মেয়েগুলো বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে জানে।

কিন্তু চম্মন! চম্মনকে যদি পাওয়া যেত। একবার যদি পাওয়া যেত!

সাতাশ

চম্মন খুব বিপদে পড়ে।

সে বেরিলির যুদ্ধের খবর পায়। তারপর আশপাশের কিছু কিছু খবর পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়। এ কি সত্যি হতে পারে?

সাহেবদের যে অনেক ক্ষমতা। কোম্পানী সরকার যে সিপাহীদের মা-বাপ। তারা কি সে-সব কথা ভুলে গেল? হ্যাঁ, সিপাহীদের অনেক দুঃখ আছে বটে। কিন্তু তা ব'লে তারা এ দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবে তা কি সম্ভব?

প্রথমটা সে ব্যাপারটির সম্যক গুরুত্ব বোঝেনি।

তারপর একদিন বেরিলি থেকে সাহেবরা পালিয়ে এল। মেম, ছেলে-মেয়ে, চাকরবাকর নিয়ে তারা চলে গেল নৈনিতাল। একজন বলল, 'বুড়ো, তোমার স্বদেশীয়রা আমাদের ঘরবাড়ী জ্বালাচ্ছে, ক্যান্টনমেন্ট পোড়াচ্ছে। তুমি যদি বাঁচতে চাও, পালাও। আর তুমি যদি…'

চম্মন জিভ কেটে মাথা নাড়ল। যাবার সময়ে সাহেবদের সে জিজ্ঞাসা করল তাঁদের কাছে বন্দুকের টোটা আছে কি না! সাহেবরা তাকে টোটা দিলেন না।

তারপর আশপাশের জঙ্গল থেকে গ্রামবাসীরা পাহাড়ের গুহায় এবং অন্যত্র পালাতে লাগল। কি হবে তারা বলতে পারে না। তারা শুধু বলে 'খুব বিপদ হবে, ভারী বিপদ! বেরিলি থেকে কিছু কিছু বাঙালী বাবুরাও নৈনিতাল গেলেন। তাঁরা বললেন, 'তুমি নিজে আত্মরক্ষা কর।'

'কিন্তু এই সাফাখানা যে আমার জিম্মায়!'

'জিম্মায় ত' কি হয়েছে? তুমি না পালালে ওরা এসে বলবে সাহেবদের সাফাখানা পাহারা দিচ্ছ? আবার সাহেবরা এসে বলবে তুমি নিশ্চয় ওদের সাহায্য করেছ। হয় এদের হাতে নয় ওদের হাতে নাকাল হবে তুমি, জানলে?'

চন্দন মহাবিপদে পড়ল।

সাফাখানায় আসবাবপত্র রয়েছে, বাসন কোসন, ফুলের টব, ওষুধপত্র, হরিণের মাথা, বাঘের চামড়া, কার্পেট এবং পর্দা। ঐ দেওয়ালে একটি ছবি আছে। একটি বালক একটা জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে, তার চারিপাশে আগুন জ্বলছে। ছবিখানাই বা সে কোথায় রাখবে? ঐ অর্কিডের টবগুলো না কি খুব দামী। কোথায় রাখবে এ সব, কার হেফাজতে রেখে যাবে চন্দন?

অনেক ভেবে চন্দন তার কাঠ রাখবার গুদাম ঘরটা খালি করল। এ ঘরটার দরজা ভারী কাঠের, তাতে লোহার বোলটু বসানো। কাঠগুলো টেনে এনে বাইরে ফেলতে তার বেশ কষ্ট হল। ঘরটা ঝাঁট দিল সে। তারপর কার্পেট গুটিয়ে আনল সেখানে। হরিণের মাথা এবং বাঘের চামড়া, বাসন-কোসন, ওষুধপত্র, তোষক, গদী ও পর্দা, বাথরুমের ড্রাম, মগ সবই টেনে টেনে আনল। অনেক চেষ্টা করে ভারী ছবিখানাও আনল। সব আসবাব আনা গেল না। টিপয়, চেয়ার, টুল, টুপী রাখবার র‍্যাক সবই সে নিয়ে এল। তারপর গুদাম ঘরটিতে তালা দিল।

ফুলের টবগুলো বারান্দা থেকে নামিয়ে রাখল। অর্কিডগুলো এনে আপেল ও অ্যাকাশিয়া গাছের ডালে বাঁধল। ক'দিন রোদে শুকোবে, তাতে পুড়বে, তারপর বিষ্টি নামলে গাছগুলো বাঁচবে।

হঠাৎ চোখ পড়লো বাগানের কোণে। তাইত! কোদাল, খুরপী, ঝুড়ি, ঘাস নিড়োবার কাস্তে এগুলো সে ফেলে যাচ্ছিল? সব ঘরে নিয়ে গেল চন্দন। তারপর ঘরগুলি বন্ধ করল। হল ঘরের দরজায় তালা দিল।

একটি চাবি নিজের কাছে রাখল, আর একটি চাবি বারান্দায় কাঠের শিলিংয়ে রাখল।

তারপর সে নিজের জিনিস গুছাতে লাগল।

বড় খাকী একটা ব্যাগে তার দু'প্রস্থ জামা কাপড় নিল। ম্যাকমোহনের লেখা চিঠি এবং সার্টিফিকেট, তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন কলিন্সের চিঠি। টাকা জমিয়ে সে তিনটি মোহর কিনেছিল তা পেট-কাপড়ে বেঁধে নিল। একটা ছোট পেতলের হাঁড়ি, একটা পেতলের ঘটি ও একটা পেতলের থালা নিল। চকমকি সঙ্গে রাখল। চাল, ডাল, আটা, লবণ, গুড়, ঘি, আলু, হলুদ, এ সব সে তার অনুগত সেই কাঠুরে পাহাড়ীটিকে দিয়ে দিল। সঙ্গে শুধু শুকনো গুড় রাখল কিছু। তেষ্টা পেলে গুড়জল খেতে চন্দন ভাল বাসে। সে ভাবল খাবার জিনিস কষ্ট ক'রে বয়ে কাজ নেই। পথে চাইলে যে-কোন গৃহস্থই চাল, আটা, ঘি, লবণ এবং ডাল দেবে। ইচ্ছে হলে সে রেঁধে খাবে। ইচ্ছে হলে কারো বাড়ীতে বসে খাবে।

চন্দন ডেরাপুর ফিরে যেতে চায়।

শরীরের ভেতর কোথায় যে মনটা থাকে! আবার মনের ভেতরও যেন আর একটা মনের বাস। এখন চন্দনের শুধু গ্রামে ফিরতে ইচ্ছে করছে। অথচ গ্রামকে সে কত ঘৃণাই না করেছে!

চন্দনের মনে হচ্ছে বড় অশান্তি চারিদিকে, বড় গোলমাল। এই সময়ে ঘরে থাবার দরকার। নিজের ছেলে, নিজের বৌ, নিজের সংসার এদের আঁকড়ে ধরা দরকার। নইলে কেমন করে সে জোর পাবে!

তার ছেলে প্রতাপ! প্রতাপের জন্যে আজ তার মন কেমন করছে। দুর্গার জন্যে মন কেমন করছে। মুখরা বৌ-টি তাকে কি সেবাযত্নই করে! কত রকম আচার, পাঁপড় বানিয়ে তার সঙ্গে দিয়ে দেয়। সর তুলে ঘি তৈরী ক'রে পেতলের প্যাঁচ দেওয়া ঘটিতে দিয়ে দেয়। নতুন কাপড়ের টুকরোয় মিষ্টি বেঁধে দেয়। 'চন্দন, তোর দাদাকে আর ক'টা দিন থাকতে বল'—এ কথা ব'লে সে চোখের জল ফেলে।

প্রতাপ আর দুর্গার জন্যে তার মন খারাপ হয়েছে। ওরা ত' আর কিছু চায়নি, সবাইকে নিয়ে সংসার করতে চেয়েছে।

'চন্দন ওদের মনে বড় ঘা দিয়েছে।'

এবার যদি সে পারে, চন্দনকে যেমন ক'রে হোক ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

সে নিজেও আর ডেরাপুর ছেড়ে আসবে না। তার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করছে। কেবলই গলা শুকোচ্ছে, কেবলই তেষ্টা পাচ্ছে।

চম্মন প্রথমে স্থির করে নেয় সে দক্ষিণে নেমে পিলভিত যাবে। পিলভিত থেকে আরো দক্ষিণে নেমে ডাকগাড়ীর পথ ধরবে। এমনি ক'রে সে একদিন নির্ঘাৎ কানপুরে পৌছবে। আর কানপুরে একবার পৌছতে পারলে ডেরাপুরে যেতে আর কতদিন বা।

কিন্তু সে যেমন নামতে থাকল, অমনি সে বুঝল এ পর্যন্ত সে কিছুই বোঝেনি। বড় বড় গ্রাম, হাট, সব জনশূন্য। মানুষ নেই। দরজা জানলা খোলা। জামাকাপড, বাসন, চাল ডাল, সবই পড়ে আছে। গাই বাছুর তারা ছেড়ে দিয়ে গেছে। যে গুলো বাঁধা আছে তারা চোখতুলে তাকিয়ে আছে। চম্মন গরুগুলোর দড়ি কেটে দিল। প্রথমে সে ভেবেছিল বোধহয় কোন মানুষ-খেকো বাঘ এসে গ্রামে হানা দিয়েছে। পরে বুঝল এর নাম বলওয়া বা বিপ্লব। কি হবে, কি হতে পারে, তা দেখবার জন্যে অপেক্ষা না করেই মানুষগুলি পালিয়েছে। আরো একবেলার পথ যেয়ে চম্মন দেখল সেই মস্ত হাটতলার চালাগুলো দেখা যাচ্ছে।

সে আশ্বস্ত হল। ওখানে অনেকেই তার চেনা। তারা নিশ্চয় তাকে আশ্রয় দেবে এবং কোন পথে যাওয়া উচিত, তা বাতলাবে।

কিন্তু নির্জন হাটতলা। চালাঘর খাঁ খাঁ করছে। মানুষ নেই জন নেই। কুমোরের মাটির হাঁড়ি কলসী ভেঙে পড়ে আছে, নয়তো গড়াগড়ি যাচ্ছে। চালের গুদাম লুঠ হয়েছে। চম্মন দেখতে পেল চাল, চিনি, আটা পড়ে আছে ছিটিয়ে। বস্তা নিয়ে যাবার সময়ে বোধ হয় পড়ে গেছে। হাটের আঙিনা ঘোড়ার খুরের আঘাতে চষা জমির মতো ক্ষতবিক্ষত। দেওয়ালে দেওয়ালে গুলীর দাগ। শূন্য কার্তুজের খোল গড়াগড়ি যাচ্ছে।

চম্মনের মাথা ঘুরতে লাগল। সে দেখল একগাছা দড়ি পড়ে আছে। দড়ি নিয়ে সে ইঁদারার পাড়ে গেল। ইঁদারার জল মাথায় দিয়ে, খেয়ে, তবে যদি সে একটু সুস্থ বোধ করে।

ইঁদারার থেকে দূরে, একটা খড়ের গাদার নীচে মানুষের পা দেখে চম্মন ভয়ে সাদা হয়ে যায়। সে এগিয়ে যায়। তারপর তার মাথা ঝিমঝিম করে। এই ডাকহরকরাটি জাতে গাড়োয়ালী। পাহাড়ের পথঘাট চেনে, সহজে চলাফেরা করতে পারে সেজন্য একে রাখা হয়। চম্মন ত একে সাতদিন

আগেই দেখেছে। তাকে এমন করে কাটল কে? গলাটা এদিক থেকে ওদিক চেরা। মাথাটা পেছনে হেলানো। মানুষটা রোগা। এখন ফুলে ঢোল হয়েছে। চম্মন সভয়ে দেখল তার চোখের কোটরে পিঁপড়ে থুকথুক করছে।

'রাম রাম!'

বলে সরে এল চম্মন। অনেকক্ষণ সে মাথা তুলতে পারল না। তারপর সে উঠল। ইঁদারা থেকে জল তুলে স্নান করল। জলপান করল। ঐ চাল ঐ ডাল তুলে খেতে তার প্রবৃত্তি হল না। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে কেন যেন তার মনে হল সে খুব বিপন্ন। সে কান খাড়া করল। তারপর কাঠবেড়ালীর মত ক্ষিপ্রগতিতে তরতর করে বাদাম গাছটায় উঠে পড়ল। অনেক ওপরে পাতার আড়ালে বসে সে নিঝুম হয়ে রইল। ঘোড়ার শব্দ কাছে এল।

প্রায় পঞ্চাশজন অশ্বারোহী। তাদের দেহ উন্নত এবং গৌরবর্ণ। পোশাক কারো লাল, কারো ধূসর, কারো নীল। তরোয়াল ও বন্দুক দুই-ই আছে। ঘোড়াগুলি বড় বড়। 'এরা বোধহয় রোহিলা পাঠান' চম্মন ভাবল। অশ্বারোহীরা মৃতদেহের গন্ধে নাকে হাত চাপা দিল।

তারা নিজেরা জল খেল। ঘোড়াকে খাওয়াল। এখন চম্মন দেখল ইঁদারার গায়ে আংটায় একটি বালতি আছে। আগে কেন তার চোখে পড়েনি তাই ভাবল সে! তারপর সে ভাবল ভালই হয়েছে। সে যদি ঐ বালতি ব্যবহার করত তা'হলে গাছের ওপর লুকিয়েও কোন লাভ হত না। ওরা ঠিক ওর উপস্থিতি টের পেত। তাদের কথাবার্তা সব বুঝতে পারল না চম্মন। তবে বেরিলী, হলদোয়ানী, কয়েকটা নাম শুনল। তারপর অশ্বারোহীরা ঘোড়ায় উঠল। একজন বলছিল, 'এ হাট লুঠ করা অন্যায় হয়েছে। দোকানীদের, ব্যবসায়ীদের ঢোল শহরত করে জানাতে হবে কোন ভয় নেই। তারা ফিরে আসতে পারে।'

তারা চলে যাবার পর চম্মন নামল।

সে বড় রাস্তা ধরতে সাহস করল না। কখনো জঙ্গলের পথে, কখনো গ্রামের পেছনের শুঁড়িপথে সে চলতে লাগল। প্রথমে তার আশা ছিল সে কানপুরে যেতে পারবে। পিলভিত, বেরিলী, সাহজাহানপুর, সাহাবাদ হয়ে মৈনপুরীর কাছে গঙ্গা পেরোবে, তারপর কানপুর যাবে।

দেখল তা অসম্ভব। বেরিলীতে ইংরেজ রাজত্বের চিহ্নমাত্র নেই। এই

সার্টিফিকেটগুলো ফেলে দিলেও তাকে কেউ হয়ত বিশ্বাস করবে না। মানুষ অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে তাকে ভয় দেখাতে লাগল। কখনো তারা বলল, 'খানবাহাদুর খান বেরিলীতে নবাব। তোমাকে দেখলে তোমার মুণ্ডুটি হাতীর পায়ের নিচে দেবে।'

চম্মন শুধু 'হায় রাম হায় রাম' বলল।

আবার অনেকেই বলল, 'বুড়ো তুমি আমাদের বাপের সমান, ভালকথা শোন। আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করিনি। অনুগত ছিলাম। ওরা আমাদের বিশ্বাস করেনি, তাড়িয়ে দিয়েছে। বুড়ো, যে সব অফিসার আমাদের চোদ্দ পনরো বছরের চেনা, তারাই যদি আমাদের এরকম অবিশ্বাস করে তোমাকে কে বিশ্বাস করবে? ভালকথা শোন, আমাদের সঙ্গে চল, ক'মাস না হয় লুকিয়ে থাকবে, তারপর যারাই জিতবে, না হয় তাদের কাছেই যেও। তোমার বাড়ী কানপুরের কাছে? সেখানে যাবে কি করে? একে ত আশেপাশে যুদ্ধ হচ্ছে। তারপর সাহেবরা সেখানে আসছে। তারা এসে পড়লে আর কি বাঁচবে? তারা কি কারো কথা শুনছে? ছোট ছেলে বুড়ো সবাইকে মারছে।'

চম্মন বলল, 'কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে। আমার ছেলে, আমার পুত্রবধূ, আমার নাতি তাদের কি আর দেখতে পাব?'

সে ভয়ে ও মনের চিন্তায় কেমন যেন শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তার মাথা যেন গোলমাল হয়ে গেল। যেখানে যে পথে সঙ্গী পায় সেই পথই ধরে। বিড়বিড় ক'রে বলে. 'আহা, আমার বুকের ভেতরটায় হাতুড়ী পিটছে, মাথা গোলমাল হয়ে যায়, এ আমার কি হল? হায় ভগবান, হায় রাম!'

শেষ অবধি বড়বাঁকি, ফৈজাবাদ, রায়বেরেলী হয়ে সে যখন এলাহাবাদের কাছে এল, তখন তার দেহ শীর্ণ। মুখে হায় রাম, হায় রাম, জপ করতে করতে সে এসেছে। তখন তার সঙ্গী নেই, সাথী নেই। ইংরেজদের আওতায় এসে পড়েছে। আশপাশে শ্মশানের নির্জনতা। তার সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেখে ইংরেজশাস্ত্রী তাকে ইংরেজ অধিকৃত এলাকায় ঢুকতে দিল। একটি সৈন্যদল আশপাশ থেকে ছত্রভঙ্গ ও দলত্যাগী জৌনপুরের কয়েকটি সিপাহীকে বন্দী করে আনছিল। চম্মন প্রথমটা খুব আকুল হয়ে ম্যাকমোহন সাহেবের খবর জিজ্ঞাসা করে। শোনে ম্যাকমোহন এলাহাবাদে আছেন।

তারপর তার সঙ্গীদলটি যখন পিছিয়ে পড়ে এবং বন্দীদের খোঁচা মারতে থাকে, সে বলে এদের নিয়ে তোমরা কি করবে?'

'দেখতে পাবে।'

'ওদের ছেড়ে দেবে?'

এর উত্তরে চম্মন ভীষণ ধমক খায়। তার চোখ পিটপিট করতে থাকে। তবু সে একজন বন্দীকে ফিসফিস ক'রে তারই মধ্যে শুনিয়ে দেয়, 'এই অফিসাররা নতুন। এরা সব জানে না। কোম্পানী সরকারের বিচার আছে। দয়ামায়া আছে। তোমরা ভেব না।'

তখন সেই বন্দীটি তার মুখে হঠাৎ একদলা থুথু ফেলে। বলে, 'খা বুড়ীয়া, যা খেয়ে মানুষ কোম্পানী সরকারের মল-মূত্র খা!'

সে আরো ভয় পায় এবং হতভম্ব হয়। তারপর, এলাহাবাদের কাছাকাছি পৌঁছে একজন বন্দী হঠাৎ কড়া বাঁধা হাত তুলে ভীষণ জোরে তার পাশের শান্ত্রীটিকে মারে। সঙ্গে সঙ্গে-ই অফিসাররা উন্মত্তের মত 'টেক ইট, য়ু ব্যাসটার্ড, য়ু হারামি, শয়তানের বাচ্চা' বলে সেই সতরোজন বন্দীকে কোপাতে থাকে। যে বন্দীটি হাতকড়া মেরেছিল, তাকে তরোয়াল দিয়ে কুপিয়েই ছেড়ে দেয় না, দুটো ঘোড়ার সঙ্গে তার দুই পা বাঁধে। তারপর ঘোড়াকে চাবুক ...য়। এই দেখেই চোখ বোজে চম্মন। সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

তার জ্ঞান হয়। সে হড় হড় করে বমি করে। তারপর আবার ওঠে। ...র পা কাঁপছে। শান্ত্রীরা নেই, অফিসাররা নেই। শুধু ক্ষতবিক্ষত ...গুলোর দু' একটা একটু একটু নড়ছে। চম্মন সম্মোহিতের মত চেয়ে ...ক। আঙুল বিহীন রক্তাক্ত তালুটা নড়ছে। পেটের নাড়ী ভুঁড়ি বেরিয়ে ...ড়ছে। চম্মন এদিকে ওদিকে চায়। সে দেখে কয়েকটা শকুন নেমে ...ছে। কয়েকটা মৃতদেহের ওপর পড়েছে। কয়েকটা প্রত্যাশায় অল্প ...ডানা নাড়ছে। সে কেঁদে ভয় পেয়ে উঠে ছুটে পালায়। তার পা ...প, তবু দৌড়াতে থাকে।

চম্মন এলাহাবাদ থেকে ছ' মাইল দূরে লালোয়ার হলুট বাংলোতে ...ছতে পেরেছিল। লালোয়ার ভূস্বামী বৃদ্ধ এবং চলৎশক্তিহীন। তিনি ...না প্রতিবাদে তাঁর পৈতৃক বাড়ীটি ছেড়ে সরে যান এবং সেটিকে ইংরাজদের ...ট হিসেবে ব্যবহার করতে দেন।

চন্দন সেখানে পৌঁছয় অনেক রাতে। সে কাল সকালে তার বুড়ো-সাহেবের কাছে যাবে। সে তাঁর কাছে হাত পা ধরে বাড়ী পৌঁছবার ব্যবস্থা করে নেবে। সে যে কোম্পানীর সরকারের কত বিশ্বস্ত সেই মর্মে একখানা সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেবে।

'সেই সার্টিফিকেট আমি দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দেব। তাহলে প্রতাপকে আমাকে চন্দনকে কেউ মারবে না।'

সে ভাবছিল কতদিনে কতবার স্নান করলে সে দেহ ও মন থেকে গত দেড়মাসের অভিজ্ঞতার অশুচিতা মুছে ফেলতে পারবে কে জানে। এই ঘৃণা, এই নিষ্ঠুর ও নির্মম হত্যা দেখে দেখে তার মন বিকল হয়েছে। তার অশুচি লাগছে। সে জঙ্গলে হত্যা ওর রক্তপাত দেখেছে কিন্তু জীবজগতে হত্যার মধ্যে অশুচিতা সেই। প্রয়োজনের বাইরেও শুধু জিঘাংসার তাড়নায় কোন জন্তু কোন জন্তুকে এমন ভাবে মারে না।

তার মনে হল সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছে। এরপর ম্যাকমোহন। 'আহা তিনি দীন দুঃখীর মা বাপ!' সে মনে মনে বলল, 'তিনি আমায় ফেলবেন না।'

লালোয়ার কুঠিতে অনেক জলে স্নান ক'রে এবং জল খেয়ে চন্দন সে রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। তার শরীর ও মন সহ্যের শেষ সীমানায় এসেছিল, তাই সে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

প্রথম দিকে সে শুধু ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখে। প্রতাপকে ওরা তরোয়াল দিয়ে কোপাচ্ছে। প্রতাপের মুণ্ডটা নিয়ে একজন বেয়নেটের ফলায় ক'রে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। তখন প্রতাপের মুণ্ডটা চেঁচিয়ে বলল, 'বাবা তোমার বউকে দেখো।'

চন্দন ঘেমে নেয়ে জেগে উঠল। সে বিড়বিড় করল। সে উপরে ও পাশে চাইল; ঘরের চালের খড় থেকে দড়ি ও শিকে ঝুলছে।

সে আবার ঘুমোল। সে স্বপ্ন দেখল, চন্দনকে ওরা ঘোড়ার দু'পায়ে বেঁধে চিরে ফেলছে! চন্দন তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। সে চন্দনের কাছে গেল। তখন চন্দনের মাথাটা কেমন করে যেন দেহচ্যুত হয়ে তার গা বেয়ে বেয়ে উঠে এবং তার মুখে একদলা থুথু ফেলে তাকে বলল 'মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ! সাহেবদের মল-মূত্র চেটে খা!'

সে জাগল। তার গায়ে ঘাম দিচ্ছে। সে উঠে ঘর ছেড়ে বেরোল। তারপর বাইরে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে পড়ল। আকাশের তারা দেখতে দেখতে সে নিশ্বাস ফেলল এবং নিজের বুকে হাত রেখে তিনবার রামনাম জপ ক'রে অজানিত আতঙ্কের উদ্দেশ্যে বলল, 'দূরে যা, দূরে যা! স্বপ্ন দেখাসনি, ভয় দেখাসনি! জানি আমি গঙ্গাস্নান না করা পর্যন্ত তোরা আমার সঙ্গে থাকবি, দূরে দূরে থাক! আমার গলায় গৈবীনাথ শিবের কবচ আছে জানবি।'

তারপর সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমল। এবার তার ঘুম বেশ গাঢ় হল। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল। চম্মন স্বপ্ন দেখল, সে সাফাখানার জঙ্গল দিয়ে চলছে। দেখল যেন, সে যে ফাঁদ পেতেছিল, তাতে একটা ছোট ঘুরাল হরিণ ধরা পড়েছে। বাচ্চা হরিণ। এখনো শিং ওঠেনি। চম্মন তার কাছে গিয়ে ফাঁদের দড়ি খুলতে লাগল। হরিণটা তখন তার মুখটা খসখসে জিভ দিয়ে চেটে দিল। চম্মন তার মুখ থেকে কচি কচি ঘাস আর পাকা আমলকী, পাকা কুলের আচার-আচার গন্ধ পেল। ঘুমের মধ্যেই চম্মনের মুখটা হাসিতে ভরে গেল।

তখনই সকালের আলো তার মুখে পড়ে এবং ব্রাইট ও 'ব্রাইটস্ হস' নামের সওয়ারের দল সেখানে পৌঁছয়।

ঘুম ভেঙে ইংরেজের গলার স্বর শুনে চম্মন কোন ভয় পায়নি। তারপর স দেখে পেয়ারা আর আমগাছের সারির ভেতর দিয়ে প্রথমে একজন ইংরেজ এবং তার পিছনে পাঠান অশ্বারোহীরা আসছে। চম্মন যখনই দেখে ইংরেজটি ব্রাইট, তার মাথার মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট চিন্তা এবং উদ্বেগ যেন গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সে একটা নির্ভরতা এবং স্বস্তির আশ্বাস অনুভব করে।

এতদিন পরে তার চেনা মানুষকে পেয়েছে, ব্রাইটকে পেয়েছে। ব্রাইট ম্যাকমোহনের ভাগ্নে। আহা ম্যাকমোহনই হয়ত ওকে পাঠিয়েছেন চম্মনকে আনতে। ব্রাইট কবে তার সঙ্গে কি দুর্ব্যবহার করেছিল চম্মনের তা মনে পড়ে না। তার বুকের ভেতর থেকে একটা বাৎসল্য মিশ্রিত স্নেহ উথলে উথলে উঠে। কি রাজার মত চেহারা হয়েছে ব্রাইটের! সে অনেক দিনের পুরনো নামটা ধরে ডেকে ওঠে এবং দৌড়ায় 'ছোট সাহেব, আমার ছোট সাহেব! ব্রাইট সাহেব! বুড়ো চম্মনকে তুমি ভোলনি তাই এসেছ?'

এই ডাকটা শোনবার আগে পর্যন্ত ব্রাইট চন্দনকে চিনতে পারেনি। ছুটে আসবার ভঙ্গীটা দেখে তার চেনা-চেনা মনে হয়েছিল। তারপর সে চন্দনকে চিনতে পারে। তার মাথার ভেতরে তখনই একটা সংকল্প ঝল্‌কে ওঠে। অদ্ভুত সুযোগ, অদ্ভুত অতি আশ্চর্য সুযোগ! চন্দন কথা বলতে থাকে এবং দৌড়ে কাছে আসতে থাকে। বহুদিন পাহাড়ের পথে চলাফেরা ক'রে তার পদক্ষেপগুলো ছোট হয়ে গেছে। সে লম্বা পা ফেলে দৌড়ায় না। ছোট পা ফেলে খুট খুট করে দৌড়ায় এবং পকেটে জামার বুকে হাত দিতে থাকে। আনন্দে চোখ দিয়ে জল পড়ে। সে একই সঙ্গে চোখের জল মুছতে, বুক পকেট থেকে তার কাগজপত্র বের করতে চেষ্টা করে এবং চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'আমি চন্দন, ছোটসাহেব, আমি চন্দন! হ্যাঁ, বিশ্বাস কর আমিই চন্দন!' তখন ব্রাইট দু'কদম এগিয়ে আসে। ব্রাইটের সঙ্গীরা অবধি বোঝেনি যে সাহেব গুলী করবে। ধীরে, কোন তাড়াহুড়ো না করে ব্রাইট বন্দুকটি তোলে এবং গুলী করে।

গলার নিচে এবং বুকের উপরে ঠিক গলা ও বুকের মাঝামাঝি জায়গায় কণ্ঠার হাড় দুটো এসে মিশেছে। সেখানে গুলীটা খেয়েও চন্দন দু'তিন পা এগিয়ে আসতে পারল। হয়তো তখনই সে মরেছে, এবং তার মৃত দেহটা দু'পা দৌড়েছে, অথবা সে তখনো মরেনি। ব্রাইটের দ্বিতীয় গুলীতে মরবে বলে দু'পা এগিয়ে আসে। ব্রাইটের দ্বিতীয় গুলীটা তার মাথায় লাগে। সে দুটো হাত এগিয়ে দেয় এবং উপুড় হয়ে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ তার শরীরটা থরথর করে কাঁপে এবং তারপর স্থির হয়। তখন দেখা যায়, তার শীর্ণ, পাতলা শরীরটির আন্দাজে পায়ের গোছা বেশ পুষ্ট, এবং তার মাংসপেশী বেশ সবল। পাহাড়ের পথে ওঠা-নামা করে এরকম হয়েছিল।

চন্দনের ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে ব্রাইটরা যখন ফিরল তখন সূর্য ভাল করে উঠেছে।

রক্তমাখা একটা হলদে থলি এবং তার কাগজপত্র সামনে নিয়ে ম্যাকমোহন অনেকক্ষণ বসে থাকেন।

তাঁর লেখা সার্টিফিকেট। তার পেছনে কাপড় জুড়ে, আঠা সেঁটে সেটার জরাজীর্ণ চেহারা মেরামত করা হয়েছে। ক্যাপটেন কলিন্‌সের প্রশংসাপত্র

এবং আরো কতকগুলি কাগজ। তাঁর চিঠি। পেতলের থালা, পেতলের হাঁড়ি, পেতলের ঘটি। একটা ছোট ছুরি, একটা চাবি এবং একটা চিরুণী। মাথার টুপিটা খুলে ফেললেন ম্যাকমোহন। পাতলা সাদা চুলভরা মাথাটা অল্প অল্প নাড়তে লাগলেন।

আর হবে না।

আর পারবেন না তিনি, আর কিছুই করতে পারবেন না। কোথায় যেন কি ভেঙে গিয়েছে, কি যেন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

'এখন আমি কি করব?'

তিনি সভয়ে কাকে যেন প্রশ্ন করলেন। প্রশ্নটা তাঁর মন থেকে উঠল। তাঁবুর দরজা অবধি গিয়ে ফিরে এসে আবার তাঁর বুকের মধ্যেই চেপে বসল। তাঁর অন্তরের বাইরে আর কোথাও সে প্রশ্নের জায়গা নেই, উত্তর নেই। ম্যাকমোহন বসে রইলেন। তাঁকে খুব ক্লান্ত এবং অসহায় দেখাচ্ছিল।

আটাশ

পিতামহ চন্দনের মৃত্যুসংবাদ চন্দন পায়নি।

সে-ও তখন কানপুরে ফিরছে।

কাশী থেকে কানপুরের দিকে আসতে তার অনেকদিন লেগেছে।

বড় রাস্তা ধরে তারা এগোতে পারেনি। বড় রাস্তার এদিকে দশ মাইল এবং ওদিকে দশ মাইল, কখনো বা এদিকে পনরো মাইল, ওদিকে পনরো মাইলের মধ্যে তারা আসতে পারেনি।

কখনো এমন পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়েছে, যে গ্রামটি তখনই ইংরেজরা আক্রমণ করেছে। ঘরে আগুন দিচ্ছে এবং ঘোড়া চালিয়ে যাকে পারছে তাকেই গুলী করছে। তখন চন্দনরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। চন্দনদের দলে যে সব হিন্দু ও মুসলমান সওয়ার ছিল তারা অসীম সাহসে যুদ্ধ করেছে এবং ইংরেজদের সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামে হানা দিতে ইংরেজরা সর্বদাই ছোট ছোট দলে এসেছে, নইলে তাদের উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, সবল ও বেগবান ঘোড়া, দেহের শক্তি-সামর্থ্য (নিয়মিত আহার ও বিশ্রামের ফল), এ-সবের সঙ্গে চন্দনেরা পারত কিনা ভেবে দেখবার কথা। ফিরে গেছে ইংরেজরা, আরো আরো ফৌজ নিয়ে এসেছে। তখন গ্রামবাসীরা বুঝেছে বাধা দিলেও মরব, নিষ্ক্রিয় থাকলেও মরব।

'তা হ'লে বাপের ব্যাটা যদি হই, মা-র দুধ যদি খেয়ে থাকি ত' লড়েই মরি।'

তাদের বৃদ্ধরা বলেছে, 'ডাকাত, লুঠেরা এদের সঙ্গে আমাদের ত' চির দিনই লড়তে হয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরব? তার চেয়ে বর্শা, লাঠি, যা পাই হাতে নিই।'

যুবকদের বলেছে, 'দে, কপালের চামড়া টেনে তুলে পাগড়ী দিয়ে বেঁধে দে।'

যুবকরা বলেছে, 'বন্দুক নেই, না-ই থাকল। চোখের সামনে মেয়েরা বেইজ্জত হবে আর বাচ্চাগুলোকে মারবে, তার চেয়ে লড়ে মরব।'

তারপর যখন ইংরেজরা আরো ফৌজ নিয়ে এসেছে, তখন সবাই তাদের সঙ্গে লড়েছে। পুরুষরা যখন যুদ্ধ করেছে, মেয়েরা বাচ্চাদের নিয়ে ততক্ষণে পালিয়েছে।

আশ্চর্য সাহস দেখিয়েছে এই সব মানুষ। তারা কোথা থেকে সাহস পেল, শক্তি পেল, তা ভাবতে গিয়ে চন্দনের মনে হয়েছে মৃত্যুর ভয় যখন চলে যায়, একমাত্র তখনই বোধ হয় মানুষ এমনি সাহস পায়।

মৃত্যুকে কি অবহেলার সঙ্গেই যে গ্রহণ করতে দেখেছে চন্দন!

দেখেছে গ্রাম যখন ঘেরাও হয়ে গেছে, বাঁচবার যখন কোন আশা নেই, তখন অসীম সাহসের সঙ্গে লড়ে মাত্র মুষ্টিমেয় ক'জন ওদের অশ্বারোহীদের পরাজিত করতে পেরেছে।

তারপর হা হা ক'রে বুক চাপড়ে কেঁদে বলেছে, 'জিতলাম কেন? এ যুদ্ধ জিতে আমাদের কি হলো?'

চন্দন তখন জেনেছে, স্ত্রীদের, পুত্র-কন্যাদের যত জনকে পেরেছে, তারা দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে। যারা পলাতে পারেনি তাদের তারা নিজেরাই মেরে ফেলেছে। তখন এ-ও বোঝা গেছে সকলকে মেরে ফেলে তবে তারা সাহসে দুর্জয় হয়ে উঠতে পেরেছিল।

কখনো বা দেখেছে অনেক চেষ্টাতে-ও চাষীরা পালাতে পারেনি। তাদের সবাইকে ফাঁসী দিয়ে গেছে ওরা। চন্দনরা যখন কোন দগ্ধ, শ্মশান সদৃশ গ্রামে গিয়ে জলাশয়ের খোঁজ করেছে, কখনো কোন উন্মাদিনী তাদের তাড়া করে এসেছে। বলেছে, 'বেরো তোরা! তোদের জন্যেই আমাদের গাঁ উজাড় হয়ে গেল। তোরা শয়তান!'

তখন চন্দনেরই মনে হয়েছে—হ্যাঁ, এ কথা-ও সত্য। তারা সত্যিই অপরাধী। তারা কি জানত না ওরা প্রতিশোধ নেবে? শুধু ওদের নয়, আরো অনেকের ওপর!

'নেতারা আমাদের পথে বসিয়েছে।' এ কথা চন্দন যোদ্ধাদের মুখে অনেকবার শুনেছে। সে নিজেও দেখল অনেক সৈন্য, অনেক অস্ত্রশস্ত্র থাকা সত্ত্বেও শুধু উপযুক্ত নেতার অভাবে তারা কেমন করে হেরেছে। তার আরো মনে হয়েছে—হ্যাঁ 'ইংরেজকে তাড়াব' এ বিষয়ে কারো মতদ্বৈধ ছিল না। কিন্তু তারপরে আর কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা তাদের সামনে ছিল না। সেই জন্যেই বোধ হয়, কি করতে হবে তা নিজেদেরই বুঝে নিতে হল। নিজেদের বুদ্ধি মতো চলতে হল। তারই ফলে কোথাও যুদ্ধ হল, কোথাও স্বাধীন রাজত্ব স্থাপিত হল। কোথাও বা সেই স্বাধীন রাজ্যেই অনেক বিশৃঙ্খলা অনেক বিক্ষোভ দেখা দিল। কোথাও বা শৃঙ্খলা এল, মানুষদের সংহত করে কাজে লাগান গেল। কোথাও কোন যুদ্ধই হল না, ইংরেজদের মেরে ধ'রে লুঠতরাজ ক'রে সবাই সরে গেল। তবে অনেক ক্ষেত্রেই চন্দন লক্ষ্য করেছে, প্রচণ্ড বলশালী জনশক্তি শুধু নির্দেশ ও নীতির অভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। ইংরেজরা তাই তাদের সহজেই মেরেছে। যুধ্যমান সৈন্যদের যেখানে ছুঁতে পারেনি সেখানে নিরীহ মানুষকে মেরেই রাগ মিটিয়েছে।

এই মৃত্যু দেখে দেখে চন্দনরা এগিয়েছে। পুরনো দলের সবাই হয়তো বলেছে, 'এরচেয়ে বিহারের কুমারসিংয়ের দলে যেতে চেষ্টা করি। কুমার সিং খুব বড় নেতা।'

সে দল ছেড়ে গেছে, নতুন দল এসেছে। তারা হয়তো একদিন 'যুদ্ধ যদি কোথাও হয় তো লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে হচ্ছে' ব'লে রওনা দিয়েছে। আবার যে সব নতুন সঙ্গী এসেছে তারা বলেছে, 'পেশোয়ার সেনাপতি তাঁতিয়াতোপী-র সৈন্যেরা ইংরেজদের সঙ্গে কি লড়া-ই লড়ছে! তাদের কাছেই যাব। একবার যদি বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলখণ্ড, রেওয়া আর রাজপুতানার পাহাড়ে জঙ্গলে যেতে পারি তাহ'লে আমাদের পায় কে!' যারা এইসব নেতাদের কাছাকাছি দেখেছে তারা অদ্ভুত আশ্চর্য সব গল্প শুনিয়েছে। কোন নেতাকে নাকি স্বয়ং শঙ্কর এসে হাতে তরোয়াল দিয়েছেন, কেউ না কি রোজ বাঘ ধ'রে এনে দুধ দুয়ে খান, কার সঙ্গে নাকি শিবের দুটি ভৈরব

ঘোরেন ছায়ামূর্তি ধরে···এইসব আজগুবী আর অসম্ভব গল্প শুনে রোমাঞ্চিত, স্ফীত কল্পনায় মগ্ন হয়ে অনেক নিদ্রাহীন রাত কেটেছে।

চন্দন এদের কথায় কান দেয়নি।

শুধু মনে হচ্ছে তার গ্রামের কথা, বাবা মা-র কথা। সেই বটগাছটার গায়ে একবার তীর ছুঁড়েছিল চন্দন। তীরটা সে তুলে নেয়, কিন্তু ফলাটা বিঁধেছিল আর ক্রমে তাতে মরচে পড়েছিল। তাদের বাড়ীর মরাইয়ে পাকা গমের গন্ধ, রান্নাবাড়ীর বারান্দা থেকে দই, ঘি ও পচা সর-এর মিশ্রিত গন্ধ মনে পড়ে। বাবার মুখখানা মনে পড়ে, মা-র আশাহত পাংশু মুখখানা মনে পড়ে। এইসব কথা বারবার মিলে মিশে যেন চম্পার মধ্যে এক হয়ে যায়। চন্দনের মনে হয় চম্পা তাকে ডাকছে, আর শুধু চম্পা-ই নয়, তার বাবা, তার মা, তার গ্রাম, সবাই যেন তাকে ডাকছে।

সে কেন বুঝতে পারেনি সে কি চায়? সে ত' এই বৃহত্তর জীবনের স্বাদ চায়নি? তবে সে এমন ক'রে বাইরের স্রোতে গা ভাসাল কেন?

আবার মনে হয়, 'না না। এই জীবনে না এলে, এমন ক'রে না ভাসলে হয়তো বুঝতেই পারতাম না আমি সত্যিই কি চেয়েছি।'

আসলে, মগ্নচৈতন্যে আশা-আকাঙ্ক্ষার আসল অঙ্কুর মুখ লুকিয়ে থাকে। বিকশিত হ'লে তা সামান্য জায়গা নিয়ে বেঁচে থাকে। বিরাট আশা, বিপুলের ও বিশালের বাসনা কম মানুষই মনে ধারণ করতে পারে। তারজন্যে তেমনি মনের প্রয়োজন। চন্দন-ও আসলে সামান্য কিছু কিছু অবলম্বন চাইছিল, যা একদিন তার হাতের মুঠোয় ছিল, কিন্তু আজ তা একেবারেই আয়ত্তের বাইরে, তাই বুঝি এমন ক'রে সে আশার রঙীন মেঘসঞ্চার চন্দনকে বারবার প্রলুব্ধ করছে।

আজ সে বুঝতে পারছে কি চেয়েছিল। চেয়েছিল চম্পার হাত ধ'রে ডেরাপুরে ফিরে যাবে। চম্পাকে সে ভালবাসবে, খুব ভালবাসবে। ভালবেসে তার শরীর আর মন থেকে সমস্ত গ্লানি, সমস্ত অশুচিতা ধুয়ে মুছে দেবে। বছরের পর বছর এখানে ওখানে অকূলে ভেসে চম্পার মনে কত দাগই না পড়েছে। সব মুছে দেবে চন্দন। এইটুকু তার কামনা।

তার চম্পাকে সে হাতে চুড়ী দেবে, মেহেদী দেবে। চম্পার পায়ে

রূপোর আংটি পরাবে। পায়ে রূপোর আংটি না পরলে বিয়ে সম্পূর্ণ হয় না। তাদের বাড়ীর উঠোনে গম ঢেলে দেবে মেয়েরা; সেই গম মাড়িয়ে মাড়িয়ে চম্পা তাদের পুবদুয়ারী ঘরখানার বারান্দায় দাঁড়াবে। তখন উনোনে দুধ উথলাবে, ঘড়া ঘড়া জল দু'পাশে এনে রাখবে মেয়েরা। তার মা তাড়াতাড়ি এসে চম্পার হাত ধরবে। কোলে বসিয়ে মুখে পেঁড়া গুঁজে দেবে আর কৌশল্যা পেছন থেকে বলবে, 'কখনো শাশুড়ীর আর শ্বশুরবাড়ীর নিন্দে ক'রো না।'

বাইরে বাজনা বাজবে। চন্দনের দাদা চমন বলবে, 'বাজনদারদের ভাল ক'রে মিষ্টি দে! ওদের নতুন কাপড় দে!' এইটুকু তার কামনা।

একদিন চম্পা জননী হবে। চম্পার শরীরটা যখন স্ফীত হয়ে যাবে তখনও চম্পাকে তার অসুন্দর লাগবে না। হয়তো তখনই চম্পাকে সুন্দরতম লাগবে। গাছের ছায়ায় ব'সে চম্পা তার সন্তানকে দুধ খাওয়াবে আর তাই দেখতে দেখতে সে নিবিড় শান্তি, নিবিড়তর আনন্দ অনুভব করবে। এইটুকু তার কামনা। আজ চন্দনের এ-সব কথা মনে হয়; মনে হয় সে কোনদিন জীবনকে, বাঁচতে চাওয়াকে এত ভালবাসেনি। তার বাবা মা-কে, তার চম্পাকে সে কোনদিন এত ভালবাসেনি।

কানপুর কাছে আসে।

এবার ইংরাজদের ছোট ছোট দলের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘনীভূত হয়। যুদ্ধ করতে ও হত্যা করতে চন্দনের মনে যেন কোন অনুভূতি হয় না।

এবার তার সাতজন সঙ্গীই সরে পড়তে চায়।

তারা যমুনা পেরিয়ে কাল্পী যাবে। কেউ বান্দা অথবা চিরখারী যেতে চায়।

শুধু দয়ারাম যেতে পারে না। তার বয়স কম। সে একেবারে নতুন রং-রুট। সিপাহী দলে ভর্তি হবার পর তিনমাসও কাটেনি। যুদ্ধবিগ্রহে নামবার কথা তার মনেও ছিল না, কিন্তু ভীত ইংরেজেরা তাকে বিশ্বাস করল কই? মির্জাপুর থেকে তাড়া খেতে খেতে সে একদিন মরিয়া হয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়। গত কাল তার বাঁ পা-খানা কাটা গেছে। উরুর নিচ থেকে রক্তমাংসের একটা জড়পুঁটলী ঝুলছে। তাতে পচ ধরেছে। উরু এবং তলপেট কালো হয়ে গেছে। জ্বরও হয়েছে।

কানপুরের উপকণ্ঠে ভগবানপুরে একটি আমবাগানে তারা বিশ্রাম করে। ঘোড়া দুটো ছেড়ে দেয় চন্দন।

দয়ারামকে সে মাটিতে শুইয়ে দেয়।

দয়ারাম শুকনো গলায় বলে, 'আমায় একটা ডাল ভেঙে দাও।' চন্দন একটা ডাল ভেঙে দেয়। কার আমবাগান কে জানে, মনে হ'চ্ছে যত্ন করলে মালিক বর্ষার মাঝামাঝি পর্যন্ত অনেক ফল ঘরে তুলতে পারত, আশ্চর্য, গাছের একটি ডাল ভাঙতে গিয়ে চন্দনের মনে এই অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা এল। দয়ারাম সেটা হাতে ধ'রে থাকে। যন্ত্রণার বেগ এলে সে ডালটা কামড়ে ধরে। যন্ত্রণা খুব বেশী হলে ডালটা ছেড়ে মাটি কামড়ায়। মাটির ঢেলা মুখে পুরে দিলে গলা থেকে আর্তনাদ উঠতে চায় না। চন্দন এখন দেখে গাছে বেশ আম রয়েছে। তার মনে হয় একটা আম পেড়ে দিলে সেটা কামড়ালে বোধ হয় দয়ারামের গলাটা একটু ভিজত। কিন্তু আম পাড়তে বা বেশী শব্দ করতে ভরসা হয় না। ওর গলা ভিজতে দেওয়াও বোধ হয় বুদ্ধির কাজ হবে না, চেঁচাতে সুবিধে হবে, এখন ও একটু শব্দ করলেই বিপদ।

রাত বাড়তে থাকে।

দয়ারামের যন্ত্রণা বাড়ে। কাছেপিঠে জল নেই। ডালটা সে কামড়ে কামড়ে ধরে। চন্দন খানিকটা নিরাশভাবেই তার যন্ত্রণা দেখে। তার মানে অবিশ্যি এ নয় যে, দয়ারামের জন্য কষ্ট হচ্ছে না, এবং চন্দন চায় দয়ারাম বাঁচুক, যদিও তার শত সহস্র আন্তরিক প্রার্থনা ওর যন্ত্রণার এক ফোঁটাও কমাতে পারবে না, তাও চন্দন জানে। দয়ারাম ফিসফিসে গলায় একবার বলে, 'আমাকে ফেলে তুমি চলে যাও।'

'চল, আমি কানপুরে যাব।'

'গেলে মরবে।'

চন্দন সে কথার জবাব দেয় না। বলে, 'রাত দু'প্রহর থাকতে আমরা উঠব। আমি তোমায় পিঠে তুলে নেব। তাহ'লে আমরা যেতে পারব।'

এ মিথ্যে কথাটা জেনে শুনেই বলে। দয়ারাম যে বাঁচবে না তা সে আগেই জানে। অথচ মরবে বলে তাকে ফেলে রেখে যেতেও তার বিবেকে বাধছে। একমাস ধরে দয়ারামের সঙ্গে অত্যন্ত বেশী মিশেছে বলে তার এখন রাগ হচ্ছে। যে মানুষটির সঙ্গে সঙ্গী হয়ে অনেক মৃত্যুকে অতিক্রম

করে আসা যায় তাকে এমন করে ফেলে দেওয়া যায় না। বরঞ্চ এখন, ওর মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও চন্দনের বুকের নিচে কি যন্ত্রণা, বাঁচুক, ও বাঁচুক, আঃ এত মৃত্যু দেখে এখন এ কি দুর্বলতা তার। দয়ারামের তরুণ, নির্বোধ মুখ দেখে ক'দিন ধরে সে যে একটা আত্মধিক্কারে কষ্ট পাচ্ছে, মনে হচ্ছে কিসের যুদ্ধ, কেন যুদ্ধ, কি লাভ হ'ল, এই ছোট ছেলেটা কেন এমন ক'রে কষ্ট পাচ্ছে।

আজ দুপুরে যখন তারা সবাই একসঙ্গে, তখন তার সঙ্গীরা বুঝেছিল দয়ারাম বাঁচবে না। বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বার আগে তারা সাতজন সঙ্গী একত্র হয়ে ভুরাগুড ও জল খাচ্ছিল। বিষ্ণু পেটকাপড়ে সযত্নে একটু ভুরা-গুড বেঁধে রেখেছিল। গুড মুখে দিয়ে দয়ারাম বলে, 'এঃ মাটির মতন লাগছে!' তখন বিষ্ণু তাকে একডেলা সৈন্ধব লবণ খেতে দেয়। দয়ারাম বলে 'সব জিনিসেরই এক স্বাদ শালা! আমার ভুরাগুড় আর গোঁড়ালেবু দিয়ে শরবত খেতে ইচ্ছে করে। আমার বাড়ীর গোঁড়ালেবু আর ভুরাগুড়।'

তারপর দয়ারাম একটি বয়াল গাডীতে হেলান দেয়। ওপাশে দাঁড়িয়ে বিষ্ণু গম্ভীর ভাবে বলে, 'ব্যাটা গুড় খাচ্ছে না লবণ খাচ্ছে তা বুঝছে না। এখন ওকে টেনে নিয়ে মরবে কেন চন্দন! আমি বলি ওকে ফেলে রওনা দেওয়া যাক। আর যদি তা না পছন্দ হয়, ত, বল!'

বিষ্ণু গলার এদিক থেকে ওদিক আঙুল টেনে দেখায় এবং খসখসে গলায় প্রস্তাব করে, এ কাজে তার দক্ষতার কথা ত সবাই জানে, এখন তাকে ও দয়ারামকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার দায়িত্বটি দেওয়া যেতে পারে।

সে কথা শুনে অন্যরা বলে, 'না। তুমি ওকে খাসীকাটার মতো জবাই করবে, তা হবে না!'

আর একজন বলে, 'তুমি এখান থেকেই সরে পড়। কেন তুমি আমাদের সঙ্গে ভিড়েছিলে জানি না। গলা কাটার সময়ে তোমার হাত খুব চলে। এখন মনে হচ্ছে কোন দিন আমাদের কারো গলাই কাঁসিয়ে দিতে, যদি না আমরা একজন না একজন পাহারা দিতাম।'

এই নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়। শেষ অবধি বিষ্ণু রেগে দল ছেড়ে একাই চিরখারী চলে যাবার সংকল্প নিয়ে চলে যায়।

এখন চন্দনের সে কথা মনে পড়লো। দয়ারামের দিকে সে খানিকটা বিতৃষ্ণার সঙ্গে তাকাল। তারপর সে বিতৃষ্ণাটা চলে গিয়ে একটা ক্লান্তির

অবসন্নতা তার শরীরকে ছেয়ে ফেলল। সে চোখ বুঁজল। দয়ারাম বলল, 'যন্ত্রণায় ঘুম হবে না আমার। একটু শব্দ শুনলেই আমি জাগিয়ে দেব তোমায়।'

দয়ারাম জাগতে পারেনি।

রাতটা যখন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বাড়ছিল, গাছের কোটরে তক্ষক ডাকছিল এবং একটা বড় ধামন সাপ পোকা খুঁজছিল, তখনই দয়ারাম মরতে থাকে।

অনেক চেষ্টা করে বারুদের গুঁড়ো মাখা পটিটা ফেলে দিয়ে সে ছোরা দিয়ে ক্ষতস্থান উরু সব খোঁচাতে থাকে। তার মনে হচ্ছিল সে খুঁচিয়ে যন্ত্রণার উৎসটাকে নিরস্ত করবে। ছোরার খোঁচা লেগে উরুর টানটান চকচকে বিশ্রী কালো চামড়ায় গর্ত হয়। সেই গর্ত দিয়ে প্রথমে কালো রক্ত এবং পুঁজ বেরোয়। তারপর ছোরাটা তার পেটের কাছে বিঁধে যায়। এবার পুঁজের সঙ্গে টকটকে লাল রক্ত ভলভল করে বেরোয়। অদ্ভুত আরাম বোধ করে দয়ারাম। সে বোঝে সে মরে যাচ্ছে। মরতে তার ভালো লাগছে, এবং স্বস্তিতে, আরামে সে পাছে চেঁচিয়ে ওঠে এই ভয়ে দয়ারাম দাঁত ফাঁক ক'রে ধুলো এবং ঘাস কামড়ে ধরে।

রাত যখন তিনপ্রহর পেরিয়ে ভোরের দিকে চলেছে তখন ব্রিগেডিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ইভান্‌সের দল এসে আমবাগানে পৌঁছয়। চন্দনের ঘুম ভাঙেনি।

তার যখন ঘুম ভাঙল তখন সে ঘোড়ার খুরের শব্দ, হ্রেষারব শুনলো। প্রথমেই সে দয়ারামের দিকে তাকায়। দেখে দয়ারাম এমন ভাবে মাথাটা গুঁজে শরীরটাকে বেঁকিয়ে রেখে পড়ে আছে, যে তাকে 'কেন জাগিয়ে দাওনি আমায়?' এ প্রশ্ন করবার কোন মানেই হয় না। কেননা ঐ ভঙ্গীটিই চন্দনের মনের প্রশ্নকে থামিয়ে দিচ্ছে। এক মৃত্যুযন্ত্রণা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় মানুষের শরীর আছড়ে ফেলা পাটকাটির পুতুলের মত বেঁকে পড়ে থাকতে পারে না। দয়ারামের শরীরের উপর বসে একটা কাক তার মাথা ঠোকরাচ্ছে।

চন্দনের রাইফেলে গুলী ছিলো। সে হাত তোলে। যখন হাত তোলে তখনই অনুভব করে যেন নাভির নিচে কে কট্ করে কাঁচি দিয়ে একটা বাঁধন কেটে দিল। সে বোঝে তার জীবনের গ্রন্থিটা ছিঁড়ে গেল।

তার বন্দুকের নিশানা ভাল। পাল্লা নিতে কষ্ট হয়নি। সামনের ঘোড়সওয়ারটি এসে পড়ে। তার চেহারা তাগড়া তাজা, রং লাল এবং গলায় উলকি। 'বোধহয় মানোয়ারী গোরা' চন্দন ভেবে নেয়। চন্দনের গুলী খেয়ে সে বিজাতীয় ভাষায় কি যেন বলে, তারপর মুণ্ডুকাটা খড়ের মানুষের মতো টুপ করে পড়ে যায়।

চন্দন আবার বন্দুক তোলে কিন্তু মৃত সৈনিকটির ঘোড়াটি ভড়কে তার ওপর উঠে আসে। চন্দনের পেট ও মুখ খুরের আঘাতে ছিঁড়ে যায়। হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে পড়ে যায়।

ভগবানপুরে ইভান্স কোর্টমার্শালে বসে ছিল। যুদ্ধে যেয়ে অবধি, দায়িত্ব পাওয়া অবধি, এ সব আইনকানুন সে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে। না, কেউ বলতে পারবে না ইভান্স বিনাবিচারে কাউকে ফাঁসীতে চড়িয়েছে। সে ফাঁসীর হুকুম দিল এবং চন্দনের মুখটা দেখে চিনতে পেরে হেসে একটি অশ্লীল গালি দিল।

দু'জন ডোম তাড়াতাড়ি দড়ি ছুঁড়ে গাছের ডালে লাগাল। চন্দন দেখল দড়িটা খুব চকচকে, খুব মসৃণ।

বোধহয় মোম দিয়ে ফাঁসীর দড়ি পালিশ করে ওরা।

সে চিন্তা করল। তারপর একটা মিনিটই খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল! এক একটা পল ও অনুপল হল অনন্ত সময়। চন্দন তীক্ষ্ণ ও একাগ্র দৃষ্টিতে যা দৃষ্টিগোচর তা দেখতে লাগল। যা অনুভূতি সাপেক্ষ, তা হৃদয় দিয়ে আস্বাদ করতে লাগল। সে দেখল সকালের আলোতে কানপুরের দিকে আমগাছের মাথা দেখা যাচ্ছে। দূরে একটা শিবমন্দিরের মাথায় ঝকমকে ত্রিশূল।

সে মুখটা তুলল। দেখল আমগাছটার ডালে একটা কাঠবিড়ালী মুখে কি নিয়ে তরতর ক'রে উঠছে।

চন্দন পা ঠুকে জুতোটা খুলে ফেলল।

মনটা ধোঁয়াধোঁয়া অন্ধকার হ'য়ে যায়নি, ভালই হ'য়েছে, হঠাৎ যেন কোন অনুভূতি ছুঁতে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠতে চায়, আছে, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় সজাগ, তীক্ষ্ণ। বস্তুত ঐ খণ্ডিত মুহূর্তের মধ্যেই চন্দন চম্পাকে পাচ্ছে। চম্পা এবং ডেরাপুরের আকাশে টিয়া পাখীদের তীব্র ক্যাঁ ক্যাঁ ডাক, ডানার সাঁইসাঁই শব্দ, শৈশবে কালোমেঘের নিচে গমকাটা এবড়োখেবড়ো

ক্ষেতের ওপর দিয়ে হাত ধ'রে ছুটে চলা চম্পা, মা'র কাছে এসে মা'র নাভির কাপড়ে মুখ গুঁজলে ধ্বকধ্বক শব্দ, কাপড় থেকে ঘি, দই ও পুজোর গন্ধ, বাবার বাঁ-চোখের নিচের লালজরুল, চন্দন, তার দাদার হাসিহাসি নীলচে কুঞ্চিত চোখ, আবার চম্পা, ছোটবেলার বেণী ঝোলানো চম্পা, প্রথম যৌবনে বাড়ীর খড়ের চাল ধ'রে মুখে আঁচল গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকা চম্পা, বিদায়ের দিনের বুকের কাছে পাওয়া চম্পা, আরো অনেক দিনের অনেক সময়ের চম্পা এক হ'য়ে মিলে মিশে চন্দনের মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল, বুদ্বুদ, সঙ্গীতের বিপুল তরঙ্গ তুলতে তুলতে হঠাৎ একটা বিরাট আলোর বিস্ফোরণে তীব্র নিনাদে ফেটে পড়ল।

নৈঃশব্দ্য।

ঝাঁকানি খেতে খেতে আমগাছের ডালটা আবার স্থির হ'ল। দুটো চারটে পাতা ঝ'রে পড়ল।

ভগবানপুরের ঠিক বাইরে, ছাউনীতে তখন চম্পা বসেছিল। তখনও ইভান্স বা ম্যাক্সওয়েল বা স্টিফেন্সন জানেন নি তাঁদের বিশ্বস্ত হাবিলদার লক্ষ্মণসিং ভারতীয় পক্ষের লোক। দীর্ঘদিন সে নিজের কার্যকলাপ লুকিয়ে রাখে এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে সন্দেহজনক লোকদের নামের তালিকা প্রস্তুত করবার নামে তাদের সাবধান করে দেয়। বহু গ্রামকে সে পূর্বাহ্নে সাবধান করে দেয় এবং প্রায় দু'হাজার লোককে বাঁচাবার পর আগস্টে তার ফাঁসী হয়।

চম্পা তারই সাহায্যে ভগবানপুরে আসে। সে আর অপেক্ষা করতে চায়নি। ইভান্সের কাছ থেকে পাশ লিখিয়ে নিয়ে ডেরাপুরে যেতে চেয়েছিল। তার মনে হয়েছিল সে চন্দনকে কোথাও-না-কোথাও খুঁজে পাবে।

ছাউনীতে এসে তাকে অপেক্ষা করতে হয়।

সে শোনে সাহেব কোর্টমার্শালে বসেছে। বসে থাকে। দুটো হাত কোলে ক'রে। সে লক্ষ্মণের কাছে শুনেছে আজ মেজর স্টিফেন্সন বিঠুরে পেশোয়ার প্রাসাদ ধ্বংস করতে যাবেন এবং ইভান্সও ক্যাম্প তুলে সেখানে যাবে। সে ভাবছিল, তারপর ভগবানপুর ক্যাম্পের প্রহরীদের ঘুষ দিয়ে হোক বা যে ক'রে হোক চলে যাবে। চন্দনকে খুঁজতে।

ইভান্‌স এলো বেলা দশটায়।

চম্পাকে দেখে তার মনে হল চম্পা যে এখানে আসবে এটা খুবই স্বাভাবিক। সে দাঁড়িয়ে বেশ প্রচুর খাবারদাবার খেল। লাঞ্চের সময় থাকবে না। তারা চলে যাবে। বিঠুরে যাবে। তারা পেশোয়ার বাড়ীর প্রত্যেকটি ইঁট খসিয়ে ফেলে সেই ভিটেকে নিশ্চিহ্ন করবে। বর্তমানে প্রত্যেক ইংরেজের কাছে 'নানাসাহেব' নামটি সবচেয়ে ঘৃণ্য। ঐ নাম শুনলে যার রক্ত গরম হয় না, যে সতীচৌড়া এবং বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার জন্যে প্রস্তুত হয় না, সে তাহ'লে ইংরেজ নয়।

ইভান্‌স গত দুই তিন মাসেই নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। সে একদা স্বপ্নদর্শী ও দুর্বলচিত্ত ছিল ভাবলে তার লজ্জা করে। এই যুদ্ধ তাকে জীবনের ঘূর্ণাবর্তে ফেলে দিয়েছে এবং এখন ইভান্‌স জানে সে আর সেই ইভান্‌স নই যে জীবনের কোথাও খাপ খাওয়াতে পারে না। যাকে দেখলেই সবাই বলে, 'Here comes the square peg in the round hole.' এখন ইভান্‌স জেনেছে সে ইংরেজ। তার ধমনীতে প্রভুর রক্ত প্রবাহিত, এবং সে-ও শাসকজাতির একজন। তার এমন কথাও মনে হয়েছে, চম্পার বিষয়ে সে ঠকে গেছে।

চম্পা যেন তাকে বোকা বানিয়েছে। সে দিনের পর দিন চম্পার চুলের গন্ধ শুঁকে, হাতের আঙুল ছুঁয়ে তৃপ্ত থেকেছে। ইদানীং তার যখনই চম্পার কথা মনে হয়েছে, হাসি, গান, কথা, সব বাদ দিয়ে চম্পার শরীরের কথাই আগে মনে পড়েছে, অথচ আগে সে চম্পার কথা ও হাসি কতই না ভালবাসত।

ইভান্‌স চম্পাকে দেখে কোন কথা বলেনি।

সে অন্যমনস্ক ভাবে অথচ তৃপ্তির সঙ্গে চেটেপুটে রুটি, মাংস, ডিম, মধু এবং চা খেল। মাঝে মাঝে সে শীষ দিয়ে গান করছিল। চম্পা দেখল তার থুতনী মাংসল হয়েছে। এখন চম্পা যেন প্রথম দেখল ইভান্‌স খুব কুৎসিত। আগে তার মধ্যে একটা সলজ্জ সঙ্কোচের ভাব ছিল। আগে সে ভোগাসক্ত ছিল না। এখন চোখের নিচের হলদেটে ফোলা, বেলফুলের পাপড়ির মতো ছোট ছোট মাংসের ভাঁজ দেখে চম্পা বুঝল সে প্রচুর খায় এবং প্রচুর মদ্য পান করে। ইভান্‌সের চোখের মণির নিচে আশে পাশে হলদেটে ও ও লালচে ছিটে, তাতে তার দৃষ্টিটা আরো কুশ্রী দেখায়।

ইভান্স পর্দা তুলে বেরিয়ে গিয়ে তার শান্ত্রীকে হুকুম দেয়, ইতিমধ্যে যদি বা আর কেউ ধরা পড়ে তাকে যেন বিরক্ত করা না হয়। সে ব্যস্ত থাকবে।

তখনই চম্পা বুঝল।

তার বুকের নিচ থেকে তলপেট অবধি একটা ঠাণ্ডা হাত কে যেন বুলিয়ে চলে গেল। সে বুঝল ইভান্সকে সে তার সুবিধে মতো ব্যবহার করেছে, আজ তাকে দাম দিতে হবে।

সে শুধু এই বুঝল না, তাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করবার কি প্রয়োজন ছিল! সে ত বাধা দিতে পারত না। বাধা দিয়ে লাভ হবে না জেনেই সে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত, ইভান্স যখন পর্দা ফেলে দেয় তখনই সময়টা ধ্বক্ করে থেমে যায়।

তারপর আবার সময়টা চলতে সুরু করল।

অনেকক্ষণ, অনড় হ'য়ে সময়টা ভারীদেহ একটা কুকুরের মত বসে ছিল, যে কুকুর প্রভুর ইঙ্গিতের অপেক্ষায় বসে থাকে।

'টিকটিক—টিকটিক—টিকটিক।' চম্পা আশ্চর্য হয়ে দেখল ইভান্সের পকেট ঘড়িটার কাঁটা ঘুরছে।

ইভান্স লাল চোখ ক'রে বসে রইল। সে দেখল চম্পা কি রকম কষ্ট ক'রে টেনে টেনে জামা পরছে। চাদর টেনে গা ঢাকছে এবং জিভ দিয়ে চেটে রক্তাক্ত ঠোঁট মুছতে চেষ্টা করছে।

ইভান্স দু'চারটে অসংলগ্ন এবং অশ্লীল কথা বলল! একবার বলল, 'একেবারে অনাঘ্রাত কুমারী, হ্যাঁ। বেশ বেশ আমার জন্যেই বসেছিলে?'

চম্পা জবাব দিল না।

'তা এবার একটা ইয়ে টিয়ে আশা করতে পার। বুঝলে?'

চম্পা জবাব দিল না। সে ধুলো ঝেড়ে ঘাগরা পরছিল।

'সেই ছোঁড়াটাকে আজ লটকালাম। সেই যে তোমার সঙ্গে যে ঘুরতো ফিরত গো! সেই যে বেশ নামটা!'

চম্পা তাকাল। বলল, 'কখন?'

'আজই ত! এই তুমি যখন আমার জন্যে বেশ সেজে সেজে, না, সেজে

গুজে বসেছিলে তখন।' ইভান্‌স ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডা বিআর খেয়েছে এবং তার জিভটা সামান্য ভারী হয়েছে, কথা টানতে কষ্ট হচ্ছে।

ইভান্‌স আবার চম্পার বাহুতে হাত রাখল। হাতটাকে যথেচ্ছ ভাবে চলাফেরা করতে দিতে দিতে বলল, 'চল না গো! তোমার মতো এমন দিব্যি খাসা একটি বন্ধু পাব কোথায়? এ্যাঁ? এই হতচ্ছাড়া লড়াইয়ের দিনে?'

চম্পা তার হাতটা নামাল। তারপর বেরিয়ে এল। ক্যাম্প তোলা হচ্ছিল। সে বসে বসে দেখতে লাগল ক্যাম্প তোলা হচ্ছে। খুঁটি তুলে নিতেই তাঁবুগুলো চুপসে ধড়মড় ক'রে পড়ে যাচ্ছে। দু'জন সহিস একটা মস্ত ঘোড়ার গায়ে সমানে চাপড়াচ্ছে। চম্পা দেখল ঘোড়াটা বেশ তাজা, তার রঙ কালো এবং কপালে সাদা দাগ আছে। সে আরো দেখল একজন সহিস চাপাটি ও লবণ খাচ্ছে। খেতে খেতেই সে পায়ের ঘা-টা ডান হাতে চুলকাল এবং সেই হাতেই আবার খেতে লাগল।

ক্যাম্প উঠিয়ে সবাই চলে গেলেও চম্পা বসে রইল।

যে চারজন শান্ত্রী ছিল তারা বিকেলের দিকে চম্পার সঙ্গে কিছুটা রঙ্গ রসিকতা করবার চেষ্টা করল। চম্পা-র জামার একদিক ছিঁড়ে গা বেরিয়ে পড়েছিল। সেই অনাবৃত দেহখণ্ডটি সারাদিন তাদের চোখকে আটকে রেখেছে।

চম্পা তাদের দিকে তাকাল।

তারপর উঠে সে চলতে লাগল। শান্ত্রীরা প্রথমে ভাবল চম্পা তাদের সঙ্গে আমবাগানের নির্জনে যেতে চায়। তারা নিজেরা বলাবলি করল, 'না না, অতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হবে না।' তারপর তারা হাসল, মাটিতে থুথু ফেলল এবং উরুতে চাপড় মারল।

চম্পা বলল, 'ওর দড়ি কেটে দাও।'

'কেন ফাঁসীর দড়ি নিতে চাও নাকি বিবি, তোমার এমন চেহারা, তা আপদের ভয় কেন? না কি কারো ওপর তুকতাক করতে চাও? শুনেছি ফাঁসীর দড়ি নানান তুকতাকে লাগে।'

তাদের সেই রসিকতা এবং লঘুচিত্তভাব সারাদিন ধ'রে গ্যাঁজাচ্ছিল, এখন চম্পার এক চাহনিতে নিমেষেই তা থিতিয়ে গেল। বিকেল, আকাশে

মেঘ, থমথমে ভাব, আম বাগানে মশার ভনভনানি এবং প্রলম্বিত মৃতদেহের সান্নিধ্য তাদের হঠাৎ নিরস্ত্র এবং অসহায় করল। তবু তারা কিছু না বলে দড়ি কাটল। ধপাস করে মৃতদেহটি পড়ল। চম্পা তাদের দিকে স্বচ্ছ, সরল চোখে চাইল।

'গোর খুঁড়ে দাও।'

তার কণ্ঠস্বর মৃদু এবং নিরুত্তাপ। তার জামা ছিঁড়ে ঐ যে স্ফীত মাংসল দেহ প্রকাশিত, তার ঘাঘরা ও চাদর ফালাফালা ছেঁড়া। শান্ত্রীদের কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। সহসা অবসন্নতা তাদের বিষণ্ণ ও ভারী করল। চম্পার চোখমুখ, কথাবলার ভঙ্গী ও আচরণ এমনই অস্বাভাবিক মনে হল যে তারা শঙ্কিত এবং নিস্তেজ বোধ করল।

তাদের মধ্যে যার বয়স বছর ত্রিশেক সে বলল, 'আমরা কোম্পানীর লোক। গোর দিতে কি দাহ করতে আমাদের মানা আছে।'

চম্পা আবার তার স্বচ্ছ, ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টি তার মুখের ওপর রাখল। বলল, 'গোর খুঁড়ে দাও।'

তখন তারা আর প্রতিবাদ করল না। বিনা প্রতিবাদে তারা অগভীর তিন হাত চওড়া, চার হাত লম্বা একটি কবর খুঁড়ল। মৃতদেহটি কবরে শায়িত করল এবং মাটি দিতে গেল। চম্পা হাত নেড়ে তাদের বারণ করল। তারা আশ্চর্য হল এবং বলাবলি করল, 'ও হিন্দু, তাই গোর দিতে চায় না। কিন্তু চিতা জ্বালানো কি সম্ভব?'

বয়স্ক লোকটি ঈষৎ সম্ভ্রম ও ঈষৎ ভয়ে একখণ্ড বারুদের মশলা ও ধুনো মাখানো মশাল জ্বালিয়ে চম্পার কাছে ধরে বলল, 'এখন তোমাকে চিতা সাজিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তুমি মুখাগ্নি করে ওকে গোর দাও। অনেকেই তাই করছে।'

চম্পা তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

লোকটি ভয় পাচ্ছিল। নির্জন বনভূমি। নির্বাক এক নারী এবং তার ভাই অথবা স্বামী অথবা অন্য কারো দেহ। মৃতদেহটির গলা লম্বা ও সরু, চোখের কোণে রক্ত, জিহ্বা স্ফীত ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তবু এ বলে না একে সমাধি দেবে, না দাহ করবে, না দাহের বিকল্পে শুধু মুখাগ্নি করবে।

চম্পাকে সে আবার মশালটি ধরতে বলল এবং তার হাত বাড়াল। চম্পা মশালটি নিয়ে দূরে ফেলে দিল। মাটির ওপর অল্প লালচে আগুন

দপদপ করতে লাগল। তখন শান্ত্রী চারজন ভয় পেয়ে, বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল। তাদের ভীষণ ভয় করছে। তারা হতবুদ্ধি হচ্ছে, অথচ কিসের ভয়, কেন ভয়, তা তারা বুঝতে পারছে না। তারা দ্রুত চলতে লাগল এবং স্থির করল আজ রাতেই তারা দূরে অন্য শান্ত্রীদের ক্যাম্পে রাত কাটাবে। পেছন ফিরে দেখতেও তাদের সাহস হল না।

চম্পা চন্দনের কোমর থেকে ছুরিটি নিয়ে তার গলার ফাঁসটা কাটল। তারপর, গলায় যেখানে ফাঁসীর দড়িটা চেপে বসেছিল, চোখের কোণে যেখানে রক্ত জমেছিল, মুখের কোণে যেখানে চটচটে লালা জমে ছিল, সে-গুলো ওড়নার কোণা দিয়ে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে তার খেয়াল হল সে বহুক্ষণ ধরে ঘসছে আর ঘসছে, তখন হাত তুলে নিল।

সে চুপ ক'রে পাশে বসে রইল। মশালটা এক সময় নিভল এবং আকাশটা অন্ধকার হয়ে নেমে এল।

অনেক রাতে দুটো শেয়াল এল।

চম্পা মশালের কাঠটা দিয়ে তাদের তাড়াল। সে একবার বলল, 'আমি তখন ছাউনীতে বসেছিলাম।'

সে বসে রইল। যমুনার দিক থেকে বাতাস এল। আমগাছ থেকে চটচট করে পাতা ও শুকনো ডাল খসে পড়ল। বাতাস উঠল, বাতাস পড়ে গেল। চম্পা বসে রইল। পরদিন সকালে তার মনে হল চন্দনের রোদ লাগছে।

সে ওড়নাটা খুলে মুখটা ঢাকল। কিন্তু আবার ওড়না খুলে নিল, কেননা সে চন্দনের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। সে বসল। পা দুটোতে একবার হাত রেখে দেখল আঙুল পায়ের চামড়ায় বসে যাচ্ছে। লক্ষ্য করল বুড়ো আঙুলের উপর সেই সাদা দাগটা এখন হলদে দেখাচ্ছে।

'প্রথমবার জুতো পরলে যখন, তখন কেটে গিয়েছিল।' সে বললে।

দুপুরবেলা থেকে মেঘ করল, এবং বিকেল নাগাদ ঠাণ্ডা বাতাস দিয়ে বিষ্টি এল। বিষ্টি আটকাবার জন্যে চম্পা ঝুঁকে পড়ে চন্দনের মুখে ওড়না ধরে রইল। বিষ্টি থামল। রাত হল। মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঠল এবং এক নিরানন্দ বিষণ্ণ দ্যুতি চরাচরকে অস্পষ্ট করল। চম্পা বসে রইল।

সকাল হল। চম্পা বসে রইল।

দুপুর নাগাদ সে লক্ষ্য করল চন্দনের দেহ ফুলে উঠছে। স্ফীত হচ্ছে। সে দেখল চন্দন ক্রমেই বড় হচ্ছে। তার হাত, তার পা, স্ফীত হয়ে কবরের অগভীর গর্তের উপরের সঙ্গে সমান হয়ে যাচ্ছে। সে লক্ষ্য করল চন্দন কালো হয়ে যাচ্ছে এবং তার দাঁত অদ্ভুত এক শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছে। সন্ধ্যে নাগাদ চম্পা উঠল।

বিষ্টিতে কাদা হয়ে কবরের পাশ থেকে মাটি গলে গিয়েছে। সে চন্দনের ছুরি দিয়ে মাটি চাঁচতে লাগল। রাত হল, এবং আবার চাঁদ উঠল।

চম্পা খুব নিচু হয়ে মাটি চাঁচতে লাগল।

সে খুব ব্যস্ত গতিতে তাড়াতাড়ি অনেক মাটি জড করে ফেলল। মাটি এনে কবরে ফেলতে লাগল। চন্দনের মুখে তার ওড়না চাপা দিল এবং মাটি ফেলতে লাগল।

সে দেখল চন্দনের পেট, বুক, হাত, পা, উরু, তলপেট সব কিছু স্ফীত উঁচু হয়ে উঠছে। তখন সে মাটি ফেলল, আরো মাটি ফেলল। ডালপালা ঝোপ, কাঁটা, যা পারল টেনে টেনে আনল, এবং চন্দনের দেহকে ঢেকে দিল।

সে বলল, 'আমি তখন ছাউনীতে বসেছিলাম।'

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলল, 'আমি তখন ছাউনীতে বসেছিলাম।'

নিচু গলায় বলল, 'হ্যাঁ আমি, আমিই তখন ছাউনীতে বসেছিলাম।'

তারপর আর কোন কথা বলল না। কবরের পাশে বসল।

সকাল হলে সে উঠল। বিঠুরের পথ ধরল। তার জামা ও কাপড় কর্দমাক্ত, সে নগ্নপদ এবং চুল কাদায় ভিজে পিঠের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে।

উনত্রিশ

ম্যাকমোহন নীলের ট্রুপের সঙ্গে কানপুর চলেছিলেন।

সৈন্যদের পায়ে এবং ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়ছিল। কানপুর কাছে আসছিল।

ম্যাকমোহন শুনেছিলেন ইংরেজরা নিজেদের কেমন করে কশাঘাতে ক্ষেপিয়ে তুলছিল এবং সেই ভীষণ উন্মত্ততার উচ্চগ্রামে নিজেদের ধরে রাখছিল। তারা বলছিল সেই ব্লাডফীও, 'সেই জানোয়ার পেশোয়াকে

যদি পাই, তাহ'লে তাকে তিলে তিলে মারব। যদি না পাই তবু আমরা প্রতিশোধ নেব।'

নীল বলেছিলেন, তিনি হিন্দু এবং মুসলমানদের নিয়ে যাবেন বিবিঘরে। ইংরেজ নারী ও শিশুদের জমাট-বাঁধা রক্ত তাদের জিভ দিয়ে চাটাবেন, একটু একটু ক'রে।

ম্যাকমোহন দেখছিলেন প্রতিশোধ নেবার উন্মত্ত বাসনা কেমন করে আত্মপ্রকাশ করছে। তিনি দেখছিলেন মৃত্যুর মুখে এসে বন্দীদের সঙ্গে রসিকতা এবং ঠাট্টা কোন বাঁধ মানছে না।

তাঁর মনে হচ্ছিল এই বোধহয় সেই শেষবিচারের দিন। পাপের ভরা এবার পূর্ণ হয়েছে। আর একতিল বেশী পাপ ধারণ করবার ক্ষমতা নেই পৃথিবীর।

সন্ধ্যাবেলা ইংরেজরা বিশ্রাম করছিল।

সিপাহী ও শান্ত্রীরা তাঁবুর মুখে খড়ের মোড়কে *ঝোলান বিআরের বোতলে জল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করছিল।

কোন সাহেব বলছিলেন, 'ঠাণ্ডা বিআর চাই না। গরম বিআর আন।'

কেউ বলছিল, 'ওহে আমার পেটে যদি বরফজলও ঢাল তাও ফুটে উঠবে এমনই ক্ষেপে আছি।'

কাঁচের মগে বিআর ঢালা হচ্ছিল। তা থেকে ভসভস ফেনা উঠে উপচে পড়ে যাচ্ছিল এবং কয়েকজন বলছিল, 'বিন্‌কী, আহা বিন্‌কীর কথা মনে আছে?' তারা উচ্চস্বরে হাসছিল।

নিজের তাঁবুতে মুখ ঢেকে বসে ম্যাকমোহন বিন্‌কীর কথাই ভাবছিলেন।

বারটি ছেলে। তাদের বয়স চোদ্দ-পনরোর বেশী নয়। ফাঁসী হবে জেনেই বোধহয় এনসাইন ব্র্যাকেটের পায়ে পড়ছিল। বলছিল, 'তুমি আমাদের মা-বাপ, সাহেব তুমি আমাদের মা বাপ।'

তারা বলছিল, 'আমরা কিছু করিনি। আমরা মোষ তাড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। মোষ দলছুট হয়ে চলে এসেছিল? এই ছেলেটার বাপ মরেছে। দেখছ না ওর গলায় কাছা, ওর মা বলছিল মোষ কে তাড়িয়ে আনবে? সবাই বলল তোরা যা, তোরা ছোট আছিস, তোরা যা!'

'তোর বাপ কেমন করে মরল, কেমন করে মরল তোর বাপ?'

'হুজুর হায়জা হয়েছিল।'

'না! আমি বলছি তোর বাপ ছিল না ভাল। তাকেও নিশ্চয় ফাঁসি দেওয়া হয়। তুই তার ছেলে, তুইও বাপের কাছে যাবি!'

'না হুজুর, আমার বাপ হায়জায় মরেছে, বিশ্বাস করুন।'

'কলেরা তোর বাপের একলারই হয়েছিল?'

'না। আর দু'জন ত আগে মরে, আমার বাপ সকালবেলা পেটে ব্যথায় মেঝেতে গড়াচ্ছিল। বমি করছিল সবুজ, তার হাত পায়ে খিল লাগছিল।'

'এঃ এমন বাপকে একলা রেখেছিস? তবে তোর ত এখন বাপের কাছে যাওয়া দরকার।'

ছেলে চারটি যেন কিছুই বুঝছিল না।

তাদের সামনেই শান্ত্রীরা গাছের ডালে দড়ি টাঙাচ্ছিল। গাছের নিচে বয়াল গাড়ী টেনে আনছিল। একজন গাড়ীর ছইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে দেখছিল যথেষ্ট মজবুত আছে কি না!

সেই সময় হঠাৎ একজন শান্ত্রী বেয়নেট নিয়ে ছেলেদের তাড়া করে সে তামাসা করছিল। ছেলেগুলো তা বোঝেনি। তারা যাকে সামনে পাচ্ছিল তাকেই বলছিল, 'তোমার পায়ে ধরি, তোমার পায়ে ধরি।'

শেষ অবধি তাদের যখন ফাঁসীতে চড়ান হয়, তাদের মধ্যে দুজন কাপড় নষ্ট করে ফেলেছিল।

ম্যাকমোহন তাঁবুর বাইরে এলেন। সমস্ত প্রকৃতি শান্তিতে শায়িত। তিনকোণা দ্বীপের মতো তাঁবুগুলো সার সার দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের গায়ে হেলান দিয়ে।

ম্যাকমোহন বুকের মাঝে নিয়ত অস্বস্তির গুরুভার অনুভব করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল এই বিরাট রণক্ষেত্রে তিনি যেন একক সৈনিক এবং পরাস্ত। সমবেত শক্তির কাছে তিনি হেরে গেছেন। কিন্তু হেরে যাওয়ার যে গ্লানি থাকে তা তাঁকে অভিভূত করতে পারছিল না। পক্ষান্তরে তিনি একপ্রকার বস্তুনিরপেক্ষ শান্তির কোমলতা অনুভব করছিলেন। সকল অস্বস্তির মাঝেও যে কোমলতাটুকু এক স্থায়ী ও চূড়ান্ত আশ্বাস দিচ্ছিল। 'এই আশ্বাসটুকু

কি ঈশ্বরের'? তিনি ভাবলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আরেকবার অন্ধকারের দিকে দৃকপাত করলেন। তাঁর মনে হল যেন অন্ধকারের আলাদা আলাদা শরীর আছে। সেই শরীরগুলো ঘিরে রয়েছে তাঁকে। তিনি তাদের অস্তিত্ব স্পষ্ট টের পাচ্ছেন। তাদের নিশ্বাস বাতাস ভরে রয়েছে। তাদের দৃষ্টি ক্ষুধিত ও অমানুষিক।

তা'রা কি মানুষ, পশু, না প্রেতযোনি! ভাবলেন ম্যাকমোহন। না, তিনি ওদের চেনেন। ওরা মানুষ ছিল একদিন। আজ ওদের মানুষ বললে ভুল হবে। লড়াই, সর্বনাশা লড়াই ওদের মনুষ্যত্বের অধিকার চিরতরে কেড়ে নিয়েছে।

'লড়াই কিসের জন্যে'? ভাবলেন ম্যাকমোহন। 'যে-লড়াই মানুষকে আর মানুষ রাখে না, সে-লড়াইয়ে কার মঙ্গল, কিসের মঙ্গল! হে ঈশ্বর, তোমার করুণার রাজত্বে এই অন্যায় কেন?'

ম্যাকমোহন আকাশের দিকে মাথা তুললেন। তাঁর মনে হল, আকাশ থেকে তিনি যেন তাঁর প্রশ্নের জবাব পাবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকের ভেতর থেকে কে যেন অট্টহাস্য ক'রে ব'লে উঠল 'সংসার সমরাঙ্গনে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই ওরা তোমায় বাতিল ক'রে দিতে চায়। তাই মানুষের প্রতি তোমার দয়া দেখে ওরা বিদ্রূপ করে।'

ম্যাকমোহন চমকে উঠলেন। চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই। শুধু সেই ছায়াগুলো, সেই দেহহীন ছায়াগুলো নিবিড় কালিমায় লিপ্ত হ'য়ে তাদের ক্ষুধিত দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রে বসে রয়েছে। আর, তাঁবুর বাইরে বাইরে পাহারারত শান্ত্রীরা।

'হ্যাঁ ঠিক, আমি আর যোগ্য নেই, আমার দরকার ফুরিয়েছে। আমি ব্রাইটদের মতো, মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হ'তে পারি না, নৃশংস হতে পারি না। আমি মানুষকে ভালবাসি, হ্যাঁ, মানুষকে আমি ভালবাসি। এই মাটিকে আমি ভালবাসি।' ম্যাকমোহন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে একটু এগোলেন। ছায়ামূর্তিগুলো পিছু হটে গেল। এখন তাদের চিন্তায় নতুন ক'রে তিনি বেদনা বোধ করলেন। এদের তিনি দেখেছেন দিনের বেলায়। কতকগুলো নারী মূর্তি। ছেঁড়া কাপড়ে শরীরের অর্ধেক ঢাকা পড়ে না। রুগ্ন, কঙ্কালসার দেহ। উন্মোচিত বক্ষ। রুক্ষ তৈলহীন চুল কানের পাশ দিয়ে সর্বনাশার মতো ঝুলে

থাকে। ভয়ংকর চোখের দৃষ্টি, অমানুষিক। সে চোখে জ্বালা নেই, দ্বেষ নেই, মায়া নেই, মমতা নেই,—শুধু তাকিয়ে থাকা, আশ্চর্য ক্ষুধা নিয়ে তাকিয়ে থাকা।

ম্যাকমোহন দেখেছেন দিনের বেলায় এরা ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে। নয়ত দগ্ধ ভস্মীভূত বাসস্থানের মাটি খুঁচোয়। খোঁজে, কি যেন খোঁজে।

হ্যাঁ, যে-গ্রাম আজ পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেছে, সেখানেও সেদিনও পর্যন্ত জনপদ ছিল। বাসস্থান ছিল। এই অশরীরী ছায়ামূর্তির মত অর্ধনগ্ন নারীরা সেদিন কারো স্ত্রী, কারো বোন, কিংবা কারো মাতা ছিল। তাদের দৃষ্টিতে স্বাভাবিকতা ছিল, মায়া-মমতা ছিল, আনন্দ-বেদনা ছিল। ক্ষেত, খামার, গাই-বাছুর, সন্তান-সন্ততি নিয়ে তারাই নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করত। তাদের দেহে লজ্জা ছিল, মনুষ্যোচিত সকল প্রবৃত্তি ছিল।

আজ কিছু নেই। গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান হয়েছে। জনপদ শূন্য হয়েছে। পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে ঘর-দোর, গৃহপালিত জন্তুরা। পুরুষরা মারা গেছে। আর নারীরা দিনের বেলায় ঝোপে ঝাড়ে, আনাচ কানাচে আত্মগোপন ক'রে থাকে। একদিন যেখানে তাদের গৃহ ছিল, সেখানকার মাটি খুঁড়ে কিসের যেন সন্ধান করে। তারপর মাথায় হাত দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে। কথা কয় না। শুধু সেই অমানুষিক চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয়, যে-দৃষ্টির সামনে কোন স্বাভাবিক মানুষ সহজ বোধ করতে পারে না। তারপর রাত্তির হ'লে তাঁবুর বাইরে অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে এসে বসে, অন্ধকারের দেহ হ'য়ে। শুধু তাদের এলো চুল, অনাবৃত স্তন আর সেই অব্যক্ত, মনুষ্যবোধ-বহির্ভূত দৃষ্টি বিভীষিকার মতো জাগ্রত হ'য়ে থাকে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাঁবু পড়লে, তারাও অনুসরণ ক'রে পিছু পিছু যায়।

ম্যাকমোহন বিচলিত হন। নিদারুণ লজ্জা ও অনুতাপে তাঁর হৃদয় দগ্ধ হতে থাকে। 'ক্ষমা কর। আমাকে ক্ষমা কর। আমাদের ক্ষমা কর।' বলতে ইচ্ছা হয়। বলতে পারেন না। গলা কে যেন চেপে ধরে! বিড়বিড় করে বলেন, 'না। আমরা ক্ষমা পাব না। আমরা যখনই একজন নিরপরাধ মানুষকে মেরেছি, একটি গ্রামে আগুন দিয়েছি, তখনই আমরা অন্যায় করেছি। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন! আমাদের ও ঈশ্বরের মধ্যে এই ব্যবধান বেড়ে চলেছে। তাই ক্ষমা পাবার অধিকার আমরা হারিয়েছি। এদের সঙ্গে যে ব্যবধান আমরা সৃষ্টি করলাম, সে

ব্যবধান বাড়বে, ক্রমেই বাড়বে! আমরা আর কোনদিন ভারতবর্ষকে অধিকার করতে পারব না। হ্যাঁ, আমরা এ দেশের চা, পাট, লোহা এবং কয়লা নেব। ইংলণ্ডে দ্রুত শিল্পবিস্তার হবে। সব হবে। কিন্তু আমরা এদেশের মানুষের মনে অধিকার বিস্তার করতে পারব না, কক্ষনো না।'

'একদিন ভীষণ দাম দিতে হবে!' তিনি আবার বললেন। এবং তখনই যেন তিনি দেখতে পেলেন আজকের আচরণের জন্য তাঁদের ভবিষ্যপুরুষকে দাম দিতে হচ্ছে।

তারপর তিনি সচকিত হলেন। নিজেকে শাসন করলেন এবং চেআরে বসলেন। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন কিছুক্ষণ ধরে শুধু পায়চারি করছিলেন।

চেআরে বসে পাইপে তামাক ভরলেন। তারপর সেটা জ্বালাতে ভুলে গিয়ে মাথায় হাত রাখলেন।

যাদের কথা তিনি মনে করতে চান না, তারাই তাঁর মনের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

আজ চম্মনের কথা মনে পড়ছে। কিংবা হয়তো এ ক'দিন তাঁর মনের আড়ালে শুধু তারই চিন্তা ছিল, আজ সে আড়াল থেকে আলোয় এসে দাঁড়াল! —'চম্মন!'

তিনি আস্তে বললেন। এবং তখনই মনে পড়ল। না। চম্মনের মুখ মনে পড়ল না। কেন যেন সেইসব গুহার কথা মনে পড়লো! তিনি যেন যৌবনের সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা অতীত থেকে ফিরিয়ে এনে আস্বাদ করতে পারলেন। গভীর রাত। সাফাখানার বাইরে জঙ্গলের কিনারে এসে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বাতাসে ধূপের গন্ধ। কারা বুঝি সরল গাছের কাঁচা ডালপালা ধরিয়েছে! আগুনের তাপে গাছের গা বেয়ে রস পড়ছে এবং ধূপের গন্ধ উঠছে! দূরে, পাহাড়ের গায়ে একটি, দুটি, তিনটি আলো জ্বলে উঠলো। আলোগুলি নামতে লাগল, নীল কুয়াশার কিনারে একটু থমকে রইল, তারপর ধীরে ধীরে আলোগুলি আবার ওপরে উঠে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল! তাঁর মনে পড়ল গ্রামবাসীরা আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল এবং ভয় ও শ্রদ্ধা নিয়ে দেখছিল! তারা হাত তুলে প্রণাম করল এবং বলাবলি করল 'কোন পুণ্যাত্মা দেহ রাখলেন। তাঁকেই ওরা দেবলোকে নিয়ে গেলেন।'

ম্যাকমোহনের মনে ক্ষীণ একটু অনুশোচনার ভাব লেগে রইল। জীবনে অনেক কিছুই করেন নি। তবে ঐ গুহাতে গিয়ে ঐ আলোর রহস্য কি তা জানবার বড় ইচ্ছা ছিল। চন্দনের কাছে যদি যেতে পারতেন, তবে তিনি তাকে নিয়ে যেতেন। ধূপগন্ধী বাতাস, মখমলের মতো ঘাস, নদীর তীরে আইরিশ বুনো গোলাপ এবং অর্কিড ঝুলে পড়ছে। সেখানেই দূরে কোথাও ব্রহ্মকমল ফোটে, আশ্চর্য, প্রস্ফুট ফুল তিনি কোনদিন দেখেন নি, তীর্থ থেকে যারা আসত তারাই শুকনো ফুল এনেছে। জীবনে কত কি অজানা থেকে যায়। শরতের সকালে ও দুপুরে সেখানে নীল রঙের প্রজাপতি ও মৌমাছি উড়ে বেড়ায়, কেবলই উড়ে বেড়ায়। শীতের শেষে পাখীরা ফিরে আসে। তারা কুল খায়, কুল ছড়িয়ে ফেলে। পাকা কুলের গন্ধ, ছোট ছোট মেয়েরা ঝুড়ি নিয়ে আসে কুল তুলতে। তাদের কানে পেতলের গহনা, তাদের চোখে অবোধ কৌতূহল। 'আমাকে ক্ষমা করো।' তিনি অস্ফুটে বললেন।

তারপর তিনি বাইরের দিকে চাইলেন। ঠাণ্ডা বাতাসে ঐ গাছের পাতা দুলছে, নড়ছে। আরো কিছুক্ষণ বাদেই ভোর হবে। 'আর একদিনের পথ। তারপর পরশু দিন সকালেই কানপুর পৌঁছব আমরা।'

কানপুর। 'আমি প্রত্যেকটি বিদ্রোহীকে দিয়ে বিবিঘরের মেঝের রক্ত চাটাব। তারপর তাদের ফাঁসী দেব।' ক্যাপ্টেন নীল বলেছেন।

'আমরা কানপুরকে এক হাঁটু রক্তে ডোবাব। ফাঁসী দেব না। কামানের মুখে ওড়াব, আর যদি কোন আসল অপরাধীকে ধরতে পারি তবে তার গা থেকে একটু একটু করে চামড়া খুলে নেব, একটু একটু করে।' এই ধরনের উক্তি অন্যেরা করেছে।

'কিন্তু আমি কানপুর যেতে চাই না। আরো নির্মমতা, আরো রক্তপাত আমি দেখতে চাই না।' ম্যাকমোহন বললেন। তিনি টেবিলের ওপর তাঁর ডান হাত প্রসারিত করলেন। সেদিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

'ক্লান্ত, আমি বড় ক্লান্ত'—তিনি বারবার বললেন।

সেই রাত এল।

অফিসার, সৈনিকসহ অন্যরা অনেক রাত অবধি মেস ডাইনিং তাঁবুতে

বসে উত্তেজিত হয়ে কথা বলেছেন। তাঁরা নিজেদের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার নানারকম অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন। সবগুলো হয়ত এই যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নয়। সবগুলো হয়তো তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়। এর কাছে শোনা, তার কাছে ধার করা।

ম্যাকমোহন চুপ ক'রে শুনেছেন তাদের কথা। ম্যাকমোহন তাদের দিকে তাকিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে আর মদে ওদের নেশা হবে না। আজ ওদের নিজেদের ক্ষেপিয়ে তোলা দরকার। তাই এইসব গল্প কাহিনীর অবতারণা। হঠাৎ তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন। তিনি যেন বুঝতে পেরেছেন।

'হ্যাঁ। তোমরা ভয় পেয়েছ। অথচ ভয় পেয়েছ সে কথা তোমরা জান না। যারা মনের গভীরে এবং গোপনে দুর্বলতা লালন করে, তারাই নিরস্ত্র জনতাকে আক্রমণ করবার সময়ে হিংস্র হয়ে ওঠে। ভেতর থেকে জোর না পেলে অমনি হয়। বন্দুক ও বেয়নেট হাতে শক্তি জোগাতে পারে, কিন্তু নীতি ও বিবেকের জোর আসে ভেতর থেকে। ভেতর থেকে জোর পেলে নির্ভয়ে মৃত্যুর সন্মুখীন হওয়া যায়। তোমাদের সে জোর নেই। তোমরা জান না তোমরা দুর্বল।'

তিনি যেন এদের থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। তাই তিনি এদের সমগ্র রূপ দেখতে পাচ্ছেন এবং বিচার করতে পারছেন। ছোটবেলা এমিনির পুতুলের সংসার যেমন টেবিলে বসে দেখতেন। তাঁর তাই মনে হলো এবং ঈষৎ হাসলেন। সামনে এবং আশে পাশে যাঁরা বসেছিলেন আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন।

তিনি যখন তাঁবু ছেড়ে চলে আসছেন তখন শুনতে পেলেন ব্যঙ্গের স্বরে একজন আরেকজনকে বলছেন, '১৭৮৭-তে জন্মেছে ম্যাকমোহন? সত্তর বছর বয়স! আমরাই ওকে মিউজিআমে পাঠাব, কি বল?'

উত্তরে আরেকজন হাসল এবং শীস দিয়ে গান করতে লাগল।

ম্যাকমোহন অনেক রাত অবধি অপেক্ষা করলেন।

সান্ত্রীরা পাহারার ডিউটি বদল করল। ওদিকে মেস তাঁবু থেকে বাসন-পত্র ধোয়া ও প্যাক করা হল। সিপাহীরা যে সব উনান ধরিয়ে রান্না করেছিল, কে যেন বকবক করতে করতে তার নিভন্ত আগুনে জল ঢালতে

ঢালতে চলে গেল। 'আগুন নেভাও। এই ঘোড়া কার? বাঁধনি কেন?' এইসব হাঁক ডাক সামান্য শোনা গেল। তারপর সবাই চুপ করল। ক্যাপ্টেন নীলের তাঁবুর বাতি-ও এক সময়ে নিভল।

ম্যাকমোহন চুপ করে চেআরে বসেছিলেন। আজ তাঁর মন শান্ত। আজ তাঁর হৃদয় নিথর। সেখানে কোন জ্বালা, কোন অবসাদ, কোন বিক্ষোভ নেই। তিনি সামনের দিকে চেয়েছিলেন। তাঁর চোখে অনেকক্ষণ বাদে বাদে পলক পড়ছিল।

তারপর, সমস্ত চরাচর যখন প্রশান্ত হল, কোমল সুষুপ্তি যখন মন্থর গতিতে মানুষ, জীবজগৎ, পাখী সকলকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেল, যখন কোথাও কোন শব্দ রইল না, সাড়া রইল না, শুধু শান্ত্রীরা ঘাসের ওপর দিয়ে আজ্ঞাবাহী পুতুলের মতো পা ফেলে ফেলে হাঁটতে থাকল, তখন ম্যাকমোহন উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে এলেন। তারপর হাঁটতে লাগলেন। তাঁবু ছাড়িয়ে, গরুর গাড়ী, উট, হাতী এবং ঘোড়া-র সারি পেরিয়ে তিনি মাঠে নামলেন। তারপর পায়ে চলা রাস্তা। তারপর ছোট একটি মাঠ।

ম্যাকমোহন ক্ষেতে নামলেন। কিছুদূর চলে এসে তিনি দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর দৃষ্টিকে চারিদিকে প্রসারিত করলেন মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। উত্তরে তাঁবু। এখান থেকে দেখা যায় না। পুবে এবং দক্ষিণে শুধু ধান ক্ষেত, শুধুই ধান ক্ষেত। সবুজ ধান, শীষের মাথা ফসলের ভারে নিচু। বাতাস বইছে, কেবলই বইছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার তাঁর চোখে সয়ে এল। তিনি দেখলেন একটি বাঁশের আগায় চুন মাখান কালো হাঁড়িটা একটু একটু নড়ছে।

পশ্চিমে কানপুর।

পশ্চিম দিকে তিনি তাকালেন না। তিনি ওপরের দিকে চাইলেন।

আকাশ। ঐ তারা, ঐ নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ খচিত আকাশ পঞ্চাশ বছর আগে কুড়ি বছরের এক অনভিজ্ঞ তরুণকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। তরুণটি জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়েছিল। কার্গো জাহাজটি তখন বোম্বাইয়ের বন্দরে প্রবেশ করছিল। বোম্বাই। যত কাছে আসে সমুদ্র ততই শান্ত মনে হয়। সমুদ্রের বুকে ছোট ছোট পাহাড় এবং লাইট হাউস দেখা যাচ্ছিল।

তিনি মাথা নিচু করলেন।

মাটি। ধূমল এবং পাটকেলে। নরম এবং কালো। বুন্দেলখণ্ডে এ মাটি পাথুরে। বাস্তার ও জগদ্দলপুরে এ মাটিতে মাইকা, কপার, লাইম এবং সালফেট। রাজপুতানায় এ মাটি বালি, কাঁকর এবং বেসাল্ট পাথর, শুধুই বেসাল্ট পাথর, ধূম্রবর্ণ, ভয়ংকর, গম্ভীর। নেপালে এ মাটি বাঁশপাতা পচে ভসভসে এবং উর্বর। পা ফেল, পা ডুবে যাবে; পা তোল, হ্যাঁ চটচটে কাদা লেগে থাকবে। কিন্তু তারই মধ্যে উর্বরতা, সে উর্বরতায় কেউ চাষ করে না, শুধু বাঁশবন হয়, শুধু জঙ্গল হয়, জঙ্গল এবং ঝোপ। গঙ্গাযমুনার জোয়ারে এ মাটির চেহারায় বৈশিষ্ট্য নেই; কিন্তু তার নাম উর্বরতা, প্রাচুর্য, শুধুই প্রাচুর্য।

সব তেমনই আছে। কিছুই বদলায়নি। শুধু তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল। সে-সব প্রশ্ন তাঁকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে।

আজ আর কোন প্রশ্ন নেই। তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর প্রথম পরিচয়, তিনি মানুষ। ক্রীশ্চান ও ইংরেজ, ধর্ম এবং জাত এ দুটোই গৌণ পরিচয়। তিনি মানুষ, তাই তিনি এ দেশের মানুষকে ভালবেসেছেন। তাঁর সামনে বড় বড় ইংরেজ আদর্শ ছিল না। তিনি ত' সামান্য সৈনিক। কেমন করে কেরী, প্রিন্সেস, হেঅার এঁদের আদর্শ বুঝবেন! তিনি অন্য মানুষদের দেখে উৎসাহিত হয়েছেন। ইংরেজদের কথা মনে পড়ে। সামান্য চাকরি করেন যাঁরা, ক্লাব ও জিমখানার শ্বেতাঙ্গ সমাজের সঙ্গে যাঁদের দেখা হয় না, গ্রামে গ্রামে ঘুরে এদের সঙ্গে সারাজীবন কাটিয়ে যাঁরা এদের ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। অখ্যাত গ্রামে বা ক্যাম্পের বাইরে খাটিয়ায় বসে যাঁরা এদের ভাষা, ব্যবহার, ইতিহাস, জীবজন্তু, গাছপালার কথা লেখেন। মনে পড়ে ভারতীয়দের। কেউ বা সামান্য মানুষ, কেউ বা চাষী, কেউ বা সাধু বা ফকির। তাদের অন্তরের ঐশ্বর্য দেখে কতবার মাথা নিচু করেছেন ম্যাকমোহন। নাম? নাম মনে পড়ে না, না—নাম মনে পড়ে না।

আজ তিনি বুঝেছেন শ্রদ্ধা ক'রে ঠিকই করেছেন। ঠিক পথটিই বেছে নিয়েছিলেন। ভালো না বাসলে, শ্রদ্ধা না করলে কি এদের অন্তরে পৌঁছনো যেত?

কিন্তু এ-ও বুঝছেন, তাঁর মতো মানুষ সংখ্যায় নেহাৎ-ই অল্প। ব্রাইটরা সংখ্যায় অনেক। ব্রাইটদের আচরণ তাঁকে লজ্জা দিয়েছে। তাই

তিনি সরে যাচ্ছেন। একজন ম্যাকমোহনের রক্তে নিশ্চয় তাঁর দেশবাসীর কলঙ্ক এতটুকু স্খালন হবে।

যদি সময় পেতেন! যদি সময় পেতেন তবে অনেক কিছুই করতেন। চম্মনের কাছে সেই সাফাখানায় অথবা পাপামৌয়ে তাঁর বাংলোয় বসে তাঁর বইটি শেষ করতেন। প্রথম লাইনটি মনে পড়ছে The evergreen oliage of Kumaon forests···হয়তো তিনি চোখ তুলে দেখতেন গুহার গায়ে কেমন ক'রে আলো জ্বলে। কেমন ক'রে পুণ্যাত্মারা স্বর্গে প্রয়াণ করেন। কিন্তু আর সময় নেই।

ম্যাকমোহন সচকিত হলেন। আকাশের দিকে মুখ তুললেন। ঐ যে কালপুরুষ। কি সুন্দর ঐ নক্ষত্রপুঞ্জের নাম। নামগুলি আবৃত্তি করলেন বিড়বিড করে 'সপ্তর্ষি ও মৃগশিরা। কালপুরুষ ও স্বাতী!' পঞ্চাশ বছর আগে ওদের স্নিগ্ধ দৃষ্টিই ত' তাঁকে ভারতের মাটিতে স্বাগতম্ জানিয়েছিল। আজ-ও ওরা তেমনই স্নিগ্ধ মমতাভরা চোখে চেয়ে আছে। বাতাস কি ঠাণ্ডা। তিনি নিচু হ'য়ে একবার একগোছা ধানের শীষ হাতে চেপে ধরলেন। তারপর মাথা তুলে দাঁড়ালেন।

ম্যাকমোহন টুপি খুলে মাটিতে রাখলেন। জুতো খুলে পাশে রাখলেন। মাটিতে পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন; চিবুকের নিচে রিভলভারটির নল চেপে ধরলেন। ট্রিগার টিপলেন।

তারপর তিনি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লেন। শরীরটা দু'বার জোরে ঝাঁকি খেল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে স্থির হল। মাথার আশেপাশের মাটি রক্তে ভিজে উঠতে লাগল।

ধীরে, অতি ধীরে তাঁর শরীর শান্তি ও বিশ্রামের ভঙ্গীতে এলিয়ে পড়ল।

মাথার সামনের চুল লাল হয়ে গিয়েছে। মাথার পেছনের স্বল্প কয়েকটি সাদা ও ফুরফুরে চুল রাতের বাতাসে কাঁপতে লাগল, অশ্বত্থ গাছের একটি পাতা মাঝে মাঝে যেমন দ্রুত কাঁপে তেমনি।

ত্রিশ

শেষ অবধি যুদ্ধ এবং সন্ত্রাস ডেরাপুরের পথ চিনে চিনে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছল।

ম্যাক্সওয়েল-এর বিজয়ী বাহিনী আসবার খবর পেয়েই গ্রামের মানুষ পোটলা-পুঁটলি বেঁধে গরু ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে সুবিস্তীর্ণ বনভূমিতে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করে। এতদিন ডেরাপুরের মানুষ যুদ্ধের মাশুল দিয়েছে।

হামীরপুর, ফতেপুর, বান্দা—সব জায়গা থেকে ভারতীয় সৈন্যেরা এসে তাদের কাছ থেকে শস্য নিয়েছে, খাদ্য কিনেছে। কখনো বা এসে খবর নিয়েছে গ্রামে কার কাছে মোহর আছে। তারা বলেছে, 'একটি মোহরের দাম কুড়ি টাকা, তার বদলে আমরা তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ যা চাও দিচ্ছি। এত রূপার টাকা বয়ে নিতে পারি না।'

কেশবরাম, মৌলবী প্রমুখ কয়েকজন মোহর বদলে টাকা নিল। সৈন্যরা রূপার টাকা দিয়ে ঘোড়ার খাবার, ঘোড়া বাঁধবার দড়ি এবং খাদ্য কিনল। যে সব চাষী জীবনে এত টাকা দেখেনি, তারা হাতে হাতে পাঁচ, সাত বা দশ টাকা পেয়ে ভাবল মস্ত জিতে গেছি।

কিন্তু তারপর গ্রাম থেকে গ্রামে দুঃসংবাদ ছড়াতে লাগল। এতদিন কেশবরাম খুব সুখে ছিল।

এ গ্রামে গৈবীনাথ আছেন জেনে মন্দিরে পুজো দিয়ে গেছে বহু হিন্দু সিপাহী সওয়ার। কেশবরাম তাদের সামনে শিখা আন্দোলিত ক'রে বলেছে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গীদের রাজত্ব শেষ হয়েছে। এখন বিঠুরের পেশোয়া আমাদের রাজা হবেন। আমি মহাদেবের আদেশ পেয়েছি, তখন এই মন্দিরের চুড়ো সোনা দিয়ে বাঁধাতে হবে।'

'চুড়ো বাঁধাতে হবে, চুড়ো বাঁধাতে হবে' এ-ই বলে কেশবরাম ক-দিন গ্রামে খুব হৈ চৈ হাঁকডাক করেছে। এখন সে-ই আগে গ্রামছেড়ে পালাল।

সে বলল, 'ফিরিঙ্গীদের বিশ্বাস নেই। ওরা যদি রূপোর টাকা দেখে-টেখে সন্দেহ করে? কে জানে ওরা ব্রাহ্মণ বলে মানবে কি না!'

সবাই বলল, 'তুমি পালাবে কেন? তোমার ভয়টা কি?'

সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'আরে মূর্খ, তোরা কি বুঝবি? ফিরিঙ্গীরা যদি আমাকে ছুঁয়ে অপবিত্র ক'রে দেয়, তবে গৈবীনাথকে সেবা করবে কে? তা ছাড়া আমি ত' পালাচ্ছি না, আমি আমার বোনকে দেখতে যাচ্ছি।'

এই ব'লে কেশবরাম মন্দিরের কুয়োতে গৈবীনাথের সোনারূপোর বাসনপত্র, কমণ্ডলু, কোষাকুষি, ঘটি, থালা, পুষ্পপাত্র, চন্দন ও ঘি-এর বাটি বড় বড রূপোর দীপাধার, সোনার পঞ্চদীপ সব ডুবিয়ে রাখল। তারপর টাকাকড়ির পঁটলী বেঁধে নিজে রওনা হয়ে গেল। অন্যরাও পালাতে লাগল।

প্রতাপ কিছুতেই গেল না। প্রতাপ রেগে বলল, 'না না! আমি কি দোষ করেছি যে ভয় পাব?'

'কিছু না করলেও ওরা তোমাকে ধরবে।'

বুড়ো লালা বৈজনাথ রেগে ধমকাতে লাগল প্রতাপকে 'আরে মূর্খ, আরে বুদ্ধু! তোর ছেলেটা আর বাবা ত' কাঠগোঁয়ার! তুই যে গোঁয়ার তা ত' জানা ছিল না! তোর ছেলে কানপুরে ছিল। কানপুরের একটা সিপাহীও সাহেবদের দলে থাকেনি। তোর ছেলে কানপুরে ছিল এ কথা শুনলেই ওরা তরোয়ালে একছটাক ঘি মাখাবে আর তোর মাথাটা কেটে নেবে! তুই কি তোর বউটাকে বিধবা করতে চাস?'

প্রতাপ বলল, 'আরে চাচা! তুমি কি আমায় মূর্খ ভাব? বাবার সার্টিফিকেটগুলোর নকল আছে না আমার কাছে? দেখলেই ওরা আমায় ছেড়ে দেবে, দেখো!'

'হ্যাঁ, ওরা তোর শ্বশুর!'

প্রতাপও একটা গাল দিল। তারপর গলা ছাড়িয়ে বলল, 'আমার গোলা বাঁধা হয়নি। বিষ্টি নামলে গম, কলাই সব ভিজে জাব হয়ে যাবে। লাল গাইটা আজ কি কাল বাচ্চা দেবে! এ সব ফেলে আমি যাব কোথায়?'

'যেও না, তবে মর!' ব'লে সবাই চলে গেল। প্রতাপ তাদের শুনিয়ে গোঁফচুমরে চড়াগলায় বলল, 'মরবে তোমরা! জঙ্গলে বর্ষা নামবে, খেতে পাবে না, শুতে পাবে না!'

তারপর বড় চাদরখানা কাঁধে ফেলে নাগরা পরে দেখতে বেরুল গ্রামে কে রইল আর কে গেল! সব ঘুরে দেখে শুনে সে খুব অবাক হল।

ফিরে এসে সে দাওয়ায় বসল। দুর্গাকে বলল, 'এক ঘটি জল দাও। আর রাখালটাকে ডাক, ও আমার পা-টা টিপে দিক।'

দুর্গা নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'কেউ নেই।'

'রাখালটা নেই?'

'কেউ নেই! তুমি গাঁয়ে কি দেখে এলে?'

প্রতাপ চিন্তিত মুখে বলল, 'পুরুষমানুষদের ত' দেখলাম না। মেয়েরাও ই। শুধু গয়লা পাড়ায় দেখলাম সুরতিয়া আর ভিখনের মা রয়েছে। মন ক'রে পালাল কেন সব? বুড়ো মৌলবীকে একলা রেখে মুসলমান াড়ার সব পালিয়েছে। বুড়ী কৌশল্যা আর তার নাতিটা আছে।'

প্রতাপ অন্যদিকে চেয়ে বলল, 'কৌশল্যা আর ছেলেটাকে আসতে বললে য়। ছেলেটা থাকলে ভালই হবে। গাইটার যে অবস্থা তাতে একটা াক দরকার।'

দুর্গা কোন কথা বলল না। সে শূন্য দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঁচকে চেয়েছিল। প্রতাপ ের কথাটি আবার বলল। তখন দুর্গা বিরক্ত গলায় বলল, 'ডাক না! কে রণ করেছে? 'বুড়ী ত' নিজেও আসতে পারত। দরকার পড়লে আসে না? ়া দাও, সেটা দাও বলে না?'

দুর্গার গলার খনখনে বিরক্তি শুনে প্রতাপ আশ্বস্ত হল। যাক, তাহ'লে েলা হাঁড়ি চড়বে। মাঝে মাঝে গুম হয়ে বসে থাকে দুর্গা, উনানে রান্না- াড়ে, কুকুর এসে বরান্দায় ওঠে, তার হুঁশ নেই। চুপ ক'রে থাকতে থাকতে েকসময়ে বড় বড় নিশ্বাস টেনে অজ্ঞান হয়ে যায়। সেদিন আর রান্নাবান্না ়না। অন্যসময়ে সে আগের মতোই খরখর ক'রে বেড়ায়। সংসারের ্রতিটি খুঁটিনাটিতে দৃষ্টি রাখে। সামান্য অপরাধে আশ্রিত আত্মীয়স্বজনকে টুকথা শোনায়। প্রতাপ বৈদ্যের কাছে শুনেছে এই চুপ করে গুম্ হয়ে কা এবং অতিরিক্ত কোপপ্রবণতা এ নাকি একটা রোগ। শাস্ত্রে এরও িকিৎসা আছে। প্রতাপ সে কথা দুর্গাকে বলতে সাহস পায়নি।

চন্দন চলে যাবার পর সবাই ভেবেছিল দুর্গার স্বভাবটা বদলাবে। দলায়নি। অন্ততঃ বাইরে কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। তবে প্রতাপ ানে মাঝে মাঝে দুর্গা রাতে উঠে মাথায় জল দেয়। তার ঘুম হয় না। ় চিন্তা করে। প্রতাপ লক্ষ্য করেছে দুর্গা কখনো ছেলের নাম মুখে আনে

সে সব কথা আবার মনে পড়ল। প্রতাপ নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলল, 'ছাতাটা দাও। আর একবার ঘুরে আসি।' দুর্গা সাদা ছাতাটা এনে দিল।

কিছুক্ষণ বাদে শুধু কৌশল্যা এবং তার নাতি নয়, গয়লাপাড়া থেকে সুরতিয়া আর ভিখনের মা-ও এল। ভিখনের মা বলল, 'কি হবে চন্দনের মা ? আমি উনোন ধরাইনি। বৌ বলছে বাচ্চাদের নিয়ে পালান দরকার। কি হবে ?

'কি আর হবে ? যা কপালে আছে, তাই-ই হবে।' ব'লে দুর্গা কৌশল্যার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের চাল-ও নিচ্ছি। তুমি ডালগুলো ঝাড়।' ছেলেটাকে বলল, 'বাছুর খুলে দে। গাইটা ছায়ায় বাঁধ। ভূষি দে।'

কিছুক্ষণ বাদে প্রতাপ ফিরল। সে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। মুসলমান পাড়ায় ক'জন ফিরেছে। সে বলল, 'ভিখনের মা ঘরে যাও। ভিখন আসবে শুনলাম। নৌকো নিয়ে আসবে। খাওযা দাওয়া করে চলে যাবে।'

সারাটা দিন একরকম ক'রে কেটে গেল। প্রতাপ অস্বস্তির ভাবনা কাটাবার জন্য জোর ক'রে কাজে হাত দিল। দাওয়ার খুঁটিটা মেরামত করল। দা ও ছুরিতে হাতল লাগাল।

পরদিন সকালে প্রতাপ এবং ছেলেটা গ্রামে বেরুল। বলদ মাঠে চরছে। তাড়িয়ে এনে গাড়ীতে জুতে খড়গুলো ঘরে আনবে।

দুর্গা স্নান করতে যাচ্ছিল। কৌশল্যা বাড়ী গেছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে সে মাথায় তেল দিচ্ছিল। এমন সময়ে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার তার কানে এল। সে ছুটে গেল।

ভিখনের মা। একবার মাটিতে পড়ছে, তারপর উঠছে। চীৎকার করে বলছে 'ভিখন !' আবার সে পড়ছে ঠাস করে। দু'একবার আছাড় খেয়ে উঠে সে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে তার বাড়ীর দিকে গেল। বলতে বলতে গেল 'কেন তুই মরতে গাঁয়ে এসেছিলি ? বৌকে আমি কি বলব ? ওরে আমার বুকটা ফেটে গেল রে !'

দুর্গার বুকে সর্বনাশের ভয়ে ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল। সে ছুটে ঘরে এল। আবার বাইরে গেল।

মাথার রক্ত নেমে যাচ্ছে, বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছে। সে গরুর গাড়ীর ওপর উঠে দাঁড়াল। চীৎকার শোনা যায়। ঘোড়ার খুরের শব্দ। ছই থেকে নেমে বাড়ীতে এল। বিপদ হলে কি করতে হয়! উনোনে জল ঢালতে হয়? হতভম্বের মতো দুর্গা একঘড়া জল উননে ঢালল। আর কি করতে হয়? গাই গরুর দড়ি কাটল সে। তাড়াদিয়ে বের করে দিল বাইরে। তারপর খিড়কীর দোর বন্ধ করে সে হাঁপাতে লাগল। তার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ঝড় উঠলে তবে গাই গরুর দড়ি কাটতে হয়। তবে আগুন নিভাতে হয়। ঝড় ত ওঠেনি। ঝকঝকে আকাশ। তপ্ত রোদ। কিন্তু আবার খুরের শব্দ শোনা গেল। তার স্বামী কোথায়? রাগে দুঃখে তার চোখে জল এল। একলা সে কি করবে? সে এবার বাইরের ঘরে গেল। শালকাঠের ভারী দরজা। প্রতাপ ছাড়া এ দরজা কেউ খুলতে বা বন্ধ করতে পারত না। সে দরজা বন্ধ করতে চেষ্টা করল। দরজার শিকল যে পাশের দেওয়ালে আটকান তা মনে নেই। শিকল খুলল। শিকল খুলবার পর আস্তে টানলেই হত। সব ভুলে সে গায়ের জোরে টানল। ধড়াস ক'রে ভারী কপাটটা এসে তার কপালে লাগল।

'মা গো!' ব'লে দুর্গা মাটিতে পড়ে গেল।

হ্যাভলকের টেবিলের ম্যাপটিতে কানপুরের আশেপাশের অনেকগুলি গ্রামের চারপাশেই লালদাগ দেওয়া। সে গুলি 'রেবেল ভিলেজ।' প্রতিটি গ্রামের সম্পর্কেই ছোট ছোট রিপোর্ট আছে।

ডেরাপুর, হাজিপুর বা বড় হাজিপুর সম্পর্কে কোন সন্দেহজনক রিপোর্ট পাওয়া যায় নি।

ব্রাইট এবং তার সওয়ার দল গ্রামগুলিতে হানা দিচ্ছে। ডেরাপুর সম্পর্কে রিপোর্টটি ব্রাইট মন দিয়ে পড়ে।

'গ্রামটি সমৃদ্ধ। ও অঞ্চলের 'লক্ষ্মীর গোলা' বলা হয়। কায়স্থ, গোয়ালা, ছত্রী ও ব্রাহ্মণরা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। গ্রামে তিনটি ইঁট বাঁধানো রাস্তা, উনত্রিশটি ইঁদারা এবং ছোট একটি বাজার। একটি প্রাচীন দেবালয় আছে।'

ব্রাইট বলে, 'আমাদের যাওয়া উচিত। যদি ওরা দোষী না হয় তাহ'লে ফিরে আসলেই চলবে।'

ব্রাইট আর একটি ইংরেজ, কিছু আইরিশ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সওয়ার সকাল আটটা নাগাদ ডেরাপুরে পোঁছয়।

গ্রামটির পরিত্যক্ত নির্জন চেহারা তারা দেখেছিল! বিশেষ করে লক্ষ্য করেছিল নদীতে একটি-ও নৌকো নেই। ওপারে, দূরে দূরে নৌকো দেখা যাচ্ছিল।

কাঁধে একটি বস্তায় চাল ডাল কম্বল নিয়ে ভিখন দাঁড়িয়েছিল নৌকার আশায়। সে ভাবছিল নৌকো না এলে বেশ হয়। আজকের দিনটার কিছুক্ষণও সে বাড়ীতে কাটাতে পারে। দূর থেকে সাহেবদের আসতে দেখে সে বোকার মতো ছুটতে থাকে। সে না ছুটলে অতর্কিতে তাকে গুলী করবার কথা বোধ হয় ব্রাইটরা ভাবত না। তার মা তাকে ডাকতে আসছিল। বলতে আসছিল নৌকো নিয়ে মন্দিরের ঘাটে এসেছে ভরত ভিখন একপাক ঘুরে টাল খেয়ে মা-র সামনেই পড়ে।

প্রতাপকে তারা বাজারতলায় ধরে। কৌশল্যার নাতিটা প্রতাপের সঙ্গেই ছিল। প্রতাপের হাতে লাঠি ছিল। সে লাঠি ব্যবহার করেনি। সে বলে, 'আমার বাপ সরকারের নিমক খেয়েছে। আমাদের গ্রামে আর কেউ কোম্পানীর চাকর নেই। এ গ্রামে কেউ যুদ্ধ করেনি। ইংরেজ মারেনি, লুঠপাঠ করেনি। আমার বাড়ী চল। কাগজ দেখাচ্ছি।'

ব্রাইট হাসে এবং বলে, 'ক্লেভার ডগ। বেশ কথা বলে।'

প্রতাপ ভাবে তার কথা বিশ্বাস করছে না। সে বলে, 'আমার বাবা চম্মন সিং। আমরা কায়স্থ।'

ব্রাইট বলে, 'চম্মন? কোন্ চম্মন?' সে এগিয়ে আসে এবং তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়।

তিরিশ বছর ধরে প্রতাপ তার বাবার মুখে সাহেবের নাম শুনেছে। সে বলে, 'আমার বাবা ম্যাকমোহনের রেজিমেণ্টে ছিল। সে পিণ্ডারী যুদ্ধে গুলী খায় সাহেব। তার মেডেল আছে।' ব্রাইট সুঁচলো মুখ ক'রে 'বুঝলাম' এই মর্মে একটি শীষ দেয়। তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'একটি পুরো রেবেল ভিলেজ। শয়তান এবং বদমাশ এরা।'

তার সঙ্গীরা ছড়িয়ে পড়ে। তবে বুড়ো মৌলবী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ মানুষকে পায় না। মৌলবীকে ওরা পাঁজাকোলা ক'রে ধরে আনে। অন্য মুসলমান পুরুষরা বাড়ীর পেছনে আধ খোঁড়া কুয়োতে লুকিয়ে পড়ে।

প্রতাপ যখন বোঝে ওরা তাকে মারবে সে তার লাঠিটা তুলে নেয়। তার বাবা বলত, 'তুই ভিতু, তোর রক্ত ঠাণ্ডা।' তার ছেলে তাকে পুরুষকারের অভাবের জন্য করুণার চোখে দেখত। প্রতাপ এখন কিন্তু লড়ে। সে লাঠি ঘুরিয়ে মারতে চায় ব্রাইটকে কিন্তু গালি দিয়ে ব্রাইট তার উপর বন্দুক তোলে।

প্রতাপের পাঁজরায় গুলী লাগে। তখন ক্রোধান্ধ ব্রাইট তাকে, কৌশল্যার নাতিকে এবং বুড়ো মৌলবীকে সামনের জাম গাছটার ডালে ঝোলাবার বন্দোবস্ত করে। একজন সওয়ার গিয়ে প্রতাপেরই বাড়ী থেকে গরু বাঁধা দড়ি আনে। নতুন দড়ি, চকচকে দড়ি। সূর্যের আলোয় তা রূপোলী দেখায়।

ফাঁস পরবার আগে প্রবল চেষ্টায় প্রতাপ গলা থেকে গৈবীনাথের কবচটা ছিঁড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দেয়। কৌশল্যার নাতি এবং মৌলবী খুব তাড়াতাড়ি মরে। প্রতাপের সবল ভারী দেহটা কিন্তু কেবলই ঝুলে মাটিতে নেমে আসে। তার প্রাণ সহজে বেরোয় না। পাঁজরা থেকে রক্ত বেরোয়। গলাটা লম্বা হতে থাকে, জিভ ঝুলে পড়ে, চোখ কোটর থেকে বেরোতে থাকে, হাত শূন্যে খিঁচতে থাকে। ব্রাইট তখন বলে, 'লেট হিম বী! ব্যাটা আস্তে আস্তে মরুক।' কিন্তু আইরিশ এন্‌সাইনটি তাকে গুলী করে। বলে, 'আমরা চলে গেলে কেউ যদি দড়ি কেটে দিয়ে ওকে বাঁচায়?'

তখন প্রতাপের রক্তাক্ত শরীরটা নিশ্চল হয় এবং পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো মাটিতে আঁচড় কেটে স্থির হয়। ব্রাইটরা তখন ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা প্রতাপের বাড়ীতে ঢুকে দুর্গার হাত গলা থেকে সোনার গহনা নেয়। দেওয়ালসিন্ধুক ভেঙ্গে টাকা ও মোহর নেয়। লালাদের বিরাট বাড়ীটি তালাবদ্ধ ও পরিত্যক্ত দেখে জুতোর চামড়ায় ঘসে দেশলাই জ্বালিয়ে খড়ের নুড়ো জ্বালায় এবং লালাদের কাছারী ঘরের খড়ের চালায় ফেলে। তারা যখন গ্রাম ছাড়িয়ে বাইরে পা দেয় তখনই দেখতে পায় ধোঁয়া উঠছে এবং ঘনবসতি ঘরের চালাগুলো একটি একটি করে জ্বলে উঠছে।

তারপরে দুর্গার মাথার দোষ হয়েছিল।

সে পথ হেঁটে হেঁটে কানপুর এসে পৌঁছয়। শহরে বাজারের রাস্তায়

রাস্তায় ঘুরতো, গঙ্গার ঘাটে বসতো। তার ঘরবাড়ী, জমিজমা সবই ক্রমে বাজেয়াপ্ত করে নেয় সরকার। সে খবরও রাখত না।

দিনমান বিড়বিড় বিড়বিড় ক'রে বকতো। রাস্তার ওপর বসে শূন্যে হাত নেড়ে রান্না করতো। আঁচলে ধুলো বেঁধে ডাকত, 'খাবার দিয়েছি, তোরা ক্ষেতে নিয়ে যা!'

কখনো সে বাতাসের গায়ে হাত বুলিয়ে বলতো, 'চন্দন, তোর দাদাকে বল্, যেন আর দুটো দিন থাকে!'

আবার কখনো ছেঁড়া আঁচল মাটিতে লুটিয়ে, জটাপড়া চুল দুলিয়ে সে ছেলের বিয়ের গান গাইতে গাইতে পথ চলত। বলত, 'পথ ছেড়ে দে! পথ ছেড়ে দে তোরা!'

তখন পথেঘাটে এ রকম উন্মাদ স্ত্রীলোক মাঝে মাঝেই দেখা যেত। শহরের পথে কিংবা হাটে বাজারে, শ্মশানে কিংবা লোকালয়ে তারা ঘুরে বেড়াত। তাদের পরনে ছিন্ন বসন এবং চুল ধূলি-ধূসর। তারা কারো সঙ্গে কথা কইত না। তারা শূন্য কোলে দোলা দিয়ে ছেলে ঘুম পাড়াত। তারা জঞ্জাল আঁচলে বেঁধে স্বামী পুত্রকে ক্ষেতে খাবার দিতে যেত। রাস্তার ধুলোয় বসে ওরা সংসারের কাজ করত।

সহসা, 'এ কি তুমি কখন এলে?' ব'লে সলজ্জ হেসে ঘোমটা টানতে চেষ্টা ক'রে যখন মুখ ঘুরিয়ে নিত তখন, একমাত্র তখনই বোঝা যেত এরা একদিন মেয়েমানুষ ছিল।

তাদের দলেই দুর্গাও ভিড়ে যায়।

আরো পরে তার খোঁজ ক'রে ক'রে লালা বৈজনাথের ছেলে এসেছিল। তার সঙ্গে দুর্গার ভাইরা-ও এসেছিল। তারা ফিরে যায়। বলে, 'গঙ্গার ঘাটে একটা পাগলী বসে আছে। পথেঘাটে কত পাগলী, মাগো রগড় যদি দেখতে। দিন নেই রাত নেই কি রান্না করবার ঘটা! কই দুর্গা চাচীকে ত' দেখলাম না। দুর্গা বহিনকে কেউ ত' দেখলাম না!'

ডেরাপুর থেকে ফিরে ব্রাইট খবর পেল তাকে ব্রীজদুলারী খুঁজছে। সে খুসী হয়। ভেবেছিল ব্রিজদুলারী বোধ হয় গয়না এবং মোহর নিয়ে তার বাপের বাড়ী পালিয়েছে বা অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়েছে। কানপুরে ততদিনে কোর্টমার্শাল বসেছে।

বিচার এবং শাস্তিবিধান চলেছে। যারা বিশ্বস্ত ব'লে প্রমাণ দিতে পাচ্ছে, তারা মোটা পুরস্কার পাচ্ছে। বিশ্বাসঘাতক ব'লে যারা নিহত হচ্ছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে রাখা হচ্ছে। পরে অন্যদের বিলি করা হবে।

ব্রাইট একটু চিন্তিত হয়েছে। সে বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছে যে সব ইংরেজ পদস্থ অফিসার লুঠপাট করেছে ব'লে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাদের নাকি জবাবদিহি করতে হতে পারে। সে ভেবেছে, 'খাস ইংরেজরা আমাকে কোন দিনই ভাল চোখে দেখেনি। আমি এবার নিজেই আর্মি ছেড়ে দেব। এখনো আশেপাশে মিউটিনি চলছে, তাই থামল না, আগেই কর্তাদের বিবেক দংশন সুরু হল। আমি আর ঝামেলায় যাব না। পুরনো সার্ভিস রেকর্ড ত' যা-তা হয়ে আছে। আমি এবার একটি ভাল দেখে জমি এবং বাড়ী কিনব। মদের ব্যবসা করব। মদের ব্যবসায়ে টাকা আছে। ইংরেজ মেয়েগুলো নাকতোলা, অহংকারী। আমি ব্রিজদুলারীকে নিয়েই থাকব। আমার বাবার মধ্যে আধা-নেটিভ রক্ত ছিল। আমারও নেটিভ মেয়েই পছন্দ। বেশী ট্যাঁ ফোঁ করলে ওদের চাবকে শায়েস্তা করা যায়। মেমসাহেবদের ত' অঙ্গে হাতটি তুলবার উপায় নেই। না হয় আমার কাচ্ছাবাচ্ছা হাফ-নেটিভ হবে। তাদের সবাই অ্যাংলো বলবে। বলুক গে! ব্রিজদুলারীর সঙ্গে ক'টা ভাল দেখে বাঁদী রাখতে হবে। হাজার হলেও ওদের যৌবন থাকে। সহজে টস্‌কায় না। ইংরেজ মেয়েগুলোর না থাকে রূপ যৌবন, না থাকে জলুস! দু'বছরেই তাদের চামড়ায় মেচেতা পড়ে, দাগ হয়। তাছাড়া ব্রিজদুলারীকে আমার বেশ সয়ে গেছে। আমার ও-ই ভাল। গড়গড়া খাব, পেট ভ'রে ভাত মাংস খাব, বেলা অবধি ঘুমোব, এসব কোন মেমসাহেব সইবে না। তারা বলবে ইংলণ্ড চল! ধুৎ, ইংলণ্ডে আছে কি! সেখানেই যদি সব সুখ থাকবে তবে তোরা ঝেঁটিয়ে এ দেশে আসিস কেন?' ব্রাইটের মনে হল সে ব্রিজদুলারীকে সেধে বললে পরে মেয়েটা 'না' বলতে পারবে না। হাজার হলেও তাকে সাহেবে ছুঁয়েছে। নিজের সমাজে ও মেয়ের পাত্তা নেই।

কানপুর থেকে আট মাইল দূরে শেঠ মগনলালের একটি বাগানবাড়ী আছে। বাগানবাড়ীটি মনোরম ও সুসজ্জিত।

তার পেছনে মস্ত আমবাগান। এই বাগানের প্রত্যেকটি আম ভাল জাতের। গাছের গায়ে চুন লেপে তাতে আলকাতরা দিয়ে নাগরী হরফে

নাম লেখা। এই বাগানে দশটি মালী শুধু আমগাছের পরিচর্যা করত এবং প্রতিবছর আষাঢ় মাসে মগনলাল সাহেবদের 'ম্যাংগো ডিনার'-এ ডাকতেন।

সামনে সুবিন্যস্ত গোলাপ বাগান, পরীমূর্তি, ফোয়ারা। বাড়ীটি গঙ্গার ধারে। বাড়ীর ভেতরে একটি শ্বেত পাথরের চাতাল আছে। সেখান থেকে গঙ্গার বুকে একশো সিঁড়ি নেমে গেছে। সিঁড়ির মুখে লোহার দরজা। ভরা বর্ষায় এই সিঁড়ি খুলে দিলে গঙ্গার জল চাতাল অবধি উঠে এসে ছলছল করে। মগনলাল এই চাতালে বসে গঙ্গাস্নান করতে ভালবাসতেন। কচিৎ বছরে একবার তাঁর বাড়ীর মেয়েরা বনভোজন উপলক্ষে এখানে আসতেন এবং এই চাতালে বসে গঙ্গাস্নান করতেন।

বাড়ীর ভেতরে নিচের ঘরে একটি তহখানা বা গর্ভগৃহ আছে। সে ঘরটির দরজা লোহার, এবং তার চাবি মগনলাল রাখতেন। সারা বছর ধরে কয়েকটি বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ দেহ রাজস্থানী দরোয়ান এ বাড়ী পাহারা দিত।

মগনলাল মস্ত ব্যবসায়ী।

তিনি যদিও শহর ছেড়ে সময় মত পালান, তাঁর হীরে-জহরৎ, সোনার মদনমোহন মূর্তি এবং বস্তাবন্দী রূপোর টাকা তিনি নাকি সব সরাতে পারেন নি। শোনা গিয়েছিল তাঁর শহরের বাড়ী লুঠতরাজ হবে ভয়ে তিনি কিছু কিছু ধনদৌলত লুকিয়ে রেখেছেন। নিশ্চয় এ বাড়ীতে রাখেননি, তা হ'লে বিদ্রোহের প্রথমেই তল্পীতল্পা গুটিয়ে পাহারাদাররা উধাও হ'ত না। তাঁর এ বাগানবাড়ীতে অনেকদিন কেউ আসেনি। শোনা যাচ্ছিল সে বাড়ীতে একটি প্রেতিনীকে দেখা গেছে। রাতের অন্ধকারে বা প্রত্যূষে কেউ কেউ সেই নির্জন ও পরিত্যক্ত বাড়ীতে পাণ্ডুবর্ণ, সাদা কাপড় পরা একটি মেয়েকে দেখেছে। এমনও শোনা যাচ্ছিল, পালিয়ে যাবার আগে মগনলাল নাকি তান্ত্রিক ডেকে ঐ বাড়ীর তহখানায় একটি নারীকে বলি দিয়ে যখ রেখে গেছেন। তখন অবশ্য অনেকে বলে, তবে আছে, ও বাড়ীতে কিছু কিছু মূল্যবান সম্পত্তি নিশ্চয় আছে। তারপর বাড়ীটি পরিত্যক্ত জেনে ঢুকে প'ড়ে। ক'জন নাকে খত দিয়ে পালায়। কি দেখল কিছুই বলে না।

'প্রেতিনী দেখেছিস ?'

'হ্যাঁ'।

'যখ দেখলি ?'

'হ্যাঁ।'

সব কথাতেই মাথা নেড়ে তারা সায় দিল।

সেই বাড়ীতে আসে ব্রাইট।

সকাল বেলা। বাড়ীর কাছে আসতেই বাড়ীর দিক থেকে গুলী চলতে থাকে।

পালটা গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে ইংরেজরা ঢোকে। কুড়িজন ভারতীয়কে সেখানে পায়। তারা দেখে একটি ঘরে কাগজপত্র পুড়ছে। আর একটি ঘরে গুলী, বারুদ ও বন্দুক। ইংরাজরা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু ভারতীয়রা-ও মরবে জেনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। একজনকে দেখে টমসন বলে, 'এই শালা সতীচৌড়া ঘাটে নৌকোর ওপর বন্দুক ছুঁড়েছিল।'

'হ্যাঁ, আমি তোর শালা। আয় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিই' বলে ভারতীয়টি খোলা তরোয়াল নিয়ে ধাবিত হয়।

'ভাই সব, শঙ্করের নাম নাও। আমরা আজ মরব। ওদের মেরে মরবো।' চীৎকার ক'রে যে এগিয়ে আসে, তাকে দেখে ব্রাইট বলে, 'এই সেই সাধু! শালা, তুমি চম্পার নাগর ছিলে!'

সম্পূরণ তরোয়াল নিয়ে 'শঙ্কর! হরহর মহাদেব' বলে সামনের সওয়ারটিকে আঘাত করতে থাকে। বাইরে বারজন আফগান বলে, 'দীন! দীন!' তখন হাতাহাতি যুদ্ধ হয়।

ঘর থেকে ঘরে সরে গিয়ে যুদ্ধ করে ভারতীয়রা। তারা মারে এবং মরে। গাদা বন্দুকের পলতে থেকে আগুন লাগে এবং আগুন ছড়াতে থাকে। একজন ইংরেজ চেঁচিয়ে বলে, 'পুবের হলঘরটা সামলাও! ওরা বারুদে আগুন দিতে চেষ্টা করছে। আমরা পুড়ে মরব। ইঁদুরের মতো!'

তখন সম্পূরণ ও আর দু'জন আফগান পলতেয় আগুন ধরিয়ে দিয়ে সেই ঘরে ঢোকে।

ভীষণ শব্দ হয়, ছাদ ধ্বসে পড়ে ও দেওয়াল ভেঙে পড়ে। বাকি ইংরেজ ও ভারতীয়রা যুদ্ধ করতে করতে এবার বাগানে নামে।

ব্রাইট যুদ্ধ করেনি। সে ঘরের পর ঘর দৌড়ে বেড়িয়েছে। সে হলঘরে প্রবেশ করে এবং দেখতে পায় বিস্ফোরণের ধাক্কায় কোণের ছোট লোহার দরজা ভেঙে গেছে। সে উপুড় হয়। মাটিতে লম্বা হ'য়ে শুয়ে ধোঁয়া, চুন, সুরকি ও ইঁটের গুঁড়োর ভেতর দিয়ে দেখতে পায় কি চকচক করছে।

'নিশ্চয়ই সোনা।' সে হাত চালিয়ে দেয়। হাত চালিয়ে দিয়ে সুরকি

ও বালি সরাতে থাকে। বারুদ ফাটবার ফলে চারপাশ থেকে চুন, বালি ঝরছে। তার নাকে চোখে লাগে এবং অস্বস্তি হয়। সে ডানহাতে একটা থলির কোণ চেপে টানতে থাকে। থলিতে টাকা আছে বলেই মনে হয়। জোরে টানে। তখন ভেতর থেকে ক'টুকরো ভাঙা ইঁট এবং বালির আস্তর ভেঙে প'ড়ে তার হাতটা চাপা দেয়। অসহিষ্ণু হয়ে হাত টানতে গিয়ে সভয়ে উপলব্ধি করে তার হাতটা এমনভাবে চাপা পড়েছে যে টেনে বের করা সম্ভব হবে না। হয়তো হাতটা কব্জি থেকে খ'সেই যাবে। সে খুবই অসহায় বোধ করে। নিজের নির্বুদ্ধিতাকে গালি দিয়ে পেছনে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে একজন ঘরে ঢুকে দেওয়ালে পিঠ রেখে হাঁপায় এবং 'থু থু' ক'রে মুখ থেকে ধুলো ছিটিয়ে ফেলে। ব্রাইটের চোখ বড় হয়ে ওঠে। অবিশ্বাস্য, তবু বিশ্বাস করতে হয়। সে বলে, 'ব্রিজদুলারী !'

ব্রিজদুলারী চেঁচিয়ে ওঠে, 'কে ?' তারপর সে তাকায়, ভাল ক'রে দেখে। বলে, 'তুমি !'

'হ্যাঁ আমি !' ব্রাইটের গলায় যন্ত্রণা সুপরিস্ফুট। সে বলে, 'একটা খন্তা আনতে পার !'

ব্রিজদুলারী দেওয়ালের সঙ্গে তেমনই লেপটে থাকে। সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়। বলে, 'কেন ?'

'এই ইঁটগুলো চাড দিয়ে সরাবে। আমার হাতটা আটকে গেছে।'

'ওখানে হাত আটকে গেছে ?' ব্রিজদুলারী যেন বোঝেনি।

'হ্যাঁ হ্যাঁ। নয়তো কি ইয়ার্কি করছি আমি ?' ব্রাইট গর্জে ওঠে।

'তাই উঠতে পারছ না ?'

'হ্যাঁ, কতবার বলব ?'

'ও, বুঝেছি। সোনার খোঁজ করছিলে ?' হঠাৎ ব্রিজদুলারী হেসে ওঠে। বলে, 'মূর্খ ! সোনা ওখানে কতটুকু আছে ?'

'এখানে তবে কি আছে ? ওঃ হাতটা ছিঁড়ে গেল।'

'রূপোর টাকা হতে পারে। সোনার খোঁজ জানি আমি !'

'ব্রিজদুলারী, তাড়াতাড়ি কর্।'

ব্রিজদুলারী তার দিকে তাকাল। বলল, 'হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি-ই করব।'

সে কাছে এল। ব্রাইট বলল, 'কই, খন্তা আনলে না !'

ব্রিজদুলারী ছুটে জানলার কাছে গেল। আবার সে সরে এল।

বাইরে গুলী চলছে। পায়ের শব্দ, ঘোড়ার চীৎকার এবং মানুষের আর্তনাদ। সে কোমর থেকে পিস্তলটা বের ক'রে টোটা ভরতে লাগল। টোটা ভরে সে কাছে এল। ব্রাইট বলল, 'কি, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না? আমার হাতটা...'

নিচু হয়ে ব্রাইটের কপালের পাশে পিস্তল তুলে ব্রিজদুলারী চেঁচিয়ে বলল, 'এবার আর আমার কোন দুঃখ নেই। তোমাকে আমি মেরে ফেলছি। আমার হাতেই মরছ তুমি, হ্যাঁ।'

ব্রাইট বাঁ হাতটা দিয়ে তাকে বাধা দেবে কি, ব্রিজদুলারী ওপাশে ঘুরে যায়। তারপর ব্রাইটের কানের মধ্যে গুলী করে। দুটো গুলী পরপর ভীষণ শব্দ তুলল।

ব্রিজদুলারী পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে বেরিয়ে এল। বাড়ীর ভেতর দিকের সিঁড়ি ধরে নামল। ঘাটের সিঁড়ির শেষ প্রান্তে এসে দেওয়ালের একখানা ইঁট সরাল। ঘাটের নৌকায় যে লোকটি বসেছিল তাকে ডাকল। লোকটি উঠে এল। দেওয়ালের ফাঁক থেকে দু'জনে মোহরের থলি কয়েকটি বের ক'রে নিল। নৌকায় ফেলল। লোকটি আর একটি লোহার ছোট হাতবাক্স বের করল। ব্রিজদুলারী পাংশুমুখে বলল, 'ও কি করছ?' লোকটি বলল, 'যা পারি সঙ্গে নিই। ওদের দেব না।' সে আর কটি থলি ও বাক্সটি নিয়ে নেমে এল। বাক্সটি বড়ই ভারী। সে সেটাকে গঙ্গার জলে ফেলল। বলল, 'যদি পারি পরে এসে নেব। নইলে গঙ্গায় যাক।'

তার পরদিন রাতে ব্রিজদুলারী ভবানীর কাছে এল। ভবানী কানপুরের উত্তর সীমান্তে একটি কাঠের গুদামে বাস করছিলেন। লক্ষ্মণ তাঁকে কথা দিয়েছিল ব্রিজদুলারীকে সে খবর দেবে।

ব্রিজদুলারী এল।

তার মুখ পাণ্ডুর। পোশাক ধূলিধূসর। কিন্তু ভবানী লক্ষ্য করলেন তার মধ্যে একটি দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। যে তার সঙ্গে এল সেই লোকটি এবং লক্ষ্মণ দু'জনেই তার সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করছে। লক্ষ্মণ ঈষৎ হেসে বলল, 'জানি না আর কতদিন ওদের ফাঁকি দিতে পারব। সম্ভবতঃ এই-ই শেষ। ওরা ধরে ফেলবে।'

'তুমি পালাও।' ব্রিজদুলারী বলল।

লক্ষ্মণ বিষণ্ণভাবে অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'না। পালাব না।'

তারপর সে বলল, 'আজই তোমরা পালিও। নৌকো পাবে। নদীতে জল আছে, চলে যেতে পারবে। আমি চলি, আমার সঙ্গে তোমাদের আর দেখা হবে না।'

সে চলে গেল। ব্রিজদুলারী ভবানীর সামনে এসে দাঁড়াল।

একত্রিশ

১৯শে জুলাই, ১৮৫৭।

বিঠুরের আকাশ আজ লাল হয়েছে। আগুন উঠছে, ফুলকি উঠছে।

সাত মাস আগে জানুয়ারীতে পেশোয়া যে উৎসব করেন, তারপর আর এ রকম রোশনাই দেখা যায়নি।

আজ মেজর স্টিফেন্‌সনের বিজয়ী ব্রিগেড এসেছে।

আজ মোব্রে টমসন, ইভান্‌স আবার এসেছে। তাদের স্বাগত জানাতে শ্যামবর্ণ স্থূলকায় গৃহস্বামী আজ উপস্থিত নেই।

সুদর্শন মিষ্টভাষী আজিমউল্লা খাঁ-ও অনুপস্থিত। পেশোয়ার অজস্র অনুচরের মধ্যে যে বলিষ্ঠদেহ, গম্ভীর কান্তি, মধ্যবয়সী প্রৌঢ় মাঝে মাঝে এসে দূরে দাঁড়াতেন, সেই তাঁতিয়া টোপী এখন মধ্যভারতে। পেশোয়া নিজে নাকি পলাতক।

আজ ইতিহাস থেকে পেশোয়ারা বিদায় নিচ্ছেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুবিচারক বালাজী বিশ্বনাথ এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, বীর ও প্রেমিক প্রথম বাজীরাও। ন্যায়পরায়ণ মাধবরাও এবং নিষ্ঠুর চক্রান্তকারী রাঘোবা। দুর্বলচিত্ত শান্তিপ্রিয় দ্বিতীয় বাজীরাও এবং নানা ধুন্ধুপন্থ।

শিবাজীর উত্তরাধিকারীদের অধিকারকে সংকুচিত করে পেশোয়ারা রাজত্ব গ্রহণ করেন। আজ তাঁদের বিদায়ের দিন।

বহু যুদ্ধ, বহু জয়, বহু গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন ঐ সব কামান। বাইরের বারান্দার দেওয়ালে দেওয়ালে পেশোয়াদের অধীন বশংবদ মারাঠা কন্‌ফেডারেসির স্মৃতিচিহ্ন। গাইকোয়াড় ও হোলকারের চিত্রলাঞ্ছিত ঢাল ঐ দেখা যায়। সিন্ধিয়াদের সূর্য ও সর্পলাঞ্ছিত ঢালের গায়ে আগুনের শিখা নাচছে। নাগারা ও চামর চিহ্নিত ঝাঁসীরাজের ঢাল ঐ এক কোণে।

রূপোর শেকলে ঝোলান ঐ তরবারি ছত্রসাল দিয়েছিলেন প্রথম বাজীরাওকে। ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী ঐ মন্ত্রপূত তরবারি তাঁকেই দেন। ঐ তরবারিতে যেদিন মরচে পড়ে, সেদিনই নাকি প্রথম বাজীরাওয়ের মৃত্যু হয়। আগুনের আভায় এক একবার ঝলকে উঠছে এই সব লাঞ্ছন আবার গাঢ় অন্ধকার এসে তাদের ঢেকে ফেলেছে।

ঐ দূরে আজিমউল্লার প্রাসাদ জলছে।

তার আগুন আকাশকে দীপ্যমান করেছে। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া বাতাসে ও আকাশে ইতস্ততঃ চলে বেড়াচ্ছে। তারা যেন ভয়ঙ্কর ও বিরাট-দেহী সরীসৃপ। আকাশে যথেচ্ছভাবে কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে নিজেদের দেহকে বিস্তৃত করছে।

পেশোয়ার প্রাসাদের ঘর থেকে ঘরে ধোঁয়ার সেই সাপ নিঃশব্দে প্রবেশ করছে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত ঘরটিকে তাদের দেহ দিয়ে ভরে ফেলছে।

সৈন্যেরা লুণ্ঠন করছে। তারা চীৎকার করে ঘর থেকে ঘরে লুঠ করছে এবং পরিত্যক্ত ঘরটিতে অগ্নিসংযোগ করছে।

অফিসার, ব্রিগেডিয়ার, ক্যাপ্টেন এবং এন্‌সাইন—সকলেই আজ লুণ্ঠনে ব্যস্ত। তাঁরা আঁতিপাঁতি করে সন্ধান করছেন।

চীৎকার করে বলছেন, 'সেই শয়তানের রাজা আমাদের যখন ডাকত তখন সোনার গোলাপপাশ, সোনার ট্রে, সোনার ফর্সী সাজিয়ে দিত। আঃ জলের গ্লাসে যে নেটের ঢাকনী থাকত তাতে সাঁচ্চা মোতির ঝালর ঝুলত।'

হলঘরের দেওয়াল আয়না ঢাকা।

ভেনিস ও ফ্রান্সের আয়না। বেলজিয়ামের উৎকৃষ্ট ঐ আয়নাটি-র জুড়ি নাকি একমাত্র ভিয়েনার সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসার বিলাস কক্ষে আছে।

মাথার ওপর হাজার বাতির ঝাড় দুলছে। ছাত থেকে হাজার হাজার অস্ত্রের মালা দুলছে। মশালের আলো সেই অস্ত্রে ঝলকাচ্ছে। সেই ঝলকানিতে বাতির ঝাড় ঝলমল করছে। আয়না থেকে তীব্র দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আয়নায় কারুকাজ করা গিলটির ফ্রেমকে মনে হচ্ছে সোনা।

সৈন্যরা সোনার নেশায় পাগল হয়েছে।

চন্দন ও মেহগনি কাঠের ঐ সোফা ভাঙ; কৌচ ভাঙ্! রেশম ও কিংখাবের ঢাকনী তরোয়াল দিয়ে চিরে ফেল। পালক ও তুলোভরা তাকিয়াগুলো ছিঁড়ে ফেল!

তুলো উড়ুক, পালক উড়ুক!

'পেয়েছি—' সোনার মোহর ভরা থলি হাতে একজন ছুটে আসে। আর একজন তাতে তরোয়ালের খোঁচা দেয়। মোহর ছড়িয়ে পড়ে। সকলে উপুড় হয়ে কাড়াকাড়ি করে।

'আহা আয়নার পেছনে কুবেরের ভাণ্ডার।'

সোনার আতরপাশ, সোনার রেকাবি। সোনার নস্যিদান, সোনার ফর্সী। আরো মোহর, আরো আতরপাশ, আরো রেকাবি। আয়না ভাঙতে থাকে সবাই। কাঁচ গুঁড়োতে থাকে।

এক আইরিশ যুবক কোনদিকে না তাকিয়ে কাঁচের ঝাড়ে গুলী করছে। দীপাধারের মাঝের ঝাড়টি গাঢ় লাল কাঁচের তৈরী। পদ্মের পাপড়ি যেমন স্তরে স্তরে রং বদলায়, ঐ দীপাধারটির কাঁচও তেমনিই গাঢ় থেকে ফিকে লাল হয়ে এসেছে! যুবকটি গুলী করে। ঝন্ঝন্ শব্দে কাঁচ ভাঙে। সে শব্দ শোনে, আরো গুলী করে এবং আরো কাঁচ ভাঙে।

একজন মশাল জ্বালিয়ে এক বিবসনা ইতালীয় নর্তকীর পিতলের মূর্তির হাতে গুঁজে দেয়। মশালের আলোয় লুণ্ঠনরত সৈন্যরা আয়নায় নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে চেঁচিয়ে ওঠে 'কে, কে, কে?'

তারা বেয়নেট তুলে তেড়ে যায়। দেখে এ শুধু তাদেরই প্রতিবিম্ব 'শালা ভেলকী দেখাচ্ছে!' বলে তারা আয়না ভাঙতে থাকে।

এবার ওদিক থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে কলরোল ওঠে। নানাসাহেবের সন্ধান পেয়েছে ওরা। সকলে সেদিকে ছুটে যায়।

নানাসাহেব নিজে পান করতেন কি না, তা এরা জানে না! তবে ইংরেজ অতিথিদের তিনি বহুবার বহুমূল্য পানীয় পরিবেশন করেছেন।

দেওয়ালের গায়ে সারি সারি আলমারি। নিচে লম্বা চৌবাচ্চার মতো ইঁটের আধার।

ব্র্যাণ্ডি এবং বিআর। শেরী এবং স্যাম্পেন। আবসাতেঁ এবং পোর্ট। ইতালী, ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানীর নানা রঙের নানা জাতের পানীয়।

কেউ বোতলের মাথা উড়িয়ে সুরা পান করে। কেউ বড় বড় কাঠের বাক্স বাইরে টেনে নিয়ে যায়। কেউ দুর্মূল্য, সুদৃশ্য পাতলা কাচের গেলাসগুলি ভাঙতে থাকে।

সহসা বাইরে থেকে এক অদ্ভুত, মিশ্রিত আর্তনাদ শোনা যায়। বাগানে আগুন লেগেছে। তেল ঢেলে সৈন্যরা বাগানের শিকারখানার কাঠের বেষ্টনীতে আগুন দিয়েছে। সেই আগুনে দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, ইউ-ক্যালিপটাস ও চন্দন গাছ জ্বলছে। মিশ্র সে সুগন্ধের সঙ্গে সঙ্গে মাংসপোড়া গন্ধ আসছে। লোহার খাঁচায় জ্বলন্ত ডাল, পাতা ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

দগ্ধ হতে হতে কালো চিতা, চিতাবাঘ, ভালুক ও সিংহ খাঁচার এদিক থেকে ওদিক ছুটছে। তাদের লোম পুড়ছে, মেঝেতে গড়িয়ে তারা আর্তনাদ করছে। হাতী শুঁড় তুলে চ্যাঁচাচ্ছে, তার দুই পা শেকলে বাঁধা। আস্তাবলে আরবী ঘোড়াগুলো বন্ধ দরজার ওপারে হ্রেষাধ্বনি করছে। সাদা ও রঙীন ময়ূর পালকে আগুন নিয়ে ভয়ে যতই ছুটছে, ততই বাতাস লেগে আগুন তাদের পোড়াচ্ছে। এক বিশাল দেহ বারশিঙ্গা হরিণ ভয়ে হলঘরে ঢুকে পড়ে। দেওয়ালের শেষ অক্ষত আয়নায় তার ছায়া পড়ে। সে আর একটা হরিণকে ছুটে আসতে দেখে আয়নার ওপর মাথা ঠোকে।

তার শরীরের চাপে গোড়া থেকে উপড়ে আসে শিং। রক্ত পড়ে চোখ ঢেকে যায়। তখন সৈন্যরা উল্লাসে চ্যাঁচায়। তারা হরিণটার চারটে পা ধরে টেনে নিয়ে চলে। হরিণটার সিং মাটিতে ঘসতে থাকে। তারা পশুটিকে আগুনের মধ্যে ফেলে বেয়নেট দিয়ে চেপে ধরে।

ইভান্‌স অন্দরে ঢুকে পড়ে।

নানাসাহেবের অন্তঃপুরের কত গল্পই না সে শুনেছে। কত নর্তকী এবং কত না বিলাসের আয়োজন। সে বিছানা ফেড়ে মোহর, সোনা ও রূপোর গহনা বের করে।

দেওয়ালে চেয়ে দেখে নগ্নদেহা বিলাসিনীদের তৈলচিত্র। দেখে অ্যাডোনিসের বুকে শুয়ে ভেনাস চেয়ে আছেন। ভেনাসের গোলাপী ও স্ফীত স্তন উন্মুক্ত। তাঁর ঠোঁটে হাসি, হাতে কালো আঙুরের গুচ্ছ।

সে চারিদিকে তাকায়। বড় বড় ডিভান। সুমসৃণ মেঝে।

মশালটা বিছানার ওপর ফেলে। চন্দনকাঠের পালঙ্কটি জ্বলে ওঠে। সেই আলোতে নিশানা স্থির ক'রে সে ভেনাসের বুকটা চিরে ফেলে।

ফ্রেম থেকে ভেনাস ঝুলে পড়েন আর রামচাঁদী মোহরের থলে ঝনাৎ ক'রে পড়ে মাটিতে।

তখন ইভান্‌স এক অদ্ভুত উল্লাস বশে ক্লিওপেট্রার বুক থেকে নাভি পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে। আলবোলা সেবনরত এক ভারতীয় বাঈজীর দেহ ছিন্ন-বিছিন্ন করে।

হঠাৎ কে যেন ঝনঝন শব্দ করে ওঠে। সে তাকায়। বোধ হয় অতর্কিতে শেকল ছিঁড়েছে, তাই ওপর থেকে দীপাধারটা নেমে আসছে।

সরে আসে ইভান্‌স। পার্শ্বের ঘরে চলে আসে। এ ঘর অন্ধকার। ও ঘরের আগুনের আঁচে এ ঘরের অন্ধকার কাটেনি। দরজার পাশে একটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ ইভান্‌সের নিশ্বাস থেমে যায়। সে পেছনে হাঁটে। বন্দুক তোলে। বলে, 'কে, কে তুমি?'

নারীমূর্তিটি এগিয়ে আসে। বলে, 'ভয় পেয়েছ? আমি চম্পা।'

'চম্পা'!

'হ্যাঁ। আমি চম্পা।'

হ্যাঁ চম্পা। তার গায়ে ওড়না নেই। তার জামা ছেঁড়া এবং দেহ অনাবৃত। তার গলায়, হাতে, হীরের বালা, হীরের মালা। তার কানে হীরের দুল। চম্পা একটু নড়ে, আর আগুনের আভায় সেই হীরে থেকে নীলাভ এবং সাদা দ্যুতি বেরোয়।

চম্পা কাছে আসে। চম্পা ইভান্‌সের হাতে হাত রাখে। বলে, 'কি খুঁজে খুঁজে মরছ? আমি সারাদিন পেশবার ছোটরাণী কালীবাই-এর রত্নভাণ্ডার আগলে বসে আছি'।

'কোথায়, চম্পা?'

'সারাদিন আমি মুক্তো, হীরে, চুনী, পান্না, নীলা নিয়ে খেলা করেছি জান?'

ইভান্‌স বলে, 'আমাকে দেখাও।'

'দেখাবই ত! তোমাকে দেব বলেই ত' বসে আছি। এস!' তারা বেরিয়ে আসে। ঘরের পর ঘর, গলি এবং আরো ঘর। ঘরের কুলুঙ্গী থেকে ধাতুনির্মিত মহালক্ষ্মী ও গণেশের সুবৃহৎ মূর্তি ঝকঝক করে। চম্পা বলে, 'ওদিকে চেও না। এস!'

তারা একটি বিশাল বারান্দায় এসে পড়ে। এখানে সারি সারি পালকী। সোনা ও রূপো, গালা ও মীনার কাজকরা সুদৃশ্য পালকী, তাঞ্জাম। ইভান্‌স দেশলাই জ্বেলে সেদিকে তাকায়। সে দেশলাইটা সামনের পালকীটার ওপর ফেলে। পালকীটা জ্বলে। প্রথমে আস্তে, পরে দপ ক'রে আগুন জ্বলে। ইভান্‌স সেই আলোতে ভাল ক'রে দেখে। তার মনে হয়েছিল এটি বারান্দা। হ্যাঁ বারান্দাই বটে, তবে খোলাবারান্দা নয়। লম্বা, অতি দীর্ঘ একটি ঢাকা দালান। পালকী একটি নয়, সারি সারি রাখা আছে। দেওয়ালের গায়ে উট, ঘোড়া ও হাতীর সাজপোষ বড় বড় হুকের সঙ্গে টাঙানো। সে বলে, 'এখানে এত পালকী কেন?'

চম্পা নিজে দাঁড়ায় না। তাকে-ও দাঁড়াতে দেয় না। চলতে চলতে বলে, 'রাণীদের, পেশবার মাতাদের ব্যবহারের খাস পালকী এগুলে।'

ইভান্‌স চলতে চলতে চেয়ে দেখে পালকীর সোনালী ও লালে কারুকাজ করা গালার আস্তর জ্বলছে। পেতলের ও রূপোর সিংহমুখ ডাণ্ডি খসে পড়ছে এবং জরির কাজকরা ঢাকনীগুলো গলে গলে নামছে।

এই বারান্দার পর তারা দু'ধাপ সিঁড়ি নেমে কয়েকটি বড় বড় ঘর ও বারান্দা পেরোয়। ঘরগুলি নিরাভরণ বললেই হয়। কোণে অনেক বাসনপত্র এবং কলসী দেখা গেল। চম্পা বলল, 'এখানে বিধবা আত্মীয়ারা থাকতেন। তাঁরা পূজোর ঘরে কাজ করতেন।'

সেই ঘরের পর ছোট ছোট কয়েকটি কুঠুরী। আরো ঘর, আরো বারান্দা, আরো উঠোন। কোথায় যে চলল তারা ইভান্‌স তা বুঝল না। সবই ছায়া ছায়া, অস্পষ্ট: চাঁদের আবছায়া আলোয় সবই অদ্ভুত, রহস্যময় মনে হয়। কখনো তারা দেখল স্তূপীকৃত বড় বড় বাসন পড়ে আছে। কখনো বা তারা ছাই ও কাঠ কয়লা পায়ের নীচে মাড়িয়ে গেল। বড় বড় উনোন দেখা গেল। স্তূপীকৃত কাঠ। এক জায়গায় একটি বাঁধানো হোমকুণ্ডের পাশে সরু সরু কাঠের স্তূপ। ইভান্‌স তাতে আগুন দিতে চাইল। বড় নিঃশব্দ, বড় নিস্তব্ধ চারিদিক। সে বুঝল মানুষজন হঠাৎ ছেড়ে গেছে প্রাসাদ। তাই তাদের প্রতিদিনের জীবনের চিহ্ন এমনি করে ছড়িয়ে আছে। সে আশ্চর্য হয়ে দেখল একটি সুবৃহৎ হোমকুণ্ডের বুকে তখনো কাঠকয়লা ও গমের তুষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। সে সেটিকে পাশ কাটিয়ে গেল কিন্তু চম্পা তার ওপর পা রেখেই পার হলো এবং তখন

এক মুহূর্তের জন্যে চম্পাকে-ও সে ভয় পেল। অবশ্য তখনই চম্পা স্বাভাবিক গলায় বলল, 'বোধ হয়, শেষ মুহূর্ত অবধি ওরা হোম যজ্ঞ করেছে। গমের তুষের আগুন অনেকদিন অবধি জ্বলতে থাকে।'

চম্পার গলার স্বর স্বাভাবিক। শুনে ইভান্‌স একটু আশ্বস্ত হল। সে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ বল ত? আমাদের সৈন্যদের গলার আওয়াজ-ও যে অনেক দূরে মনে হচ্ছে।' 'অনেক দূরেই ত! চল না, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল ওরা এ সব, দেখবে চল! সত্যি ইভান্‌স, আমি যখন দেখলাম...' আবার তারা ক'টি সিঁড়ি নামল।

তারা একটি কাঁচা মাটির উঠোনে এল। বেলফুল, জুঁইফুল, রজনীগন্ধা এবং হাসনুহানার গন্ধ সেখানকার বাতাসে থেমে আছে।

সেখানে দাঁড়িয়ে চম্পা বলল, 'দাঁড়াও, চাঁপা গাছটা কোথায় দেখি?'

একবার শুধু একবার ইভান্‌সের মনে হল চম্পা পথ ভুল করেছে আর চম্পার ওপর অন্ধবিশ্বাস আরোপ ক'রে এত দূর এসে সে-ও ভুল করেছে। ফিরবার পথ কোথায়? ঘরের পর ঘর, সিঁড়ি, বারান্দা, বিধবাদের মহল, পুজোর বাসন রাখবার মহল, রান্নাবাড়ী, আরো ঘর, আরো বারান্দা, মনে করতেই তার পা অবশ বোধ হল এবং মাথাটা কেমন ক'রে উঠল। অনেক দূরে এসেছে সে। এত দূরে এসেছে যে ওদিকের শব্দ কানে স্তিমিত শোনাচ্ছে। ওদিকের আকাশটা শুধু দেখা যাচ্ছে। লাল আকাশ। কিন্তু বাড়ীর ভেতরে সে যে পালকী গুলোতে আগুন দিয়েএল তার আভাস এতটুকু চোখে পড়ে না। তার মনে হল বাড়ীটা খুব গোলমেলে। সে বলল, 'বাইরে এলাম নাকি?'

'না।' চম্পা হাসল। লাবণ্য মাখা মিষ্টি হাসি। চম্পা ইভান্‌সের হাতে হাত বুলোল। বলল, 'এ বাগানে যে সব ফুল ফোটে তা দিয়ে দেবসেবা হয় না। এ সব রাতের ফুল। রাতেই এদের বাহার। এই ফুল দিয়ে গুঞ্জা ও বেণী গাঁথা হতো। রাণীরা পরতেন। বাইরে যেত। নর্তকীরাও কখনো কখনো পরতো। আমি পথ চিনেছি। এসো।'

•

এবার তারা নামছে। দশটা সিড়ি নেমে তারা যেখানে পৌঁছল, সেখানে ঢুকেই ইভান্‌স হঠাৎ দাঁড়াল। বলল, 'কে, কে ওখানে?' সাড়া নেই। ছায়া-ছায়া সব কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। ঘরটা মস্ত বড়।

ঘরটার মধ্যে মধ্যে থাম। বড় বড় দরজা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। দূরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা নড়ে না, কথা বলে না।

ইভান্‌স তার রিভলভার ছুঁড়লো। কোথায় যেন লাগলো গুলীটা, কি যেন ঠং করে বাজল। তারপর শব্দটা থামল। শব্দের রেশটা গুর-গুর করতে লাগল। কাঁপতে থাকল। তারপর কেঁপে কেঁপে, ক্ষীণ হয়ে হয়ে রেসটা যেন বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজতে লাগল।

চম্পা এগিয়ে যাচ্ছিল, ফিরে এল। বলল, 'আঃ, কি করছ?'

'ওগুলো কি, চম্পা?'

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ইভান্‌সের গলাটা একটু কাঁপল।

'গঙ্গাজলের জ্বালা।'

'গঙ্গাজলের জালা?'

'হ্যাঁ। এদের পানীয় জল ভরাবর্ষায় গঙ্গাথেকে আসত। ঐ জালাতে কর্পূর দিয়ে রাখা হত।'

'ও, গঙ্গাজল খুব পবিত্র।' ইভান্‌স এবার বুঝেছে।

'হ্যাঁ। এস।'

তারা আর কয়েকটি মাত্র ঘর পেরুল। ঘরগুলি ছোট। ছাদ নিচু। তারপর তারা একটি নিচু বারান্দা দিয়ে চলল। বারান্দাটির দু'পাশে থাম। এবং দেয়াল নেই। কিন্তু মাথার ওপরের ছাদটি নিচু। এত নিচু যে তাদের নত হয়ে চলতে হল। তারপর চম্পা একটি ছোট দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজাটি খোলা। চম্পা বলল, 'এসে গেছি। দেখি, মশালটা রেখেছিলাম!'

দেওয়ালের গায়ে মশাল ছিল। চম্পা সেটি জ্বালল। সেই মশালের আলোয় ইভান্‌স দেখতে পেল দেওয়ালে কিছু দূরে দূরেই মশাল গোঁজা আছে। সে বলল, 'এ-ই মশালটা এখানে আছে তুমি জানতে?'

'জানতাম ত! কেন, মশাল ত' বরাবরই ছিল। আমরা যে-সব জায়গা দিয়ে এলাম তার দু'ধারে-ই মশাল ছিল।'

'তবে অন্ধকারে এলে কেন?' ইভান্‌স চম্পাকে বুঝতে পারছে না।

চম্পা সে কথার জবাব দিল না। বলল, 'এস।'

'কোথায়?'

'এই পাতাল-ঘরে। হীরে-জহরৎ লুকোবার জায়গাটি কেমন বের করেছে বল ত?'

ইভান্‌স মশালটি হাতে নিল।

দরজা দিয়ে সে ঢুকতেই চম্পা বলল, 'সাবধানে নাম। সিঁড়ি আছে।'

ইভান্‌স সাবধান হয়েই নামল। চম্পা তার পাশ কাটিয়ে আগে নামল। বলল, 'বড় পেছল। আমার কাঁধে হাত রেখে নাম।'

ইভান্‌স নামতে লাগল। মশালের আলো ও ধোঁয়ায় তার কাশি এল। সে দেখল ঘরটি গোল। ঘরের দেয়ালে শ্যাওলা ঝুলছে। ভ্যাপ্সা এবং অদ্ভুত একটা গন্ধ। নিশ্বাস নেওয়া যায় না। সে নিচের দিকে তাকাল।

সিঁড়ি, সিঁড়ির পর সিঁড়ি। সিঁড়িতে শ্যাওলা এবং পেছল। হঠাৎ দপ দপ করে মশালটা নিভে গেল।

'চম্পা, মশালটা নিভে গেল যে!' দেশলাই জ্বালতে চাইল ইভান্‌স।

'নিভে গেছে, ফেলে দাও।'

'দেশলাইটা পাচ্ছি না কেন?'

'দেশলাই ওপরে ফেলে এসেছি।'

'ছি ছি!'

'ফেলে দাও না! আমি ত' আছি। তুমি নেমে এস।'

ইভান্‌স মশালটা ফেলে দিল। তার নিজেকে অসহায় এবং দুর্বল মনে হল। মশালটা যতক্ষণ হাতে ছিল সে সাহস পাচ্ছিল। এখন তার মনে হল, 'আঃ, ইচ্ছে করলেও আমি আলো জ্বালতে পারব না।'

'এত অন্ধকার কেন চম্পা?'

'নিচে নেমে এস, নিচে নেমে এস।'

ইভান্‌স হঠাৎ একটা সিঁড়িতে পা হড়কাল। তার পা পিছলে গেল। খানিক পিছলে, খানিক সামলিয়ে সে শেষ অবধি নিচে পৌঁছল। অনুভব করল তার পা কাদায় পড়েছে। চটচটে এবং নরম কাদা। পা তুলে সাবধানে পাশে রাখল। সেখানেও কাদা। ইভান্‌সের জুতোয় কাদা ঢুকল। তার পা-টা ভারী বোধ হলো। সে হাতের রিভলভারটা চেপে ধরল। সেই রিভলভারের লোহার স্পর্শ পেয়ে তার হাতটা, এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরটা একটা আশ্বাস ও নির্ভরতা অনুভব করল। অন্ধকারে চারিদিকে তাকাল। ভাবল আস্তে আস্তে অন্ধকারটা তার চোখে সয়ে যাবে। তখন

সে দেখতে পাবে চম্পা কোথায় হীরে-জহরৎ দেখেছে। কিন্তু অন্ধকারটা বড়ই গাঢ়। অন্ধকার যে এত গাঢ় হতে পারে ইভান্‌স তা এই প্রথম উপলব্ধি করল। তার প্রাণটা এক নিমেষে হাঁপিয়ে উঠল এবং কোনমতে বাইরের বাতাসে নিশ্বাস নেবার জন্যে সে ব্যগ্র হল।

'কোথায়, চম্পা ?'

'কি, ইভান্‌স ?'

'ছেনালী ক'রো না। হীরে-জহরতের কথা বলছি!'

'ও!'

চম্পা চুপ করল। তখন ইভান্‌স দেওয়ালের গায়ে হাত দিল। দিয়েই সে হাত সরিয়ে নিল। সে স্পষ্ট বুঝলো তার হাতের নিচ থেকে কিলবিল করে কি যেন সরে গেল। সে ভয় পেল। তার ঘেন্না হল। রূঢ় এবং ঈষৎ কম্পিত গলায় বলল, 'চম্পা ?'

'ও, হীরে-জহরৎ! শোন, বারান্দায় একটা বড় পাল্কীতে তুমি আগুন দিলে মনে পড়ছে ?'

'সে কথার মানে কি ?'

'আজ সকালে আমি এখানে আসি। কয়েকটি নর্তকী, এবং কয়েকজন দাসদাসী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারাও পালাচ্ছিল। আমি সত্যিই একবাক্স গয়না পেয়েছিলাম। এগুলো পরে নিই, পরতে শখ হয়েছিল। আমি ত' জানতাম তুমি আসবে।'

'কি বলছ তুমি ? তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'এগুলো গায়ে না পরলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে না। আমার সঙ্গে আসতে না।'

'চম্পা!'

'অন্য গয়নাগুলো বাক্স সমেত আমি ঐ পালকীটায় ফেলে দিই। হয় তো পুড়বে, হয়তো পুড়বে না। কে জানে, কেন ওরা বাক্সটা ফেলে গেল!' হীরে পান্না কি আগুনে পোড়ে, ইভান্‌স ?

'শয়তানী, পরিষ্কার ক'রে কথা বল!'

'কালীবাঈ, বা দ্বারকাবাঈ বা কুসমাবাঈ, কে জানে কার খাজগী দৌলতী ওগুলো! একটা পান্নার কণ্ঠির দামই বোধহয় লাখটাকা হবে। ওরা রাজা। ওরা ত' কম দামের জিনিস পরে না!'

'তবে তুই এখানে আমায় কেন আনলি ? এখানে কি আছে ?'

চম্পা হাসল। তার হাসিটার শব্দই অন্যরকম। কেমন যেন ঠাণ্ডা এবং অশরীরী। সেই হাসিটা ইভান্‌সের ত্বক ও মাংস ভেদ করে হাড পর্যন্ত ঠাণ্ডা করে দিল। চম্পা বলল, 'এখানে ? এখানে আমি আছি আর তুমি আছ।'

ইভান্‌স তাকে গালি দিয়ে তার কাছে যেতে চেষ্টা করল।

চম্পা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'দাঁড়াও।'

'শালী তোমাকে আমি···তোমার ছেনালী করা···'

'আর এক পা এগোলে তুমি পডে যাবে। সামনে কুয়ো আছে।'

'তার মানে কি ? এ সব কথার মানে কি ?'

'চুপ। শুনতে পাচ্ছ ?'

'কি শুনতে পাচ্ছি ?'

'জলের শব্দ ? আর, কুয়োতে জল উঠছে। গঙ্গা থেকে সুডঙ্গ এসেছে কুয়োর তলায়। এখন জল আসছে। আমি শুনতে পাচ্ছি। শোন, শোন !'

'হ্যাঁ। গভীরে, পাতালের বুক দিয়ে ধূসর রঙের পেছল পাথরের নালী দিয়ে জল আসছে। শূন্যগর্ভ সুডঙ্গে জল ঢুকছে। অনেক নিচে তারই গুম-গুম শব্দ।' ভয়ে ও আতঙ্কে অস্থির হয়ে ইভান্‌স বলল, 'চম্পা, এমন করছ কেন ? চল আমরা পালিয়ে যাই।'

চম্পার কণ্ঠ নির্লিপ্ত এবং ব্যঞ্জনাহীন। যেন তাকে বিবৃতি দিতে বলা হয়েছে এবং সে বলে যাচ্ছে। সে বলল, 'পালিয়ে কি কোথাও যাওয়া যায়, ইভান্‌স ? পালানো যায় না। আমি তোমার হাতে ধরা পড়লাম ভগবানপুরে। আবার তুমি আমার কাছে এসেছ এই এখানে। না। পালানো যায় না। আর কোথায় পালাবে ? আমি আর তুমি এখন মাটির নিচে দাঁড়িয়ে আছি। এই ঘরটি আজ দেখেছি, আজই দুপুরে। এ ঘরে যারা ঢুকেছে, তারা আর বেরোয় নি।'

'চম্পা, তোকে আমি ! বুঝতে পারছি···'

ইভান্‌স জোর করে কাদা থেকে পা তুলল। সে রিভলভারটি নিয়ে চম্পার দিকে তেডে যাবার চেষ্টা করল। প্রথম চেষ্টাতেই তার শরীরটা ঝাঁকানি খেল। তার পায়ের জুতো বোধহয় কিসে আটকেছে। তার মনে

হল কুয়োর গায়ে বড় আংটা আছে এবং সেই আংটাতে তার পা বেধেছে। সে জুতো ছাড়াবার জন্যে যেমন নিচু হল, তেমনই তার হাতের রিভলভার খসে ছিটকে পড়ল। সভয়ে শুনল কুয়োর পাথর বাঁধানো গায়ে ধাক্কা খেয়ে রিভলভারটা অনেক নিচে, ঝপ্ করে জলে পড়ল। ঐটুকু ঘরে, রিভলভারের ধাক্কা খাবার শব্দটাই ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। ইভান্‌স তখন পেছন ফিরল, এবং সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। সে আতঙ্ক ও ক্রোধে কাঁপছে, তার পা রাখতে পারছে না পিছল সিঁড়িতে।

তবু সে উঠল। একটা সিঁড়ি উঠতে সে দু'সিঁড়ি পড়ে গেল। তার চিবুক ও কনুই ছেঁচে গেল। অনেক পরে, অনেক চেষ্টায় সে ওপরে উঠল এবং উঠতে উঠতেই তার মনে হচ্ছিল এত অন্ধকার কেন, উঠে শেষ ধাপে পৌঁছে সে জবাব পেল। একটা আহত পশুর মতো কেঁদে চেঁচিয়ে উঠল 'বন্ধ! দরজা বন্ধ!' সে চেঁচাতে চেঁচাতে দরজাতে ধাক্কা এবং লাথি মারতে লাগল এবং নিজে দরজার উপর পা ছুঁড়ে পা হড়কে পিছলে নিচে পড়ল।

তারপর সে শেষ সিঁড়িতে পড়ে, ককিয়ে কেঁদে উঠল, 'চম্পা, তুই যখন এসেছিস, তুই বেরিয়ে যাবার রাস্তা জানিস।' নিজেকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চম্পার কাছে গেল। চম্পার শরীরটা খুঁজে, হাত দিয়ে তাকে ধ'রে সে চেঁচাতে লাগল, 'খুলে দে! যেতে দে আমাকে! এমন করে ইঁদুরের মতো আমাকে মারিস না!'

চম্পার গলা অভিব্যক্তিহীন এবং তার কথাগুলো ইভান্‌সকে বরফের ছুরির মত নির্মম শৈত্যের আঘাতে এফোঁড়-ওফোঁড় করতে লাগল।

'দরজা আর খুলবে না। দরজা খুলবে, আপনা থেকেই খুলবে কাল সকালে।'

'চম্পা! দয়া কর!'

'ইভান্‌স, দয়া আমি করতে জানি না। তুমি জান? তোমরা জান? তোমরা যাদের মেরেছ, ফাঁসী দিয়েছ, কামানের মুখে উড়িয়েছ, তাদের ওপর দয়া করেছিলে?'

ইভান্‌স এবার বুঝতে পারছে। সে চম্পাকে যেন এখন চিনতে পারছে। অথচ সে ভেবেছিল চম্পাকে চিনেছে জেনেছে।

'তুমি, তুমি তা'হলে··· !' ইভান্‌সের শেষ কথাটা থেমে গেল।

'হ্যাঁ। আমি আগে ভাবিনি, ভাবতে চাইনি। যখন, যেদিন তুমি ভগবানপুরে···সেই সকালে···আঃ, সেই থেকে আমি ভেবেছি আর ভেবেছি। আমার শক্তি নেই, আমার হাতে অস্ত্র নেই, আর সামনাসামনি আমি কি তোমাকে, তোমাদের কিছু করতে পারতাম?'

ইভান্‌স তার গলা খুঁজতে লাগল। সে দুই হাতে তাকে ঝাঁকিয়ে বলল, 'শয়তানী, তবে তোর মনে এই ছিল?'

'মনে? না ইভান্‌স। আমার মনে এই ছিল না। তুমিই আমার মনে এই চিন্তা ঢোকালে। তুমি আমার দেহটাকে কলঙ্কিত করেছ, মনে পড়ে? তোমার ত তখনই বোঝা উচিত ছিল ওখানেই ফুরোবে না ব্যাপারটা!'

'সেইজন্যেই কি তুই আমাকে মারবি?'

'শুধু সেইজন্য? না। চন্দনকে মনে পড়ে ইভান্‌স?'

'চন্দন!'

'চন্দনকে তুমি ভগবানপুরে ফাঁসী দিলে। তারপর এসে আমাকে···ইভান্‌স তখন আমি ভাবলাম মরতে কি এতই ভয়? যারা মরেছে তারা কি বাঁচতে ভালোবাসত না? তবু তারা মরল। তবু ত মরবে বলেই চন্দনও ফিরে এসেছিল। তখন আমার মনে হল আমার শরীরে যেন কলঙ্ক মেখে গেছে। আমার মনে হল যদি একজনকেও মারতে পারি, মেরে মরতে পারি তবে বোধ হয় আমি পরিষ্কার হব। এত কলঙ্ক নিয়ে আমি চন্দনের কাছে কেমন করে যেতাম ইভান্‌স?'

চম্পা চুপ করল। তারপর অতি ভীষণ গম্ভীর স্বরে বলল, 'ইভান্‌স, নিজেকে প্রস্তুত কর!'

'মরতে হযত তোকে মেরে···'

'না ইভান্‌স। আর ওরকম ক'রো না। পায়ের নিচে জল উঠছে টের পাচ্ছ?'

'জল?'

'হ্যাঁ জল। জল কুয়ো ছাপিয়ে উঠছে। জল এই ঘরটা ভরে ফেলবে। তুমি আর আমি কোনদিন এ ঘর ছেড়ে বেরোব না।'

'না!' ইভান্‌সের গলা বিকৃত এবং স্বর নেই বললেই হয়।

'ওপরে তোমাদের সৈন্যরা বাড়ীটা গুঁড়োবে, পোড়াবে, তারপর হাতী দিয়ে মাড়াবে। না ইভান্‌স, তোমার সময় হয়েছে।'

ইভান্স এদিকে ওদিকে তাকাল। এই ভয়ংকর অন্ধকারকে ভেদ করার মত এক অমানুষী শক্তি যেন পেয়েছে তার চোখ।

সে যেন দেখতে পাচ্ছে জলের গতি ঘূর্ণাবর্ত এবং ক্রমেই ওপর পানে উঠে আসার চেহারা। তার পায়ের জুতো ছাপিয়ে জল নিঃশব্দে উঠছে। ভগ্নকণ্ঠে বিকৃত আর্তনাদে নিজেকে দীর্ণ করল ইভান্স, 'কে আছ, বাঁচাও!' বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও, চাও চাও চাও ও ও ও!'

খুব স্বল্প বৃত্তের মধ্যে তার-ই কণ্ঠের প্রতিধ্বনি হল।

জল উঠতে লাগল।

ইভান্সের শরীর ও মনকে এক আশ্চর্য জড়তা অধিকার করেছে। সে আর ভয় পেতে পারছে না, আর যন্ত্রণার বোধ যেন থাকছে না। সে যেন এখনই মরেছে, এবং মৃত্যুর পর নিজের মৃতদেহকে পাহারা দিচ্ছে।

জল সন্তর্পণে তার আঙুলগুলোকে ছুঁল।

তখন সেই জড়তা সরে গেল। তখন মৃত্যুভয় তাকে আবার দ্বিগুণ শক্তিতে আক্রমণ করল। সে হাত দিয়ে সরাতে লাগল জল, যেন এমনি ভাবে হাতনাড়া দিলেই জল সরে যাবে, নেমে যাবে। বলতে লাগল, 'আমি বাঁচতে চাই! আমি মরতে চাই না, মরতে চাই না!'

তবু জল নিষ্ঠুর এবং একমুখী সংকল্পে উঠতে লাগল। হাতের কনুই ডুবল, বুক ডুবল, কণ্ঠার হাড়কে ছুঁল।

তখন এবং একমাত্র তখনই চম্পা তাকে জড়িয়ে ধরল। ইভান্স বিকৃত রুদ্ধকণ্ঠে বলতেই থাকল, 'বাঁচতে চাই, ওরে আমি বাঁচতে চাই।'

চম্পা চিবুক তুলে, গলাজল থেকে উঁচু করে বলল,

'ইভান্স, তোমার ঈশ্বর নেই? থাকলে তাঁকে ডাকতে চেষ্টা কর।'

কিন্তু ইভান্স কোন ঈশ্বরকে স্মরণ করতে পারল না। চম্পার কথা তার কানেই গেল না।

'মরতে ভয় পেও না, ইভান্স' চম্পার এই কথাটাও জলে ডুবে গেল। এবং চম্পার গলা থেকে জলের ভুড়ভুড়ি কাটার শব্দ পাওয়া গেল। তারপর আর কিছু শোনা গেল না। আর কোন শব্দ রইল না। জল উঠতে লাগল। জল সিঁড়ি ছাপাল। দরজা পর্যন্ত উঠল এবং থেমে রইল।

বত্রিশ

১৮৫৯ সালে নভেম্বর মাসে মহারাণীর উদ্‌ঘোষণা প্রকাশ্যে প্রচারিত হল। এলাহাবাদে একটি বৃহৎ দরবার হয়। ভারতের সর্বত্র বড় বড় শহরে প্রকাশ্য দরবারে এই উদ্‌ঘোষণা পড়া হয়। তাতে অনেক ভাল ভাল কথা ছিল। ক্যানিং ১৮৫৮ থেকেই বিদ্রোহ দমনের নামে নির্বিচারে নরহত্যার যথাসাধ্য বিরুদ্ধতা করেন। শেষ অবধি তাঁকে অনেক বিদ্রূপ ও অভিযোগ সইতে হয়, এবং যখন এই রক্তাক্ত অধ্যায়ের ওপর যবনিকা পড়ল, তার আগেই কয়েক লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

ভবানীশঙ্কর তখন নেপালের তরাই-এ।

তিনি ব্রিজদুলারীকে নিয়ে কেমন করে সেখানে পৌঁছতে পেরেছিলেন তা তিনিই জানেন। ব্রিজদুলারী যে শেষ অবধি কতিপয় ভারতীয়ের সঙ্গে মগনলালের বাগানবাড়ীতে আত্মগোপন ক'রে বাস করছিল, এ কথাটা খুব পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন কথাও শোনা গিয়েছিল, ব্রিজদুলারী হয় অযোধ্যার বেগম, নয় ঝাঁসীর রাণীর চর। ভবানীশঙ্করের মনে হয় ইংরেজরা প্রতিশোধ নেবার জন্যে যে রকম বদ্ধপরিকর তাতে ধরা পড়লে তিনি বা ব্রিজদুলারী কেউ-ই নিজেদের বাঁচাতে পারবেন না।

ব্রিজদুলারী খুব অবসন্ন হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে সে একটা উত্তেজনার মধ্যে বাস বরে। ব্রাইটকে যে শেষ অবধি সে মারতে পারবে, ভবানীশঙ্করকে সে যে নিজের জীবনে পাবে, এর কোনটাই হয়ত সে বিশ্বাস করতো না। তার মনে হত এ অসম্ভব। এ বাস্তবে হয় না, হতে পারে না। তাই সে অমন মরিয়া হয়ে ভারতীয়দের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়ায়। হয়ত ভেবেছিল আর কিছু না পারি, যুদ্ধ ক'রে ইংরেজদের হাতে মরব। তবু সবাই জানবে আমাকে ওরা যা মনে করত আমি তা নই। আমি মানুষ। আমার মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু শেষ অবধি সেই অসম্ভবই সম্ভব হল।

সে ঐ বাগানবাড়ীতে বাস করছিল। সম্পূরণ একদিন সেখানেই এল। সে তাঁতিয়ার সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। শেষ অবধি ঘুরে ফিরে এখানে ফিরে আসে। অবশ্য ফিরে আসাটা তার পক্ষে মূর্খতা হয়েছিল। ব্রিজদুলারীকে দেখে খুব আশ্চর্য হয়।

পরে অবশ্য সম্পূরণ স্বীকার করে ব্রিজদুলারী না থাকলে সে এবং তার

সঙ্গীরা প্রাণ বাঁচাতে পারত না। ব্রিজদুলারী আগে সম্পূরণকে ভয় পেত। কিন্তু এখন আর তার সম্পূরণ সম্পর্কে ভয় বা সম্ভ্রম কোনটাই ছিল না। সম্পূরণের উরুর ক্ষতে মাছি এসে বসত। সে মাছি তাড়াতে তাড়াতে বিরক্ত হয়ে একসময়ে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। তখন তাকে অসহায় দেখাত। ব্রিজদুলারীর মনে পড়েছিল এক সময় ঐ ধর্মোন্মাদ লোকটি বিশ্বাস করত সে নিজে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী, এ জন্মে ম্লেচ্ছ নিধন করবে বলে 'সম্পূরণ' নামে জন্মেছে। সে ভবানীকে বলে, 'জান, তখন আমার সম্পূরণের জন্যে কষ্ট হত।'

ভবানী কিছু বলতেন না। তাঁরা তখন কানপুরের উত্তরে ঘর্ঘরা নদীর তীরে একটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে বাস করতেন।

বাড়ীটি অতীতে এক সাহেবের ছিল। সে বিহারে নীলের চাষ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। এখানে একটি কাঠচেরাই কাঠফাড়াই-এর ব্যবসা করবার ইচ্ছে ছিল তার। সঙ্গে তার ভাইপো ছিল। ভাইপো একদিন টাকাপয়সা হাতিয়ে কাকা-কাকীকে খুন করে পালায়। বাড়ীটার হাতার মধ্যে ঘরদুটো ছিল। গ্রামের লোকরা আগেই কপাট ও জানলা ভেঙে নিয়ে যায়। বাড়ীটা জঙ্গলে ঢেকে যায় এবং কেউই সেখানে আসত না। একটি ভিখারীর কুষ্ঠ হওয়াতে গ্রামের লোক তাকে তাড়িয়ে দেয়। শেষ অবধি সে এই বাড়ীতে বাস করত। এইখানেই সে মারা যায়। ঐ দুটো কবর, তার ওপরে মৃত কুষ্ঠরোগীর আত্মাও যে এই বাড়ী ছেড়ে বেরুতে পেরেছে তা কেউ বিশ্বাস করে নি। তাতেই এ বাড়াটা ক্রমে সবাই ত্যাগ করে। ভবানীশঙ্কর এখানে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন।

বাসযোগ্য একটি ঘর, একটি বারান্দা, তাতেই তাঁরা ঘরকন্না পাতেন। প্রথম কয়দিন তাঁরা খুবই গোপনীয়তা অবলম্বন করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে গ্রামবাসীরা তাঁদের কথা জানতে পারে। ভবানীকে তারা সন্ন্যাসী মনে করেছিল। ব্রিজদুলারীকে ভেবেছিল তাঁর ভৈরবী। ব্রিজদুলারীর কাছে মোহর ছিল। একটি মোহর ভবানী আগেই ভাঙিয়ে নেন। মাঝে মাঝে সাত মাইল দূরে একটি বেনের দোকান থেকে তিনি চাল, আটা কিনে আনতেন। ব্রিজদুলারী ঝাউগাছের ডাল ভেঙে ঘর দোর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে নেয়। সে ঐ নির্জনবাসের আশ্রয়টুকুই গুছিয়ে নিয়েছিল। সামান্য কাজ, সহজেই মিটে যেত। দুজনে বারান্দায় বসে দেখতেন গাছ থেকে পাতা ঝরছে,

পাখীরা কলরবে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে। কয়েকটা বাঁদর এসে হুপহাপ করে গাছের ডালপালা ভেঙে উধাও হয়। পউষ মাসে তীব্র শীত। দিন মাস পাতা ঝরে, চারিদিক নিশ্চুপ। দূরে, ক্ষেতে অথবা বাড়ীর উঠোনে মেয়েরা আছড়ে আছড়ে গমের শীষ থেকে গমের অবশিষ্ট দানা ছাড়ায়, সে শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। ব্রিজদুলারী গাছের পাতা কুড়িয়ে জড় করে আগুন জ্বালে। সন্ধ্যে হয়ে গেলে দেখা যায় ধিকিধিকি আগুন, উড়ন্ত ছাই। শুক্লপক্ষের রাত্রে চাঁদ ওঠে। সব কিছুই অপার্থিব মনে হয়, দূরদূরান্তের গাছপালা কত স্পষ্ট দেখায়।

অস্বস্তি, গভীর অস্বস্তি।

বাইরের খবর পান না, প্রোক্লামেশান জারি হবার পর কি হ'ল না হ'ল জানতে পারেন না। যেন নিজেকে প্রবোধ দেবার জন্যেই বলেন, 'এ অবস্থাটাও বরাবর চলতে পারে না, আমরা এবার লোকালয়ে ফিরব, ভদ্র, সভ্য মানুষের মত বাঁচব।'

ব্রিজদুলারী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

মাঝে মাঝে ভবানী আর কোন কাজ খুঁজে না পেয়ে তার কাছে এসে বসেন। ব্রিজদুলারী একটু হেসে বলে, 'কাজ খুঁজে পাচ্ছ না?'

'না।'

'দড়ি দিয়ে এই চারপাইটা বাঁধি এস।'

'তা না-হয় বাঁধলাম...' কাজ করতে করতে ভবানী হঠাৎ চোখ তুলে বলেন, 'কষ্ট হচ্ছে ব'লে তুমি মনে মনে দুঃখ পাও?'

সে কথার জবাব না দিয়ে ব্রিজদুলারী বলে, 'কাঠকয়লা আছে, এ বাড়ীর মেঝেতে কত জায়গা, বেশ লেখা যায়। তুমি অমন ছটফট না ক'রে আমায় লেখাপড়া শেখাও না কেন? তোমার সময় কাটবে, আমারও লেখা হবে।'

'বেশ ত।'

'কত কষ্টই দিলাম তোমায়।'

'নিজে কত কষ্ট পেলে?'

একদিন ব্রিজদুলারী প্রশ্ন করে, 'তুমি যে ফিরে যেতে চাও, আমার তা হ'লে কি হবে?'

'আমার সঙ্গে যাবে।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, ওরা ঠিক জানে, আমি সে সময়ে মগনলালের কুঠিতে ছিলাম।'

'জানলেই বা কি?' বললেন বটে, তবে মনের তলে অস্বস্তি ঘনিয়ে উঠল। ফিরে যাবার পর, ব্রাইটের হত্যার খবরটি বেরিয়ে পড়বার কোন সম্ভাবনা আছে কি?

এ অস্বস্তি বাড়তে বাড়তে এমন হ'ল, যে বাইরে বেরুলেই ব্রিজদুলারীর জন্যে চিন্তিত হন, ভয় পান।

বাড়ীতে এসে যখন দেখতেন সে গুন-গুন ক'রে গান করতে করতে কাঠ ভাঙছে বা চাল ধুচ্ছে, তখন আবার তিনি আশ্বস্ত হতেন। বাড়ীটির বিস্তীর্ণ বাগানে কুল ও পেয়ারা গাছ ছিল। জংলা শাক জন্মাত। মাঝে মাঝে কচিৎ শিকার করা হরিণের মাংস বিক্রি করত রাখাল ছেলেরা। নদীর মাছও পাওয়া যেত। একটি রাখাল ছেলে খুব বড় বড় ফাঁপা বাঁশের চোঙ্গা দিয়েছিল ভবানীকে। লোহার শিক পুড়িয়ে তার গায়ে ব্রিজদুলারী ছবি এঁকেছিল। সে তাতে দুধ ও পানীয় জল রাখত।

কয়েক মাস তাঁরা খুব সুখে, খুব শান্তিতে ছিলেন। নভেম্বর মাসে মহারাণীর উদ্‌ঘোষণার সংবাদ ভবানী ঐ বেণেটির দোকানে কয়েকজন ডাকরানারের কাছে শোনেন। তিনি খুব আশ্বস্ত হন। ফিরে এসে ব্রিজদুলারীকে বলেন, 'প্রোক্লামেশান বেরিয়ে গেছে। আমি ডাকরানারকে পয়সা দিয়ে একখানা কাগজ নিয়ে পড়েছি। এবার বোধহয় আমাদের আর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে না। আমরা ফিরে যেতে পারব।'

কিন্তু তারপরই তিনি লক্ষ্য করেন, ছোট ছোট দলে, কখনো বা একলা সিপাহী, সওয়ার ও অন্যান্য লোকেরা ঐ গ্রাম দিয়েই সীতারামপুরের দিকে যাচ্ছে। তিনি একজনকে দেখে মুখ চিনতে পারেন। নামটা মনে পড়েনি। লোকটি তাঁকে বলে, রাণী যে-সব কথা বলেছেন সে-সব সত্যি নয়। আবার ধরপাকড় হচ্ছে। বাবুজী, দু'চার টাকার জন্যে লোকে আমাদের ধরিয়ে দিচ্ছে। তাই আমরা নেপালে পালাচ্ছি।'

'নেপালে? কেন?'

'শুনেছি পেশোয়া সেখানে আগেই পালিয়েছেন। সেখানে ঘন জঙ্গল আছে, পাহাড় আছে। আমরা সেখানেই লুকিয়ে থাকব।' কিছুক্ষণ হতাশ ও শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে লোকটি আবার পথ চলতে সুরু করে।

তারপর একদিন বেণেটি তাঁকে বলে, 'বাবুজী, একটা কথা বলব? আপনি আমার এখানে আসেন তা সবাই জানে। তহশীলদার আমাকে বলছিল উনি নিশ্চয় সাহেবদের ভয়ে এখানে লুকিয়ে আছেন। তুই খবর নে। বাবু, আপনি আর এখানে আসবেন না। আমি ছা-পোষা লোক। সাহেবরা সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সরকারী কর্মচারীরা যদি মনে সন্দেহ করে তাহ'লে আমি বড় নাকাল হব। বাবুজী, আপনি সেদিন এখানে বসে ইংরাজী কাগজ পড়লেন, সেই থেকেই কথাটা উঠেছে। এখানে ইংরাজী জানা লোক ত বেশী নেই।'

ভবানী বুঝতে পারেন তাঁর দুঃখের দিন এখনো ফুরোয়নি। ব্রিজজলারীকে আবার পথ চলবার কথা বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। ব্রিজদুলারী কি যত্নে কি আগ্রহে এই দু'দিনের আবাসকে আঁকড়ে ধরেছিল! হয়তো ভেবেছিল যাযাবরের জীবন নিরাশ্রয়ের জীবন আর কাটাতে হবে না।

তিনিও নেপালের পথই ধরেন।

বাহ্‌রাইচ আর বাঁকি পর্যন্ত পয়সা দিয়ে যানবাহন পেয়েছিলেন। তারপর নেপালের রাজার সীমান্ত পর্যন্ত কেমন করে পৌছলেন তা তিনিই জানেন না। বাহ্‌রাইচে পৌছে কিছু জিনিসপত্র কিনে নেন। সেখানে বেশ বড় একটি বাজার আছে। ভবানী দেখে আশ্চর্য হল, সেই সুদূরেও একটি উদ্যমী বাঙালী ভদ্রলোক ব্যবসায়ে ব্রতী হয়েছেন। তিনি গরম কাপড ও রেশমী কাপড়ের ব্যবসা করেন। আড়তের ওপরেই দোতলায় বসবাস করেন। খুব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ভবানী তাঁকে নিজে যে বাঙালী সেই পরিচয়টুকুও দিতে পারেন নি। বাংলা কাগজ দেখে তাঁর পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল। আশ্চর্য, বাংলা অক্ষর দেখেই মনটা যেন অভিভূত হ'যে পড়ল। কি যেন হারিয়ে গিয়েছিল, খুঁজে পেলেন। পরিশেষে তিনি তাঁর কাছ থেকে হরিশ মুখুজ্জের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এক বাণ্ডিল চেয়ে নেন। ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়েছিলেন। কৌতূহলও হয়েছিল তাঁর। ভবানীর সঙ্গে তিনি হিন্দীতে কথা বলছিলেন। ভবানীও পুরবিয়া হিন্দীতে কথা বলেন। একবার মনে হয়েছিল তাঁর কাছে দুটি মোহর ভাঙিয়ে নেবেন। তাতে অযথা সন্দেহ উদ্রিক্ত হতে পারে ভেবে নিরস্ত হন।

বাহ্‌রাইচে তাঁরা মাত্র একরাত ছিলেন।

বাঁকি-তে তাঁরা একটি রাং-রেজীর বাড়ীতে আশ্রয় নেন। রাং-রেজীটি বৃদ্ধ এবং দরিদ্র। তাকে একটা টাকা দিতে সে খুব খুশী হয়। বাঁকি থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে মেলা হচ্ছিল। ভবানী একটি টাটু ঘোড়া বা ডুলীর ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেন। এরপর হয়ত হাঁটতে হবে, শুধুই হাঁটতে হবে। ব্রিজদুলারীর পথশ্রম যতটা বাঁচানো যায়।

সেই রং-রেজীর বাগানে একটি ঘরে তাঁরা ছিলেন। ব্রিজদুলারী দেখেছিল বাড়ীতে কেউ নেই। বৃদ্ধ রং-রেজী একটা চালাঘরে জল গরম করে এবং কাপড় রঙায়।

রং-রেজীর কাছে কয়েকজন লোক এসেছিল। তারা ব্রিজদুলারীকে দেখে হয়তো গল্প করে, কিংবা অন্য কেউ তাঁদের দেখে থাকবে। ভবানী বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখেন বাড়ীর সম্মুখে বেশ ভিড় জমেছে। কয়েকজন লোক উদ্ধতভাবে তাঁকে বলে, 'আপনি এ বাড়ীতে একজন সাহেবের বিবিকে লুকিয়ে রেখেছেন, আমরা খবর পেয়েছি। আমরা থানায় খবর দিতে চাই।'

ভবানীর মুখ পাংশু হয়ে যায়।

গুজবে উন্মত্ত জনতাকে কোন যুক্তির পথে আনা যায় না তা তিনি জানেন। জনতা ক্ষেপে গেলে তারা অসম্ভব সব কাজ করতে পারে। তা তিনি গত ক'বছরে ভাল করেই দেখেছেন। দু'বছর আগে ইংরেজ নারী বা শিশুকে আশ্রয় দিয়েছে—শুধু এই গুজব শুনে জনতা নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। এখন শাসনযন্ত্র আবার ইংরেজের হাতে। হয়তো খোঁজ-খবর করতে করতে তারা ব্রিজদুলারী ও তাঁর পরিচয় জেনে ফেলবে। তারপর হয় মৃত্যু, নয় কারাবাসের অন্ধকার পরিণতি।

তিনি নিজেকে কঠোর করলেন। কড়া গলায় ধমক দিয়ে বললেন, 'আমরা তীর্থযাত্রী। সন্তান কামনায় পুজো দিতে যাচ্ছি। আমাদের বিরক্ত করলে আমিই থানায় খবর দেব।' তিনি আরো কিছুক্ষণ চোট-পাট করলেন। জনতা আস্তে আস্তে সরে গেল। কিন্তু দু'জন যুবক খুব জোর গলায় বলে গেল, 'কাল আমরা আসব। আবার আসব।'

ভবানী রং-রেজীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

তিনি বাড়ীতে ঢুকলেন। রং-রেজীটি কাতরভাবে জানাল, 'আজ মাতাজী আমার কাছে গরম জল চেয়ে নিলেন। তিনি স্নান করেছিলেন। তারপর উঠোনে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছিলেন। হুজুর, ঐ ছেলে· দুটো ভারি বজ্জাত। ওরা ওঁকে বোধ হয় বাগান থেকে দেখে ফেলে। আমি বাজার থেকে আসছিলাম। আমাকে অনেক কথা শুধোয়। আমি বলি—হ্যাঁ হ্যাঁ, —মাতাজীর গায়ের রং খুব গোরা। তাতে তোমাদের কি? হুজুর ঐ ছেলেগুলো আর আরো ক'জন আছে। তারা এইসব উড়ো খবর যোগাড় করে বেড়ায়। থানায় খবর দেয়।'

'কেন?'

'হুজুর যারা 'বলওয়া' (বিদ্রোহ) করেছিল, তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে ওরা যে মোটা ইনাম পায়, জমি পায়। ছ' মাস আগে একজন ব্রাহ্মণ না কি নানাসাহেবের বিবিকে নিয়ে আসছিল, তাকে ধরিয়ে দিয়ে ওরা মোটা টাকা পেয়েছে।' ভবানী বোঝেন বৃদ্ধটিও ভয় পেয়েছে। তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখছে।

তিনি ঘরে গিয়ে দেখেন ব্রিজদুলারী খুব ভয় পেয়েছে। সে মাটিতে বসে আছে অবসন্ন হয়ে।

প্রথমে, বিপদে ফেলবার জন্য তার 'ওপরও ভবানীর রাগ হয়।

পরে মনে হয়, সত্যিই, একসময়ে ও ত' কোন কষ্টই করে নি। তিনি তাকে কতটুকু সুখ, কতটুকু স্বস্তি দিতে পেরেছেন! খুব রাগ হয়। নিজের ওপর নয়, ভবিষ্যতের ওপর। এখনো তাঁদের পালাতে হচ্ছে, আত্মগোপন ক'রে থাকতে হচ্ছে। নিয়তি যে সময়ে এমন সর্বশক্তিমান হতে পারে তা কি আগে বুঝেছিলেন?

সেই রাতেই দশ টাকা কবুল করে তিনি একটি ডুলি ভাড়া করেন। প্রত্যূষেই বাঁকি ছেড়ে চলে যান। অনেকে ডুলি করে তীর্থে যাচ্ছিল। তাতে তাঁদের সুবিধে হয়। ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন ক'র চলে গেলেন।

তারপর নেপাল।

আশ্চর্য হয়ে তিনি দেখেন পলাতক ভারতীয়দের বেশ ক'টি ছোটখাট বসতি এখানে সেখানে গড়ে উঠেছে। কিঃ নিঃসঙ্গ, কি নির্বাসিত জীবন! সকলেই কোনমতে বাঁচবার তাগিদে ব্যস্ত। অতি ভয়াল ও ভীষণ বন প্রকৃতি। বড় বড় গাছ। তরাইয়ের অন্ধকার। এই রুক্ষ ও প্রখর

শীতেও মাটি ভিজে স্যাঁৎসেঁতে। গাছ থেকে শ্যাওলা ঝোলে। বাঁশবনের কচি ও নতুন বাঁশের অঙ্কুরের লোভে হাতীর পাল নামে। মানুষ অনেক চেষ্টা করে যেটুকু জঙ্গল পরিষ্কার করে, তা অচিরেই কচুপাতার মতো একধরণের লতায় ঢেকে যায়। ভবানীর মনে হয় একদিন প্রকৃতিই ছিল সর্বশক্তিমান। মানুষ তাকে উচ্ছেদ করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এখানে সেই প্রাচীন ও আদিম প্রকৃতি মানুষকে পদে পদে বুঝিয়ে দিচ্ছে মানুষ কত অসহায়। তিনি দেখলেন ভারতীয়রা এখানে গ্রামবাসীদের দয়ার উপর নির্ভর করছে। স্থানীয় অধিবাসীরা জেনে নিয়েছে এরা ইংরেজের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে। তারা দু'বছরে অনেক ভারতীয়কে দেখেছে। তারা কথায় কথায় এদের হুমকি দেখিয়ে বলে, 'আমাদের রাণা সাহেবদের মিত্র। আমাদের সৈন্যরা এখন ইংরেজ সরকারে ভাল ভাল চাকরি পাচ্ছে। আমরা ইচ্ছে করলেই তোমাদের ধরিয়ে দিতে পারি।' তারা ভারতীয়দের নির্মমভাবে শোষণও করছে। চাল, আটা, লবণ বা পানীয় জলের বিনিময়ে তারা টাকা চায়, মোহর চায়। তারা মনে করে ভারতীয়রা সকলেই বহু ধনরত্ন লুঠ করে তবে নেপালে এসেছে। একজন রাজপুত হাবিলদার সাক্ষাতে বললেন, 'এটি পেশোয়ার জন্যই হলো। ওঁদের সঙ্গে অগাধ টাকা, মোহর, মণিমুক্তা ছিল। লোকজনও কয়েক হাজার। ওঁরা মোহর দিয়ে আটা, চাল, ঘি কিনেছেন। এরা সে সব দেখেছে। গল্প শুনেছে। তাতেই ওদের লোভ বেড়ে গেছে। 'পেশোয়া কোথায়?' ভবানী সাগ্রহে প্রশ্ন করেন। হাবিলদারটি মাথা নাড়েন। বলেন, 'বলতে পারি না। আমি তাঁকে দু'বছর আগে একবার দেখেছিলাম। তাও দূর থেকে। তবে তাঁর অনুচর সাঙ্গো-পাঙ্গর ত অন্ত নেই। তারা নাকি তাঁকে লুকিয়ে রেখেছে। তাঁর মতো দেখতে আর কাউকে নাকি পেশোয়া বলে চালায়।'

ভবানার আগ্রহ নিভে যায়। তবে নেপালের তরাই-এ ঘুরতে ঘুরতে নানাসাহেবের নামে এতরকম গুজবই শুনতেন। কেউ বলতো তাঁকে কলকাতা দেখা গেছে, কেউ বলতো তিনি হিমালয়ে চলে গেছেন। নানাকথা শুনতে শুনতে তাঁর মনে হয়েছিল মানুষটি হতভাগ্য এবং বুদ্ধিহীন। বুদ্ধি থাকলে তিনি ধনরত্ন ঘুষ দিয়ে বারবার ইংরেজের কাছে আর্জি পাঠাতেন না। বুদ্ধি থাকলে তাঁকে কেন্দ্র করে এত রকম গল্প ছড়াতে

দিতেন না। নিজেকে কিংবদন্তীর নায়ক যে মানুষ হতে দেয় সে প
কোনদিনই প্রমাণ করতে পারে না সে সে-ই লোক। তাঁকে একথ
লাজপৎ সিং-ও বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'এরপর নানাসাহেব তাঁর অন্তর
সঙ্গী বা আত্মীয়দের কাছেও প্রমাণ করতে পারবেন না তিনিই নানা
অবশ্য এ সব যে ঘটেছে তার কার কারণ তিনি অতি দুর্বল চিত্ত লোক।'

'কেন?' ভবানী কিছুই জানতেন না।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই শব্দ শুনতে শুনতে লাজপৎ সিং বলেছিলেন, 'দুর্বল এবং স্নেহবৎসল। সকলের কথাই শোনেন। কাউকেই উপেক্ষা করতে পারেন না। আমি জানি। কানপুরে আমরাই ওঁকে সব ক্ষমতা দিয়ে আসনে বসিয়েছিলাম। একটি হত্যাকাণ্ডেও ওঁর সমর্থন ছিল না। সেখানে ওকে আজিমুল্লা চালিয়েছে, জ্বালানাথ চালিয়েছে। ডাক্তারবাবু, তাঁতিয়াটোপী যদি ও-রকম যোদ্ধা না হতো, এবং ঐভাবে এখানে ওখানে ইংরেজকে ধোঁকা দিয়ে উল্কার মতো যুদ্ধ করে না বেড়াত, তাহলে ওঁর সম্পর্কে এত কথা হয়তো রটত না। তাঁতিয়ার যখন ফাঁসী হয়, সেই ১৮৫৯ এর এপ্রিলে, তখন উনি'ত কলকাতায় চিঠি পাঠাচ্ছেন? উনি তখন কোথায়, অথচ ইংরেজরা ভাবতো উনিই সব কিছু করছেন।' তাঁতিয়া বলেছিল কিনা সে পেশোয়ার চাকর, প্রভুর আজ্ঞায় সব করেছে। অথচ, ভগবান জানেন ওঁর নাম দিয়ে যতচিঠি লেখা হ'ত তার কোনটাই পেশোয়ার নিজের লেখা নয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে লাজপৎ সিং আবার বলেন, 'জানি না কোথায় আছেন। জানি না বেঁচে আছেন কিনা! তবে নিজেও ত' অনেক আঘাত পেলেন? আমার মনে হয় এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ওঁর পক্ষে মৃত্যুই ভাল।'

ভবানী হেসে বলেছিলেন, 'না। তা নয়। আসলে ওঁকে দিয়ে আজ কারু প্রয়োজন নেই। আপনারা জয়ী হলে ওঁকে বিঠুরের রাজা করতেন। আপনারা জেতেননি, তাই আপনাদের কাছে ওঁর দরকার ফুরিয়েছে। ইংরেজরা 'Legend, that is Nana Sahib' তাতে বিশ্বাস করে। ওঁকে পেলে ওরা হত্যা করবে! তাই, এখন উনি দীর্ঘদিন বাঁচুন বা ইতিমধ্যেই মরে গিয়ে থাকুন, তাতে কারো কিছু এসে যায় না।'

লাজপৎ সিংকে তিনি এই কথা বলেন। হ্যাঁ। নেপালে আসবার ছ'মাস বাদে। লাজপৎ সিং-এর সঙ্গে তখনই তাঁর দেখা হয়।

তরাই-এ যখন বর্ষা নামে, তখন ভবানী প্রাণপণে নিরাপদ এবং বাসযোগ্য একটি আশ্রয় খুঁজছিলেন। তিনি পাঙচক, লেঙ এবং সোম ছেড়ে আরো উত্তরে যান। সেখানে ক'জন ভারতীয় শাল কাঠের খুঁটির ওপর বেশ শক্ত সমর্থ কয়েকটি ঘর তৈরী করে বাস করছিলেন বলে খবর পান। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে দূষিত পানীয় জল, শ্বাসরোধকারী বন্য উদ্ভিদ্, জোঁক, সাপ ও মশার উপদ্রবে ব্রিজদুলারীর শরীর ভেঙে পড়ছিল। সেই সময়ে, একদিন একটি লোক তাঁর খোঁজ করতে আসে। সে লাজপৎ সিংয়ের চর। লাজপৎ সিং তাঁর খবর পেয়েছিলেন। ভবানী গিয়ে দেখেন সেই তথাকথিত বসতিটি লাজপৎ সিংয়েরই গড়া। লাজপৎ সিং তাঁকে দেখে আশ্বস্ত হন। বলেন, 'একটি লোক বড় অসুস্থ। আপনি তাকে বাঁচান।' ভবানী আশ্চর্য হয়ে যান। কেননা রুগীটি একজন আইরিশ যুবক। তার নাম টিমথি ও' কোনোলী। ছেলেটির আমাশা ও জ্বর হয়েছিল। ভবানী নিতান্ত অসহায় বোধ করেন। ওষুধ নেই, কোন যন্ত্রপাতি নেই। লাজপৎ সিং তাঁর কথামতো দূরের গ্রাম থেকে বেল, আমরুল পাতা এবং পিপুল আনিয়ে দেন। ভবানী তাই দিয়ে সাধ্যমতো চিকিৎসা করেন। ছেলেটির শুশ্রূষার প্রয়োজন ছিল। তাকে জল ফুটিয়ে খাওয়ানো, কাঁচা বেল পুড়িয়ে ছেঁকে দেওয়া, আমরুল পাতার রস এবং দুধে পিপুল জ্বাল দিয়ে দেওয়া এইসব ছাড়া আর কোন ওষুধ দিতে পারেন নি ভবানী। তার অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যায়। ব্রিজদুলারী সে সময়ে নিঃসঙ্কোচে তার বিছানা পরিষ্কার করতো, সেবা করতো। শেষ অবধি ছেলেটির ঘোর বিকার হয়।

ক'দিন প্রায় অজ্ঞান থাকে। মারা যাবার আগে সে বিছানা আঁচড়াচ্ছিল এবং ভাঙা গলায় ব্রিজদুলারীকে 'মাদার, মাদার, মাদার!' বলে ডেকেছিল।

টিম-এর মৃত্যুর পর সেই ঘরেই ভবানী আশ্রয় পান। লাজপৎ সিং তাঁকে ছাড়তে চাননি। ব্রিজদুলারী সম্পর্কে একদিন যে তাঁরও বিরুদ্ধ ধারণা ছিল তা তিনি বুঝতে দেননি। হয়তো ভুলেও গিয়েছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতি মানুষকে জ্ঞানী করে।

টিম-কে তাঁরা নরম ও পচা মাটিতে কবর দেন।

টিম এবং আরো ক'জন আইরিশ যুবক দিল্লীতে না কি ভারতীয়দের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে। পরিণামে তাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি পেতে হতো।

টম তাই শেষ অবধি নেপালে পালিয়ে আসে। সে জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে লাজপৎ সিংয়ের আশ্রয় নেয়। যখন আসছিল তখন তাকে দেখে লাজপৎ সিং মনে করেন তাঁকে ধরতে এসেছে। কিন্তু কাছে এসে সে সব কথা খুলে বলে। লাজপৎ সিং সাক্ষাতে বলেন, 'আপনি জানেন না, সাহেবকে আশ্রয় দিয়েছি বলে অন্যান্য ভারতীয়রা আমাকে কতবার মারতে এসেছে। ঘর দু'বার পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই, অনেকটা ওর জন্যেই, লোকালয়ের কাছে থাকা বিপদজনক জেনেও আমি এখানে এলাম। ওকে বলেছিলাম, বর্ষা চলে গেলে আবার হয়তো ওরা উপদ্রব করবে। তোমাকে বাঁচাতে পারব না। আমিও মারা পড়ব। তার চেয়ে তুমি কাঠমুণ্ডু চলে যাও। সেখানে রাণা তোমাকে চাকরি দিতে পারেন।' তিনি একটু চুপ ক'রে থাকেন। বলেন, 'ডাক্তারবাবু, গত চার বছরে কতই যে দেখলাম! ও ত' আমাদের কেউ নয়। ও কেন এমন করে নিজের সর্বনাশ করল?'

তরাইয়ে বর্ষা। ১৮৬০ সাল। বাঁশবন এবং তার পাতায় পাতায় বর্ষার বাতাসে হু হু শব্দ। কান্না অথবা দীর্ঘশ্বাসের মতো। দিন-রাত সেই শব্দ শোনা যায়। মনে হয় নিরন্তর কারা শোক করছে, বিলাপ করছে। পানীয় জল বারবার সিদ্ধ করলেও তার দুর্গন্ধ নষ্ট হয় না। পচা পাতা। শোথ জ্বর। আমাশা। জোঁক, সাপ ও অন্যান্য সরীসৃপ। ঘরের মেঝেয় কাঠের পাটাতনের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নিচের মাটি যেন কিলবিল করে নড়ছে। সোনালী ও মেটে গো-সাপ দলে দলে নড়ে বেড়ায়, তারা পোকা খোঁজে, মাটি সোঁকে।

বর্ষা নামবার পর থেকে অন্যান্য ভারতীয়রা আসে না। লাজপৎ সিংয়ের একান্ত অনুগত একজন সওয়ার মাঝে মাঝে হাটে যায়। সে এসে খবর দেয়—'এই বর্ষাটা ওরা সইতে পারছে না। মরছে।'

লাজপৎ সিং কিছু বলেন না। আগে আগে কারু মৃত্যুর খবর পেলেই বুকে ধাক্কা লাগত। মনে হতো আরো একটু নিঃসঙ্গতা বাড়ল, আরো একজন সঙ্গী কমল। কাছে না-ই থাকে, তবু যে আছে, এই নির্বান্ধব নির্জনতায় যে একজন স্বদেশীয় আছে, তা-ও যেন মস্ত লাভ। এখন আর কিছু মনে হয় না।

মাঝে মাঝে, যে সব ভারতীয় এখনো যুবক, তারা ক্ষেপে ওঠে। সহায় নেই, সম্বল নেই, অর্থ নেই, তবু তারা আসে। বলে, 'ডাক্তারবাবু, এ ভাবে বাঁচার কোন মানে হয় না। আমরা ফিরে যাব।' লাজপৎ সিং কিছু বলেন না। ভবানী বলেন, 'ফিরে গেলেই ত মরবে। জানই ত, ১৯০৮ সাল অবধি তোমাদের ওপর দণ্ড বলবৎ থাকবে। জানই ত' তোমাদের ধরিয়ে দেবার জন্য একদল লোক ব্যগ্র হয়ে আছে। তারা সীমান্তে সীমান্তে ঘোরে। তোমরা যে এতদিন আত্মগোপন করে আছ সেটাই তোমাদের বিরুদ্ধে মস্ত বড় একটা অভিযোগ।'

এইসব ভারতীয়রা ভারতবর্ষের খবরাখবর রাখবার জন্য ব্যস্ত থাকত। তারা অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্ট করে 'ফ্রেণ্ডস অফ ইণ্ডিয়া', 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'ফৌজী অখবর'এর দু'মাসের পুরনো কপি আনায়। ভবানীর কাছে নিয়ে আসে। অন্যান্য খবর জানতে চায় না। তারা কোনদিন ফিরতে পারবে কিনা, তাদের জমি-জায়গা, ঘর বাড়ী কিছু ফেরৎ পাবে কিনা, এইসব জানতে চায়। সে-সব খবর কাগজে থাকে না। তখন মাঝে মাঝে তারা মরিয়া হয়ে ফিরে যায়। গোরখপুর হয়ে বাঁকি এবং ডুংরাগড হয়ে ভারতে যায়। আবার, বেশ কিছুদিন বাদে খবর আসে তারা কেউ ফাঁসীতে বা গুলীতে মরেছে। কেউ বা নাম ভাঁড়িয়ে পরিচয় লুকিয়ে বাংলা, আসাম, বা মাদ্রাজে পালিয়েছে।

এইসব খবরের পর মনে হতাশা ঘনীভূত হয়। অবিরাম, অবিশ্রান্ত বিষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে মনে হয় আর কোন আশা নেই, আগামী কাল নেই। এইভাবেই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যতদিন না মৃত্যু আসে। ভবানীশঙ্কর ও ব্রিজদুলারী বসে বসে সেই বিষ্টির শব্দ শোনেন। মাঝে মাঝে ঘরের নিচে কেউ আসে। টিন বাজিয়ে ডাকে এবং মই বেয়ে উঠে আসে। কেউ পীড়িত হয়েছে, ডাক্তারবাবুকে চাই। ব্রিজদুলারী বাধা দেয় না। তবু একবার বলে, 'ওষুধ নেই, পথ্য নেই, কি দেখতে যাবে?'

ভবানী কিছু বলেন না। নেমে যান। ব্রিজদুলারীর কথা সত্যি। কিছুই করতে পারেন না তিনি। গাছ-গাছড়া থেকে কিছু টোটকা ওষুধ বানিয়েছেন, তাই সঙ্গে নিয়ে রোগীর কাছে গিয়ে বসেন। একেবারে শেষ অবস্থায় না পৌঁছলে ওরা তাঁকে ডাকে না। তিনি রোগীকে মরতে দেখেন, এবং নিজেকে, ভাগ্যকে, সকলকে একজোটে অভিসম্পাত দেন।

কেউ মারা গেলে তিনি দু' দিন, তিন দিন বিমর্ষ হয়ে থাকেন। ব্রিজদুলারী মাঝে মাঝে তাকায়। কথা বলে না। অবাস্তর কৌতূহল প্রকাশ করে না। তিনি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে অথবা চোখ বুজে ভাবেন আর ভাবেন। তারপর ব্রিজদুলারীকে ডাকেন। বলেন, 'ওরা আবার আমাকে কষ্ট দিয়েছে!'

ব্রিজদুলারী তাঁর পায়ে হাত বুলোয়।

ভবানী আবার বালকের মত বলেন, 'আমি ওদের বলি, আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক করি না। আমার উপবীত নেই। ওরা তবু শোনে না। কেন শোনে না বল ত?'

'ওরাও যে অসহায়!'

'কিন্তু দুলালী, আমি ডাক্তার হয়ে রোগীকে আরাম দিতে পারি না, সেই লজ্জায় মরে থাকি। তারপর ব্রাহ্মণ বলে ওরা যদি আমার পায়ের ধুলো রোগীর কপালে দেয়, আমার যে ভয়ানক কষ্ট হয়। আত্মগ্লানি হয়।'

'তুমিই ত' বলেছ, যখন যেমন অবস্থায় পড়া যায়, তখন তেমন ভাবেই চলতে হয়।'

'হ্যাঁ। বলেছি। এ অবস্থায় জাত না মানলে দোষ নেই তাই বলেছি। জাত জাত করে আমরা কেমন করে মরেছি দেখ না? কিন্তু এ ত' অন্য কথা। ওদের যেন ঠকাচ্ছি আমি, তাই মনে হয়!'

ভবানী বালকের মতো বলেন, 'আর যাব না, কেমন?'

ব্রিজদুলারী বলে, 'বেশ ত! তোমার মন থেকে সায় না দিলে তুমি যাবে কেন?'

তবু আবার যখন কেউ ডাকতে আসে, ভবানী আবার প্রস্তুত হন। একটা নিশ্বাস ফেলেন। মাথা নাড়েন। তারপর সব গুছিয়ে নিয়ে রওনা হন। মাঝে মাঝে সক্ষোভে বলেন, 'যদি আয়ুর্বেদ পড়তাম, তবে না হয় একটু আধটু লতাপাতা চিনতাম। কাজে লাগাতাম।'

মাঝেমাঝে পাহাড়ের উপর থেকে ভোট ও নেপালী ব্যবসায়ীরা আসে। তারা শুকনো চা-পাতা এবং গাছের ছালটাল আনে। তাই জলে ফুটিয়ে কাথ ক'রে ভবানী রুগীকে দেন। নেহাত আয়ুর জোর থাকলে দু'একজন বাঁচে।

লাজপৎ সিং তাঁকে বলেন, 'আপনি আসা-তে আমরা একটু ভরসা পেলাম।'

ভবানী তাঁর কথার উত্তর দিতে পারেন না। একদিন, এই রাজপুত ক্ষত্রিয়টি তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী হবেন, একথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। জীবনের আগামী দিনগুলোকে ত' দেখা যায় না। এক এক্ সময় ভবানীর মনে হয়, এই যে কয়েকটি মানুষের কাছে আসা গেল, তাদের বিশ্বাস অর্জন করা গেল, এ-ও একটা মস্ত লাভ। সবটুকুই ক্ষতি নয়, অপচয় নয়।

লাজপৎ সিং তাঁর সব কথা বোঝেন না। দুঃখ এবং প্রতিকূল অবস্থা লাজপৎ-কে অনেক শিখিয়েছে। সে ঠেকে শেখা। বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা যে শিক্ষা আসে তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। তিনি এবং ভবানী দুই জগতের এবং দুই জীবনের মানুষ। এবং এই দুইয়ের মধ্যে এক বিরাট, দুস্তর ব্যবধান আছে।

লাজপৎ সিং, একজন ব্রাহ্মণ, এবং আরো দু'একটি যুবক প্রায়ই আসতেন। ব্রাহ্মণটির দেশ এলাহাবাদ। তিনি জজকোর্টে ভাল কাজ করতেন। যুবকরা কেউ রেভিনিউ, কেউ বা রেজিমেণ্টে লেখাপড়া ও হিসেব রাখার কাজ করত। একটি ছেলে অবশ্য সবে ক্যাভেলরি-তে টাকা দিয়ে ঢুকেছিল।

ইংরেজী কাগজ ছাডা তারা অন্য কাগজ আনাতে পারত না। তাই তারা ভবানীর কাছে কাগজ পড়তে আসত।

ভবানী তাদের সঙ্গে যে সব কথা বলতেন, তারা সব বুঝতে পারত না। তিনি নিজে ভাবছেন তখন। নিরন্তর ভাবছেন। তাই কথা বলতে ইচ্ছা হত। এদের বোঝাতে, শেখাতে ইচ্ছা করত। ব্রাহ্মণটি সংস্কৃত, হিন্দী ও ফারসী জানতেন। লাজপৎ সিং উঁচু ঘরের ছেলে। তিনি রিসালদার মেজর হয়েছিলেন। ফারসী, হিন্দী ও উর্দু ব্যতীত তিনি অল্প-স্বল্প ইংরেজীও শিখেছিলেন। যুবকদের মধ্যে দু'জন হিন্দী, ফারসী ও উর্দু ভালই জানত। তারা ইংরেজী শিখছিল। তৃতীয় যুবকটি মুখ বুজে তাদের কথা শুনত। কোন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করত না। বাড়ীর আদরের ছেলে, জেদ করে রিসালায় ঢোকে। উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের নেশায় যুদ্ধে যোগ দেয়। আর যে ফিরে যেতে পারবে না, তা সে তিন চার বছরে-ও সম্যক বুঝে উঠতে পারেনি। কেবলই ভাবত কেমন ক'রে পূর্বের সেই শান্ত, নিরুত্তেজ জীবনের

আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া যায়। উত্তর, মধ্য ভারত এবং বিহারে, বাংলায়, পাঞ্জাবে, কোথাও যে সেই জীবন অপরিবর্তিত রূপে বিরাজমান নেই, তা সে বুঝত না।

আর একজন কথা শুনত।

সে ব্রিজদুলারী। সে ভবানীর মুখের দিকে চেয়ে কথাগুলি বুঝতে চেষ্টা করত। কিছু কিছু কথা সহজেই বুঝত। তার চোখে একটি আগ্রহের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে থাকত।

ভবানী বলেছিলেন, 'টিম কেন ভারতীয়দের সঙ্গে যোগ দেয়, সেটি চিন্তা করবার কথা। ওদের দেশ আয়ার্ল্যাণ্ড। ইংলণ্ড ওদের ওপর-ও প্রভুত্ব করে আসছে। আইরিশরা চিরদিনই স্বাধীনতা চেয়েছে। আপনারা যখন যুদ্ধ করেন, এবং পরিশেষে পরাজিত হন, তখন কেউ-ই আমরা এই সংগ্রামের সম্যক রূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না। আপনারা মনে করেছিলেন আপনারা শুধু ইংরেজকে তাড়াতে চান। ইংরেজদের সঙ্গে লড়ছি, সে ধারণাও হয়ত' সকলের ছিল না। কেউ মনে করেছে আমরা লক্ষ্মীবাইয়ের সঙ্গে লড়ছি। কেউ মনে করেছে দিল্লীতে বাহাদুর শাহ-কে কোনমতে বসাতে পারলেই হবে। কেউ কেউ, হয়ত অতি অল্প সংখ্যক, তাঁরা বুঝেছিলেন আমরা সকলেই পরাধীন। ওরা, ওদের মতো কতিপয় আইরিশ মনে করেছে এএকটি পরাধীন জাতির স্বাধীনতার প্রয়াসে সংগ্রাম, তাই তাকে সাহায্য করা উচিত।'

'স্বাধীনতার সংগ্রাম!' ধীরে ধীরে কথাগুলি উচ্চারণ করছেন লাজপৎ। ভবানী একটু হেসে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই। বিদেশী শাসককে সরাতে চেয়েছে যারা, সেই জন্যে মরেছে যারা, তারা স্বাধীনতাও চায় নি এ কথা কে বলবে?'

'কিন্তু সে কথা কি কেউ জানবে? সবাই জানবে আমরা নির্বোধের মত ওদের সরাতে চেয়েছিলাম। তারপর আমরা ফাঁসিতে মরলাম, গুলীতে মরলাম, নির্বাসনে মরলাম। আমাদের কথা কেউ জানবে না।'

যুবকরা কেউ হয় ত রূঢ়ভাবে তাঁকে বলেছে, 'ওদের জেতবার কারণ কি?'

'ওরা ভারতীয়দের চেয়ে উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছে, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকের ব্যবস্থা ওদের সাহায্য করেছে, ওদের যুদ্ধ করবার পদ্ধতি অনেক উন্নত। সবচেয়ে বড় কথা ওদের মধ্যে একতা আছে।'

'এসব কথা আপনি প্রায়ই বলেন। আপনি বলেন ওরা শিক্ষিত এবং উন্নত। আচ্ছা, আপনার নিজের দেশে ত' ইংরেজী শিক্ষা করে এসেছিল, আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন না কেন?'

ভবানী চুপ ক'রে থাকেন। তারপর বলেন, 'আমাদের দেশ, অর্থাৎ বাঙলা দেশ সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনারা? কতটুকু খবর রাখেন? বাংলাদেশেই ইংরেজী শিক্ষা সবচেয়ে আগে ছড়িয়ে পড়ল। কেন পড়ল তার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। দেখুন, আমাদের দেশে যখন ইংরেজরা এল, সন্দেহ নেই তারা রাজত্ব করতেই আসে। কিন্তু তারা সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা আনে। বাইরে, ভারতবর্ষের বাইরের জগতের খবর আনে। আমাদেরই দেশের একজন, রাজা রামমোহন প্রথম ইংরেজী শিক্ষার দিকে নজর দেন।'

'ইংরেজী শিক্ষা ছাড়া কি শিক্ষা হয় না?'

"নিশ্চয় হয়। কিন্তু রামমোহন বুঝেছিলেন ওরা নিজেদের শক্ত সমর্থ করে তোলবার মত অনেক কেজো শিক্ষা পেয়েছে, যা আমাদের ছিল না। আমাদের তিনি এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি আমাদের দেশে ইস্কুল কলেজ খুলবার দিকে নজর দেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করবার দিকে তাঁর এত আগ্রহ ছিল বলেই তা বন্ধ হতে পারল। নইলে হয়ত দেরি হত। বাংলাদেশে ছেলেরা লেখাপড়া শিখল, কাগজপত্র বেরুল, বিলেতে গেল, দেখে এল অন্য অন্য দেশ। আমাদের দেশের লোকই কি শুধু ১৮৫৭তে যুদ্ধে নামেনি? মাদ্রাজ কোথায় ছিল? গুজরাট কোথায় ছিল? আসলে এইভাবে সরালেই যে ইংরেজকে সরান যাবে তা বাঙালী বিশ্বাস করেনি। তারা জানত ইংরেজের সবটুকু শক্তি ও সামর্থ্য শুধু এ দেশেই নয়, তারা পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই আজ আধিপত্য করছে।'

'তাই তারা এমন ক'রে সরে রইল?'

'কে বলল সরে রয়েছে? তারা শিক্ষায় এগোচ্ছে, চিন্তায় এগোচ্ছে। যুদ্ধ করতে হলে যে সুশিক্ষিত সৈন্যের-ও দরকার হয়, শুধু সাহস দিয়ে কাজ হয় না। তা ত' অনেক দাম দিয়ে আপনারা শিখলেন, আমিও দেখলাম। দেখুন, বাংলাদেশ হয়ত আজ নানাভাবে শিক্ষায়, চিন্তায় নিজেকে গড়ছে। ভেঙে ভেঙে গড়ছে। একদিন হয়ত সবাই বুঝবে তারা যা করেছে তা ভুল নয়। আমি ত' বিদ্যাসাগরকে দেখেছি, রামমোহনের কথা শুনেছি।

তাঁদের-ও অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। কেননা তাঁরা যাদের উন্নতি করতে চেয়েছেন, তারাই যে বাধা দিয়েছে।'

'আপনার কথা বুঝলাম না।'

'দেখুন, তর্ক করতে বসে আমরা এই সংগ্রামকে যেন ছোট ক'রে না দেখি। যাঁরা সবটুকু বোঝেননি, তাঁরা এটুকু বুঝেছেন যে এর পেছনে ইংরেজের শাসন থেকে মুক্ত হবার একটা মস্তবড় চেষ্টা ছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজের সম্পাদক হরিশ মুখুজ্জে দেখছি, তিনবছর আগেই লিখেছেন এ একটি গ্রেট রেভল্যুশান। আবার মে মাসে মীরাটের খবর পেয়েই তিনি লিখেছেন, 'ভারতীয় প্রজাদের মনে ইংরেজ-শাসনের প্রতি আনুগত্য বড় কম। আজ শুধু সিপাহী নয়, সমস্ত দেশেই বিদ্রোহ। ব্রিটিশ শাসনের ফলে যে অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে, তা অবশ্যম্ভাবী। দেখুন, বাংলাদেশে তারপরেই নীলকর সাহেবদের নিয়ে কি হাঙ্গামাটা-ই হল। আর, এই যে যুদ্ধ, তা-ও প্রথমে বাংলাদেশেই শুরু হয়। বহরমপুর এবং ব্যারাকপুরে।'

'হ্যাঁ। তবে সে সব সিপাহীও উত্তর ভারতের।'

'লাজপৎ জী, আমরা নিজেদের মধ্যেই কতরকম ভাগ করেছি দেখুন। ধর্মের ভাগ, জাতের ভাগ, আবার দেশের ভাগ। এই ভাবে আমরা নিজেদের দুর্বল করেছি। ইংরেজ দেখবেন আরো ভাগ করবে।'

'কি রকম?'

'এই ত' দেখছি, ওরা এর মধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, শিখ, রাজপুত, গুর্খা, পাঠান, এরাই হল যোদ্ধা-জাত। যেন সাহস ও বীরত্ব যা আছে এদের-ই আছে। যেন অনেক শিখ, অনেক রাজপুত, অনেক পাঠান ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি!'

'এর ফলে কি হবে তা ত' জানাই যাচ্ছে।'

'এর ফলে এদের রেজিমেন্টে নেবে। চাকরি দেবে। অন্যদের এদের ওপর রাগ হবে, বিদ্বেষ হবে।' ওরা ত' তা-ই চায়।'

'কেন?'

লাজপৎ সিং এবার গালি দিলেন। বললেন, 'কেন তা-ও বোঝ না? আমরা নিজেদের মধ্যে হিংসে করতে ব্যস্ত থাকব। তাতে ওদেরই সুবিধে হবে।'

তারপর একটু নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ। ওরা বুদ্ধি রাখে। আমরা

ভেবেছিলাম পলাশীর পর একশো বছর হল এবার ওরা যাবে। কিন্তু ওরা আরও শক্ত হয়ে বসল। ওদেরই সুবিধে হল, লাভ হল।'

'ওদের? হ্যাঁ, তা হল। তবে লাভ কি আমাদের একেবারেই হয়নি?'

'আমাদের লাভ?'

'নিশ্চয়। এবার দেখবেন দেশে শিক্ষা কত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে, কতদিকে কত উন্নতি হয়।'

'ওরা উন্নতি করবে! ওরা কি আমাদের বিশ্বাস করে?'

'না করুক! এটা ত ভালভাবেই বোঝা গেল এরকম অবস্থাটা যাতে আর না হয় সেদিকে ওদের নজর থাকবে। কোম্পানীর হাত থেকে রাজত্ব নিলেন মহারাণী, তার ফলে কি কোন উন্নতিই হবে না?'

'কি হবে?'

'দেখবেন, পঞ্চাশবছর বেঁচে থাকলেই দেখবেন। এত লোক মরল, এত ধনসম্পত্তি নষ্ট হ'ল, ওরা ভাল করেই বুঝবে এদেশ শাসন করতে গেলে এমন করে আর অসন্তুষ্ট করলে চলবে না। ভয় শুধু আমরাই পাইনি, ওরাও পেয়েছে।'

লাজপৎ সিং রেগে উরুতে চাপড় দিলেন। বললেন, 'বোকার মত ভয় পেল সব, সবাই যদি একজোট হ'ত, সাধ্য কি ওদের ওরা জেতে?'

ভবানী হাসলেন। বললেন, 'শিক্ষার প্রয়োজন ত আপনি মানেন না। যদি জিততেন, তাহ'লেই বা রাজ্য কতদিন রাখতে পারতেন? দেখুন, ঘোড়া আর তরোয়াল নিয়ে দেশশাসন করা চলত চারশো বছর আগে। আজ দেশ চালাতে হলে লেখাপড়া চাই, রেলওয়ে চাই, টেলিগ্রাফ চাই, চাষবাসের সুবন্দোবস্ত চাই। নইলে রাজত্ব রাখা চলে না। কার সে ক্ষমতা ছিল? নানাসাহেবের? বাহাদুর শা'র? না লাজপৎ জী, চোখ মেলে চেয়ে দেখে সত্যি কথাটা স্বীকার করুন। এ দেশের ধনরত্ন নিয়ে ওরা নিজেদের দেশে কল-কারখানা গড়ছে, ওদের রাজত্ব পৃথিবীর সর্বত্র। এক কথায় ওরা মিশর, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, চীন থেকে সৈন্য আনিয়ে নিল।'

'তাহ'লে ওদের রাজত্বই চলতে থাকবে?'

'এখন ত নিশ্চয়ই চলবে। তবে একটা কথা জানবেন ওরা আমাদের

আর বিশ্বাস করবে না, আমরাও হয়ত পরিপূর্ণ বিশ্বাস পাব না। এ ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ওরা বারবার থামাতে পারবে। আসলে যেদিন দেশের শিক্ষিত মানুষরা এগিয়ে আসবেন, ওরা ভয় পায় সেই আগামী দিনকে। সে কাজ বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে।'

'কাজ! ইংরেজী লেখা কি এতবড় কাজ?'

'ইংরেজী লেখা ত শুধু নয়। ওদের আনা শিক্ষার ভেতর দিয়ে আমরা জানতে পারব পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পরিচয়, আমরা পৃথিবীকে দেখতে পাব।'

এই ধরনের আলোচনা তাঁদের প্রায়ই হত। বরাবর হত। ভবানী নিজের আবেগে কথা বলে যেতেন। ওরা শুনত, তর্ক করত। এই তর্ক, এই বাদানুবাদের ভেতর দিয়ে তাঁরা হয়ত একটু একটু করে কাছে আসছিলেন। ভবানী হয়ত নিজেকে চিনতে পারছিলেন। তাঁর মনে ক্রমেই অস্থিরতা বাড়ছিল, তিনি কাজ করতে চাইছিলেন।

লাজপৎ সিংয়ের মৃত্যুর পর তিনি নেপাল ত্যাগ ক'রে চলে আসেন। ১৮৬৩ সালে। লাজপৎ সিং শেষ অবধি নেপালেই মারা গেলেন। মৃত্যুকালে তিনি ভবানীকে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলেছিলেন, 'আমাকে দাহ করবেন।'

'করব।'

'আপনি মুখাগ্নি করবেন।'

'আমি?'

'হ্যাঁ। আর, যদি কখনও ঝালোয়ারে যান, রাজস্থানে…'

তারপর লাজপৎ সিং ইচ্ছে করেই কথাটা শেষ করেননি। বলেছিলেন, 'আমার তরোয়ালের হাতলটি ফাঁপা। সেখানে কয়েকটা মোহর আছে, আপনি নেবেন।'

তারপর স্বর বন্ধ হয়। শ্বাসকষ্ট অনেকক্ষণ ছিল।

ভবানী তাঁর সব কথাই রেখেছিলেন।

তেত্রিশ

শেষ অবধি ভবানী কাশীতে আসেন।

তিনি যখন ভারতে এলেন, তখন সীমান্তে সীমান্তে পাহারার কড়াকড়ি কমেছে।

গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে প্রথমদিন পূর্ব কথা স্মরণ করে তিনি বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়ে যান। সেদিন চন্দন তাঁর সঙ্গে ছিল। বহু মানুষের ব্যস্ত জীবন দেখতে দেখতে তাঁর বারবার মনে হয়, তিনি যাদের একদিন জানতেন, তারা নেই।

চন্দনও নেই। চম্পাও নিশ্চয়ই মৃত। অথবা তার কি পরিণতি ঘটেছে, তা তিনি জানেন না। আর কতজনকে মরতে দেখেছেন, আর কতজনই ত মরেছে। তবু যেন কোথাও কোন অপূর্ণতা নেই। জীবন যেমন চলতো, তেমনিই চলেছে। আজকের কাশীকে কি মনে হয় ছ'বছর আগে একদিন এই নগরীই নিষ্প্রদীপ, অন্ধকার হয়েছিল? নীলের সেই অত্যাচার, আহতদের আর্তনাদ, নিহতদের শবদেহ সব যেন সবাই ভুলে গেছে।

তাঁর দাদা হরিলাল তাঁকে দেখে খুব আশ্চর্য হন। পাঁচ বছর তাঁর কোন খবর পাননি। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন ভবানী মৃত। প্রথমে তিনি আবেগে উচ্ছ্বসিত হন, কিন্তু তারপর কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করেন। ব্রিজদুলারীকে দেখে আরো বিস্মিত হন। যে ভবানী বিবাহ-বিমুখ ছিলেন, তিনি শেষ অবধি একজন অবাঙালী মেয়েকে বিয়ে করলেন এটা হরিলাল বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি প্রথমে ধরে নেন, ভবানী নিশ্চয়ই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ভবানী একটু হেসে সে প্রশ্ন এড়িয়ে যান। হরিলাল বলেন, 'আবার চাকরির চেষ্টা করবে ত?' ভবানী বলেন, 'না। ভেবেছি ডাক্তারী করব।' হরিলালের সমস্ত প্রশ্ন-ই তিনি এড়িয়ে গেলেন। হরিলাল শেষ অবধি নিরস্ত হলেন। একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েই বিদায় নিলেন। ভবানী অসিঘাটের কাছে একটি ছোট বাসা নিলেন।

কলকাতা থেকে ডাক্তারী বই, ওষুধপত্র আনালেন। প্রথমে কিছুদিন রোগী পাননি। তারপর একটি দু'টি ক'রে রোগী এল। বড় ডাক্তার নীলকমল সেন তাঁর প্রসঙ্গে নানাকথা শুনে আকৃষ্ট হন। নিজেই একদিন পাল্কী চড়ে আলাপ করতে আসেন। ভবানীর ঘরে অন্যান্য বই-টই দেখে তিনি বলেন,

'আপনি আমার বাড়ীতে আসবেন। অনেকেই আসেন। আমার নিজের লাইব্রেরী আছে। কলকাতা থেকে যতগুলো কাগজ বেরোয় সবই আমি রাখি। আপনার ভাল লাগবে।'

নীলকমল সেনের মধ্যে শিক্ষার উদারতা ছিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের আওতায় মানুষ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদিত কাগজ রাখতেন। সবরকম সংস্কার ও উন্নতির কাজে প্রভূত অর্থ সাহায্য করতেন। আহারে ব্যবহারে বাজে সংস্কার ছিল না। চিকিৎসক হিসেবে অত্যন্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন বলে সকলেই তাঁকে ডাকত। অনেকে তাঁকে আড়ালে 'ক্রীশ্চান নীলকমল' বলতো। তিনি হাসতেন এবং ভবানীকে বলতেন, 'যে যা বলে বলুক, নিজের কাজটি ক'রে যাব। নিজের মতে বাঁচ। জীবনটা ত একবারের হে! যা ভাল মনে কর, তা কাজে করতে ভয় পেও না। যারা কাজ করতে চেয়েছে তারা যদি লোকের কথা মেনে চলতো, তাহ'লে কিছুই হতো না।'

তিনি ভবানীকে রোগী পাঠিয়ে, বই দিয়ে, সাহায্য করেন। কমিশনার এবং কালেক্টরের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট খাতির ছিল। নীলকমল সেনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ভবানীর কাজে লেগেছিল।

কিছুদিনের জন্য, ভবানী যা যা চেয়েছিলেন সবই পেয়েছিলেন। কাশীতে অতি সামান্য খরচেও বাস করা যায়। তিনি জীবনযাত্রায় সব বাহুল্য ত্যাগ করেছিলেন। ব্রিজদুলারী তাঁর গোপনতম ইচ্ছাটুকুও বুঝে নিত। সেই মত চলত। দোতলার ঘরের সামনে বারান্দা। তারপর গঙ্গা দেখা যেত। ভবানী ব্রিজদুলারীকে কখনো কোন বই পড়ে শোনাতেন। কখনো কোন চিন্তা মনে এলে তখনই তাকে বলতেন। কখনো কখনো দিনলিপি লেখবার সেই খাতাটিতে মনের কথা লিখে রাখতেন। ব্রিজদুলারী খাতাটিকে রেশমী কাপড়ে মুড়ে সযত্নে মলাট সেলাই করে দিয়েছিল।

তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা তিনি আবার লিখতে শুরু করেন। নেপালের বর্ষায় প্রথম দিকের কয়েকটি পাতা ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। ব্রিজদুলারী তার পাঠ উদ্ধার করে কিছু কিছু নকল করে দিয়েছিল।

কিছুদিন শান্তি এবং আরাম পেয়েছিলেন তাঁরা। পাঁচবছর ধরে বিপদ ও উত্তেজনা সর্বদা তাঁদের ঘিরে থেকেছে। তারপর নতুন ক'রে এক সুস্থ ও সুন্দর জীবন শুরু করতে পেরে তাঁরা কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন। ব্রিজদুলারী

বুঝেছিল, ভাগ্য যখন তাকে ভবানীর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, তখন অন্তত তাঁর সঙ্গে বসবাসের যোগ্য হতে হবে তাকে। ভবানী বলেছিলেন, 'সবাই যে অর্থে সুখী হতে চায়, সে সুখ আমি তোমাকে দিতে পারব না। আমরা অন্য ভাবে সুখী হব।'

সুখী হবার পন্থাটা যে কি হবে, তা তিনি কোন দিনই বিশেষ ক'রে বলেননি। ব্রিজদুলারী তা বুঝে নিতে চেষ্টা করতো। সে নতুন করে পড়াশোনা শুরু করে। বাংলা শিখে সে যেদিন ভবানীকে পুরনো 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে খানিকটা নকল ক'রে দেখায়, ভবানী খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। নীলকমল সেন তাঁর বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে একদিন সমাগতদের বলেছিলেন, 'ভবানীবাবুকে খুব সাধারণ মানুষ মনে করবেন না। উনি বিদ্যাসাগর মশায়ের আদর্শকে মানেন।' 'শুনেছি অক্ষরে অক্ষরে মানেন।'— এই বলে একজন সম্ভবতঃ ভবানীর বিবাহ বিষয়ে কোন গূঢ় কটাক্ষ করেন। নীলকমল সেন অনাবশ্যক লঘুতা ও তরলতা একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, 'না, ওঁর স্ত্রী অতি উত্তম লেখাপড়া জানেন। ভবানীবাবুব বলতে নেই এখন মাসে দেড়শো টাকা রোজগার। কিন্তু অধিকই তিনি বই সংগ্রহে ব্যয় করেন। বঙ্কিম চাটুজ্জের 'দুর্গেশনন্দিনী' উনি এবং ওঁর স্ত্রী দু'জনেই পাঠ করেছেন।'

এই কথা শুনে সবাই খুব কৌতূহলী হন। ভবানী বিব্রত হয়ে পড়ে নীলকমলবাবুকে বলেন, 'আমার বিষয়ে দয়া ক'রে মানুষকে কৌতূহলী করবেন না।' নীলকমল সেন তাঁর বিষয়ে কিছু কিছু জানতেন। তিনি বলেন, 'এটি যেমন আশা, তেমনি আনন্দের কথা। মশায়, আমরা 'ইয়ং বেঙ্গল'-ও দেখেছি, আবার বিদ্যাসাগরকেও দেখেছি। বাংলাদেশে মেয়েদের শিক্ষা বিস্তার কল্পে কতজন কতভাবে চেষ্টা করেছেন। আমার ইচ্ছা হয় আপনার কথা অন্যদের বলি। বাবু-রা ইংরেজী শেখেন, চাকরি করেন, পরিবার নিয়ে বিদেশে আসেন, কিন্তু অন্তঃপুরে যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার। আমার বড় মেয়েটি দুটি সন্তান নিয়ে বিধবা হ'ল। সে যখন এখানে আমার বাড়ীতে বসে ছোট ছোট মেয়েদের পড়াতে শুরু করল তখন ওই হুঁকো চাটুজ্জে, সায়েব খাস্তগীর, তত্ত্ববোধিনী গাঙ্গুলী আমাকে কত কথাই বললে। বাবুরা যদি তোমার মতো ঘরের দিকে একটু নজর দেন, তবে অনেক সুবিধে হয়।'

নীলকমল সেন তাঁর পরিচিত সকলকেই একটি ক'রে ডাকনাম দিতেন। কালেক্টরীর বড়বাবু অত্যধিক হুঁকো-প্রীতির জন্য হুঁকো চাটুজ্জে হন, ছোট ডেপুটি রামগোপাল খাস্তগীর নীলকমলকে চটাবার জন্য বলতেন 'সায়েবরা না এলে আমরা পাঁউরুটি এবং বরফ পেতুম না' তাই তাঁকে সায়েব খাস্তগীর বলা হত। কুমুদিনীনাথ গাঙ্গুলী গোঁড়া ব্রাহ্ম এবং 'তত্ত্ববোধিনী' সভা ও পত্রিকা ব্যতীত 'আর কিছুই তেমনটি হল না' বলতেন, তাই তাঁকে তত্ত্ববোধিনী গাঙ্গুলী বলা হত। নীলকমল সেন নেহাত না চটলে এ সব নাম ব্যবহার করতেন না। একবার তাঁর স্ত্রী পরিচয় না জেনে কুমুদিনীনাথ গাঙ্গুলীর স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'আমাদের বাবুকে সবাই চেনে। অমুক সেনের গলি নামে গোধূলিযায় রাস্তা ক'রে দেবে কালেক্টর, এ কথাও সবাই জানে। আমিও অনেককে জানি। তবে তত্ত্ববোধিনী গাঙ্গুলীর পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়নি। শুনেছি সে ভারী দেমাকী। হবে না কেন, ভূকৈলাসের চাটুজ্জে বাড়ীর মেয়ে। ওদের বড় অহঙ্কার।'

এ কথা নানাভাবে পল্লবিত হয়ে ছড়ায়। তারপর নীলকমল অবশ্য যখন তখন এসব নাম ব্যবহার করতেন না।

ভবানী যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা মোটেই তুলতেন না, তা তিনি লক্ষ্য করলেন। তিনি একদিন ভবানীর বাড়ীতে যান এবং ব্রিজদুলারীর সঙ্গে আলাপ করেন। তার সহজাত সম্ভ্রম এবং ব্যবহারের আভিজাত্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল ব্রিজদুলারী নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে।

এই সময়টাই ভবানীর জীবনে সবচেয়ে সুখকর।

জীবনেও যে শান্তি এবং স্বস্তি জানেননি, তা এইসময় তিনি খুঁজে পান। প্রৌঢ় বয়সে প্রেমের মধ্যে যে পরিপূর্ণতা এবং পরিণতি থাকে তা তাঁদের সম্পর্ককে শ্রদ্ধা ও মহিমা দিয়েছিল। ব্রিজদুলারীকে তার অতীত জীবন কতকটা ভেঙে দিয়েছে তা তিনি জানতেন না। ভুলে-ও কখনো তাঁরা তার অতীত নিয়ে কথা বলতেন না। বাংলাদেশে শিক্ষা, সমাজচেতনা এবং সাহিত্যের যে দ্রুত প্রসার হচ্ছিল, বাংলাদেশে যে নতুন জীবন, নতুন চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল, তার প্রতি ভবানীর আগ্রহ দেখে সে একদিন বলেছিল, 'তুমি কলকাতায় কোন কাজ নিতে পার না?'

এ কথা নীলকমলও বলেছিলেন, 'আপনার আসল জায়গা কলকাতা।

আপনি যদি সেখানে যান, ত' আমি আপনাকে উত্তম কাজ যোগাড় ক'রে দিতে পারি। আমার চেনাশোনা অনেকেই সেখানে আছেন।'

ভবানী দু'জনের কথাই সযত্নে শোনেন এবং নিরুত্তর থাকেন। মনে হয়েছিল সেখানে ব্রিজদুলারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক-কে তিনি হয়তো তেমন ক'রে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। বাংলাদেশের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ ছিল তাঁর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হত, তিনি নিজেকে হয়ত অপরের কাছে বোধ্য করতে পারবেন না। তিনি ব্রাহ্ম নন, আবার ব্রাহ্মণের আচার-ও পালন করেন না, উপবীত বহুদিনই ত্যাগ করেছেন। আহার ও অন্যান্য ব্যবহারে তিনি মোটামুটি রক্ষণশীল। কিন্তু জাতিবিচার তিনি অন্তর থেকেই মানেন না। অথচ তাই নিয়ে নিজেকে উগ্র নব্যপন্থী বলতে তাঁর বাধে। এইসব নিয়ে তিনি ব্রিজদুলারীকে যখনই কিছু বলতে চাইতেন, তখনই ঈষৎ হেসে ব্রিজদুলারী তাঁর খাতা এগিয়ে দিত। খাতায় তিনি লিখেছিলেন, 'মিথ্যা সংস্কার ও জীর্ণ আচার মানি না। যে মানে না তাহাকেই যে ব্রহ্মবাদী হইতে হইবে ইহাও আমার হাস্যকর লাগে। যখন অন্তর হইতে জোর পাই না, তখনই আমার ধর্মের আশ্রয় প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর তাঁহার অন্তরের অনুশাসনে, সত্যের নির্দেশে, বিবেকের নির্দেশে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ করাইলেন। বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী সর্বদাই উদ্যত। তাঁহার পূর্বে, রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়সভা'র অধিবেশনে এবং ইয়ং বেঙ্গলের বেঙ্গল স্পেক্টেটর কাগজে বিধবা কেন পুনর্বার বিবাহ করিবে না, বহু বিবাহ প্রথা কেন নিষিদ্ধ হইবে না, এই সব বিষয়ে আলোচনা হয়। বিদ্যাসাগর সেই সকল চিন্তাকে একে একে রূপ দিতেছেন এবং কঠোর প্রতিবন্ধকতা তাঁর সকল প্রয়াসকে ধ্বংস করিতে উন্মুখ। অথচ বিদ্যাসাগর হিন্দু। বন্দ্য বংশীয় ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাহার উদ্যম, কর্মনিষ্ঠা, সাহস, জগৎ সংসারকে এক দিকে রাখিয়া নিজে অপর দিকে দাঁড়াইয়া অবিচলিত দৃঢ়তায় সত্যের জন্য সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা, সব দেখিয়া মনে হয় তিনিই সকল ধর্মের সারাৎসার বুঝিয়াছেন। আমি অতি নগণ্য মানব। তবু আমি ভাবি, আমি সাধ্যমতো যাহা সত্য বলিয়া বুঝি, যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝি, তাহা লইয়া বাগাড়ম্বর করিব না। নিজের জীবনে তাহা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব। যেহেতু আমি অমুক ধর্মাবলম্বী, সেহেতু আমার ধর্মটিই শ্রেষ্ঠ—এ ভাবে চিন্তা করিলে সকল ধর্মকেই গোঁড়া এবং সঙ্কীর্ণ মনে হয়। তাহাতে মানবকে সমগ্রভাবে

দেখিবার দৃষ্টি জন্মে না। ঈশ্বরকে ত আরো দেখা যায় না। আমার মনে হয় এ সকল কথা বলিলে সকলে আমাকে দুর্বোধ্য মনে করিবে।' লিখেছিলেন তিনি তাঁর ইচ্ছেমতো একটি সৎ ও শুদ্ধ জীবন যাপন করতে চান। মুখে যে আদর্শের কথা বলেন, জীবনেও তাই-ই যাপন করতে চান।

একদিন ব্রিজদুলারীকে বলেন, 'তুমি এবং আমি দ্বিজ। কেননা আমরা দ্বিতীয় জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছি। ব্রাহ্মণকে তার দ্বিজত্ব রক্ষার জন্য নিয়ম পালন করতে হয়। আমরা—আমাদের বুদ্ধিতে যা সত্য বলে বুঝি, শ্রদ্ধেয় বলে বুঝি, সেই জীবন যাপন করতে চেষ্টা করব।'

চারিদিকে চেয়ে দেখতেন, সবাই যৌথ পরিবারে বহুজনকে নিয়ে বাঁচে। শুধু দু'জন দু'জনের কাছে সবকিছুর পরিপূরক হয়ে বাঁচছে এমন বাঙালী বা অন্য ভারতীয় পরিবার তাঁর কচিৎ চোখে পড়েছে। তাঁর মনে হত তাঁদের দু'জনের জীবনটা অন্য কারো মত নয়। এই প্রসঙ্গে অনেক পরে তিনি একজন মিশনারী সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন। অনেক বছর পরে। 'ফাদার ব্রাউনকে' তিনি পেয়েছিলেন জগ্‌দলপুরে। রাজধানীতে নয়। দুর্গম অরণ্যে, লোকালয় থেকে বহুদূরে আদিবাসীদের একটি গ্রামে। তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। ব্রাউন তাঁকে বলেছিলেন, 'বাবু তুমি আমাকে বলবে আমার এই ধর্মপ্রচার অভিসন্ধিমূলক। কিন্তু ত্রিশবছরে আমি একজনকেও জোর করে বা লোভ দেখিয়ে ক্রীশ্চান করিনি।'

ত্রিশবছর! কাগজ, বই, রেলপথ এবং তথাকথিত সভ্যতা থেকে তিনশো মাইল দূরে। শুধু বড় বড় গাছ। আদিবাসীদের সমাজ। তাদের বিশ্বাস, সংস্কার এবং ধর্মের জগৎ। দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দাবানল, জর এবং বন্যপ্রাণীর জগৎ। ভবানী বলেছিলেন, 'তুমি ত্রিশহাজার বছর পেছিয়ে আছ।'

'জানি।' ফাদার ব্রাউন হেসেছিলেন।

'কিন্তু কেন?'

'দেখ, ধর্মপ্রচারকদের ব্রাদারহুডে আমি একটি বিরাট ফেলিওর। কেননা ধর্মপ্রচারের কথাটাই আমি ভুলে যাই। কিন্তু আমি অন্য অন্য কাজ করি। হ্যাঁ, আমি খ্রীস্টের সেবক হ'য়ে কাজ করি।'

'কি?'

'আমি ওদের মদ খেতে বারণ করি। আমি ওদের শিশুদের পরিচ্ছন্ন রাখবার প্রয়োজনীয়তা শেখাই। আমি ওদের শিশুদের চোখ ধুয়ে দিই।

কুষ্ঠরোগীকে ঢিল মেরে, মেরে ফেলতে হয় না তা শেখাই। ছোট ছোট কাজ করি। হ্যাঁ বাবু, গরীব বুড়ীকে ডাইনী মনে করতে নেই, বন্যা বা অনাবৃষ্টিকে ভগবানের অভিশাপ মনে করতে নেই, প্রসূতি ও শিশুকে মাটিতে ফেলে রাখতে নেই—এ সব শেখাই।'

'তাতে লাভ হয়?'

'না। সবসময় নয়। ওরা আমার সব কথা শোনে না। ওরা মদ চোলাই করে। মদ খেয়ে বাপ ছেলেকে খুন করে। পরে এসে বলে, ঠিক বলেছিলি তুই, ঠিক বলেছিলি। আবার ভুলে যায়। হ্যাঁ। বীজ পুঁতলাম আর গাছ বেরুল, এরকম প্রত্যক্ষ ফলাফল দেখতে পাই না।'

'তবে?'

'তবু এ সব করতে হবে। তুমি একথা মানো ত, যে এদের শিশুরা চোখের অসুখে ভোগে, তাই চোখ নিয়মিত ধুতে বলা উচিত? মাঘের শীতে প্রসূতি কাঁচামাটিতে শুলে মরে যায়, তাই তা করতে বারণ করা উচিত?'

'মানি।'

'আমি তাই করি। এখন আমার বয়স সাতষট্টি। আমি হয়তো এখানেই মারা যাব। আমার মতো আরো আরো ইংরেজ মিশনারী আছে যারা এইরকম দুর্গম নির্জনতায় জীবনকাল ধরে বাস করে, যারা প্রত্যক্ষ ফলাফলের আশা করে না, যারা ছোট ছোট জিনিস শেখায়—পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যরক্ষা। কুসংস্কারকে জয় করতে হয়, মহাজনকে সর্বশক্তিমান মনে করতে নেই, আড়কাঠিদের প্রলোভনে পড়ে একটা টাকা এবং মদের লোভে ক্রীতদাসের দলে নাম লেখাতে নেই, লেখাপড়া শেখা ভালো— এইসব। আমি জানি আমি বিধর্মী। কিন্তু বিধর্মী এবং বিজাতি যদি এইসব ছোট ছোট জিনিস শেখাবার ব্রত নিয়ে নিজেদের সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে, এদের মধ্যে জীবন কাটায়, তাহ'লে তুমি আর যাই মনে করো, তারা যে স্ব-ব্রতে বিশ্বাসী তা অস্বীকার করতে পার না!'

'না।'

'দেখ, এই কাজটা সবসময় আমাদের স্বজাতীয়দের সমর্থনও পায় না। There are missionaries and missionaries. Ours is a thankless

job. কেননা আমরা কখনোই ওদের খুশী করবার মতো অনেক লোককে ক্রীশ্চান করতে পারি না। তবু, আমার মনে হয় সে-সব কথা না ভাবাই ভাল। আমি কফি এবং চা-র প্ল্যান্টেশান দেখেছি। আমি ভারতীয়দের আফ্রিকা, চায়না, বর্মাতে দেখেছি। অনেকেই কনভার্টেড। তারা ক্রীশ্চান-ও হয়েছে। ইয়েস বাবু। সে সব ভারতীয় তোমাদের মতো শিক্ষিত নয়, বড় চাকরি করে না। তারা আদিবাসী, তারা গরীব। তারা তোমাদের 'ভেদিক রিলিজিয়ন' ইনহেরিট করেনি। They have worshipped their primitive gods. সে সব দেবতার চেহারা দেখলে তোমরা এবং আমরা ভয় পাই। আমরা তাদের কাছ থেকে সে-সব দেবতাকে কেড়ে নিয়েছি। তার পরিবর্তে তাদের উন্নত এবং সুসভ্য এক ধর্ম দিয়েছি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাদের রোগ, বেশ্যাবৃত্তি, মিথ্যাচার, মদ্যপান এবং ইটার্নাল আনরেস্টিং পভার্টি দিয়েছি। হ্যাঁ। আমি সেইসব ভারতীয়কে দেখেছি। তারা শুওরের খোঁয়াড়ের মতো ঘরে থাকে। তারা রোগে মরে এবং অনাহারে মরে। এই যাদের জীবন, তারা ক্রীশ্চান ফেথ্-এ মরলো কিনা, তাতে আমার কি সান্ত্বনা থাকতে পারে? তবু তারাই আমাদের কাছে আসে। যারা ধনী, যারা শিক্ষিত, যারা পুস্তক এবং পত্রিকার আলোকিত জগতে বাস করে চিন্তা করে, দে নেভার কাম টু আস্। দেখ, ধর্মের ব্যাপারটা বড় গোলমেলে। আমি তর্ক করতে পারব না, বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমি তোমায় বলছি, আমরা হয়তো লোকদের যথেষ্ট সংখ্যায় কন্‌ভার্ট করি না, ইয়েট উই সার্ভ ক্রাইস্ট।'

'কিন্তু নিঃসঙ্গতা? শূন্যতা? তা কি তোমাকে কখনো ক্লান্ত ক'রে ফেলে না?'

'ফেলে। এক এক সময় মনে হয় সব ছেড়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। আমি জানি আমার এইসব বিশ্বাস নিয়ে, অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি যেখানেই যাব, আমি নিঃসঙ্গ বোধ করব। হাজার জন মানুষের মধ্যে যদি আমার জীবন কাটে, তবুও।'

এগিয়ে এসে ছোট-খাটো, রোগা এবং কুৎসিত বৃদ্ধ মানুষটি ভবানীর বুকে আঙুল রেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'এখান থেকে শূন্যতা নড়ে না, নিঃসঙ্গতা সরে না।'

'শূন্যতা নড়ে না, নিঃসঙ্গতা সরে না' এই কথা দু'টি অনেকদিন অবধি

ভবানীর মনে ছিল। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল তিনি ব্রাউনকে তাঁর নিজের কথা বলেন। বলতে পারেন নি। ঐ কথা দুটি, এবং বৃদ্ধ পলিতকেশ ব্রাউন, কাঠের দেওয়ালে একটি ক্রুশ, এক সীমাহীন আদিম অরণ্যের ব্যাপ্তি—এইসব কিছুর স্মৃতি তাঁর মনে অনেকদিন পর্যন্ত একটা বিশেষ তন্ত্রীতে ঘা দিত। কেন যেন বহুক্ষণ ধ'রে ঐ ছবিটাকে মনে পড়ত, এবং দুটো কথা তিনি মনে মনে আবৃত্তি করতেন, 'শূন্যতা নড়ে না, নিঃসঙ্গতা সরে না।"

কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

একজন মানুষ, আর একজনের কত কাছে আসতে পারে, সে বিষয়ে ভবানীর মনে একদিন ঘোর সংশয় ছিল। ব্রিজদুলারীকে যখন তিনি পেলেন এবং ধীরে ধীরে দিনে দিনে দু'জনে দু'জনের খুব কাছে এলেন, তখন এই পরিপূর্ণতার মাঝখানেও ভবানীর মাঝে মাঝে কেমন যেন সংশয় জেগেছে। ব্রিজদুলারী তাঁরই পাশে বসে হয়ত সেলাই করছে, নয়ত তাঁর কথা শুনছে, নয়ত চুপ ক'রে গঙ্গার দিকে চেয়ে থেকেছে, তখন ভবানী হঠাৎ কথা থামিয়ে তার দিকে চেয়ে থেকেছেন। ব্রিজদুলারী বলেছে, 'কি দেখছ? কি ভাবছ?'

'কেমন যেন বিশ্বাস হয় না জান?'

'কি?'

'এই, তুমি যে কাছে আছ, পাশে আছ, তা বিশ্বাস হয় না।'

'কেন বলত?'

ব্রিজদুলারী আনত মুখে কি যেন ভেবেছে। তারপর বলেছে, 'তুমি অনেক কিছু মান না। তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি জান, অনেক বেশী বোঝ। আমিত অত বুঝি না। জান, আমার মনে হয় পরজন্ম যদি থাকে তা হলে আমি আবার তোমার কাছে আসব।'

'এ কথা কেন?' ভবানীর কণ্ঠ খুব মৃদু হয়েছে।

এবার যে অনেক দেরি হয়ে গেল। অনেক দেরি করে এলাম। ব্রিজদুলারীর কণ্ঠ প্রায় মৃদু নিশ্বাসের মতো শুনিয়েছে।

তখন ভবানী সহসা ভয় পেয়েছেন। বলেছেন, 'তুমি এ সব কথা বলো না। আমার ভয় করে।'

'ভয় ত আমারও করে। আমি ত তোমায় ছেড়ে যেতে চাই না। তবু কেন এ রকম মনে হয়?'

কি মনে হয় তা আর শুনতে চান নি ভবানী। তাঁর মনেই কি সব সময় একটা অজানিত আশঙ্কা উপস্থিত থাকেনি? তিনি কি জানেন না ব্রাইট কয়েক বছরে ব্রিজদুলারীকে কেমন ক'রে একটু একটু ক'রে ক্ষয় করেছে, তারপর এখানে সেখানে পলাতকের জীবন যাপন করতে করতে কেমন করে ও আরো নিঃশেষ হয়েছে? তাই ত তাঁর এত চেষ্টা। তাই ত তাকে তিনি এমন ক'রে ঢেকে রাখতে চান!

এক এক সময়ে, পাশের ঘরে এসে ঘুমন্ত ব্রিজদুলারীর দিকে চেয়ে তিনি দেখেছেন কি পাণ্ডুর ওর মুখ, চোখের নিচের কালি কি গাঢ়, হাত দুটি কি পাতলা, যেন স্বচ্ছ মনে হয়।

তখন তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন হঠাৎ থেমে গেছে। অন্ধের মত, অসহায়ের মত, ক্রুদ্ধ হয়ে এবং মিনতি ক'রে তিনি বার বার বলেছেন, 'ওকে সরিয়ে নিও না। ওকে কেড়ে নিও না। ও-ই আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। ও সরে গেলে আমি কেমন ক'রে 'বাঁচব?' এই সব সময়ে তিনি খুব সতর্ক থেকেছেন।

যখন তাঁর নিজেকে খুব সার্থক এবং খুব পূর্ণ মনে হয়েছে, তখন তিনি সতর্ক হয়েছেন। যেন সুখ তাঁর প্রাপ্য নয়, তাই সতর্ক হতে হবে। যেন যে-কোন সময়ে তিনি মৃত্যুর ঘ্রাণ পাবেন। মৃত্যুর ভেতর দিয়ে চলতে চলতেই তিনি এবং ব্রিজদুলারী জোর ক'রে সরে এসেছিলেন তা তাঁর মনে আছে। সেই মৃত্যুকে তিনি মনে করতে চান না। সুখ শান্তি নিরাপত্তা-তে ভবানীর ঘোর অবিশ্বাস, তিনি জানেন এদের আয়ু বড় কম।

॥ চৌত্রিশ ॥

পাপামৌ-য়ে একটি বাংলো বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে, এক অগ্রহায়ণের বিকেলে একজন ইংরেজ এবং একজন ভারতীয় ব'সে কথা বলছিলেন। ইংরেজটি প্রৌঢ়, তাঁর চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কথা বলতে বলতে তিনি চোখ তুলে তাকাচ্ছিলেন। তখন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল চোখের চাহনি অস্থির এবং উজ্জ্বল। ভারতীয়টির দীর্ঘ শরীর সবল, কপালে অজস্র রেখা, পোশাক উত্তর ভারতের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের মত। সাদা শেরওয়ানী এবং ধুতি।

তাঁর মাথার অধিকাংশ চুলই সাদা, তাই বয়স বোঝা কঠিন। তাঁরা কথা বলছিলেন। বেলা বড়জোর চারটে হবে। তবু বাতাস ঠাণ্ডা। শীত করে। বাদামগাছ থেকে অবিরত বড় বড় পাতা খসে পড়ছিল। যখন তাঁরা চুপ করছিলেন, তখনো পাতা-ঝরার ঝরঝর সরসর আওয়াজে বাতাস শব্দিত হচ্ছিল। নিস্তব্ধতাটা অখণ্ড এবং জমাট হতে পারছিল না। তারপর তাঁরা উঠে শুকনো পাতা এবং কাঁকর মাড়িয়ে বারান্দায় এলেন। একটি বড় ঘরে ঢুকলেন। সমস্ত জায়গা ছেড়ে ঠিক মাঝখানে গুটিকয়েক চেয়ার ছড়ানো। মাঝে নিচু তেপায়া। তেপায়ার ওপরের শিলিং থেকে শেকলে টাঙানো হ্যাজাক জ্বলছে। শিলিংএর মাঝখানে একটি বিরাট টানাপাখা ঝুলছে। পাখাটির লালশালুর ঝালর বিবর্ণ এবং ছেঁড়া। একজন চাকর এসে নিঃশব্দে কাঁচের দরজা বন্ধ করে দিল। তখন দেখা গেল বাইরে বাগানে কারা শুকনো পাতা জ্বালিয়েছে। আগুন ঘিরে তারা বসেছে। একটা কালো গুবরে পোকা আলোর বৃত্তটা ঘিরে পাক খাচ্ছিল, এবার সেটা মাটিতে পড়ল। ঠক্ ক'রে শব্দ হল। এঁরা আবার কথোপকথন শুরু করলেন।

'আমি ভেবেছিলাম আপনি আমায় সাহায্য করতে পারবেন,' ইংরেজটি ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, 'আমার এবং আপনার উদ্দেশ্য খুব পৃথক নয়।'

'সেখানেই বুঝতে ভুল হয়েছে আপনার।'

'ভুল!'

'ভুল নয়? আপনি ইতিহাস লিখতে চান। আপনি মিউটিনি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে চান। সে তথ্য প্রচুর এবং প্রভূত, আপনার দেশে বসেই পেতে পারতেন। আমি লিখেছি আমার নিজের অভিজ্ঞতা। দু'য়ের মধ্যে মিল কোথায়?'

ইংরেজটি বললেন, 'দেখুন, ভারতে আসবার এই সুযোগটা যখন হল, আমি সেটা ছাড়তে চাইনি। আমার জ্যাঠামশাই-এর নামটা কেন হঠাৎ ক্রনিকল থেকে মুছে গেল জানবার কৌতূহল ছিল। দেখুন, তারপরে আমার কৌতূহল বাড়তে থাকে, যখন এটুকু জানলাম যে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। হ্যাঁ, কানপুরে পৌঁছবার আগেই। মাঝপথে। আর্মির পুরনো লোক, রিটায়ার্ড অফিসারদের কাছে ঘুরে ঘুরে, আমি যে-সব টুকরো টুকরো খবর জেনেছি, তাতে আমার আগ্রহ বেড়ে যায়। তখন স্টেট্সম্যানে বিজ্ঞাপন দিতে

আরম্ভ করি। আপনার চিঠি পেয়ে আমার আশ্চর্য লেগেছিল। আমি তখন হায়দ্রাবাদে। যখন এলাম, তখন আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। একমাস আগে।'

'কেন ছাড়লেন?'

'বইটা যদি শেষ করতে পারি সে ইচ্ছেটাই মুখ্য, তবে স্বাস্থ্যের প্রশ্নটাও আছে বৈ কি!'

'দেখুন, ছোট ছোট অনেক কথাই জানলাম, যা'র কোন দামই হয়তো নেই, কিন্তু আমার জেনে ভাল লেগেছে।'

'যেমন?'

'যেমন ব্রাইট, একজন অন্যতম মিউটিনি হিরো। সে আসলে ছিল লুণ্ঠক এবং লুট করবার সময়েই সে গুলী খেয়ে মরে। অবশ্য বহুদিন অবধি তার নামে বড় বড় বই বেরিয়েছে, ইণ্ডিয়াতে বড় বড় শহরে তার নামে রাস্তা আছে। থাকলে কি হয়, ব্রাইট এবং তার ক্যাভেলরি সম্পর্কে আমি যে-সব খবর নিয়ে যাচ্ছি তা ছেপে বেরুলে লোকে তাজ্জব ব'নে যাবে।'

'আর?'

'আর তাকে মেরেছিল বিরিজ অথবা ব্রিজদুলারী নামে একটি মেয়ে, যার সম্পর্কে আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে অনেক কিছু বলতে পারেন, ইচ্ছে করলে না বলতেও পারেন, আমার কিছু বলবার নেই।' ইংরেজটি তাঁর চোখে চোখ রেখে বলে গেলেন।

ভারতীয়টির মুখ সাদা হয়ে গেল। নিজের হাতের আঙুলের দিকে চেয়ে তাঁর দৃষ্টি শূন্য এবং বিমর্ষ দেখাল।

তিনি একহাতে মুখ ঢাকলেন এবং বললেন, 'তারপর?'

'একটি নাচ-গার্ল-এর কথা শুনলাম, তার নাম চম্পা। তারপর ইভান্স নামে একটি ইঞ্জিনীয়ার, তার খোঁজ না কি অনেকদিন ধরে চলেছিল। আপনার হয়ত বিশ্বাস হবে না, কিন্তু এদের সম্পর্কে জেনেছি কাগজপত্র থেকেই —যুদ্ধের চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেও এইসব খবরই পৌঁছাত, আমাদের গুপ্তচর বিভাগ খুব নিপুণ এবং তাতেও প্রচুর ভারতীয় ছিল।'

ভবানীশঙ্কর মুখ থেকে হাত নামালেন। বললেন, 'ব্রাইটের কথা জানতে আমার আগ্রহ নেই। চম্পা শুধুই নাচ-গার্ল ছিল না। কিন্তু আপনি যাদের কথা বলছেন, তারা সবাই মৃত।'

'মৃত ?'

'দেখুন, যেহেতু তাদের কোন খবর পাওয়া যায় না, সেহেতু ধরে নিতে হবে তারা মৃত।'

'সবাই ?'

ভবানীশঙ্কর হাসলেন, বললেন, 'হ্যাঁ! যার কথা আপনি জানতে চাইলেন, সে দশবছর হল মারা গেছে। আপনি কি সেইসব মৃত নাম কবর থেকে খুঁড়ে তুলতে চান ?'

'না। ভুল বুঝবেন না। আমার মনে হয়েছে নানাসাহেব, বা অন্যদের চেয়ে এদের জীবন, এদের কাহিনী কম রোমান্টিক না।'

'রোমান্স। তা বলতে চাইলে বলতে পারেন। কেননা একদিন যারা বেঁচে থাকে, মৃত্যুর পর তারাই শুধুমাত্র নামে পর্যবসিত হয়ে যায় কি না! কিন্তু কেন আপনি এ সব জানতে চান ? এই ১৮৮৪তে আপনি কি নতুন ক'রে মিউটিনির আর একটা ইতিহাস লিখবেন ?'

'যদি লিখি...।'

'ছাব্বিশ বছরে বহু বই লেখা হয়েছে। আরো একটা বই না হয় লেখা হল, তাতে লাভ কি হবে ?'

'লাভ হবে না ? অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে...'

'না।' ভবানী তাঁর কথাটার ওপর জোর দিলেন। বললেন, 'বিষয়বস্তুটা এমনই, যে তার থেকে অনেক দূরে সরে দাঁড়িয়ে না দেখলে তাকে বিচার করা যাবে না। এবং, খুব বিনীত ভাবেই বলছি, একজন ইংরেজের পক্ষে বিষয়টিকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা সম্ভব হবে না।'

'একজন ভারতীয়ের পক্ষেই কি... ?'

'না। হয়ত না। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে না দেখলে ইতিহাসকে দেখা যায় না।'

'আপনি কি ভাবে বিষয়টিকে বিচার করেছেন ?'

ভবানী হাসলেন। বললেন, 'বিচার করবার কোন ক্ষমতাই নেই আমার। আমি, আমার ষাটবছরের জীবনে কোম্পানীর রাজত্ব এবং মহারানীর শাসন দেখেছি। আমি ভারতের জীবনযাত্রার বহু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। সে সম্পর্কে আমার ডায়েরী থেকে এই পরিবর্তনের মোটামুটি একটা বিবরণ লিখেছি। হ্যাঁ, তার মধ্যে ১৮৫৭-ও আছে

বৈ কি। ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ককে আমি যেমন বুঝেছি, তা রূপ দিতে চেষ্টা করেছি।'

'আপনার বই বাংলাতে লেখা?'

'হ্যাঁ।'

'বাংলাতে কি ইতিহাস জাতীয় বই লেখা সম্ভব?'

'কেন নয়! গত চল্লিশবছরে বাংলাভাষা এমন শক্তিশালী হয়েছে যে তাতে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, নানা জাতের পত্র-পত্রিকায় নিয়ত বেরুচ্ছে। বাংলা আজ ভারতীয় ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অনেক উঁচুতে তার স্থান।'

'আপনি কি স্বীকার করেন না এর মূলে ইংরেজ আধিপত্যের বিরাট অবদান আছে?'

'এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে আপনাকে খুশী করতে পারব না হয়ত, তবে আমাদের দেশ প্রাচীন, ভাষা প্রাচীন, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে আমরা একটি চলমান ও জীবন্ত শিক্ষা-সংস্কৃতির সাক্ষাৎ পেলাম। তাতে উপকার হয়েছে, প্রভূত উপকার হয়েছে…'

'আমরা শিক্ষা, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ আনলাম। আমাদের মিশনারী ফাদাররা আপনাদের জন্য…'

'হ্যাঁ। রেলওয়ে। রেলওয়ে এবং টেলিগ্রাফ। এবং আরো অন্যান্য জিনিস। কিন্তু জানবেন আমরা সেজন্য দাম দিয়েছি, ভীষণ দাম দিয়েছি।'

'বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার সবচেয়ে বেশী হ'ল, তবু আপনারা বড় প্রতিবাদ করেন, বিক্ষোভ জানান, প্রেস অ্যাক্ট, ইলবার্ট-বিল, এবং এইসব নিয়ে সর্বদাই…দেখুন মিউটিনির পর ত' আপনারা বুঝছেন, ওভাবে কোন বিদ্রোহ হয় না, হতে পারে না…।'

ভবানী উঠলেন, এবং হেঁটে আলোর বেষ্টনীটুকু অতিক্রম করে অন্ধকারের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালেন। গম্ভীর ও সংযত স্বরে বললেন, 'আমি জানি না আপনি কেন আমাকে দিয়ে এত কথা বলাচ্ছেন, তবে আমি ভাবি না, আর ভাবি না। আপনি যাকে মিউটিনি বলছেন, তাকে আমি খুব নিকট থেকে দেখেছি। কয়েক লক্ষ লোককে প্রাণ দিতে হয়, লক্ষাধিক লোক পরিচয় গোপন ক'রে পালায়, এবং তারা ঠগী, ডাকাত বা লুটেরা ছিল না, না!'

ইংরেজটি বললেন, 'এই কথাগুলো বলবার জন্যে আমি আপনাকে

বিপদগ্রস্ত করব না। না। আমি শুনতে চাই। আমার গায়ের চামড়া একটা মস্ত ব্যারিআর। কেউ মুখ খুলতে চায় না। মিউটিনিতে আমরা জিতলাম…' ভবানী ফিরে এলেন। চেয়ারে বসলেন। বললেন, 'আমার কি মনে হয় জানেন? কোন পক্ষই জেতেনি, কোনপক্ষই পরাজিত হয়নি। তবু আমরা লাভবান হয়েছি। কেন জানেন? এই রেলওয়ে, এই টেলিগ্রাফ, পার্মানেণ্ট সেট্‌লমেণ্ট, বিচার ব্যবস্থার রদবদল, এ সব পাওয়া গেছে। কিন্তু তার জন্যে আমরা ভীষণ দাম দিয়েছি, দিয়ে চলেছি।'

শুধু ফেমিন কমিশনের রিপোর্ট-ই দেখুন না! দুর্ভিক্ষ কি বন্ধ হয়েছে? লর্ড রিপন কি বলেন নি, 'দু'একবৎসর অন্তর লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যখন অনাহারে মরে, তখন বছরে পাঁচলক্ষ পাউণ্ড খরচ ক'রে রেলপথ করা হোক বা না হোক কিছু এসে যায় না।'

ইংরেজটি বললেন, 'হ্যাঁ। অতি দুঃখের কথা। অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। আমি সেটা বুঝি। আপনি ভাববেন না সাগরপারে এসব খবর পৌছয় না। অনেক ওয়েলথিংকিং ইংরেজ আছেন, তাঁরা ব্যথিত হন। আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার আপনার কথা শুনতে ভাল লাগছে। কিন্তু একটা কথা বলুন। আপনি কি স্বীকার করেন না, মিশনারী ফাদারদের আত্মত্যাগের জন্য বাংলাদেশে এবং অন্যত্র শিক্ষার প্রসার হতে সুবিধে হয়েছে?'

'মিশনারী!'

ভবানী চিবুকের নিচে বুড়ো আঙুলটি ঠেকিয়ে বুকে কনুই রেখে বসলেন। বললেন, 'আমি একজন মিশনারীকে দেখেছিলাম।'

ফাদার ব্রাউনের কথা তিনি বলে গেলেন। কথা বলতে বলতে রাত হ'ল। অনেকক্ষণ অবধি তাঁরা কথা বললেন। একসময় চাকর এসে খবর দিল। তাঁরা খেতে গেলেন। খাবার ঘরটি-ও বিরাট। নিরাভরণ এবং পরিষ্কার। একটি টেবিল, গুটিকয়েক চেয়ার। চারিদিকে অনেকখানি পরিসর। দরজার কাঁচে লাল ও সবুজ, সোনালী ও হালকা বাদামীতে গাছ, ফুল এবং দু'টি শিশুর ছবি আঁকা। দেওয়াল সাদা। চারিপাশের ধবধবে সাদার মধ্যে ছবিটিকে মোহনীয় দেখায়! ইংরেজটি মাঝেমাঝে চোখ তুলে তাই দেখছিলেন।

আহারের পর তাঁরা আর একটি ঘরে এসে বসলেন। ঘরটি ছোট। সাদা দেওয়াল। সাদা বিছানা। বুকশেল্‌ফে বই।

ছোট তেপায়ায় জলের গ্লাস। সসঙ্কোচে ইংরেজটি বললেন, 'আপনাকে হয়ত ঘরছাড়া করলাম।'

'না।' ভবানী মৃদু হাসলেন, 'এ ঘরটি আপনার জন্যেই পরিষ্কার করিয়ে রেখেছিলাম।'

'কালকেই বম্বে চলে যাব ভেবে খারাপ লাগছে।' ইংরেজটি বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম একটি সন্ধ্যায়ই আপনার সঙ্গে সব কথা বলা হবে। ভুল করেছিলাম।'

কিছুক্ষণ পরে তাঁরা আবার আলাপে নিরত হলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজটি ভবানীর একপ্রস্থ ধোয়ানো পাজামা, পাঞ্জাবি এবং শাল পরেছেন। ভবানী শালের কাজকরা একটি ঢিলে জামা পরেছিলেন। ইংরেজটি লক্ষ্য করে দেখলেন, হাসলেও ভবানীর চোখ দুটিতে হাসি ফোটে না। এবং অন্য সময়ে তাঁকে চিন্তামগ্ন, গম্ভীর ও বিষণ্ণ দেখায়।

ভবানী বললেন, 'ফাদার ব্রাউনকে আপনি কি বলবেন জানি না। তিনি সারাজীবনে ক'জনকেই বা ক্রিশ্চান করতে পেরেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে তাঁর স্মৃতিতে আমি যেন দেবতার মন্দিরের সান্নিধ্য অনুভব করি। সারাজীবন ধ'রে তিনি ছোট ছোট জিনিস শিখিয়েছেন—প্রসূতি, নবজাতককে অযত্ন কোর না, রোগ এড়াবার চেষ্টা ক'রো, শিশুদের চোখ ধুইয়ে দিও, পশুকে নির্যাতন ক'রো না, বৃদ্ধাদের ডাইনি ব'লে পুড়িও না, মদ খেও না। তাঁর মতো নিশ্চয়ই অনেকে আছেন। যাঁরা দূরদূরান্তে, সভ্যসমাজের বাইরে, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে আজীবন কাটিয়ে যান!'

'আমরা শিক্ষার কথা বলছিলাম।'

'শিক্ষা! দেখুন, শিক্ষাবিস্তারের জন্যে সব সময় তাঁরা চেষ্টা করেছেন বলে আমি মনে করি না। মূলতঃ ধর্মপ্রচার করতেই তাঁরা এসেছিলেন। কিন্তু প্রথমেই এ দেশের ধর্মবিশ্বাসকে নিকৃষ্ট মনে করা তাঁদের ভুল হয়েছিল। ধর্মের কথা যদি বলেন, এদেশে অনেক ধর্ম, শুধু কি হিন্দু, মুসলমান আর বৌদ্ধ? শিখদের নতুন ধর্মের কথা আমি যদি না-ও বলি, ঐ আদিবাসীদের কথা ভাবুন! আর্যসভ্যতার কত আগে থেকে কত হাজার বছর ধরে তাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসকে তারা রক্তের মধ্যে পালন করে আসছে তা আমরা জানি না। যদি হিন্দুধর্মের কথাই বলি, তবু বলব মিশনারীরা এই তেত্রিশ-কোটি দেবদেবীকে কেড়ে নিয়ে তার পরিবর্তে কি দিতে পারতেন?'

'তবু এখন অনেক লোকই ত ক্রীশ্চান হয়েছে।'

'হিসেব নিলে দেখবেন অজ্ঞ, দরিদ্র এবং সমাজের কাছে, শাসকের কাছে নিপীড়িত যারা, তারাই সংখ্যায় বেশী। শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, উঁচুঘরের ক'জন ক্রীশ্চান হয়েছেন?'

'শিক্ষার প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলেন আপনি।'

'না। আমি বলতে চাই, বাংলাদেশেই আগে ইংরেজী শিক্ষা আসে। কিন্তু বাঙালীরা শাসকদের ওপর নির্ভর ক'রে থাকেন নি। তাঁরা নিজেরা শিক্ষা লাভ করেন। তারপর তাঁদের চেষ্টাতেই স্কুল, কলেজ, মেয়েদের শিক্ষা বাড়তে থাকে। আমি একজনের কথা জানি কি তেজ, সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি শিক্ষাবিস্তারের পেছনে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

'কে তিনি?'

'তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আরো অনেকে আছেন, তাঁদের ভূমিকাও মস্ত বড়।'

'তিনি কি ব্রাহ্ম?'

'না। তিনি ব্রাহ্মণ।'

'হিন্দু?'

'ঠিক ঐটুকু বললে তাঁকে বোঝা যাবে না। আত্মবিশ্বাস, কর্মনিষ্ঠা, সবরকম সংস্কারকে উপেক্ষা করে একাকী কাজ ক'রে চলবার সাহস, অসাধারণ তেজস্বিতা সব মিলিয়ে আমি মনে করি এ দেশে এই যুগের মানুষের আদর্শ তিনি।'

বলতে বলতেই ভবানীর অনেকদিন আগেকার কথা মনে পড়ল। ফাদার ব্রাউন। বুকে হাত রেখে উচ্চারণ করা 'শূন্যতা নড়ে না, এখান থেকে নিঃসঙ্গতা সরে না।'

'শূন্যতা নড়ে না, নিঃসঙ্গতা সরে না' কথাদু'টি বারকয়েক তিনি মৃদুস্বরে আবৃত্তি করলেন। তারপর বললেন, 'আপনার বোঝবার মত ভাষায় বলি। মানুষ যত আধুনিক হচ্ছে, ততই সে নিঃসঙ্গতা এবং শূন্যতা অনুভব করছে, তাই না? সে-দিক থেকে বিদ্যাসাগর চৌষট্টি বছরের বৃদ্ধ হলেও অন্তরের গভীরে বোধহয় নিঃসঙ্গ।'

'আপনি কি তাঁর বন্ধু?'

'ছি ছি! আমার মত মানুষ কি তাঁর বন্ধু হতে পারে? আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি এইমাত্র।'

'আপনার কথা শুনে আমার বাংলা দেশে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'গেলেই কি আপনি বাংলা দেশকে বুঝতে পারবেন? তবে দেখলে ভালো লাগবে। অন্ততঃ বাংলা যে জাগ্রত হয়েছে, সেটা বাইরে থেকেও দেখে বোঝা যাবে।'

'কিন্তু রাত যে অনেক হল। মিউটিনির কথা…'

'মিউটিনি!'

ভবানী তাঁর সাদা, ঘন চুলগুলি কিছুক্ষণ টানলেন। তারপর মুখ তুললেন। বললেন, 'মিউটিনি থেকে আমরা লাভবান হয়েছি তাই বলছিলাম? হ্যাঁ। লাভবান হয়েছি। দেখুন, ইংরেজীতে অনেক বই পড়েছি। এ নিয়ে আলোচনাও কম শুনিনি। এর কারণ কি, মুল কোথায় তা নিয়েও আমি আলোচনা করব না। আমিই কি সব বুঝি? তবে কার্তুজের চর্বিটা কিছুই নয়। ওটা মুহূর্তের সত্য। কারণ ছিল অন্যত্র। লাভের কথা বলেছি? কয়েক লক্ষ মানুষকে মরতে হয়েছিল সেদিন।' কিন্তু তারপর থেকে ভারতবর্ষের মানুষ এ কথা বুঝল, বাঁচতে হলে নিজেদের বাঁচাতে হবে। কেননা শাসকদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান কত বড, কি চোখে তাদের দেখা হয় তা ১৮৫৭-৫৮-তে বোঝা গিয়েছিল। এক হবার নয়, এক হতে পারে না, তা আবার, গত বছর, কিন্তু ইলবার্ট বিল নিয়ে আলোচনা করব না। আপনি জানবেন, ছাব্বিশ বছর হয়ে গেছে, তবু মিউটিনি দুই জাতের মনেই কাজ করে চলেছে। ১৮৫৭ সালে সেই বিরাট ব্যাপারটি সম্পর্কে ভারতবর্ষে, এমন কি বাংলাদেশেও কতজন বা মাথা ঘামিয়েছিল। তখনো এমন কথা কেউই ভাবতে পারত না যারা ধ্বংস হ'ল, এবং যাদের গায়ে আঁচ লাগল না, তারা একই জাতির লোক। আমার ভাবলে আশ্চর্য লাগে, ১৮৫৭-তে সেই যুদ্ধ, অরাজকতা, অত্যাচার, হত্যা, ১৮৫৭-র অনেক মানুষের কাছেই দূরের ব্যাপার ছিল। ১৮৮৪-তে ১৮৫৭ মানুষের চিন্তায় অনেক কাছে এসেছে।'

কিছুক্ষণ সময় নীরবে কাটল। ইংরেজটি বললেন, 'কিন্তু ব্রিটিশ শাসন এখন অনেক বেশী বদ্ধমূল!' তাঁর কথায় সামান্য ব্যঙ্গের সুর ছিল।

'নিশ্চয়ই।' কিন্তু দু'টি জাতের মাঝখানে সেই সাতান্ন সাল একটি

বিরাট গহ্বর রচনা করেছে। সে খাদ বেড়েই চলেছে। তাকে আপনি বোজাবেন কি দিয়ে?'

'পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে। আমার মতো আরো যাঁরা আছেন…'

'না। আমার মনে হয় এই ব্যবধান বাড়তেই থাকবে। কেরী এবং ডাফ, সেদিনের স্কুলমাস্টার হেয়ার এবং আজকের লর্ড রিপণ, আপনার মতো কতিপয়, আপনার ভাষায় 'ওয়েল থিংকিং' ইংরেজ কি সেতু বাঁধতে পারেন? আপনি কি শহরে শহরে এখন ক্রমেই ক্লাব, জিমখানা, পোলোগ্রাউণ্ড; এ ছাড়া ইংরেজদের অন্য কোথাও দেখতে পান? না। অথচ ফ্যানীকুপার পড়ুন, পঞ্চাশষাট বছর আগেও ইংরেজরা রীতিমতো সংসার পাততেন এখানে।'

এবার ইংরেজটি, ভারতে ইংরেজদের জন্যে যেন হঠাৎ বিপন্ন বোধ করলেন। বললেন, 'আপনি শিক্ষিত, আপনি কি মনে করেন, এরপর…'

'আরো ক্লাব, আরো জিমখানা, এবং মনে হয় এই-ই চলবে!'

'আপনার কথাবার্তা…'

'আপত্তিজনক, এই ত? দেখুন, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবার আগে আমি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছি। আপনি জানেন না, আমি আজ একান্তই একলা। এ সব কথা বলবার জন্য যদি কোন বিপদ হয়, তাতে আর ভয় করি না। বিপদকে খুব কাছে থেকে দেখেছি বলেই বোধহয় ভয়টা কেটে গেছে।'

'আপনি কি ভাগ্যবাদী?'

'অস্বীকার করতে পারি না। ভাগ্যের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

'যতক্ষণ কথা বললেন, শুধু বাংলার কথাই বেশী বললেন। অথচ আশ্চর্য, আমি শুনেছি আপনি ত্রিশবছরের ওপর প্রবাসী।'

'বাংলার কথা বেশী বলেছি? এই শতকের বাংলার কাছে সারা ভারতবর্ষ ঋণী। অবশ্য জানি না সে ঋণ একদিন কারো মনে থাকবে কি না!'

'আপনি মিউটিনি সম্পর্কে সব রোমান্সটুকু কেড়ে নিলেন আমার। তাদের কথা বললেন না…।'

'আমি তাদের খুব নিকটে থেকে দেখেছি। তারা মানুষ। তারা একদিন ছিল, এবং আজ তারা নেই। যাদের সঙ্গে জীবনের আশ্চর্য

কতকগুলো দিন যাপন করেছি তাদের সম্পর্কে আমি আপনাকে কি বলতে পারি?'

'মনে হচ্ছে আপনি বই লেখবার জন্য তাদের কথাগুলিকে আমার কাছে গোপন রাখলেন।'

'না। চম্পা কি শুধুই নাচ-গার্ল ছিল? চন্দন নামে একটি ছেলে, সে তাকে ভালবাসত—সেই চন্দন ভগবানপুরে ফাঁসীতে মরে। সম্পুরণ নামে একটি লোক ছিল, সে বিশ্বাস করত সে গতজন্মে শিবাজী ছিল। সে মারা যায়···। আপনার ইচ্ছে হলে আপনি এ থেকে রোমান্স রচনা করতে পারেন। আমি কি করে পারব? আমি তাদের দেখেছি, তাদের জীবন, তাদের মৃত্যুর কথা আমি জানি!'

'আর ব্রিজদুলারী? ১৮৫৭-তে যে কানপুরে সবচেয়ে সুন্দরী বলে খ্যাত ছিল?'

ভবানী উঠলেন। বললেন, 'আপনার আত্মীয় কর্ণেল ম্যাকমোহনের সেই পাণ্ডুলিপিটি আপনাকে দিই।'

তিনি উঠলেন, এবং নিজের ঘর থেকে বিবর্ণ, প্রায় খসে-পড়া একটি চামড়ায় বাঁধানো খাতা এনে দিলেন। প্রথম পাতাটি খোলা হল।

'ফিফটি ইআর্স ইন ইণ্ডিয়া'— টানা, ডানদিকে হেলানো, বড় বড় হরফে লেখা। ভবানী বললেন, 'আপনার সমস্ত পরিশ্রম, এই একটি খাতা দেখেই বুঝবেন, বৃথা হয়নি। আপনি মূল্যবান একটি জিনিস পেয়েছেন। এই বইটি অসমাপ্ত। আপনি বোধ হয় জানেন, কর্ণেল ম্যাকমোহন আত্মহত্যা করেছিলেন। তিনি এ দেশকে ভালবাসতেন। আপনি খাতাটি সযত্নে পড়বেন, তারপর বুঝতে চেষ্টা করবেন আজীবন যিনি আর্মিকে সেবা করেছেন, সেই সত্তর বছরের বৃদ্ধ আত্মহত্যা কেন করলেন! যদি তা বোঝেন, তবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে, হয়তো আরো অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। যা আমি আপনাকে বোঝাতে পারিনি!'

'আপনার বই?'

'আমার বই ত' আমারই কথা বলবে।'

'আমাকে পাঠাবেন ত?'

'ওই বইটি প্রকাশ করবার জন্যেই একবার কলকাতা যাবার ইচ্ছা রাখি। যদি প্রকাশ করতে পারি, তবে পাঠাব।' ভবানী বেরিয়ে এলেন।

প্রশস্ত হলঘর পেরিয়ে তিনি নিজের ঘরে ঢুকলেন। ঘরটি বড়। একদিকে তাঁর শয্যা, টেবিল, চেয়ার, বইয়ের শেল্‌ফ। একদিকে দেওয়াল আলমারী পর্দা দিয়ে ঢাকা। ঐ আলমারীতে তাঁর পোশাক, ব্যবহারের জিনিসপত্র। একদিকের দেওয়ালে একটি তৈলচিত্র আবরণ দিয়ে ঢাকা। ভবানী আবরণটি সরালেন। ছবির গলায় সোনার হার ঝুলছে। তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন সেদিক পানে। তারপর ধীরে ধীরে আবরণ টেনে দিলেন। তিনি ইজিচেয়ারে এসে বসলেন।

দশবছর আগেকার সেই দিনটির কথা মনে পড়ছে। বরাবরই তাঁর মনে ভয় ছিল হয়তো ও বাঁচবে না। হয়তো তাঁকে আবার নিদারুণ আঘাত পেতে হবে। তবু ত' এক সঙ্গে তাঁরা সতরো বছর কাটালেন। কয়েক বছর ত' আত্মগোপন করেই থাকতে হল।

ব্রিজদুলারীর শরীরটা দুর্বলই ছিল। তারপর সে রক্তশূন্যতায় ভোগে। দুর্বল ও জীর্ণ শরীরে আস্তে আস্তে কত রোগই যে বাসা বাঁধল। শেষের চারটে মাস ত' সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। ভবানী নিজে সব দায়িত্ব নেননি। নীলকমল সেন খুব যত্ন ক'রে চিকিৎসা করেন। তিনি রোজই আসতেন। সন্ধ্যেবেলা এসে তার পাশে বসতেন। তার সঙ্গে গল্প করতেন। ভবানীকে সাধ্যমতো সান্ত্বনা দিতেন। একদিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, 'আমাদের ক্ষমতা বড কম। চিকিৎসা ক'রে কি আয়ু দেওয়া যায়?'

ভবানী বুঝেছিলেন নীলকমল সেন পরোক্ষে তাঁকে মন শক্ত করতে বলছেন। তিনি নিজেও মনকে প্রস্তুত করতে চাইছিলেন। মনে হচ্ছিল ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার। নইলে অতবড় শূন্যতা তিনি সইবেন কি করে?

ভাবতেন, কিন্তু পারতেন না। ব্রিজদুলারী তাকে শক্ত হতে দিত না। এত বোঝে এত জানে, তবু স্বীকার করতে চাইত না যে সে মরতে চলেছে। ভবানীকে বড্ড বেশী আঁকড়ে ধরেছিল। সব সময় চোখের সামনে রাখতে চাইত। একদিন কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'আমি এত বাঁচতে চাই, তবু ভগবান আমাকে সরিয়ে নিচ্ছেন কেন?' সে কথা শুনে ভবানী তাকে সান্ত্বনা দেন, 'এই ত' তুমি আগের চেয়ে ভাল হয়ে উঠছ। দেখো, এবার শীতের সময়েই তুমি ভাল হয়ে উঠবে।'

ক্রমে, সে বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গেল। শেষের দিকে ভবানী

একবার বলেছিলেন, 'তুলালী, শ্রীকণ্ঠজীকে ডাকব? তুমি যে ওর গলায় ভাগবত শুনতে চেয়েছিলে?'

সে মাথা নাড়ে। একটু হেসে বলে, 'তার চেয়ে তুমি আমাকে একটু পড়ে শোনাও। সেই যে 'ন জায়তে, ন মৃয়তে'—। তারপর তার চোখ দিয়ে জল পড়ে। তাঁর হাত ধ'রে বলে, 'তুমিই আমাকে তৈরী ক'রে দাও না গো। তুমি বুঝিয়ে দিলে আমার মরতে ভয় করবে না।'

একদিন সকালে তার মৃত্যু হল। সারারাত কষ্ট পায়। বাঁচবার কি যে আকাঙ্ক্ষা! একটু নিশ্বাসের জন্যে কি কাতর চেষ্টা। তারপর সকাল হল। ভবানী বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি ঝুঁকে পড়ে তাকে বারবার ডাকছিলেন। নীলকমল সেন বালকের মত কেঁদেছিলেন।

তারপর শ্মশান। তুপুরের রোদে চিতার ধোঁয়া নীল। ভবানী একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। এমনি ক'রে দেখলে তবে যদি বিশ্বাস হয়। নইলে বিশ্বাস করবেন কেমন করে? একসময়ে সব শেষ হল। গঙ্গামাটিতে মুড়ে নাভিকুণ্ডল গঙ্গার জলে ফেলে দিলেন। হাতে ফোস্কা পড়ল। নীলকমল সেন তাঁকে হাত ধরে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে এলেন ভবানী। দরজা খুলে ঢুকলেন। ওপরে উঠলেন। শূন্য ঘর, শূন্য খাট, মেজেতে জলের দাগ, অগ্রাণের তীব্র শীতল বাতাস অবাধ গতিতে ঘরে ঘরে বয়ে যাচ্ছে। মেঝেতে গণ্ডীদেওয়া এবং তাতে একটি নির্বাপিত প্রদীপ বসানো।

তারপর সে কি উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা জীবন! কিছুতেই নিজেকে শাসনে আনতে পারেন না। কেবলই ভেঙে পড়েন। কত মনে করেন এমন ক'রে তুর্বল হবেন না! কিছুতেই কিছু হয় না। তখন নীলকমল সেনের সে কি আন্তরিক চেষ্টা! তাঁকে কত বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'ভবানীবাবু, আমরা ভারতীয়। জৈবদেহের মৃত্যুতে মানুষ শেষ হয়ে যায় না। সে বৃহত্তর, চিরন্তন এক জীবনস্রোতে মিশে যায়। বিশ্বাস করতে চেষ্টা কর।'

ভবানী উত্তর দিতেন না। তিনি শুনতেন। সবটুকু হয়ত অনুধাবন করতেও পারতেন না।

তখন নীলকমল সেন জোর করে তাঁকে চাকরি দেওয়ালেন। চাকরি দেবার আগে অবশ্য তাঁকে অনেক জবাবদিহি করতে হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের

কাছে, কমিশনারের কাছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। শুনতে শুনতে তাঁর মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেত।

'যখন আপনি জানতেন আপনি নির্দোষ, তখন কেন প্রথমেই যে-কোন ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নি?'

'যে মহিলাকে আপনি বিবাহ করেন, তাঁর প্রকৃত পরিচয় কি?'

ভবানী কিছুই লুকোননি। সব কথাই বলেন। শুধু ব্রাইটের হত্যার খবরটি গোপন রাখেন। চাকরি নেবার বয়স তাঁর ছিল না। কিন্তু কলকাতা থেকে পাশকরা ডাক্তার এত বেরুচ্ছে না, যে তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে বাদ দেওয়া চলে।

নীলকমল সেন তাঁর সবটুকু প্রভাব সবটুকু প্রতিপত্তি কাজে লাগাল।

নীলকমল সেন।

সাতবছর আগে রক্তচাপে মাথার শির ছিঁড়ে তাঁরও মৃত্যু হয়েছে।

ভবানী খবর পেলেন দেরিতে দেখা হল না। বৃদ্ধ ব্রিজদুলারীকে সত্যই ভালবেসেছিলেন। তার মৃত্যুর ক'দিন আগে পাশে বসে, 'অপার মহিমা তব, সত্যপ্রেমরূপ তুমি হে' গানটি গেয়ে তাকে শোনান।

সময়ের প্রলেপ কেমন ক'রে সেই শোকের তীব্রতাকে জুড়িয়ে দিয়েছে। আজ ভবানী অনুভব করেন, অন্তরে যেন তাকে গভীরভাবে পেয়েছেন। যেন নিঃশেষে হারাননি।

ভবানী চোখ তুললেন। ইজিচেয়ারে বসেই রাতটা কাটল তবে। তিনি উঠে দরজার কাছে এলেন। কাঁচের শার্সি দিয়ে বাইরের আকাশ দেখা যাচ্ছে। পুবের আকাশ ফিকে। ঐ শুকতারা দপদপ করছে।

কপালটা টনটন করছিল। দরজার ঠাণ্ডা কাঁচে কপালটা রেখে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বইটি নকল করতে হবে। তারপর তিনি বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখবেন। বিদ্যাসাগর হয়ত তাঁকে স্মরণ করতে পারবেন না। কেমন করেই বা পারবেন! কিন্তু ভবানী ত' তাঁকে বিব্রত করবেন না। বই নিজের খরচেই ছাপবেন। তাঁর পরামর্শ নেবেন শুধু। বিদ্যাসাগর অবশ্য এখন আগেকার মত সবরকম কাজে জড়িয়ে পড়েন না। তবু, তাঁর আশ্বাস ও উৎসাহ পেলে তবেই তিনি যাবেন। বাংলাদেশে তাঁকে কে

চিনবে? বাবা নেই। বৈমাত্রেয় ভাই বিজয়শঙ্কর হয়ত তাঁকে মৃত বলেই মনে করে।

ভবানী ভাবলেন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে চিঠির জবাব পেলে তবে কলকাতা যাবেন।

পঁয়ত্রিশ

১৮৮৬ সাল।

একটি গরুর গাড়ী ধীরে ধীরে সুজাখাল গ্রামের দিকে চলছিল। গ্রীষ্মের শেষ রাত। গাড়ীতে একজন বৃদ্ধ শুয়েছিলেন। তাঁর শরীর নিস্পন্দ এবং চোখ নিমীলিত-প্রায়। মাথার নিচে বালিশ ছিল না। মাথাটি পেছনে হেলে পড়েছিল। হাত দুটি বুকের ওপরে রাখা। তাঁর চুল ও ভ্রূ সাদা। দীর্ঘ দেহ এবং পোশাকে আভিজাত্য আছে। তাঁর বাক্স, বিছানা কোণে দড়ি দিয়ে বাঁধা। গাড়ীর ছৈ-এ গাড়োয়ানের দুটি তিনটি তেলের শিশি ও হুঁকো দড়িতে বাঁধা ছিল। ঠোকাঠুকিতে তার শব্দ হচ্ছিল। গাড়ীর ছৈ-এর মুখে একটি লণ্ঠন বাঁধা। তাতে সামান্য লালচে আলো ও প্রচুর কালি, ধোঁয়া উঠছিল। গাড়োয়ান ঢুলছিল। গরু দুটো অভ্যাস বশে চলছিল। মাঝে মাঝে তাকিয়ে গাড়োয়ান আরোহীকে দেখছিল।

অজ্ঞান ও অসুস্থ অবস্থায় ওঁকে কলকাতাগামী ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ছোট স্টেশন। স্টেশন থেকে গ্রাম সাতমাইল দূর।

অজ্ঞান মানুষটির পরিচয় জানা যায়নি। স্টেশন মাস্টার শেষ ট্রেনটি পাস করিয়ে বাড়ী যাবার সময়ে আবার ওঁর কাছে যান। গাড়োয়ানটি যাত্রী পাবার আশায় এসে বসেছিল। সে যাত্রী পায়নি। মুমূর্ষু মানুষটিকে সে জল দিচ্ছিল এবং তাঁর পাশে বসে মাথায় হাত রেখে নিয়তি এমন দুর্বোধ্য কেন তাই ভাবছিল। নিয়তিই যে ঐ বৃদ্ধকে টেনে নামিয়েছে তাতে তার সন্দেহ ছিল না।

স্টেশন মাস্টার যখন ওঁকে প্রশ্ন করেন, তখন উনি ঘোলাটে চোখে তাকান, জড়িত ও অস্ফুট স্বরে বলেন, 'বাংলাদেশ…কলকাতা…বিদ্যাসাগর …চিঠি…আমার বই!'

আবার বলেন, 'বাংলাদেশে যাব।'

স্টেশন মাস্টার তখন তাঁর ব্যাগ, চেনঘড়ি ইত্যাদি নিজের জিম্মায়

রাখেন। গাড়োয়ানকে একটি টাকা দেন। বলেন, 'চৌধুরীবাবুদের অতিথশালায় নিয়ে যা।'

তখন তিনি অস্ফুটে বলেন, 'কোথায়?'

স্টেশন মাস্টার বলেন, 'সুজাখাল গ্রাম। বিজয়শঙ্কর চৌধুরীর বাড়ী। ওখানে ডাক্তার বদ্যি পাবেন। চৌধুরীমশাই বড় ভাল লোক।'

'কলকাতা যাব।' আবার তিনি শিশুর মত বলেন।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবেন।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' জড়িয়ে জড়িয়ে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

রাত অন্ধকার। সামনের পথ সেই অন্ধকারে হারিয়ে রয়েছে। গাড়োয়ানটি একমনে গাড়ী চালাচ্ছিল। তবুও ঢুলুনির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছিল না। খাওয়া না-হওয়াতে ঘুমটা আরো জেঁকে বসতে চাইছিল।

বৃদ্ধের প্রশ্ন শুনে সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তাঁকে ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে না। তিনি অন্ধকারে মিশে রয়েছেন। তাঁর বুকের ওঠা-নামাটা সে লক্ষ্য করল।

'সুজাখাল, আমরা সুজাখালকে যেছি বাবু।'

গাড়োয়ানটির মনে হল জবাব শুনে বৃদ্ধ হাসলেন। অন্ধকারে সেই হাসিটি বড় অদ্ভুত দেখাল। লোকটির কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। তার মনে হল, এপথ আর শেষ হবে না, কখনোই না এবং তারা কোনদিনই আর নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছতে পারবে না। সে তাড়াতাড়ি গরুদুটোর লেজ মুচড়ে দিল এবং মুখ দিয়ে একটা শব্দ করল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। আকাশের একটা দিক একটু একটু ফর্সা হচ্ছে। বৃদ্ধ বিড়বিড় ক'রে কি যেন বললেন। গাড়োয়ানটি কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল।

'আর কতদূর?'

'এই যে আসি গেলম বাবু—হঃ, হঃ।' গরু দু'টিকে আবার তাড়া দিল লোকটি।

বৃদ্ধটি আর কোন কথা বললেন না, শুধু তাঁর গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় শব্দ হল।

চৌধুরীদের বাড়ীর সামনে গরুর গাড়িটির ছই খুলে ফেলা হয়েছিল। দু'-একটি ক'রে অনেক মানুষ জমেছিল। জটলা করছিল তা'রা, তাদের মুখে-চোখে বিস্মিত কৌতূহল স্তব্ধ হ'য়ে ছিল। গাড়োয়ানটি মাঝে মাঝে বলতে চেষ্টা করছিল যে, বাবু বলেছিলেন কলকাতায় যাবেন, বাংলাদেশে। কিন্তু কেউই তা'র কথা শুনছিল না এবং সে হাতের গামছাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস খাচ্ছিল ও সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটির গুরুত্ব বোঝবার চেষ্টা করছিল।

চৌধুরীবাড়ীর কর্তা বিজয়শঙ্কর এলেন। বৃদ্ধের বাক্সটি খোলা হল। একটি চিঠি ওপরেই ছিল। খামের ওপর নামটি দেখে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হন। তখন বৃদ্ধের নিস্পন্দ শরীরটির দিকে তিনি ভাল ক'রে তাকান। তারপর চিঠিটি প'ড়ে প্রেরকের নাম দেখে আরো অবাক হন।

পূব-আকাশ তখন আলোয় আলো হ'য়ে উঠেছে। সেই আলো এসে পড়েছে শায়িত বৃদ্ধের মুখে। মৃত্যুর আগে বৃদ্ধটি জেনে গিয়েছিলেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশেই এসে পৌঁছতে পেরেছেন।

—